সোমেন চন্দ: মার্কসবাদী বিপ্লবী ও সাহিত্যিক

ড. সফিউদ্দিন আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

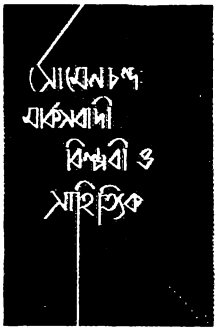

ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে শহীদ মহান বিপ্লবী সোমেন চন্দ ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান মার্কসবাদী ও নিষ্ঠাবান সংগঠক এবং তিনি ছিলেন সাড়া জাগানো 'প্রগতি লেখক সংঘের' সম্পাদক।

সোমেন চন্দের আরো একটি বড়ো পরিচয় তিনি একজন বড়োমাপের ছোটগল্প লেখক - 'দাঙ্গা' 'সংকেত' 'ইঁদুর' ও বনস্পতি'র মতো বৈশ্বিক চেতনায় উজ্জ্বল ও চিরন্তন আবেদনে ভাস্বর কিছু গল্প লিখেছেন এবং তার বেশ ক'টি গল্প ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

প্রগতির পদাতিক সোমেন চন্দ ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলনে যোগদানের জন্য রক্তিম পতাকা হাতে মিছিলে নেতৃত্বদান কালে ফ্যাসিবাদী অপশক্তি তাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। তখন তার বয়স মাত্র বাইশ বছর (২৪.০৫.১৯২০-০৮.০৩.১৯৪২)। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তেও তার হাতের মুঠোয় ছিলো কমিউনিষ্ট পার্টির রক্তিম পতাকা।

কৃতী সন্তানের রত্নভূমি, নরসিংদীর পলাশ উপজেলার বালিয়া গ্রামে তার জন্ম।

সোমেন চন্দের জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে এ আকর্ষণীয় ও হৃদয়স্পর্শী গবেষণা গ্রন্থটি রচনা করেছেন নরসিংদী জেলার আরেক কৃতী সন্তান, মৌলিক গবেষক ও সাহিত্যিক প্রফেসর ড. সফিউদ্দিন আহমদ। তাঁর আলোচনায় যুগ-মানসের উত্তাপও উৎসারিত হয়েছে। বিপ্লবী ও সাহিত্যিক সোমেন চন্দের ওপর ইহাই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা গ্রন্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমেন চন্দ
মার্কসবাদী বিপ্লবী ও সাহিত্যিক

ড. সফিউদ্দিন আহমদ

বিশ্বসাহিত্য ভবন ॥ ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশকাল ❑ বইমেলা ২০১০

প্রকাশক ❑ তোফাজ্জল হোসেন
বিশ্বসাহিত্য ভবন ❑ ৩৮/৪ বাংলাবাজার (দোতলা) ঢাকা ১১০০
অক্ষরবিন্যাস ❑ কমপিউটার ল্যান্ড ৪৭/১ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ ❑ সালমানী মুদ্রণ সংস্থা ৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ ❑ নাসিম আহমেদ স্বত্ব ❑ লেখক

মূল্য ❑ ৩০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-8309-445-1

যুক্তরাজ্য পরিবেশক ❑ সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক ❑ মুক্তধারা, জ্যাকশন হাইট, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

অগ্নিযুগের বিপ্লবী
ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ
ও
সতীশ পাকড়াশী-কে
স্মরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবেদন

সোমেন চন্দ শুধু একজন নিষ্ঠাবান বিপ্লবী ও নির্দ্বান্দ্বিক মার্কসবাদীই নন—সাহিত্যলোকেও তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার ওপর এ আমার কোন মহৎ গবেষণা কর্ম নয়—আগামীদিনের গবেষকদের জন্য আমি শুধু কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছি মাত্র। তবে এ পর্যন্ত সোমেনের জীবন ও সাহিত্য কর্ম নিয়ে এ'ই প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। যদিও এখানে আমার সীমাহীন দুর্বলতা ও অক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে।

পৃথিবীর আদিম স্তরে না কি, তামা, লোহা, সীসে, সোনা ও হীরে একই গলিত অবস্থায় ছিলো। বহু বিবর্তনে এগুলো আলাদা রূপ নিয়েছে। সোমেনের ওপর আমিও এ আদিম স্তরের কাজই করেছি।

সোমেনকে নিয়ে লিখতে গিয়ে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি—আমাদের রায়পুরা পশ্চিম পাড়ার বঙ্কু ডাক্তারকে। তিনি ছিলেন বিখ্যাত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও রাজনীবিদি ব্রজেন্দ্রচন্দ্র সাহার বাবা।·বঙ্কু ডাক্তারের পুরো নাম বঙ্কিমচন্দ্র সাহা, তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ ও সতীশ পাকড়াশীর সাথে বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে সক্রিয় ছিলেন। নেপথ্যে কাজ করেছেন বলেই তিনি সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন না।

১৯৬৫ সনে ব্রজেন্দ্র সাহা জেলে যাবার আগে বিপ্লবীদের সম্পর্কিত হাতে লেখা দু'টি বই এবং বঙ্কু ডাক্তারের কাছে লেখা বিপ্লবীদের চিঠি পত্রসহ বেশ কিছু গোপনীয় কাগজপত্র আমার কাছে রেখে যান। দু'টি চিঠিতে সোমেন প্রসঙ্গেও কিছু তথ্য ছিলো। ১৯৬৮ সনে আমি নেত্রকোণা কলেজে অধ্যাপনাকালে একদিন রাতে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক আমার কোয়াটার্স তছনছ করে ঐ সমস্ত গোপনীয় বই, চিঠি ও কাগজপত্র নিয়ে যায়। এরপরও একটি বই এবং সোমেন সম্পর্কিত দু'টি চিঠি আমার ছাত্রী নন্দিতা অনেক গোপনে আঁকড়িয়ে রেখেছিলো—কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় সেও এগুলো রক্ষা করতে পারে নি।

এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে বই ও পরামর্শ দিয়ে উদারভাবে সাহায্য করেছেন ড. পবিত্র সরকার, ড. অরবিন্দ পোদ্দার, ড. অজন্তা মিত্র, কবি আশিস সান্ন্যাল, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অনুজপ্রতিম নীতীশ বিশ্বাস এবং ড. চয়নিকা রায় ও সজল চৌধুরী। তাদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আমাদের এলাকাকে বিপ্লবী এলাকা হিসেবে অভিহিত করে সোমেন চন্দ সম্পর্কে আমাকে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু করে তুলতেন বিপ্লবী বিজয় চ্যাটার্জী, রণেশ দাশগুপ্ত, আমার শিক্ষক শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও ফয়েজ মাস্টার। তারা আজ আর নেই।

প্রাক্তন সচিব মোহাম্মদ আলী সাহেব বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় সোমেন চন্দ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন। তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

জ্ঞান মনীষা ও পাণ্ডিত্যে ঋদ্ধ এবং নান্দনিক ব্যক্তিত্ব জনাব মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন মন্টু তার সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ বই আমাকে শুধু ব্যবহার করতেই দেন নি, সোমেন সম্পর্কে বই রচনায় আমাকে অনুপ্রাণিতও করেছেন। তার প্রতি আমি শ্রদ্ধান্বিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত, মাঈনউদ্দিন খন্দকার, খায়রুল আলম মল্লিক, বেস্টওয়ের মিজানুর রহমান, লীনা চক্রবর্তী, প্রণব চক্রবর্তী, অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া তপন, ঔপন্যাসিক হরিপদ দত্ত, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক সরকার আবুল কালাম, অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তাফা মিয়া, অধ্যক্ষ কবি ড. মশিউর রহমান মৃধা, নন্দিত মেয়র লোকমান হোসেন, ড. আবদুল হাই ছিদ্দিক, কামরুজ্জামান কাজল, অধ্যাপক শহিদুল হক সুমন, রাকিব হাসান, কবি গবেষক জনাব জাকির হোসেন, জি. এম. কামাল হোসেন, মোমেন সরকার, আসাদুজ্জামান খোকন। পাপিয়া দত্ত, জনাব হাবিবুল্লাহ পাঠান, আফছার উদ্দিন আহমদ, মোফাজ্জল হোসেন খোকন, উৎপল, সমীর সাহা, ঝুমুর, শিশির, পলাশ ও মাসুদ রানা।

বইটি সম্পর্কে দারুণ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যবৃন্দ, খোঁজ-খবর নিয়েছেন প্রফেসর এম. এম. আকাশ, আফরোজান নাহার রাশেদা, তনুজ কান্তি দে এবং প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন নরসিংদী, রায়পুরা, শিবপুর, মনোহরদীসহ সোমেনের জন্মস্থান পলাশের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। তাদের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা।

আমার পরম প্রিয় ছাত্র, মৌলিক গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের নন্দিত অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত সোমেন চন্দ রচনাবলী থেকে আমি পরিশিষ্টের গল্প এবং সোমেনের মূল রচনার উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছি।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সোমেনের ওপর তথ্য সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেছে আমার বড়ো মেয়ে খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির সিনিয়র লেকচারার সোহেলী সায়লা আহমদ, আমার ছেলে গীতিকার ও একটি বিদেশী বিজ্ঞাপনী সংস্থার চিফ ক্রিয়েটিভ সুপারভাইজার সাকী আহমদ ও আমার ছোট মেয়ে আর্কিটেকচারের ছাত্রী সেঁজুতি এবং আমার জামাতা রেজাউল কবীর। তাদের প্রতি শুভেচ্ছা।

আমার স্ত্রী শিরিয়া আহমদ সব সময়ই আমার লেখা ও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে যত্নবান থাকে। এ বইয়েও তাই হয়েছে। তার সীমাহীন আনন্দ আমার বই প্রকাশ হলে।

মার্কসবাদী সোমেন চন্দ 'প্রাঙ্গণ' পত্রিকায় এবং সাহিত্যিক সোমেন চন্দ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের 'বই' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বসাহিত্য ভবনের নন্দিত প্রকাশক সুপ্রিয় অনুজপ্রতিম তোফাজ্জল হোসেন বইটি প্রকাশের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে শাহজাহান সাহেব এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ও আমার ধন্যবাদ।

মূল শিকড়
ছায়াবীথি
রায়পুরা পূর্বপাড়া
রায়পুরা, নরসিংদী।

মহান একুশে
২০১০

ড. সফিউদ্দিন আহমদ
গাজীভবন, ৬-সি
৪১, নয়াপল্টন (ভি.আই.পি রো৬)
ঢাকা ১০০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয় সূচি

১.	প্রারম্ভিক জীবন	৯
২.	বাংলার নবজাগরণ ও বৈশ্বিক চেতনা	২০
৩.	ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ও সোমেন চন্দ	৩৭
৪.	'প্রগতি লেখক সংঘ'	৬৪
৫.	মার্কসবাদ ও সোমেন চন্দ	৭৬
৬.	সোমেন চন্দের মৃত্যু	৯০
৭.	সোমেন চন্দের সাহিত্য চিন্তা	১০৯
৮.	সোমেন চন্দের গল্পে শারীরিক ঘ্রাণ	১৯৮
৯.	সোমেন চন্দের গল্পে নিসর্গ	২০৪
১০.	সোমেন চন্দের উপন্যাস	২১০
১১.	সোমেন চন্দের কবিতা	২৩১
১২.	সোমেন চন্দের নাটক	২৩৪
১৩.	সোমেন চন্দের চিঠি	২৩৫
১৪.	পরিশিষ্ট: সোমেন চন্দের কয়েকটি গল্প	২৫১
১৫.	সোমেন চন্দকে নিয়ে আলোচিত গ্রন্থ	৩৪৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রারম্ভিক জীবন

কৃতী সন্তানের উজ্জ্বল ভূমি, রত্ন সন্তানের রত্নভূমি রায়পুরা, শিবপুর, বেলাব, মহোহরদী, পলাশ উপজেলা তথা নরসিংদী জেলা সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চায়, প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞান-মনীষার ঔজ্জ্বল্য এ এলাকা যেমন সর্বত্র পরিচিত তেমনি এর কৃতী সন্তানেরাও শুধু বাংলাদেশে নয় বহির্বিশ্বেও নন্দিত।

এ এলাকার মাটি—বিপ্লবের মাটি, বিদ্রোহের মাটি, প্রগতিশীল আন্দোলনের মাটি ও পুরাকীর্তি এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার উর্বর মাটি। সে-ই অতীতের কথা বাদ দিয়েও মহাভারতের প্রথম অনুবাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী, কোরানের প্রথম অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, নিখিল ভারতের প্রথম আই. সি. এস স্যার কে. জি. গুপ্ত, বৈষ্ণব কবি হরিচরণ আচার্য, মহাভারতের প্রথম অনুবাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী, ভারতের চন্দন নগরের প্রথম গভর্নর সুনীল চক্রবর্তী, কোলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ফণি চক্রবর্তী, বাউল কবি দ্বিজদাস, অগ্নি যুগের বিপ্লবী পুরুষ ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ, আন্দামান দ্বীপান্তরিত বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী, সাহিত্যের সব্যসাচী আলাউদ্দিন আল আজাদ, কবি শামসুর রাহমান, বিশ্বনন্দিত শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমদ, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের নতুন মাত্রা অভিযোজনায় মৌলিক কথা শিল্পী হরিপদ দত্ত এবং ফকির বিদ্রোহের এক নায়ক উজ্জ্বল শাহ (আমার পূর্ব পুরুষ) আমাদের এ এলাকাকে আরো উজ্জ্বল করেছেন। কিন্তু আমাদের এলাকাকে প্রগতিশীল সাহিত্য রচনায়—মার্কসীয় চিন্তা চেতনায়, ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে আরো উজ্জ্বল করেছেন কৈশোরোত্তীর্ণ এক তরুণ। তার নাম সোমেন চন্দ।

প্রগতিশীল সাহিত্যিক, সুদক্ষ সংগঠক মার্কসীয় চিন্তাচেতনায় ঋদ্ধ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক বিপ্লবী সোমেন চন্দ এই নরসিংদীর পলাশ উপজেলার বালিয়া গ্রামের সন্তান। তিনি ২৪ মে, ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

বিপ্লবী সোমেন চন্দ, প্রগতির পদাতিক, সোমেন চন্দ রক্তিম পতাকা হাতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী মিছিলে নেতৃত্ব প্রদানকালে এই ফ্যাসিবাদী অপশক্তি তাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে ৮ মার্চ, ১৯৪২ সালে।

কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নাম পরিবর্তন, ছদ্মনাম ধারণ, প্রতীকী নাম গ্রহণ এবং প্রকৃত নাম অণু-করণ এমন নতুন কিছু নয়। চর্যাপদ রচনারও আগে একজন বাঙালি কবি তার একটি শ্লোকে নিজের নাম আড়াল করে নিজেকে 'বঙ্গাল' কবি হিসেবে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করেছেন। এ কবির প্রকৃত নাম আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা যায় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভানুসিংহ ঠাকুর ছদ্ম নামে লিখেছিলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। এই ভানুসিংহের পরিচয় ও তার পদাবলী নিয়ে গবেষণার জন্য সুদূর লন্ডন পর্যন্ত পাড়ি জমিয়েছিলেন নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

এ প্রজন্মের কবিরা কিন্তু নিজের নাম আড়ালে করে এই প্রতিকী নাম গ্রহণে বেশি উৎসাহী। এইতো মাত্র ক'দিন আগে আমার বাসায় এলেন এক উঠতি কবি। নিজেকে পরিচয় দিলেন শ্মশান রহমান হিসেবে। আরো ক'জন কবির নাম জানি যেমন-মশাল মাহমুদ, উর্বর হাসান ও বহ্নি রহমান। এ ধরনের নাম গ্রহণের অভিধায় অভিযোজিত হয়ে তারা গর্বিত।

পুরো নাম অণু-করণ করেছেন অনেকেই। ফলে জীবনানন্দ দাশ গুপ্ত হয়েছে জীবনান্দ দাশ, রণেশ কুমার দাশ গুপ্ত হয়েছে রণেশ দাশ। ঠিক এমনিভাবে সোমেন্দ্র কুমার চন্দ হয়েছে সোমেন চন্দ। সোমেন চন্দের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে তার ছোট ভাই কল্যাণ চন্দ আমাদের জানিয়েছেন—

সোমেন চন্দের পিতামহ রামকুমার চন্দ। রামকুমার চন্দের পিতা শিব প্রসাদ। শিব প্রসাদ চন্দের পাঁচ পুত্র কন্যা। তাদের নাম—

১. রামকুমার চন্দ
২. নন্দকুমার চন্দ
৩. হরকুমার চন্দ
৪. নবকুমার চন্দ
৫. তিলোত্তমা

শিবপ্রসাদ পিতা বলরামের তৃতীয় সন্তান। এবং বলরাম পিতা রাজবল্লবের দ্বিতীয় সন্তান। রাজবল্লবের পিতা হলো শুকদেব চন্দ।

বিখ্যাত এই চন্দ পরিবারের শিকড় অবিভক্ত ঢাকা জেলার বর্তমানে নরসিংদী জেলার নব গঠিত পলাশ থানার (পূর্বে ছিল কালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত) খানপুর মৌজার বালিয়া গ্রামে। এই বালিয়া গ্রাম ঘোড়াশাল ফ্ল্যাগ স্টেশন থেকে ৪ মাইল সোজা উত্তরে শীতলক্ষা নদীর তীরে প্রায় ছয় মাইল দূরে এবং চরসিন্ধুর স্টীমার স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে। সোমেনের জন্মকাল পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় ছয় পুরুষ ধরে এই বালিয়া গ্রামের অধিবাসী।

সোমেন চন্দের পিতার নাম নরেন্দ্র কুমার চন্দ। মাতার নাম হিরণ বালা। এ প্রসঙ্গে কল্যাণ চন্দ লিখেছেন—

'দাদার জন্ম টঙ্গী স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল দূরে আশুলিয়া গ্রামে, মাতামহ আদিত্য বসুর বাড়িতে। মা হীরণবালা। বাবা নরেন্দ্রকুমার ও জ্যেঠামশায় রাজেন্দ্রকুমার, দুই ভাইয়ের যৌথ পরিবার। জ্যেঠিমার দুই কন্যা সংযুক্তা ও নিরাশার পর দাদার জন্ম, পরিবারে প্রথম পুত্রসন্তান, সকলের আদরের ধন। বাড়ির কর্ত্রী, জ্যেঠিমা সুখদা তাঁর নিজের মেয়েদের থেকেও দাদাকে বেশি ভালোবাসতেন। দাদার নাম রাখা হয় শম্ভু। দাদার তিন বছর বয়সের সময়, মা হীরণবালা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এর এক বছর পর বাবা টঙ্গী থেকে আড়াই মাইল দূরে ধউর গ্রামে ডাঃ শরৎ বিশ্বাসের কন্যা সরযুকে বিয়ে করেন। দাদা এই মাকেই নিজের মা বলে গণ্য করে, তাঁর আদর-যত্নের মধ্যে বড় হয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে এই মাকে তিনি নিখুঁতভাবে উপস্থিত করেছেন'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১০www.amarboi.com ~

আমরাও অনেক অনুসন্ধান করে জেনেছি সোমেন চন্দের মাতার নাম হিরণবালা বসু এবং তার পিতার নাম আদিত্য বসু। কল্যাণ চন্দও বলেছেন হিরণবালা কিন্তু হায়াৎ মাহমুদ বলেছেন—

'নরেন্দ্রকুমার বিবাহ করে ঢাকা জেলার কেরানিগঞ্জ থানা অধীনস্থ পারজুয়ার এলাকায় অবস্থিত ধিতপুর গ্রামে। ঢাকার উল্টোদিকে, বুড়িগঙ্গার অপর পাড়ে জিঞ্জিরা বাজার থেকে পশ্চিমে মাইল তিনেক গেলেই ধিতপুর গ্রাম। যাঁকে বিবাহ করেছিলেন তাঁর নাম বা বংশপরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। তাঁদের প্রথম সন্তান সোমেন্দ্রকুমার। সোমেন চন্দ জন্মেছিলেন বাংলা ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ সনে। গুপ্ত প্রেসের পুরনো পাঁজিতে দেখা যায়, দিনটি ছিল সোমবার এবং ইংরেজি তারিখ ২৪শে মে ১১৯২০ সাল। সোমেনের বয়স যখন চার বৎসরেরও কম তখন তাঁর গর্ভধারিণী জননী সন্তান প্রসবকালে প্রয়াত হন'।

কল্যাণ চন্দ বলেছেন হিরণবালা কলেরায় মারা যায় আর হায়াৎ মামুদ বলেছেন সন্তান প্রসবকালে মারা যায়। আমাদের ধারণা কল্যাণ চন্দের ওপরই আস্থা রাখা ঠিক।

সোমেন চন্দের বংশলতিকা

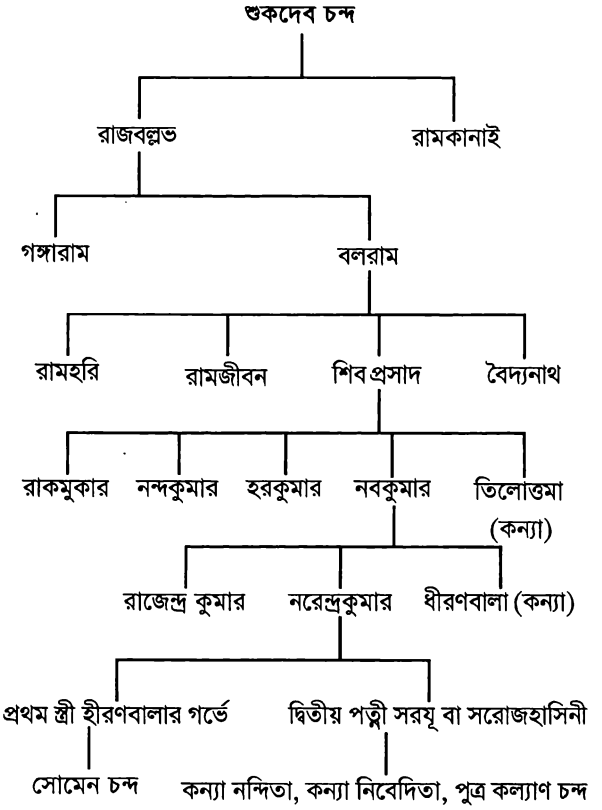

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১১ www.amarboi.com ~

কল্যাণ চন্দ নিজে যেখানে সোমেনের মায়ের নাম হিরণবালা বলেছেন সেখানে হায়াৎ সাহেব কেন 'যাকে বিবাহ করেছিলেন তা নাম বা বংশ পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত' বলেছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।

তবে এ বিষয়ে আমি নিজেও অনেক অনুসন্ধান করেছি। এবং সোমেনের বালিয়া গ্রামে গিয়েছি। সেখানে অনেকের কাছে আমি জিগ্যেস করেছি—সঠিক ও প্রামাণ্য কিছু তারা বলতে পারে নি। আগেকার দিনে অনেকেই মাতার নাম জানতেন না এবং জানার চেষ্টাও করতেন না। অনেকে আবার মাতার নাম উচ্চারণ করতে লজ্জাবোধও করতেন। 'মা' সমাজে পরিচিত হতেন প্রথম সন্তানের নামে। যেমন সোমেনের মাতার নাম সবার কাছে পরিচিত ছিল 'সোমেনের মা' হিসেবে।

আমাদের এলাকায় নববধূকে প্রকৃত নামের পরিবর্তে নতুনবৌ বা ছোটবৌ হিসেবে সম্বোধন করা হতো। অথবা প্রথম সন্তানের মা হিসেবে ডাকা হতো। তাই হিরণবালার নামটি সকলের কাছে না জানাটাই স্বাভাবিক। কল্যাণ চন্দের বক্তব্যের পর আর কারো কোন বক্তব্যের প্রয়োজন হয় না সোমেনের মাতার নাম ও পরিচয় প্রসঙ্গে। তবে এইতো মাত্র কিছুদিনের কথা—আমি লৌহজং কলেজের অধ্যাপক মুহাম্মদ জমির হোসেনকে নিয়ে ধিতপুর গ্রামে গিয়েছি কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে কেউই হিরণবালা এবং তাদের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে সঠিক তথ্য দিতে পারে নি। সোমেন বিমাতা সরোজহাসিনী বিশ্বাসের মমতা আদর, যত্ন ও স্নেহে লালিত পালিত। বিমাতাকে সোমেন আপন মা হিসেবেই জানতেন। সরযূবালা বিশ্বাস সোমেনের বিমাতা এ ধারণা তার মনে কোনদিনই স্থান পায় নি।

সরযূবালা বিশ্বাস সোমেনকে তার বুকের সমস্ত মায়া মমতা ও স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে আপন সন্তানসম লালন পালন করেছেন। সত্যিকথা বলতে কি সোমেনের জীবনে ও মানসিক বিকাশে সরযূবালা বিশ্বাসের প্রভাব গভীর।

শিক্ষিত ও জোতদার এবং বিখ্যাত পরিবার হিসেবে সোমেনদের পরিবার শুধু আমাদের রায়পুরা, নরসিংদী ও কালীগঞ্জ কাপাসিয়া এলাকায় নয়—বাইরেও নামডাক ও পরিচিতি ছিলো। সোমেনের পিতামহী অর্থাৎ রামকুমারের স্ত্রীর নাম ছিলো কাদম্বিনী দেবী। তিনি রাজধানীর বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে শুভাঢ্যা বিখ্যাত রায় পরিবারের কন্যা। তার বড় ভাই তারক রায় ছিলেন নামকরা পণ্ডিত ও শিক্ষক। তিনি ব্রতচারী আন্দোলনের নায়ক গুরুসদয় দত্ত ও অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তির শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিলো কাদম্বিনী দেবীরও। তাই দুই পুত্র রাজেন্দ্র কুমার ও নরেন্দ্র কুমারকেও শুভাঢ্যায় রেখে পড়াশুনা করিয়েছিলেন। এ বিষয়ে কল্যাণ চন্দ লিখেছেন—

'আমাদের ঠাকুরমার কাদম্বিনী দেবী ছিলেন ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পারের বিখ্যাত গ্রাম শুভাঢ্যার রায় পরিবারে মেয়ে। সেই গ্রাম সেদিন শিক্ষা ও স্বদেশ চেতনায় (১৮৫৭ সালে ঐ গ্রামের লোকেরা পলায়মান সিপাহীদের আশ্রয় দিয়ে নানাভাবে সহায়তা করেছেন) বেশ এগিয়ে। অথচ আমাদের গ্রামাঞ্চলে, পাশের গ্রাম মাইলতায় একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঠাকুরমা তাঁর দুই ছেলেকে একে একে শুভাঢ্যায় প্রেরণ করেন। তাঁর এক ভাই তারক রায় শ্রীহট্ট জেলার বীরশ্রী গ্রামের (ব্রতচারী আন্দোলনের

www.amarboi.com ~

প্রবর্তক গুরুসদয় দত্তদের গ্রাম) স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। গুরুসদয়াদের বাড়িতে থাকতেন। জ্যেঠামশায়ও এক বছর ঐ বাড়িতে থেকে গুরুসদয় দত্তের সঙ্গে একসঙ্গে পড়াশুনা করেছেন। জ্যেঠামশায় মামার বাড়িতে থেকে ১৮৯৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনিই আমাদের বালিয়া গ্রামের আশে পাশের মধ্যে প্রথম ম্যাট্রিক পাস। বাবার জন্ম ১৮৮৮ সালে, শুভাঢ্যায়'।

তখনকার দিনে সোমেনদের পরিবার শিক্ষিত পরিবার হিসেবে খ্যাত ছিলো। এবং তাদের সকলেই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো। এবং এ পরিবারে অনেক শিক্ষিত লোকও বড় বড় চাকুরে ছিলো। কল্যাণ চন্দের বরাতে আমরা বলতে পারি—

'রাজেন্দ্রকুমার এফ. এ প্লাকড্ করিয়া ঢাকা পুলিশ অফিসে চাকরি নেন। নরেন্দ্রকুমার ন্যাশনাল স্কুলে ও অন্যত্র প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। পরে বিপিন পালের প্রভাবে আসেন। (কলিকাতায় বিপিন পালের বাড়িতেও কিছুদিন বাস করিয়া যান)। তারপর পরিবারের প্রভাবে চাকরি গ্রহণ করেন। দুই-তিন জায়গায় চাকরি পরিত্যাগ করিয়া শেষে ঢাকা মিডফোর্ড হাসপাতালে যোগ দেন, স্টোরকিপার হিসাবে।'

রাজকুমার চন্দ সোমেন চন্দের পিতামহ। তাঁর তিন সন্তান—তারা হলেন রাজেন্দ্রকুমার, নরেন্দ্রকুমার ও এক মাত্র কন্যা ধীরণ। ধীরণ সকলের কাছে ধীরু হিসেবে পরিচিত ছিল। এই ধীরণ চন্দ তখনকার দিনে ঐ এলাকার প্রথম বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্রী। ধীরণের বিয়ে হয় কালিগঞ্জ থানার বক্তারপুর গ্রামের উচ্চশিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারের বিশিষ্ট শিক্ষক বিদ্যাভূষণ মিত্রের সাথে।

সোমেনদের পরিবার থেকেই ঐ এলাকার প্রথম এম. এ পাস করে পীতম্বরের পুত্র দেবেন্দ্রকুমার চন্দ এবং তার স্ত্রী সুনীত দেবীও এম. এ পাস ছিলেন। তিনি জলপাইগুড়ি জেলায় শিক্ষিকতা করতেন।

সোমেনদের পরিবার শুধু শিক্ষিত নয়-একটি সম্পন্ন এবং স্বচ্ছল পরিবারও ছিলো। কল্যাণ চন্দের জবানীতে—

'আমার আগের মা হীরণবালার (দাদার যিনি গর্ভধারিণী ছিলেন) বাবা আদিত্য বসুর আশুলিয়া ও টেঘরিয়া দুই জায়গায় বাড়ি জমি ছিল। তাঁর ছেলের পূর্বেই মৃত্যু হয়েছিলো। দুই মেয়েকে দুই জায়গায় স্থির করে রেখেছিলেন। হীরণবালার অংশ দাদার জন্য বরাদ্দ ছিলো। দাদার মৃত্যুর পরও দেশ থেকে নৌকা করে ফল ও কৃষিজাত দ্রব্য নিয়ে তিনি আমাদের ঢাকার বাসায় আসতেন। আমার মাকে মেয়ের মতো ভালোবাসতেন। নিজের মৃত মেয়ের নামে হীরণ বলে ডাকতেন। দাদুর মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করতে আমরা যাইনি'।

পিতার চাকরি উপলক্ষে সোমেন ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকাতেই কেটেছে তার জীবনের প্রথম থেকে শেষ লগ্ন। কিন্তু সোমেন ঢাকাতে অবস্থান করলেও পূজা-পার্বণ, ছুটি এবং বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান এবং পার্টি ও আদর্শিক কারণে বিশেষ করে জনতার সাথে একাত্মতার আকর্ষণে চলে আসতেন পলাশ, কাপাসিয়া, শিমুলিয়া, বালিয়া, ডাঙ্গা, চরসিন্ধু, চালাক চর, ঘোড়াশাল, জিনার্দি প্রভৃতি স্থান। বিজয় চ্যাটার্জী আমাকে জানিয়েছেন যে, সোমেন একবার পার্টি সংক্রান্ত কাজে তার বাড়িতে গিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৩www.amarboi.com ~

পারিবারিক, সামাজিক ও নিরাপত্তাজনিত কারণে ঢাকায় বারবার বাসা বদল করেছেন। সোমেনের প্রথম জীবনের বেশ অনেকটাই সময় কেটেছে তাঁতি বাজারে। ১৯৩৬-৩৭ সালে তারা দক্ষিণ মৈশন্ডিতেই কাটিয়েছেন।

সোমেনের পিতা নরেন্দ্রকুমার চন্দ উদার ও ভাবুক প্রকৃতি এবং উন্নত মন-মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। ফলে লক্ষ্মীর প্রসাদ তিনি কোনদিনও পান নি। আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ তিনি কোনদিনই দেখেন নি। সরলানন্দ সেন এ বিষয়ে তার স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে লিখেছেন—

'শুধু সোমেন এবং তার বাবা শহরের বাসায়। আমি নিয়ন্ত্রিত। জানতাম না সোমেনদের মা এখানে নেই। নম্বর খুঁজে বাড়ি বার করে বেলা বারোটায় দরজায় ধাক্কা দিতেই সোমেন এসে উপস্থিত। হাতে উনুনের কালি। মুসুরির ডাল, ইলিশ মাছের ঝোল, সোমেনের হাতের রান্না—এই দিয়ে নেমন্তন্ন। গভীর আন্তরিকতা না থাকলে এই খেয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায় না এবং অপরকে সহজে আপন করার ক্ষমতা না থাকলে আজকের বুর্জোয়া সমাজে এমন নেমন্তন্ন সম্ভব হয় না।....

বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প-গুজব করে সময় কাটাতে পারত না সে। আমাদের গল্পের সময়েও তার চঞ্চল ও নিপুণ হাত নারিন্দার সেই দোতালা বাড়িটায় ষ্টোভ ধরাচ্ছে, প্যান পেয়ালা মেজে ধুয়ে টুংটাং আওয়াজে চক্‌চকে করে এনেছে, পাঁচ মিনিটের ভিতর চা-তৈরির উদ্যোগ পর্ব প্রায় শেষ করে ফেলেছে এবং এর আড়ালে কোঠাঘরে যেখানে যত জঞ্জাল জমেছিল সব ঝাটা দিয়ে সাফ করে সমস্ত ঘরে একটা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ডেকে এনেছে সোমেন'।

ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পারিবারিক ও সামাজিক আর্থিক কারণে নরেন্দ্রকুমার বাসা পরিবর্তন করেছেন বহুবার। সোমেনদের পরিবার সম্পর্কে সোমেনের আমৃত্যু সুহৃদ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত একটা বিবরণ তুলে ধরেছেন—

'সোমেনের পিতা নরেন্দ্রকুমার চন্দ ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং যৌবনে আরও অনেক যুবকের মতোই স্বদেশচিন্তা তাঁর ধ্যানের বস্তু ছিল। কর্মজীবনের প্রথমদিকে যে চাকুরি করতেন সেখানে দুর্নীতি আছে আভাস পেয়ে সে চাকুরি পরিত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেননি। তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাঁর বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী সরযূ, পুত্র সোমেন এবং দুটি কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণ চন্দ। নরেন্দ্রকুমার ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের স্টোর্স বিভাগে কাজ করতেন। যা মাইনে পেতেন তাতে কোন রকম সংসার চলত, ইচ্ছাপূরণের সচ্ছলতা সে সংসারে সোমেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু অবস্থা তেমন সচ্ছল না হলেও নরেন্দ্রকুমার তাঁর পুত্রকে ভালোভাবে মানুষ করবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ইস্কুলে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে পড়বার সময়ই একটি বাইসাইকেল কিনে দেয়ার জন্যে বায়না ধরলে নরেন্দ্রকুমার সোমেনকে একটি বাইসাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। খুব অল্প বয়স থেকেই সোমেনের নিত্যসঙ্গী ছিল বই আর বাইসাইকেল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পিতার দেয়া এই সাইকেলটি ছিল তাঁর প্রতিদিনকার সঙ্গী'।

সোমনের পিতা নরেন্দ্রকুমার স্বদেশী যুগের আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লোকমান্য তিলক, শহীদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং এবং আর অনেক স্বদেশপ্রেমিক জীবনের নানা ঘটনা সোমেন জানতে পেরেছিলেন সর্বপ্রথম বাবার কাছ থেকেই। স্বদেশীয় যুগের নানা ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা নানা প্রসঙ্গে সোমেন কৈশোরকাল থেকেই বাবার মুখে শুনে ধীরে ধীরে তৎকালীন স্বদেশী সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের ছিল একটি রসিক মন, যে মনটি দারুণ অভাবের তাড়নায়ও কখনও শুকিয়ে যায় নি। যুক্তির সঙ্গে রস মিশিয়ে গল্পের ছলে তিনি যখন দেশের কথা, বড় বড় ব্যক্তির কথা বলতেন তখন তরুণ হৃদয়ে তার কথাগুলো রেখাপাত করত। পিতার অনন্য ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সোমেনের সচেতনতা ছিল এবং তাঁর কথাবার্তার কোনো কোনো অংশ পিতার অগোচরে পুত্র একটি নোট বইয়েও টুকে রাখতেন। সুতরাং বলতে পারা যায় পিতার কাছে থেকেই স্বদেশ চিন্তার প্রথম মন্ত্র সোমেন গ্রহণ করেছিলেন।

সোমেনের বাবা অফিসের কাজে বেরিয়ে যেতেন সকালের দিকে, ফিরতেন দেরি করে রাত দশটায়। অফিস থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার দিকে অফিসের কাছাকাছি একটি পরিচিত বড় ঔষধের দোকানে গিয়ে তিনি দৈনিক পত্রিকা পড়তেন। দোকানের কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানতেন ও পছন্দ করতেন। প্রতিদিন পত্রিকার সমস্ত সংবাদ নরেন্দ্রকুমার খুঁটিয়ে পড়তেন এবং সেই ঔষধের দোকানের লোকরা দেশ-বিদেশের নানা ঘটনার ব্যাখ্যা তাঁর কাছেই আগ্রহের সঙ্গে শুনতে চাইতেন। সকলের জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিয়ে দীর্ঘ দু-মাইলপথ হেঁটে বাড়িতে ফিরতে তাই প্রায় রোজই দেরি হয়ে যেত তাঁর। তাঁর বাড়িতে বিপ্লবীদের আনাগোনা সম্পর্কে কিছুই জানা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সোমেন কিংবা সোমেনের মা এ বিষয়ে তাকে কিছু বলতেন না। সোমেনদের দক্ষিণ মৈশণ্ডির ভাড়া বাড়িটি সে সময় বিপ্লবীদের একটি নিশ্চিত আশ্রয় হয়ে ওঠে এবং মাঝে মাঝে এই বাড়িতে রাজনৈতিক ক্লাসও চলতে থাকে। বাবা সরকারি কর্মচারী, এই বাড়িতে বিপ্লবীদের কেউ পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাঁর চাকুরি চলে যাওয়া ছিলো স্বাভাবিক এবং তখনকার ব্রিটিশ আমলে এই রকম পরিণতিই ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সোমেনকে ইতস্তত করতে দেখা যায় নি।

সোমেন ছেলেবেলায় দুরন্ত ও জেদি ছিলেন। কোনো ত্রুটি ঘটলে নানাভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে সমস্ত বাড়ির লোকজনকে তটস্থ করে রাখতেন। একবার রাগ করলে সহসা সে রাগের উপশম ঘটত না, আহারের সময় কিছু না খেয়ে শুয়ে থাকা একটি অবশ্যম্ভাবী অস্ত্রে পরিণত হয়েছিল। বাড়ির সবাই অনেক সাধ্য-সাধনা করেও তাঁকে খাওয়াতে পারতেন না। কিন্তু ওই বয়সেই গল্পের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল সোমেনের। মা দিদিমাদের কেউ তাঁর বিছানার কাছে বসে গল্প বলতে শুরু করলে আস্তে আস্তে ছেলের মুখে হাসি ফুটত। তখন তাঁকে খাওয়ানো কোনো শক্ত ব্যাপার হতো না। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সোমেনের রাগ আর দুরন্তপনা কমতে থাকে, খুব অল্প বয়সেই ভদ্র সদালাপী কিশোরের প্রিয় মূর্তিতে তাঁর স্বভাবের রূপান্তর ঘটে যায়। একেবারে বালক বয়স থেকেই গল্প শোনার জন্য উন্মুখতা, গল্পের প্রতি দারুণ আকর্ষণ লক্ষ করে বাড়ির প্রিয়জনেরা যে যখন পারতেন সময় করে গল্প শোনাতেন তাঁকে। গল্প শুনে এক সময় সোমেনের কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল। উত্তরকালে লেখালেখির ক্ষেত্রে এই কল্পনাপ্রবণতা তাঁর গল্প রচনার সহায় হয়েছিল বলতে পারা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক গবেষক ও জীবনীকার সোমেন চন্দ সম্বন্ধে অনেক কিংম্ভূতাকার রসগ্রাহী গল্পের ফাঁদ পেতেছেন যে, সোমেনের দুরারোগ্য ব্যাধি ছিলো, গোপনীয় এই ব্যাধি কারও কাছে প্রকাশ করা লজ্জাকর। কারো কারো মতে তার ওপর অপশক্তির আশ্রয় হয়েছিলো।

কিরণশঙ্কর সেন গুপ্তের বরাতে সোমেনের আত্মীয় জ্যোৎস্না রাণীর স্মৃতিচারণে আমরা জানতে পারি যে—

'ঠিক যে কী অসুখ হয়েছিল তা জানি না। আমার বিয়ে হয়েছিল পনেরো বছর বয়সে, শ্বশুরবাড়িতে জড়োসড়ো হয়ে থাকতাম—কিছু জিজ্ঞেস করা দূরে থাক, এক হাত ঘোমটার তলা থেকে গুরুজনের দিকে তাকাতেই সাহস হতো না। চারদিকে আমার ভাসুর তো অনেক ছিল—মনে পড়ছে, সোমেনের অসুখ নিয়ে ভাসুরদের ভিতরে আলোচনা হয়েছিল। শেষে এক ভাসুর বললেন, এমন অসুখ কাউকে বলাও যায় না, জানাজানি হলেই মুশকিল—আমি একজনকে জানি, সে স্বপ্নদত্ত ওষুধ দিয়ে এ রোগ সারায়, আমি এনে দিই; দেখ ভগবানের কৃপায় যদি সারে! ঐ ওষুধেই সোমেনের অসুখ সেরেছিল।'

নির্মলকুমার ঘোষ আমাদের জানিয়েছেন যে—

'অর্থনৈতিক অক্ষমতার জন্য স্কুলের গণ্ডী অতিক্রম করে মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হয়েও পড়াশুনা এগোয়নি তার।'

প্রকৃতপক্ষে সোমেনের কোনো কঠিন ব্যাধি ছিলো এবং সোমেনদের আর্থিক বিপর্যয়ের জন্য ডাক্তারি পড়া হয় নি এ অসত্য ও অবমানাকর মন্তব্য মাত্র। আমি নিজে বালিয়া গ্রামে গিয়েছি, সোমেনরা জোতদার এবং স্বচ্ছল ও সম্পন্ন পরিবার ছিলো। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান পরিবার হিসেবে সে এলাকায় তারা সুপরিচিত ছিলেন। কল্যাণ চন্দ আমাদের জানিয়েছেন—

'অনেক লিখেছেন, দারিদ্র্য ও অসুস্থতার কারণে দাদার ডাক্তারি পড়া সম্ভব হয়নি। এটা একেবারেই সত্য নয়। কারণ দাদা ডাক্তারী পড়া ছাড়েন ১৯৩৭/৩৮ সালে, প্লুরিসিকে আক্রান্ত হন ১৯৩৯ সালে। ছোটখাটো অসুখ দাদার দু'একবার হয়েছে কিন্তু সেটা প্রকৃত কারণ নয়। আর আর্থিক কারণ! পড়া ফ্রি। সব উপকরণ সংগৃহীত। ঘরের খেয়ে সাইকেলে যাতায়াত। আর কী চাই? আসলে সেই সময় প্রগতি পাঠাগার ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে তিনি সক্রিয় হয়েছেন। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্যপথে প্রবাহিত। ঐ সময়ই তাঁর প্রথম গল্প 'শিশু তপন' 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ডাক্তারি পড়ার জন্য সোমেনের ওপর একটি পারিবারিক চাপ ছিলো—এবং শত চাপেও সোমেন ডাক্তারি পড়তে রাজি হন নি। এ সময়ে সোমেনের মানসিকতা প্রসঙ্গে কল্যাণ চন্দ বলেছেন—

মায়ের মনে ছেলেকে ডাক্তার করার প্রবল বাসনা সৃষ্টি হল। দাদা সবদিক বিবেচনায় ডাক্তারি পড়তে সম্মত ছিলেন না। মা বোঝাতে লাগলেন। অন্য আত্মীয়দের লাগালেন, দাদাকে রাজি করতে। এমন কি আমাদের আগের মায়ের বাবাকে পর্যন্ত নিয়ে আসলেন। সকলের প্রচেষ্টায় দাদাকে ডাক্তারিতে ভর্তি করা হল। মায়ের সোনার গয়না বিক্রি করে দাদার পড়ার বই, সম্পূর্ণ কঙ্কাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ দাদার ডাক্তার হওয়ার জন্য কোনো আগ্রহ দ্যাখা গেল না। তিনি তখন প্রগতি পাঠাগার, পড়াশুনা ও লেখক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে সদাব্যস্ত। প্রথম বছরের পর পরীক্ষা দিলেন না। ফেল করলেন। ডাঃ লিন্টন বাবাকে ডেকে আলোচনা করলেন। পাশ করিয়ে দিতে চাইলেন। এবারে কিন্তু দাদাকে আর কোনোক্রমেই পড়তে রাজি করা গেল না'।

ডাক্তারি পড়ার প্রতি সোমেনের কোনো আকর্ষণই ছিলো না। সোমেন চেয়েছে সমাজ পরিবর্তন, মেহনতি মানুষের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। সোমেন জানতে চেয়েছে মাটি ও মানুষকে। যে মাটি ফসল ও সম্পদ দেয় এবং যে মানুষ ফসল উৎপাদন করে—

ডাক্তারি পড়ার চেয়ে (সোমেনের) অধিক আগ্রহ মানুষের জীবনকে জানার, ইতিহাসের ঠিকানাকে উপলব্ধি করার।... ইতিহাসের জটিল যুগসন্ধিক্ষণে সেই বাইশ বছরের যুবক সোমেন আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে বিভ্রান্তির সমস্ত কুয়াশা ভেদ করে আগামীর দিকে তাকিয়েছেন। ইতিহাসের সড়ক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয় না। তাকে তৈরি করতে হয়। ইতিহাসের সেই সড়ক তৈরিতে সোমেন নিজের হাত লাগিয়েছেন এবং মানুষের জন্য সুন্দরতম সমাজ গড়ার সেই ইতিহাসের সড়কে নিজের জীবন দান করেছেন'।

প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক শত চাপেও কিন্তু সোমেন ডাক্তারি পড়তে চায় নি। তখনকার দিনে আমাদের লোকালয়ত গ্রামীণ সমাজে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় কোনো প্রকার অনীহা হলে তারা বিভিন্ন রোগও অপ্রকৃতিস্থের ভান করত—যাতে এ বিষয়ে আর পড়তে না হয়। এজন্যই বলা হয়েছে যে—

'ডাক্তারি পড়ার চেয়ে সোমেনের অধিক আগ্রহ মানুষের জীবনকে জানার, ইতিহাসের ঠিকানাকে উপলব্ধি করার। ...ইতিহাসের জটিল যুগসন্ধিক্ষণে সেই বাইশ বছরের যুবক সোমেন আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে বিভ্রান্তির সমস্ত কুয়াশা ভেদ করে আগামীর দিকে তাকিয়েছেন। ইতিহাসের সড়ক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয় না। তাকে তৈরি করতে হয়। ইতিহাসের সেই সড়ক তৈরিতে সোমন নিজের হাত লাগিয়েছেন এবং মানুষের জন্য সুন্দরতম সমাজ গড়ার কামনায় সেই ইতিহাসের সড়কে নিজের জবিন দান করেছেন'।

আসলে প্রথাগত একাডেমিক পড়াশুনার প্রতি সোমেনের তীব্র অনীহা ছিলো। স্বাধীনভাবে পড়াশুনার প্রতি তার ছিলো উদগ্র নেশা।

এরপর সোমেনের সাথে পরিচয় হয় আন্দামান ফেরত বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর। এবার শুরু হলো সোমেনের জীবন আর এক নতুন পর্বের। কল্যাণ চন্দ বলেছেন—

'১৯৩৮ সালে বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী ঢাকায় আসেন। প্রগতি পাঠাগার ও দাদার উদ্যোগে আরম্ভ হল রাজনৈতিক ক্লাস। অন্যদের সঙ্গে সতীশদাশও ক্লাস নিতেন। দাদার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা। আমাদের বাসায় দাদাকে তিনি ঢাকার তরুণ লেখকদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী হতে বললেন। পার্টির আর একজন, দাদার থেকে দশ বছরের বড় রণেশ দাশ গুপ্ত, যিনি তখন পার্টির টেকের কাজ করেন, তাঁকেও প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হল। রণেশদা তখন ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলার' সহকারী সম্পাদক। দাদার ভূমিকা প্রধান সংগঠকের'।

এ সময় সোমেন গভীর পড়াশুনা ও প্রগতিশীল সংগঠন গড়ে তোলা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠার জন্য সব সময় সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এ বিষয়ে রণেশ দাশ গুপ্তের বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সোমেন চন্দই আমাকে লেখক সঙ্ঘে নিয়ে আসেন। ও বয়সে আমার ছোট। জেল থেকে বেরিয়ে সতীশ পাকড়াশী ১৯৩৭-৩৮ সালের দিকে সাহিত্যিক-শিল্পীদের একটি প্রগতিশীল প্ল্যাটফর্ম গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন সোমেন চন্দকে সঙ্গে নিয়ে। ওঁরা একই পাড়াতে থাকতেন। সোমেন চন্দ আমাদের সংগঠিত করেন। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আর আমি একই সঙ্গে এসেছি। আমরা মূলত তাত্ত্বিক আলোচনা করতাম। সোমেন চন্দই ছিলেন আমাদের মধ্যে একমাত্র ক্রিয়েটিভ লেখক। বয়সে ছোট, কিন্তু সৃজনশীলতায় সবাইকে ছাড়িয়ে।' [ইন্টারভিউ ১/১০/১৯৯৭ ড. সৌমিত্র শেখর সঙ্কলন, অবিনশ্বর, পৃ. ৫৬-৫৭]

সোমেনের নিষ্ঠা, সততা, দায়িত্ববোধ ও সাংগঠনিক তৎপরতা দেখে তার বন্ধু কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত, নির্মল ঘোষ ও সমীন্দ্রকুমার হোর বলেছেন যে, পড়ার নেশা সোমেনকে পাগল করে তুলতো। সমীন্দ্র হোর বলেছেন—

'খুব সম্ভবত ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হবে। একদিন খুব সকালে সোমেনের বাসার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সোমেন বাইরে দাঁড়িয়েছিল—হঠাৎ ডাক দেওয়ায় সাইকেল থেকে নামতে হলো। ঘরে ঢুকেই দেখলাম ভীষণ অগোছাল একটি ঘরে দুটি তক্তপোষ। ডানদিকটার তক্তপোষের ওপর অনেকগুলো বই ছড়ানো রয়েছে। আমার পাশে একটা টেবিলের ওপর একখানা Penguin series-এর বই পড়ে ছিল—দেখলাম 'The floating Republic। আমি বললাম—'সোমেন তুমি নিশ্চয়ই ভীষণ পড়াশুনা কর, না?' এইবার সোমেনের মুখের হাসি থেমে গেছে। 'কোথায় আর পড়া হয় বলুন? বিদ্যে তো ম্যাট্রিক—ভালো ভালো ইংরেজি বই পড়ে ভালো বুঝি না। ইস্, কি বলব কমরেড্ যদি ইংরেজি ভাষাটা জানতাম?' ও বলে যাচ্ছিল। ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, বেশ একটা অনুশোচনার ছাপ। আমি বললাম, 'এর কোনো মানে হয় না। তুমি তো ইংরেজি জান তবুও। অনেকে যে একদম জানে না।' সোমেন বলল—'কোথায়, এই দেখুন না, Caudwell-এর Illusion and Reality পড়ে ভালো বুঝতে পারলাম না—এর কোনো মানে হয়?'

সোমেন চন্দের পড়াশুনা বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা এবং আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও গভীরতা প্রসঙ্গে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বলেছেন—

তখনকার দিনের ছয় আনায় পেঙ্গুইন সিরিজের অনেক বই কিনতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলতেন। বই পড়ার একটা তীব্র ক্ষুধা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতির বই নয়, সাহিত্যের নানা সৃজনশীল তত্ত্বমূলক বইও সোমেন চন্দ এই সময় থেকেই (১৯৩৭/৩৮ থেকে) পড়তে শুরু করেছিলেন। কলেজের পড়াশুনা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি, অথচ পৃথিবীর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যতটা সম্ভব গ্রহণ করে জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে হবে এই উপলব্ধি সোমেনকে রাজনীতি ও সাহিত্যের জগতে অন্বেষণে দিনের পর দিন পরিচালিত করেছিল।

নির্মল ঘোষ বলেছেন যে,

"Anthropology, Economics এবং Philosophy of Religion তার পঠিত বিষয়সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট হয়েছিল।"

 www.amarboi.com ~

পড়াশুনার জন্য সোমেনের মনে একটি সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ছিলো। এই বৈশ্বানবের ক্ষুধা একমাত্র বই'ই প্রশমিত করতে পারতো। তিনি অন্যের কাছ থেকে বই নিয়ে পড়তেন এবং পড়ে খুব দ্রুত ফিরিয়ে দিতেন। এতো দ্রুত ফিরিয়ে দেবার ফলে অনেকে বিশ্বাসই করতো না যে, এমন জ্ঞানগর্ভ বই এতো তাড়াতাড়ি পড়া হয়ে যেতে পারে। তার প্রিয় বইয়ের তালিকায় ছিল প্রগতিশীল লেখকদের বই।

"সোমেন খুব অল্প বয়সে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নানা দেশের লেখকদের বই পড়তে শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রিয় লেখকদের তালিকায় ছিলেন ঃ ডস্টয়েভস্কি, পুশকিন, গর্কি, শলোকভ, টমাস মান, অর্নেস্ট টলার, হোমিংওয়ে, ইগৎসিয়া সিলোনে, হেনরি [অঁরি] বারব্যুস, লাউডইগ [লাডউইগ?] রেনে, বার্নার্ডশ, কডওয়েল, এইচ জি ওয়েলস্।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলার নবজাগরণ ও বৈশ্বিক চেতনা

এক :

বিপ্লবী সোমেন চন্দ, কমিউনিস্ট সোমেন চন্দ, সমাজতান্ত্রিক সোমেন চন্দ এবং ফ্যাসিবাদী বিরোধী ও সাহিত্যিক সোমেন চন্দকে জানতে হলে অবশ্যই আমাদের ঊনিশ শতকের নবজাগরণ এবং বাংলাদেশ ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি পটভূমি তুলে ধরতে হয়।

ঔপনিবেশিক ও গোলামি মনোবৃত্তিতে আসক্ত পরগাছা স্বরূপ একদল পণ্ডিত সব সময়ই মনে করেন যে, আমারা পাশ্চাত্যের কণ্ঠস্বর ও প্রতিধ্বনি। আমাদের যা কিছু ভালো তা পাশ্চাত্য থেকে পাওয়া। কিন্তু আমরা ভুলে গেছি যে, আমাদের পায়ের তলায় হিমালয়ের মতো শক্ত একটি ভিত্তি আছে এবং আমাদের রয়েছে একটি মহিমান্বিত অতীত ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য।

আমরা কোনো দেউলিয়ার জাতি নই—আমাদের আত্মপরিচয়, উৎসের সন্ধান, স্বরূপের সন্ধান ও শিকড়ের সন্ধান করতে গেলেই আমাদের সামনে উজ্জ্বল ও ভাস্বর হয়ে প্রতিভাত হবে পাহাড়পুর, ময়নামতি, মহাস্থান গড় ও ওয়ারি বটেশ্বর। আমরা দেখবো অতীশ দীপঙ্কর আর শীলভদ্র আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা নিয়ে। এবং আমরা আরও দেখবো প্রমিথিউসের এক আলোর মিছিল ও ইকারোসের এক উজ্জ্বল আকাশ।

বাংলার নবজাগরণ এবং সোমেন চন্দকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের সামনে আসবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতার জন্য সিপাহি সংগ্রাম—হিন্দু কলেজ, ডিরোজিও, ইয়ং রবঙ্গল মুভমেন্ট, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনকে। এবং শ্রদ্ধাভরে আমরা স্মরণ করবো শহীদ ভগৎসিং, ক্ষুদীরাম, প্রফুল্লচাকী, সূর্যসেন ও তীতুমীরকে—। এরই সাথে আর এক বৈপ্লবিক ঘটনা হলো ভারত এবং বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা। উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর দিকে তাকালেই দেখতে পারবো আমাদের পায়ের তলায় রয়েছে হিমালয়ের মতো শক্ত একটি ভিত্তি। এ ভিত্তিকে কেন্দ্র করেই বাংলা ও বাঙালির রেনেসাঁ এবং মহান ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ে আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

উনিশ শতক বাঙালির নবজাগরণের যুগ, চিত্তজাগরণ ও আত্মজাগরণ যুগ, আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রত্যয়ের যুগ এবং এ যুগ বাংলা ও বাঙালির রেঁনেসার যুগ। মূলত এ সময়টাকে বলা যায় ইকারোস আর প্রমিথিউসের আলোর মিছিলে উজ্জ্বল এক চিৎকর্ষের যুগ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালির এ নবজাগরণকে কেউ কেউ পাশ্চাত্যের ঢঙে বলেছেন, 'The age of reason বা the age of illumination' আবার কেউ কেউ একে উনিশ শতকের রেনেসাঁও বলেছেন। আর শিবনাথ শাস্ত্রী একে 'বাঙলার নবযুগ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২০ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগ অলৌকিকতা, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। দেবতা প্রধান ও আচারনিষ্ঠ এবং"কাণুবিনে গতি নাই" এই প্রথাবদ্ধ জীবনের বৃত্ত ভেঙে উনিশ শতকে এলো জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবন-পিপাসা ও আত্মজিজ্ঞাসা এবং এলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তিবাদ ও দেশপ্রেম। আরও এলো মানব মহিমার উজ্জ্বল উচ্চারণ, এরই উৎসারণ আমরা দেখি আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে মননে ও দর্শনে এবং জীবন বোধ ও শিল্পচর্চায়। তাই ঊনিশ শতকে আমাদের এই আলোক উজ্জ্বল উৎসারণকে আমরা বলবো ঊনিশ শতকের রেনেসাঁ।

আমাদের মনে রাখতে যে, ইউরোপীয় রেনেসাঁয় ছিলো বিশাল ব্যাপক বিস্তৃত, চিত্ত মুক্তি ও আত্মমুক্তির উদারতা, সাহিত্য শিল্প দর্শন এবং বিজ্ঞান, মনন ও মানব সম্প্রীতির বৈশ্বিক প্রসারতা-যা সমগ্র পৃথিবীকে আন্দোলিত করেছে শুধু তাই নয়—সমগ্র পৃথিবীকে পাল্টিয়েও দিয়েছে।

বাংলাদেশ ঊনিশ শতকে যে নবজাগরণ এসেছ তা ইউরোপীয় রেঁনেসার মতো বৈশ্বিক চেতনা নিয়ে আসে নি।

রেনেসাঁর প্রথম এবং সবচেয়ে বড় শর্ত হলো ধর্মীয় বৃত্তের বাইরে এসে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানব মহিমার উদার জয় ঘোষণা।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর ইতিহাসবেত্তা J.A.SIMSON বলেছেন—

It was which scholarship first and last, Which revealed to man the wealth of their own minds the dignity of human thought, the value of human speculation, the importance of human life regarded as a thing apart from religious rules and dogmas.

বাংলাদেশে তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে যে একটা নতুন আন্দোলন ও নবজাগরণ এসেছিলো তা সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছিলো, এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

'কোলাকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে, অনিচ্ছা সহকারেও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষা প্রদত্ত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত'। (ভারতের বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল)

এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সীমাবদ্ধতার মধ্যে হলেও রামমোহন ও ডিরোজিও এবং হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই ইউরোপীয় রেনেসাঁ, রিফর্মেশন ও এনলাইটেনমেন্টর চিন্তাধারার সাথে এদেশবাসীকে পরিচিত করেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে যে বিষয়টি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো, তাহলো তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রথম সামন্ততান্ত্রিক শাসনের নেতিধর্মিতা ধরা পড়ে এবং এর বিরুদ্ধে তারা সাহসী আন্দোলনের মানসিকতাও গড়ে তুলেছিলো। দেশপ্রেম, শিক্ষার দাবি এবং মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার উন্নতি বিধানের সচেতনতাবোধও তাদের মধ্যে প্রথম জাগ্রত হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষও তাদের

 www.amarboi.com ~

মাধ্যমেই সঞ্চারিত হয়। এই প্রথম দেশকে তারা নতুনভাবে উপলব্ধি করতে পারলো এবং তাদের অনুভূতিকে সক্রিয় করতে পারল যে, আর সামন্ততান্ত্রিক খোলস নয়, নতুন ধরনের স্বাধীন সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক দেশ হোক তাদের মাতৃভূমি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মূলে রয়েছে হিন্দু কলেজ, ডেভিড ড্রামন্ডের 'ধর্মতলা একডেমী', ডিরোজিও এবং তার শিষ্য ইয়ংবেঙ্গলের একাডেমিক এসোসিয়েসন। এর মহান স্থপতি হলেন আধুনিকতার অগ্রদূত রামমোহন, নব্য বাঙালির চিত্তলোকের আলোকদূত ডিরোজিও এবং স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সাহিত্য আধুনিকতার অগ্রদূত মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ডিরোজিও এদেশীয় রক্তোৎভব ছিলেন না। কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন বাঙালি। তার দেশপ্রেম ছিলো প্রবাদতুল্য।

KALELDOSCOPE পত্রিকায় ডিরোজিও তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

'নিতান্ত ওপর থেকে যাঁরা বিচার করবেন। তারা নিশ্চিত বুঝতে পাবেন যে, শুধুমাত্র সামরিক শক্তির জোরেই ভারতকে পরাধীন রাখা সম্ভব হয়েছে। সৈন্য সরিয়ে নাও, অমনি দেখবে ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরাগের বদলে, তাদের মেরে তাড়াবার উদ্যোগই নিচ্ছে ভারতবাসীরা'।

ডিরোজিও'র ছাত্ররা ডিরোজিও'র আদর্শে দীক্ষা নিয়ে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পরও ছাত্ররা গুরুর আদর্শকে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, ডিরোজিও'র ছাত্ররাই ইংরেজ শাসনের অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এদেশের স্বাধীনতার দাবি তাদের কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ৫ জানুয়ারি কোলকাতা টাউন হলে ইংরেজ শাসনের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভা ডাকা হয়। এই সভায় ডিরোজিও'র ছাত্র, দ্বিভাষিক জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার সম্পাদক ও ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর তরুণ নেতা রসিককৃষ্ণ মল্লিক তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতায় বলেন—

'গরিব ভারতবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ কেন কেড়ে নেওয়া হবে, তারা নিরণ্ন ও অর্ধ উলঙ্গ থাকবে, আর বিদেশি শাসনের ও শোষণের এবং বিজাতীয় ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করা হবে কেন'?

ঠিক ঐ সময়েই একটি রচনা প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিলো 'শতবর্ষ পরে তোমার কল্পনার ভারতবর্ষ'। হিন্দু কলেজের ষোল বছরের ছাত্র কৈলাশচন্দ্র দত্ত কাল্পনিক এক রোজনামচা লিখে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর লেখাটির নাম ছিলো "১৯৪৫ ও ৪৮ ঘন্টার রোজনামচা"। লেখাটিতে তিনি আধুনিক সশস্ত্র সংগ্রামীর ভাষায় বলেন—ইংরেজ সাম্রাজবাদীর বর্বর ও লোমহর্ষক অসহ্য অত্যাচারে উৎপীড়ত হয়ে ভারতবাসী এক সশস্ত্র গণবিদ্রোহ করে এবং অত্যাচারী বড়লাট লর্ড কেল বচারকে গদিচ্যুত করে দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ ভক্তদের নিয়ে একটি বিপ্লবী জাতীয় সরকার গঠন করে।

রচনায় তিনি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন শেষ পর্যন্ত এ বিদ্রোহ কীভাবে ব্যর্থ হয় আর তরুণ বিদ্রোহী বাঙালি নেতা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কীভাবে জল্লাদের খড়্গে প্রাণ

www.amarboi.com ~

দেয়ার পূর্বে জ্বালাময়ী ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, দেশমাতৃকার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, জনগণের মুক্তির জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে পৃথিবীতে মানুষের জন্য আর কোনো মহৎ কাজ হতে পারে না।

ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গলদের দেশপ্রেম ছিলো নিখাদ। প্রথম স্বদেশপ্রেম ও রাজনৈতিক সচেতনতাও তাঁদের মাধ্যমেই। প্রথম সচেতন অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্রও আমরা তাঁদের মাধ্যমেই পাই। ইংরেজ শাসন ও শোষণের ফলে এদেশের শোচনীয় অর্থনৈতিক দুর্গতির চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি উদারপন্থি ইংরেজি পত্রিকায় ইয়ং বেঙ্গলদেরই একজন লেখেন—

'১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ-এর সনদ গৃহীত হওয়ার দু'বছরের মধ্যেই বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে ৬ কোটি টাকা রাজস্ব বিলাতে প্রেরিত হয়েছে এবং আগামী বছরগুলোতে যা বেড়েই চলবে.....এর এক ভগ্নাংশও খরচ করা হচ্ছে না রাস্তাঘাট নির্মাণে, স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠায় বা অন্য কোনো জনকল্যাণকর কাজে'।

একটি নামকরা মাসিক পত্রিকায় হিন্দু কলেজের এক ছাত্র প্রশ্ন করছে; ইংরেজরা ভারতবর্ষ জয় করার আগে এদেশের মানুষ বর্বরস্তরে ছিল ইংরেজদের এ কথা মনে করার অধিকার কে দিয়েছে; ভারত ছিল একটি শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত ও সভ্যদেশ এবং আমেরিকার দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, ইংরেজদের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে তবেই ভারতবাসীর দুর্গতির মোচন হবে।

ডিরোজিও-র ছাত্র সারদা প্রসাদ ঘোষ এক বক্তৃতায় বলেন—

'ইংরেজ-রাজত্বের গোড়া থেকেই আমাদের শাসকশ্রেণীর মতলব ছিল আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা। আর এই স্বাধীনতাহীনতাই আমাদের সমস্ত দুর্দশার মূল কারণ। তাই আমার প্রস্তাব এই যে, দেশের দুর্গতি মোচনের জন্য আমাদের প্রথমত, ঐকবদ্ধ হতে হবে; দ্বিতীয়ত, দেশকে ভালোবাসতে হবে; দেশপ্রেমই হবে ঐক্যের ভিত্তি এবং সেই সংঘশক্তিকে পরিচালনা করতে হবে জাতীয় কল্যাণের পক্ষে'।

ইয়ংবেঙ্গলদের আরও গর্বিত উচ্চারণ ছিল—

১. অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমরা হিন্দু ধর্মকে ঘৃণা করি'।

২. আমি গঙ্গার পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না।

৩. পুজোর ঘরে মন্ত্রোচ্চারণের নামে ইলিয়াডের অংশবিশেষ আবৃত্তি।

৪. দেবীর সামনে মন্ত্রোচ্চারণের পরিবর্তে হেলেনের রূপ বর্ণনা।

৫. কালীদেবীর সামনে মাথা নিচু করে প্রণামের পরিবর্তে Good morning madam বলে কালীকে নমস্কার জানানো।

৬. যে তর্ক করে না সে নির্বোধ এবং যে তর্ক করে না সে ক্রীতদাস ইয়ং বেঙ্গলদের অন্য একজন নারীশিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—

'এটা কি সত্য নয় যে, আমাদের শাস্ত্রে নারীশিক্ষা নিষিদ্ধ। খোলাখুলিভাবে না হলেও কার্যত কি নিষিদ্ধ নয়? ন্যায় ও যুক্তির দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোনো অনুশাসন যদি শাস্ত্র গ্রন্থে থাকে তবে সেই শাস্ত্র গ্রন্থকে আমি পদদলিত করি'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৩www.amarboi.com ~

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মা উচ্চারণ করলেন—

বাঁশ-খড় মাটি দিয়ে যে দেবতা তৈরি করা হয় তা কী জীবন্ত দেবতা হতে পারে! জীবন্ত দেবতা যে মানুষ।

ডেভিড ড্রামন্ডের তীক্ষ্ণ বক্তব্য 'ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন তবে কল্পিত স্বর্গে তিনি সুখে থাকুন। যাদের অফুরন্ত অবসর আছে তারা তাকে নিয়ে খুব করে ভাবুন কিন্তু ইহ জগতে মানুষই ঈশ্বর'।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের উক্তি—

কৃষকের পরিশ্রম= ফসল

কৃষকের পরিশ্রম+ভগবৎ প্রার্থনা = ফসল

অতএব ভগবৎ প্রার্থনা = ০ (শূন্য)

ব্যারন হেলবেখের অমোঘ মন্ত্র তখন ইয়ং বেঙ্গলদের মুখে মুখে উচ্চারিত—

If we go back to the begining we shall always find that ignorance and fear have created God.

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মীয় সভার কথা' নামক গ্রন্থের বরাতে আমরা জানতে পারি বর্ধমানের মহারাজা তেজেশচন্দ্র বাহাদুরের তরুণী বিধবা পত্নী রাণী বসন্তকুমারীকে বিয়ে করেন ডিরোজিও শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। English civil Marriage laws অনুসারে কোলকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। ভাস্কর পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এই বিয়ের সাক্ষী হয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ আইন পাস করার অনেক আগে এই বিবাহ হয়। এটি প্রথম বিধবা বিবাহ, প্রথম অসবর্ণ বিবাহ ও প্রথম আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়—এই বিবাহকার্যের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ পবিত্রতা রক্ষার্থে গঙ্গানদীর ঘাটগুলোতে স্নানের জন্য ভিড় জমায় এবং দেশের মাটি অশুচি হয়েছে বিধায় পাল্কী চড়ে গঙ্গাস্নানে আসত আবার পাল্কী চড়ে চড়ে বাসায় ফিরতো। তারা বেশ ক'দিন এমন করেছিলো। শেষ পর্যন্ত এক যজ্ঞের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় মনস্তাপ করে মাটিতে পা রাখা হয়।

এ সময় গণিকা হীরা বুলবুলের ছেলে শিবসুন্দরের হিন্দু কলেজে ভর্তিকে কেন্দ্র করে কোলকাতায় মহাপ্রলয়ের ঝড়। ধনী-গরিব, অভিজাত ও শিক্ষিত সকলেই এ ভর্তির বিরোধিতায় সাক্ষরতা অভিযান শুরু করে। এবং সকলেই স্বাক্ষর প্রদান করে কিন্তু ব্যতিক্রম ডিরোজিও তার শিষ্যরা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর স্বাক্ষর প্রদানে আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'কোনো দোষ করলে হীরা বুলবুল করেছে তার ছেলে তো করেনি—শিক্ষার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হবে কেন'?

কোলকাতার রাস্তাঘাট, দোকানপাট, বাড়ি-বাড়ি এমন কি স্নানঘাট পর্যন্ত প্রচারপত্র ও পোস্টারে ছেয়ে যায়। এতে লেখা ছিলো 'গণিকাবান্ধব বিদ্যাসাগর'। এবং বিদেশিদের গর্ভস্রাব ডিরোজিও ইয়ংবেঙ্গল। ইয়ং বেঙ্গলদের পত্রিকা সর্বতত্ত্ব দীপিকার মুখবন্ধে লেখা হয়েছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

দেশকে ভালোবাসা এবং দেশপ্রেমই আমাদের একমাত্র ব্রত ও ঐক্যের ভিত্তি। আমাদের চিন্তাচেতনা ও সাধনাকে নিবেদন করব দেশ, জাতি ও মানুষের কল্যাণে। এই দেশপ্রেমের ভিত্তিতেই প্রথম সচেতনভাবে দেশপ্রেমের কবিতা রচনা করেন ডিরোজিও এবং তার ভাবশিষ্য কাশীপ্রসাদ ঘোষ। দুটি কবিতাই এখানে উপস্থাপন করছি—

ডিরোজি'ওর কবিতা—

TO INDIA—MY NATIVE LAND

My country! in thy day of glory past
A beautcous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast.
Where is thay glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou :
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy miscry!
Well-let me dive into the dephs of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold :
And let the guerdon of my labour be
My fallen country! one kind wish from thee!

কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবিতা—

TO MY NATIVE LAND
Kashi Proshad Goesh

Farewell my lovely native land
where roses bloom in many a vale
where green clad hills majestic stand,
where flowers woo the scented gale

where surya from his throne above
with brightest colour paints the pay,
whose mighty Gunga's billows low;
and wonder many a country by;
Whose ocean smiies serene below
Beneath the blue and sunny sky.

www.amarboi.com ~

land of the Gods & lofty name;
land of the fair and beauty's spell;
land of the bards of the mighty fame;
my native land. For F'er farewell,

মধুসূদন ডিরোজিও'র ভাবশিষ্য, হিন্দুকলেজের ছাত্র এবং ইয়ং বেঙ্গলদের এক আলোকিত সূর্য। রেনেসাঁর প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত তা'হলো দেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও উদার মানবিকতাবোধ। মধুসূদন তাঁর কাব্য ও মহাকাব্যে এবং নাটক ও প্রহসনে যথাযথভাবে এই শর্ত পালন করেছেন।

পরাধীনতার গ্লানিতে মধুসূদনকে কতো মর্মান্তিকভাবে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করেছে এবং স্বাধীনতর জ্বলন্ত উচ্চাশার বহ্নিজ্বালা তাকে কী ভাবে উদ্দীপ্ত করেছে এরই একটি চিত্রকল্প আমরা পাই 'মেঘনাদবধ কাব্যের' প্রথম সর্গে রাবণের উক্তিতে। রামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণ করেছে। লঙ্কা আজ শত্রুসেনা বেষ্টিত। প্রাসাদশীর্ষ থেকে রাবণ অবরুদ্ধ লঙ্কাকে দেখে প্রচণ্ড ক্ষোভে বলছে—

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেত: হা ধিক, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর?
.....
উঠ, বলি : বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ, জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে, এ প্রবল রিপু।
রেখো নাগো তব ভালে এ কলঙ্করেখা,
হে বারীন্দ্র, তবপদে এ মম মিনতি।

লঙ্কার কলঙ্ক চিরতরে মোচনের জন্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ-হোমে মগ্ন মেঘনাদ বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের ষড়যন্ত্রে গুপ্তপথে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে এবং লক্ষ্মণ-বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতায় লঙ্কার স্বাধীনতাসূর্য আজ অস্তপথে। তাই মেঘনাদের উক্তি—

নিজ গৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড়দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে।
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

উনিশ শতকের নবজাগরণের আলোকরশ্মিতে অভিস্নাত হয়েই দেশপ্রেম ও মানবিকতাবোধের উৎসারণ এবং ঔপনিবেশিকতার থাবা হতে দেশকে মুক্ত করার জন্য শুরু হয় সাংগঠনিক রাজনীতি। এ সময় থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতায় স্বাদেশিক আবহে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দেশ।

বর্তমানে রাজনীতির প্রবর্তনার ইতিহাসে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যেনো খুব সচেতনভাবেই এদেশের মানুষ ভুলে গেছে। তিনি উপমহাদেশে একজন শ্রেষ্ঠ এক আইনজ্ঞ ছিলেন। এবং তিনিই প্রথম এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সংগঠন গড়ে তুলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তারই সভাপতিত্বে মুম্বাই শহরে জাতীয় সংগ্রাম নামে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

এই রাজনৈতিক দলের মোট চারটি নীতি অনুসৃত হয়, যেমন—

১. বহু ভাষিক, বহু ধার্মিক ও বহু সংস্কৃতিগত বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের দেশপ্রেমীদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও একাত্মতা গড়ে তোলা।

২. জাতি ধর্ম ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা দূর করা।

৩. বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করা।

৪. রাজনৈতিক উন্নতির জন্য সদর্থক কার্যপ্রণালী স্থির করে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সুপারিশ ও দেন-দরবার করা।

সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতে আর একটি সচেতন বিদ্রোহ আসাম, মণিপুর, পুণা ও ছোটনাগপুরের চা শ্রমিকদের বিদ্রোহ। সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিশের উগ্র দমননীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে এই প্রকাশ্য বিদ্রোহ ভারতের সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

অনুশীলন সমিতি বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক আকাশে এক চাঞ্চল্যকর ভূমিকা পালন করে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ কোলকাতায় প্রমথ নাথ মিত্রের সভাপতিত্বে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন আন্দামান ফেরত বিপ্লবী—

১. সতীশচন্দ্র বসু

২. পুলিন বিহারী দাস

৩. ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী

অনুশীলন সমিতির সবচেয়ে বেশি শাখা ছিলো বাংলাদেশে। বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এর কর্মতৎপরতা ছিলো জোড়ে শোরে। এই সমিতি সন্ত্রাসবাদ ও সশস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে বারীণ ঘোষ ও অরবিন্দ ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এরই একটি শাখা 'যুগান্তর' নামে আত্মপ্রকাশ করেছিলো।

'সাধারণতভাবে বলা যায়, 'অনুশীলন সমিতি' একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত দল ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তার অদ্বিতীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন রাসবিহারী বসু। আর যুগান্তর ছিল বরিশালের 'শঙ্কর মঠ' (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ পরিচালিত), কলকাতায় ও আশপাশে বিপিন গাঙ্গুলি পরিচালিত 'আত্মোন্নতি সমিতি', অতুল ঘোষের দল এবং অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষের দল, ঢাকায় হেম ঘোষ পরিচালিত 'মুক্তি সংঘ'

www.amarboi.com ~

(পরে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা বি.ভি এবং অনিল রায়, লীলা রায় পরিচালিত 'শ্রী সংঘ'), মাদারীপুরে পূর্ণ দাসের দল, ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ পরিচালিত দলগুলোর একটি ফেডারেশন। তার অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন বাঘা যতীন।'

রুশ বিপ্লবের পর থেকে প্রগতিশীলদের সামনে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়। এই বিপ্লবের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। দেশে সমাজতন্ত্র, মার্কসিজম, বিপ্লব কমিউনিজমের বই পুস্তক আমদানি হতে থাকে।

ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত বিপ্লবীরা অবস্থান করতেছিলো তারা যুক্তরাষ্ট্র, হিন্দুস্তান গফর পার্টি, বার্লিনে গঠিত হয় ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি, ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত হয় লীগ এগেনেস্ট ইম্পিরিলিজম আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন, ভারতে রাওলাট বিল বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন, সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, গান্ধীর উদ্যোগে অসহযোগ আন্দোলন, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে আন্দোলন এবং একই সাথে শ্রমিক আন্দোলন, আরও বিস্ময়কর ঘটনা মালাবারে অনুষ্ঠিত মোপা গণঅভ্যুত্থান, মুহজিরিন আন্দোলন, চৌরিচৌরায় কৃষকরা সমস্ত আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, অন্ধ্রপ্রদেশে রম্পা অভ্যুত্থান, সমগ্র ভারতে স্বরাজদলের ব্যাপক আলোড়ন, বিশ্ববিখ্যাত কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা, সমস্ত বাধা ও বিপত্তিকে উপেক্ষা করে কানপুরে কমিউনিস্ট সমাবেশ ও সম্মেলন, বারদৌলির সত্যাগ্রহ আন্দোলন, মুম্বাইয়ে সুতাকল শ্রমিকদের বিপুল অভ্যুত্থান, সমগ্র দেশকে আলোড়িত করে কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক পার্টির সম্মেলন, মিরাটে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা, নিখিল ভারত কংগ্রেস সম্মেলনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন, মাস্টারদা সূর্যসেনের চট্টগ্রামে অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহ ঘোষণা, এভাবে এ সমস্ত উত্তেজনাকর ঘটনায় ভারত সরকার তখন সম্বিতহারা।

"এই সময়কার অর্থাৎ ১৯২১ সাল হইতে ১৯২৫ সালের মধ্যকার আরও কয়েকটি ঘটনা বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কর্মীদের উপরে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। ২২ সালের দিকে জার্মানি হইতে প্রকাশিত 'ভ্যানগার্ড' নামে একটি ইংরেজি প্রচারপত্রিকা বেশ কিছুদিন গোপনে ঢাকায় আসে এবং ইহা কিছুটা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এই পত্রিকাটি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রচার দপ্তর হইতে প্রকাশিত হইত। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা এম. এন. রায় ১৯১৯ সালের দিকে মেক্সিকোতে থাকা অবস্থায় কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়া তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দেন এবং পরে রাশিয়ায় থাকিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার উপরে আন্তর্জাতিকের তরফ হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল। ১৯২২ সালের দিকে এম. এন. রায়ের দূত হিসাবে নলিনী গুপ্ত নামে ইউরোপে প্রবাসী একজন বিপ্লবী গোপনে ভারতবর্ষে আসেন এবং ১৯২৩ সালের দিকে ঢাকায় থাকেন। প্রায় একই সময়ে আর একজন নামজাদা বিপ্লবী অবনী মুখার্জি রাশিয়া হইতে গোপনে এদেশে আসেন এবং কিছুকাল ঢাকায় থাকেন। অবনী মুখার্জির প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুরে মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু সেখান হইতে মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়া

 www.amarboi.com ~

তিনি পলায়ন করেন এবং নানা দেশ ঘুরিয়া রাশিয়ায় গিয়া উপস্থিত হন ও কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। ঢাকায় থাকা অবস্থায় বেশ কিছু বিপ্লবী কর্মী এই দুই জনের সংস্পর্শে আসেন এবং রুশ বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহাদের মুখ হইতে অনেক কথা শুনেন। অনুশীলন সমিতির নেতারাই এই দুইজনের ঢাকায় থাকার ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ইহাদের মাধ্যমে বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

এই সমস্ত ঘটনার ফলে ঢাকায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী একটা অংশের ভিতরে—বিশেষ করিয়া যাঁহারা অনুশীলন সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন—কমিউনিজম সম্বন্ধে বেশ কিছুটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইহাদেরও অধিকাংশই সন্ত্রাসবাদী দল ছাড়িয়া দেন না কিংবা মতবাদ হিসাবে কমিউনিজম গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মধ্যে ঢাকার গোপাল বসাক ও নলীন্দ্র সেন (পদ্ম)-এর নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ঢাকায় ১৯২৬ সাল হইতে কমিউনিজমকে ভিত্তি করিয়া কিছু সংগঠন দাঁড় করাইতে চেষ্টা করেন। নলীন্দ্র সেন কলিকাতায় থাকিয়া পড়িতেন এবং সেখানে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হন। ছুটির সময় ঢাকায় আসিয়া তিনি কিছু কিছু যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিতেন। গোপাল বসাক ঢাকায় থাকিতেন এবং তিনি বিশেষ করিয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেন।

১৯২৭ সালে বিভিন্ন বিপ্লবী গ্রুপগুলির মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকায় একটি যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গোপাল বসাক ইহাতে বেশ উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার চেষ্টায় সম্মেলনের দুইটি বিভাগে সভাপতিত্ব করার জন্য কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ডাঃ ভূপেন দত্ত আমন্ত্রিত হন। ভূপেন দত্ত বিদেশে দীর্ঘদিন নির্বাসিত জীবন যাপন করেন এবং ১৯২৬ সালে তিনি ভারতে ফিরিবার অনুমতি পান। তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং উঁচুদরের পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল! ১৯২৬ সালে গৌহাটিতে জাতীয় সংগ্রেসের অধিবেশনের সময় নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মার্কসবাদী-ব্যাখ্যামূলক যে অভিভাষণ দেন, তাহা অন্যান্য জায়গার মত ঢাকার যুবকদেরও আকৃষ্ট করে। ঢাকার যুব সম্মেলনে ডাঃ ভূপেন দত্ত ও কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদের ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ হাজির করা হয়। কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ বিশেষ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকদের ভূমিকার উপরে যে আলোকপাত করেন তাহা ঢাকার যুবক ও বিপ্লবীদের সামনে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলিয়া ধরে"।

ব্রিটিশ সরকার অনেক চেষ্টা করেও কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দমন করতে পারে নি বরং সংগঠন তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং কমিউনিজমের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সমগ্র ভারতব্যাপী কমিউনিজমের সাংগঠনিক তৎপরতা বেড়ে যায়। জ্ঞান চক্রবর্তী এ সময়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

"এই সময়েই ঘটে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রাভিযান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের বিপুল সাফল্য এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

সোভিয়েটের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। এই চার বৎসর বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কর্মীরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাহা সাধারণ অবস্থার চার যুগের সমান। এই চার বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের দুঃসাহসিক কাজকর্মের মাধ্যমে এতবড় শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। আর কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী পথ ও আপসবাদী নেতৃত্বের দ্বারাও স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হইতে পারে না। তবে পথ কী? মীরাট মামলার প্রচার ও সোভিয়েটের সাফল্য তাঁদের এই পথের সন্ধান দেয়।

আন্দামান, দেউলী ক্যাম্প, বক্সা ক্যাম্প, হিজলী ক্যাম্প, বহরমপুর ক্যাম্প ও অন্যান্য জেলেও অন্তরীণ হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মী কমিউনিজম চর্চার ভিতর দিয়া পথের নির্দেশ খুঁজিতে আরম্ভ করেন। বৎসরের পর বৎসর নিরলসভাবে তাঁহারা কমিউনিস্ট তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে গিয়া বইয়ের মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। বাহিরেও চলে নূতন পথের সন্ধান। এন্ডারসনি দমননীতির ফলে তখন বাংলাদেশে চলিতেছে চরম সরকারী সন্ত্রাস। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে '৩৩-৩৪-৩৫-৩৬ সাল হইতেছে সবচেয়ে অন্ধকার যুগ। এই অবস্থায় ১৯৩৪ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া গোপাল বসাক ঢাকায় আসেন। ধীরে ধীরে কিছুসংখ্যক ছাত্র, যুবক এবং পুরান পরিচিত লোক আসিয়া তাঁহার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। '৩৫ সালের পরে কিছু কিছু বন্দী ও জেলখানা হইতে মুক্তি পাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা জেলখানা হইতে কমিউনিজমের প্রাথমিক জ্ঞান নিয়া আসিয়াছিলেন। ৩৭ সালে নলীন্দ্র সেনও জেলখানা হইতে মুক্ত হইয়া ঢাকায় আসেন।

১৯৩৪ সালে একটি গোপন সম্মেলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) নূতন করিয়া গঠিত হয়। ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড পি.সি. যোশী। পার্টি গঠিত হওয়ার পরেই ভারত সরকার পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পার্টি গঠন সমগ্র দেশে একটা নূতন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। এই সময়ে বাংলাদেশের বিশেষ করিয়া ইহার জিলাগুলির অবস্থাই ছিল সবচেয়ে কঠিন। এন্ডারসনি সন্ত্রাসের দাপটে কিছুমাত্র রাজনৈতিক কাজের সুযোগ ছিল না। পুলিশ ও সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের তখন অবাধ রাজত্ব। কোন রকম রাজনৈতিক সংগঠন তো দূরের কথা, ক্লাব, লাইব্রেরী, সেবাসমিতির মত কোন সংগঠনও সেই সময়ে করা সম্ভব ছিল না।

১৯৩৭-৩৮ সালে আন্দামান ও বিভিন্ন জেল হইতে বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ ও নেতৃস্থানীয় বন্দী মুক্তি লাভ করিয়া ঢাকায় আসেন ও পার্টিতে যোগ দেন। জেলখানা হইতেই ইঁহারা কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে মুন্সীগঞ্জের পূর্ণদাস গ্রুপের জিতেন ঘোষ; জীবন চ্যাটার্জি গ্রুপের সত্যেন সেন, প্রবোধ গুপ্ত, সুশীল ঘোষ; ঢাকার শ্রীসংঘের নেপাল নাগ, বিনয় বসু, বঙ্গেশ্বর রায়; যুগান্তর পার্টির জ্ঞান চক্রবর্তী; নারায়ণগঞ্জের অনুশীলন সমিতির অনীল মুখার্জি, ব্রজেন দাস, সুবোধ সেন, বারীন দত্ত; নারায়ণগঞ্জ গ্রামাঞ্চলের সতীশ পাকড়াশী, সতীন রায়, গোপাল গুপ্ত, অন্নদা পাল; মানিকগঞ্জের যুগান্তর পার্টির সমর ঘোষ, যাদব চ্যাটার্জির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা জিলা পার্টিকে গড়িয়া তোলার ব্যাপারে ইঁহাদের সকলেরই উল্লেখযোগ্য অবদান

দুনিয়ার পাঠক এক হও!৩০ www.amarboi.com ~

আছে। কাজেই ১৯৩৮ সালেই জিলায় পার্টি ও গণসংগঠনগুলি গড়িয়া তোলার উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপিত হয়।' ৩৮ সালের মধ্যেই ঢাকা প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, নারায়ণগঞ্জ হোসিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, লক্ষ্মীনারায়ণ টেক্সটাইল মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি ইউনিয়নগুলি গড়িয়া উঠে; ঢাকেশ্বরী মিলও চিত্তরঞ্জন মিলের শ্রমিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়; ছাত্র ফেডারেশন জিলার একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠে এবং মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ মহকুমার গ্রাম অঞ্চলে কৃষক সমিতি গড়ার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক কৃষকসভা অনুষ্ঠিত হয়"।

এ সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, বিশেষ করে রায়পুরা, বেলাব, মনোহরদী, শিবপুর, নরসিংদী প্রভৃতি এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করে।

উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত রায়পুরায় (বেলাব, মনোহরদী, শিবপুর) তখন কমিউনিস্ট কর্মীদের একটি শক্তিশালী মোর্চা গড়ে ওঠে—এ এলাকায় কমরেড মণি সিং থেকে শুরু করে জ্ঞান চক্রবর্তী, সত্যেন সেন, যীতেন ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ, সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ ছাড়াও সরদার ফজলুল করিমের আত্মগোপনের নির্ভরতম আশ্রয় ছিল। জ্ঞান চক্রবর্তী বলেছেন—

"১৯৩৮-৩৯ সালে পার্টি হইতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে দুইটি অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই অফিসগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বহু সারাসময়ী কর্মী থাকিতেন। ঢাকার অফিস হইতে জিলার সমস্ত জায়গায় আন্দোলন ও সংগঠনের সঙ্গে এবং নারায়ণগঞ্জ শহর ও মিল অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হইত। এই ফিস দুইটি খুবই কর্মব্যস্ত ছিল। এগুলিতে প্রায় প্রতিদিনই ক্লাশ আলোচনা সভা ও শ্রমিকদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইত এবং এইগুলি সারাদিনই খোলা থাকিত। ঢাকা অফিসে কোন কোন সময়ে সারাদিনে কয়েক শত লোক উপস্থিত হইত। নারায়ণগঞ্জ অফিসেও মিলের শ্রমিকদের ও শহরের নানা অংশের লোকের ভিড় লাগিয়াই থাকিত। ঢাকা অফিস হইতে জিলার জায়গার কাজই পরিচালনা করিতে হইত বলিয়া ইহার কাজ খুবই দায়িত্বপূর্ণ ছিল। শ্রমিক এবং ছাত্র ছাড়াও ঢাকা শহরে গেণ্ডারিয়া, ফরিদাবাদ, সূত্রাপুর, দয়াগঞ্জ, মৈশণ্ডি, তাঁতিবাজার, আরমানিটোলা, শান্তিনগর, ধানমণ্ডি, তেজগাঁও প্রভৃতি পাড়াগুলিতে শক্তিশালী সংগঠন গড়িয়া উঠে। নারায়ণগঞ্জ শহরেও পার্টি সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে দাঁড়াইয়া যায়। ইহা ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ মহকুমার নরসিংদী, মাধবদি অঞ্চলেও চালাকচর অঞ্চলে; মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুর, সোনারং, আউটশাহী, মাওয়া অঞ্চলে এবং মানিকগঞ্জের তেরশ্রী অঞ্চলে বেশ শক্তিশালী পার্টি সংগঠন গড়িয়া ওঠে।

৩৯ সালে পার্টির প্রদেশিক নেতা মুজাফ্ফর আহমেদ, বঙ্কিম মুখার্জি ও সোমনাথ লাহিড়ী বিভিন্ন কাজ উপলক্ষে ঢাকায় আসেন এবং জিলা কমিটির সহিত ও অন্যান্য কমরেডদের সহিত পার্টির বিভিন্ন বিষয় নিয়া আলোচনা করেন। এই সময়ে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র ইংরাজী সাপ্তাহিক ন্যাশনাল ফ্রন্ট ঢাকা জিলায় নিয়মিত প্রায় ২০০ কপি বিক্রয় হইত। প্রত্যেক পার্টি-সভ্যের জন্য এই পত্রিকা বিক্রয় করা বাধ্যতামূলক ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৩৮ সালে পার্টির কমরেডরা জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে যেমন কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া কাজ করিতেন সেরকম গণ-প্রতিষ্ঠানগুলিও অন্যান্য দলের সহযোগিতায় গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে আর.এস. পি'র (রেভোলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি) সঙ্গে; কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে এবং ছাত্র ফেডারেশনের ক্ষেত্রে আর. এস.পি, শ্রীসংঘ-বি.ভি (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স) প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহারা একযোগে কাজ করিতেন। জিলা কংগ্রেস এবং বিভিন্ন গ্রাম ও মহকুমা শহরগুলিতে আমাদের অনেক কমরেডই কংগ্রেসের নেতা"।

আন্তর্জাতিক, বৈশ্বিক ও দৈশিক এ সমস্ত ঘটনা সোমেন চন্দের মানসিক বলয়ে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তখন সোমেনের সামনে একটি উজ্জ্বল আলোকিত পথ কমিউনিজম। মেহনতি মানুষের মুক্তি ও পথ ছিলো একমাত্র সমাজতন্ত্র।

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা বলতে পারি যে, সোমেনের সময়টাই ছিল সমগ্র পৃথিবীতে বিপ্লব, বিদ্রোহ, সংগ্রাম, সংঘর্ষ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন। সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতিতেও এসেছিলো এ পরিবর্তন। বিজ্ঞান ও দর্শন মানুষের চিন্তার জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলো। আধুনিক বিশ্বের মহান স্থপতি কার্লমার্কস, ডারউইন ও ফ্রয়েডের তত্ত্ব মানুষের মনোভূমিতে নতুন করে চিন্তার সুযোগ ছিল। বিজ্ঞান ও দর্শনের নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে উন্মুখ হলো মানুষ। জীবন জিজ্ঞাসা ও আত্মজিজ্ঞাসায় মানুষ নতুন নতুন আবিষ্কারে গবেষণা শুরু করলো।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে-ইতিহাসের পদতাড়নায় জেগে ওঠেছে একটি নতুন যুগ, সে রুশ বিপ্লব। ভেঙে গেছে মানুষের সামন্ত স্বপ্ন। পুঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করেছে রুশ বিপ্লব। কল কারখানা আর ক্ষেত-খামারের এবং সমাজের ভুখা নাঙ্গা শ্রমে ঘামে সিক্ত, কালি-ঝুলি মাখা অধিকার বঞ্চিত সর্বহারা মানুষগুলো বিপ্লবের ঝাণ্ডা হাতে লড়াইয়ের শাণিত শপথ নিয়ে মিছিলে স্লোগানে সমগ্র পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে তুলেছে তারা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য।

মহান রুশ বিপ্লব শুধু আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নয়— সাহিত্য তথা কাব্য জগতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আলোক সম্পাত করেছে। আমাদের সাহিত্যে এতোদিন যেখানে, সামন্ত প্রভু, উপরওয়ালা আর ধনিক-বণিকের জয়গানে মুখরিত ছিল-সে স্থান দখল করল কুলি, শ্রমিক, মজুর, রিকশাওয়ালা, পতিতা ও মেহনতি মানুষ। বাংলা সাহিত্যে উৎসারি হল আর একটি নতুন ধারা। 'কালি-কলম', 'কল্লোল' ও 'প্রগতিগোষ্ঠি' এই নতুন ধারার উত্তাপকে আত্মস্থ করে সৃষ্টি করলো মার্কসীয় সাহিত্য, গণসাহিত্য ও প্রলেতারিয়াত সাহিত্য। সাহিত্য এবার বিলাস ও বিনোদনের সামগ্রী না হয়ে হলো মেহনতি মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার। পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ ও উপরওয়ালাকে সালাম জানিয়ে এ সাহিত্যে ভিড় জমালো কুলি, শ্রমিক, মজুর ও মেহনতি মানুষ। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও রুশ বিপ্লবের চেতনা উৎসারিত হয়েছে নজরুলের কবিতা ও বিভিন্ন লেখায়। তার 'সাম্যবাদী' কাব্য এ ধারার সাক্ষ্য বহন করে। তাই নজরুলের উচ্চারণে আমরা উচ্চকিত হই—

প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস
যেনো লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩২www.amarboi.com ~

এ ধারার অন্যান্য কবি হলেন সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ মিত্র, সুকান্ত, গোলাম কুদ্দুস আরও অনেকে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কণ্ঠে শুনি আর এক নতুন সুর—

'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের
আমি কবি যত ইতরের'।

পদাতিকের' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শুনি—

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে।

সুকান্ত সম্বন্ধে আজ আমাদের নতুন বক্তব্যের প্রয়োজন নেই, তার বহুল উচ্চারিত উক্তি আবার উপস্থাপন করছি—

হে মহাজীবন আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ লালিত্য-ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতার
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেনো ঝলসানো রুটি।

সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবে বিশ্বাসী মার্কসবাদী এই বিপ্লবী যখন আহ্বান করেন—

বেজে উঠলো কি সময়ের ঘড়ি?
এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি,
আমরা সবাই যে যার প্রহরী,
উঠুক ডেকে;
উঠুক তোকান মাটিতে পাহাড়ে
জ্বলুক আগুন গরীবের হাড়ে
কোটি করাঘাত পৌঁছাল ঘাড়ে—
ভীরুরা থাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩৩www.amarboi.com ~

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার আন্দামানে যাদের দ্বীপান্তরিত করেছিলো মুক্তি পাবার পর তারাই ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলায় গোপনে পার্টির কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো। সোমেন সোভিয়েত রাশিয়ার সফল বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্রের সাফল্যে ও আন্দামান ফেরত বিপ্লবীদের দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হন।

এই আন্দামান ফেরত বিপ্লবীদের মধ্যে সতীশ পাকড়াশীর সাথে সোমেনের সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। এই ঘনিষ্ঠতার ফলেই সোমেন কমিউনিস্ট পার্টি, মার্কসবাদী দর্শন ও মার্কসীয় সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ বিষয়ে শুভেন্দু শেখর মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

"...ঢাকায় তাঁর পরিচয় হয় আন্দামান ফেরৎ প্রবীণ বিপ্লবী নেতা সতীশ পাকড়াশীর সঙ্গে। সোমেন রাজনীতি ও সাহিত্যকে মিলিয়ে দেখার প্রথম প্রেরণা পান এই বিপ্লবী নেতার কাছ থেকেই।... সতীশদা সেদিন সোমেনকে যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ এই : অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়— তখন একজন লেখককেও কলম ছেড়ে বন্দুক ধরতে হয়। ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে তাই স্পেনের লাঞ্ছিত গণমানবের মর্মকথা ফুটিয়ে তুলবার যে প্রেরণা, সেই প্রেরণাই লেখককে গণমানবের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে। [সোমেন চন্দের রচনায় জীবন প্রত্যয়]

এরই মধ্যে সোমেন বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্য ও ইতিহাস পড়েছেন। পড়েছেন বিশ্বের রাজনীতি, সংগ্রাম, বিপ্লব, আন্দোলনের ইতিহাস ও সাহিত্য। এই পড়ার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রগতিবাদী ও বিপ্লবী লেখকদের বইও পড়ে ফেলেছেন। সোমেনের আন্তর্জাতিক ভিত্তি শক্ত হয়েছে। এ সময়ে তার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্তের লেখায়—

১৯৩৮-এ সোমেনের যখন আঠারো বছর বয়স, তখন স্বদেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছিল ১৯২৯ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে স্বদেশ, ব্রিটেন, ও ইউরোপের রাজনৈতিক পটভূমি যেসব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনায় প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল—মাত্র আঠারো বছর বয়সেই সোমেন যেন সেসব ঘটনাকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। এই সময়ে যেসব লেখকের লেখা তিনি পড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তাঁদের মধ্যে টি.এস. ইলিয়ট, অডেন, স্টিফেন স্পেন্ডারের মতো কবি এবং ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, অলডাস হাক্সলি, ই.এম.ফর্স্টার, হেমিংওয়ে, গোর্কি, শোলোখভ, রেমার্কে, ইগনোৎসিও সিলোনি, লুডভিক রেনে, আঁদ্রে, জিদ্, টমাস মান, আপটন সিনক্লেয়ার, পার্ল বাক্ প্রভৃতি ঔপন্যাসিক ছিলেন। সমসাময়িক কালের পৃথিবীটা কোন্ কোন্ সমস্যায় জর্জরিত, সেটা জানবার জন্যই ঐ সময় থেকেই সোমেন চন্দ নিজের একটা নোট বুক-এ এসব লেখকের নানা বই থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি টুকে রাখতেন। তাঁর নিজের লেখক-জীবনকে সমৃদ্ধ করবার জন্যও এসব লেখকের রচনার সঙ্গে পরিচয় অত্যাবশ্যক বলে তিনি মেনে নিয়েছিলেন।' [সোমেন চন্দ ও সমকাল—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত]

পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ এবং বিপ্লব সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নিয়ে সমস্ত বিশ্বে যখন আলোড়ন ও তোলপাড় এর প্রভাব সোমেনকেও আলোড়িত করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩৪www.amarboi.com ~

আমরা বিশ্বরাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপকে বোঝার জন্য একটু উদ্ধৃতির আশ্রয় নেব।

এদিকে যেমন মহাযুদ্ধের বিজয়ীপক্ষের উদ্দেশ্য ছিলো ইউরোপের জার্মানিকে বলহীন করে তার প্রভাব ঠেকিয়ে রাখা, অন্যদিকে জার্মানির পরাভূত ও ক্রুদ্ধ দেশনায়ক ও জনসাধারণ স্থির করে রেখেছিলো—সময় ও সুযোগ পেলেই এই অসম অন্যায় চুক্তির সমস্ত দলিলটা অস্বীকার করা হবে। অল্প বয়সে বাবার কাছে এসব ঘটনার বিবরণ শুনে সোমেন সমসাময়িক কালের পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন।

স্পেনে যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হল এবং জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট সেনার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রীদের স্বপক্ষে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে কবি ও কথাশিল্পীরা স্পেনে এসে যুদ্ধে যোগ দিলেন তখন লোকসমাজের এই মানসিক সক্রিয়তা আরও অনেক লেখকের মতো তরুণ লেখক সোমেন চন্দকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।...হেমিংওয়ে, আঁদ্রে, মানরো, লুডভিক, রেনে—যুদ্ধের আগুন থেকে যদিও-বা বেঁচে এলেন; আত্মাহুতি দিলেন স্পেনের রণাঙ্গনে র‍্যাল্‌ফ্ ফক্স, জন কনফোর্ড, জুলিয়ান বেল, ক্রিস্টোফার কডওয়েল এবং তরুণতর আরও কেউ কেউ।"

কখনো কখনো যুগ মানুষকে তৈরি করে আবার মানুষও যুগকে সৃষ্টি করে। বিশ্বব্যাপী তখন পবিরর্তনের পালা। ভাঙনের পালা, গড়ার পালা এবং সৃষ্টি সুখের উল্লাসের কাল। ফলে বৈশ্বিক এই পরিবর্তন এবং রুশ বিপ্লবের সাফল্যে শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের জাগরণ ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন হতে বাঁচার মন্ত্র মানুষকে, উদ্বুদ্ধ করে—সাম্যবাদের বীজ রোপিত হয়েছে তরুণদের মধ্যে। সোমেন এদেরই একজন। নেপাল মজুমদারের ভাষায়—

'রবীন্দ্রনাথ ইতালি পরিভ্রমণকালে রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছে বিশেষভাবে ফ্যাসিবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ধারণা পেয়েছিলেন। ভারতে ফ্যাসিবাদবিরোধী মনোভাবের সূত্রপাতের পেছনে এ ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হল প্রগতি লেখক সম্মেলন। সেই সম্মেলনের সভাপতি মুন্সি প্রেমচাঁদের ভাষণে এবং তাঁর মহাজনী সভ্যতা প্রবন্ধে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত হল ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধ মনোভাব। একদিকে প্রগতি লেখক সম্মেলন অপরদিকে স্পেনে প্রেরিত আন্তর্জাতিক ব্রিগেড—এরই মধ্যে সোমেনের মতো বহু তরুণ সেদিন রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।' [ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের প্রথম শহিদ সোমেন চন্দ]

বৈশ্বিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আঠারো বছরের সোমেন যেমন অনুরাগের সাথে পড়েছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের গ্রন্থাবলি যেমন—

টি. এস. এলিয়ট, অডেন, স্টিফেন, স্পেন্ডার, ভার্জিনিয়া উলফ, হাক্সলি, ই.এম. ফর্স্টার, হেমিংওয়ে, ম্যাক্সিম গোর্কি, আঁদ্রে জিদ, র‍্যালফ ফক্স, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, আপটন সিনক্লেয়ার প্রমুখের লেখা পড়েছেন গো-গ্রাসে। সোমেনের যেমন ছিলো পড়াশুনায় প্রচণ্ড আগ্রহ তেমনি ছিলো অনুসন্ধিৎসা। এবং তার পড়াশুনার পরিধি ছিলো বহুধায় বিস্তৃত। একই সাথে পড়েছেন কার্লমার্কসের ক্যাপিটাল ও রোমাঁ রোলাঁ I will

www.amarboi.com ~

not rest. অন্যদিকে নান্দনিকতা থেকে পড়েছেন র‍্যালফ ফক্সের The Novel and the people. ক্রিস্টোফার কডওয়েল ইলিউশর্ণ এ্যান্ড রিয়্যালিটি। একই সাথে গভীর নিষ্ঠার সাথে পড়েছেন ম্যাটসিনির Duties of man. এ প্রসঙ্গে তিনি অমৃতকুমার দত্তকে লিখেন—

"...লিখতে হবে—মেহনতী মানুষের জন্য, সর্বহারা মানুষের জন্য আমাদের লিখতে হবে। র‍্যালফ ফক্সের বই পড়ে আমি অন্তরে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। কডওয়েলের বইটিও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই না-হলে কি মহৎ সাহিত্যিক হওয়া যায়? স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে তাঁদের আত্মবিসর্জন ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আশার কথা—সাহিত্যে তরুণ লেখকরা এদিকে সচেতন হচ্ছেন।....বিপ্লবের জন্য একজন তরুণ লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। গোর্কির কথাই চিন্তা কর। সৌখিন সাহিত্য করার আর সময় নেই।..."

তথ্য নির্দেশ

১. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : পৃ. ৩৪
২. J.A. Simson, History of Renaisance, P. 91
৩. কার্লমার্কস : ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল, পৃ. ৭৩
৪. Kaleldoscope, Sept, 1921.
৫. ক্যালকাটা জার্নাল, ফেব্রুয়ারি, ১৮৩১
৬. ইস্টবেঙ্গল, FEB, ১৮৩০
৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ৭৪
৮. ঐ পৃ. ৬৬
৯. ঐ পৃ. ১০৬
১০. ঐ পৃ. ৭৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ও সোমেন চন্দ

মহান রুশ বিপ্লবের সাফল্য ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশেও অভিঘাত করেছে। সোমেন চন্দ বাল্যকালেই এই অভিঘাতে উদ্দীপ্ত হন। এবং আঠারো বছর বয়সে তিনি মার্কসবাদী রাজনীতি ও মার্কসীয় সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। সোমেন চন্দের শিক্ষাজীবন শুরু ঢাকার পোগোজ স্কুলে। বাল্যকালেই তিনি নিজের এলাকা এবং ঢাকায় মার্কসবাদীদের সংস্পর্শে আসেন। আগেই আমি নরসিংদী এলাকার কথা উল্লেখ করেছি—এ এলাকায় তখন বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী, বঙ্কু ডাক্তার, ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ, বিজয় চ্যাটার্জি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে তৎপর ছিলেন এবং সরদার ফজলুল করিমের আত্মগোপন জীবনের একটা বিশেষ অধ্যায় কেটেছে এই এলাকায়। অপরদিকে পোগোজ স্কুলে পড়ার সময় সোমেন ঢাকায় অবস্থানকারী মার্কসবাদী বিপ্লবীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন।

ঢাকায় সোমেন চন্দের সাথে প্রথমে আদর্শিক ঘনিষ্ঠতায় একাত্ম হন আন্দামান ফেরত বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর সাথে। উল্লেখ্য যে, সতীশ পাকড়াশীর বাড়ি আমাদের নরসিংদী এলাকায়। এরই সাথে সোমেন তখন রণেশদাশ গুপ্তের সান্নিধ্যেও আসেন।

ঢাকার মৈশন্ডি এলাকায় 'কমিউনিস্ট পাঠচক্র' নামে একটি গোপন পাঠচক্র গড়ে ওঠে। সে ১৯৩৮ সনের কথা। এর মূল হোতা ছিলেন সতীশ পাকড়াশী, জ্ঞান চক্রবর্তী রণেশদাশ গুপ্ত প্রমুখ। প্রবল বৈরিতার মুখে এই পাঠচক্রের সদস্যরা দেশপ্রেম, মানবতা ও সমাজ পরিবর্তন এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রচারণা চালাতেন নতুন নতুন ছাত্রদের কাছে।

'কমিউনিস্ট পাঠচক্রের' প্রতিষ্ঠাতাদের প্রকাশ্য শাখা ছিল প্রগতি পাঠাগার। এই পাঠাগারে সোমেন চন্দ নিয়মিত পাঠাভ্যাস করতেন এবং প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে আলাপ আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। আর এ সময় সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতায় সম্পৃক্ততা হন সতীশ পাকড়াশীর সাথে। সতীশ পাকড়াশী সোমেনকে বলেন— 'সাহিত্য রচনার পথেও বিপ্লবের কাজ হয়। তুমি দেশের দারিদ্র্যপীড়িত দুঃখী জনগণের আশা উদ্যমহীন জীবনের কথা দিয়ে জীবন্ত গণসাহিত্য তৈরি কর— তাহলে তোমার ইপ্সিত স্বাভাবিক কর্মপথেই তুমি ভবিষ্যৎ গণবিপ্লবের পথ প্রস্তুতের সহায়ক হতে পার'।

এরই মধ্যে সোমেন চন্দ অনেক বই পড়েছেন—বিপ্লব, সমাজ পরিবর্তন ও মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং বিশ্বের বিপ্লবী কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের জীবন-কাহিনীও লেখার সাথে পরিচিত হয়েছেন। এ সময় সোমেনের মানসিক অবস্থা প্রসঙ্গে সতীশ পাকড়াশী বলেছেন—

'স্পেনে জনগণের জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস—আন্তর্জাতিক বাহিনী ব্রিটেনের গণ-সাহিত্যিক, ব্রিটেনের বিপ্লবী কমিউনিস্ট র‍্যালফ ফক্সের স্পেনের আন্তর্জাতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩৭www.amarboi.com ~

বাহিনীতে যোগদান...বিদেশী কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও রাজনীতিক কর্মীদের জীবন উৎসর্গ—এই টুকরো টুকরো কথাগুলো একত্রে মিশিয়ে সোমেনের মনে এক অপূর্ব ভাব বিস্ময় পুলকের সঞ্চার করে। সোমেন জিজ্ঞাসু প্রাণে বলে উঠলেন—এরাই সত্যিকারের সাহিত্যিক'।

এই আকর্ষণের ফলেই সোমেন হয়ে ওঠলেন প্রগতির পদাতিক, মার্কসবাদী, সমাজ বিপ্লবী ও একজন কমিউনিস্ট এবং সুদক্ষ সংগঠক।

রুশ বিপ্লবের সাফল্য ও এর প্রভাব সমগ্র পৃথিবীর কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলো—তারা পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে তাদের কলম তুলিকে শাণিত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন এবং মেহনতি মানুষের মুক্তি ও বিপ্লবের পক্ষে একত্রিত হতে শুরু করেন।

প্যারিস সম্মেলনের শেষে লন্ডনে ব্রিটিশ ও ভারতীয় লেখকদের সমন্বয়ে প্রগতি সাহিত্য সংঘ গঠিত হয়। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন—হ্যারাল্ড ল্যাস্কি, হার্বার্ট রিড, মন্টেগু শ্ল্যাটার, মুলুকরাজ আনন্দ, রজনীপাম দত্ত, ই. এম. ফসস্টার ও সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ। ১৯৩৬ সালে ১০ এপ্রিল গঠিত হয় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ।

মুনসী পেমচাঁদের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন ভারত কন্যা কবি, রাজনীতিবিদ, বিদ্বত ব্যক্তিত্ব সরোজিনী নাইডু।

১৯৩৬ সালের ২৫ জুন মহান শিল্পী ম্যক্সিম গোর্কির মৃত্যু উপলক্ষে কলকাতা এলবার্ট হলে এক শোকসভা হয় এবং এখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘ প্রসঙ্গে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন পূর্ব বঙ্গের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিলো ঢাকায়। প্রচলিত সেখানেই লেখকরা সংগঠিতভাবে এই ধরনের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর এবং অন্যান্য জেলায় প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক ইউনিয়ন ও কৃষক-সভার মাধ্যমে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিলো। কিন্তু শ্রীহট্ট ছাড়া ঢাকা জেলার বাইরে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সাংস্কৃতিক চেতনার স্বাক্ষর তেমন পাওয়া যায় না।

১৯৩৯ সালে রণেশদাশ গুপ্ত ও সোমেন চন্দ প্রমুখের সাংগঠনিক তৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা জেলা শাখা প্রগতি লেখক সংঘ। প্রাথমিক অবস্থায় এ সংঘের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন রণেশদাশ গুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অমৃত কুমার দত্ত, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, সত্যেন সেন, সতীশ পাকড়াশী, মুনীর চৌধুরী ও সোমেন চন্দ।

সোমেন চন্দ সম্বন্ধে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন—'ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের লেখক আন্দোলনে একদিক থেকে সার্থকতা লাভ করেছিল। কেন না সোমেন চন্দের মতো একজন পুরোপুরী কমিউনিস্ট লেখক এই সংঘে একবারে আন্দোলনের পুরোভাগে এনে দিতে পেরেছিল। ঢাকার সোমেন তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে প্রগতি লেখক সংঘ জেলা শাখার উদ্বোধন করেছিলেন ১৯৩৯ সনেই'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩৮www.amarboi.com ~

প্রগতি লেখক সংঘের সকল সদস্যই ছিলেন নিষ্ঠাবান ও কর্মতৎপর কিন্তু এর মধ্যে সোমেন চন্দ ছিলেন অনন্য। তার জনসংযোগ, কর্মতৎপরতা, আন্তরিকতা, সততা, কর্মদক্ষতা ছিল প্রবাদতুল্য। প্রগতিশীল তরুণ কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের তিনি সৌর বলয়ের মতো আকর্ষণে টেনে আনতে পারতেন।

সোমেনের যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় তা তার গ্রহণযোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, সততা, নিষ্ঠা, মার্কসীয় আদর্শের প্রতি নিবেদিত প্রাণ, অমায়িক ব্যবহার ও চারিত্রিক মাধুর্য। অল্পবয়সের কোন বালকের মধ্যে এসব গুণের কোন সমন্বয় সহজে পরিলক্ষিত হয় না। এজন্যই রণেশদাশ গুপ্ত তার স্মৃতিচারণে বলেছেন—

'ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপিত হয়েছিল একটা সন্ধিক্ষণে। শাখা স্থাপনের প্রস্তুতির মুখে ছিলেন কয়েকজন লেখক—যারা ভাবছিলেন প্রগতি লেখক সংঘের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও গণমুখী ঘোষণাপত্র অনুযায়ী অবিলম্বে কিছু করা প্রয়োজন। যারা এই প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ বয়সী ছিলেন সোমেন চন্দ। যার বয়স এখন মাত্র আঠারো। আর সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন সতীশ পাকড়াশী। ...বাংলার অগ্নি যুগের পথিকৃৎদের একজন। যার বয়স সে সময় পঁয়তাল্লিশ অতিক্রম করেছে। ...পুরনো ঢাকা শহরের দক্ষিণ মৈশণ্ডী মহল্লায় প্রগতি পাঠাগার ছিল সঙ্গের প্রথম কেন্দ্র।'

সমগ্র বিশ্বব্যাপী তখন চলেছে ফ্যাসিজমের সর্বগ্রাস। রক্তোৎসব ও তাণ্ডব। ফ্যাসিজমের লোল জিহ্বার রক্তোন্মোত্ততা ও বীভৎস ত্রাসে বিশ্ব আগ্রাসনের উগ্রচণ্ডরূপ দেখে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তখন শঙ্কিত ও ভয়ভীতি কবলিত। মানবতাবাদী এবং বিশ্বশান্তির বাণীবাহক রোমাঁ রোলাঁ এবং আরি বারবুস ফ্যাসিবাদের এ রক্তোন্মত্ততার ভয়াবহ ও বীভৎস চিত্র তুলে ধরলেন বিশ্ববাসীর চোখের সামনে। এবং যুদ্ধের দাবানলও বিশ্বমানবকে যুদ্ধের রক্তোৎসব থেকে রক্ষার জন্য গঠন করলেন 'League Against fascism and war' নামক সংগঠন।

এই দুই মহামানব সামরিক জান্তা জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর দানবীয় থাবার ছোবল থেকে স্পেনকে রক্ষার জন্য বিশ্ববিবেকের কাছে আবেদন জানালেন। এ আবেদন তড়িৎ গতিতে সাড়া দিলেন ভারতের প্রগতিশীল ও শান্তিবাদী কবি, সাহিত্যিক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা। সাথে সাথেই 'League Against fascism and war' এর একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা গঠিত হল ভারতে। সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক হলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯৩৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ব্রাসেল্‌সে যে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এর জন্য রবীন্দ্রনাথসহ আরও কিছু সংখ্যক ব্যক্তিত্ব এই সম্মেলনে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এবং শান্তির পক্ষে একটি ইস্তেহার প্রচার করেন। তবে এই ইস্তেহারে প্রকাশ ও প্রচার হয় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষ থেকে। এই ইস্তেহারের বক্তব্য ছিলো—

'সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের দরদ আছে তাহাদের কাছে ভারত অপেক্ষাও ভারতের বাহিরের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক। মহাযুদ্ধের প্রেতচ্ছায়া পৃথিবীময় বিচরণ করিতেছে। ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরী খাদ্যের পরিবর্তে অস্ত্র যোগাইয়া এবং সংস্কৃতির সুযোগের পরিবর্তে সাম্রাজ্য গঠনের প্রলোভন ধরিয়া নিজেদের জঙ্গীবাদী রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। আবিসিনিয়াকে পদানত করিবার জন্য ইতালী যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহা যুক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসবান সকলকে কঠিন আঘাত করিয়াছে। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতা, স্থূল জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তিকে ইচ্ছাপূর্বক প্ররোচনা দান, দ্রুত অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি, সংকটময় পরিস্থিতির এই সব পূর্বসূচনা। আমরা এই সুযোগে আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে, আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই; যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ নাই। কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষের যোগদানের আমরা ঘোর বিরোধী; কারণ আমরা জানি যে, আগামী যুদ্ধে সভ্যতা ধ্বংস হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নই হউক, বা নাৎসী জার্মানীই হউক—যেখানে সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে সেখানেই উহার রক্ষার জন্য আমরা উদগ্রীব এবং আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য আমরা যথাশক্তি সংগ্রাম করিব'।

এই ইস্তেহারে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বসু, নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জওহর লাল নেহেরু, মুন্সী প্রেমচন্দ আরও অনেকে।

এ প্রসঙ্গে কিরণশঙ্কর সেন গুপ্ত তাঁর চল্লিশ দশকের 'ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন: পূর্ববঙ্গ' শিরোনামের প্রবন্ধে বলেছেন—

'পূর্ববঙ্গে ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল ঢাকা। প্রধানত সেখানেই লেখকরা সংগঠিতভাবে এই ধরনের আন্দোলনের জড়িয়ে পড়েছিলেন। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর এবং অন্যান্য জেলায় প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক ইউনিয়ন ও কৃষক সভার মাধ্যমে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীহট্ট ছাড়া ঢাকা জেলার বাইরে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বাক্ষর তেমন পাওয়া যায় না। শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত এবং কালীপ্রসন্ন দাশ সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'বলাকা' পত্রিকাটি প্রগতি সাহিত্যের ভাবধারাকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। বলা বাহুল্য, ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে তৎকালীন বাঙালি লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আসা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গোড়ার দিকে ছিল পুরোপুরি একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ; ব্রিটেনের এই যুদ্ধে হার হলে ভারত তার বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পেয়ে যাবে এই মনোভাব থেকে অনেকেই নাৎসী জার্মানীর আপাতসাফল্যকে খুবই উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন জানাতে শুরু করেছিলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের অমানুষিক দমনপীড়ন এই মনোভাবকে আরও দৃঢ় হতে সাহায্য করে'।

বিশ্বমানব ও মানবতার ওপর হিংস্র ও উন্মত্ত বর্বরতা এবং কলঙ্কিত রক্তাক্ত বীভৎস ঘটনা যদি কেউ ঘটিয়ে থাকে তবে সে হিটলারের নাৎসী বাহিনী। এই নাৎসী বাহিনী লোল জিহ্বা প্রসারিত করে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার ওপর। এরই ফলে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়লো ইউরোপ মহাদেশে। এবং বেজে ওঠল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা। সমগ্র বিশ্বে এই নিয়ে তোলপাড় এবং প্রকম্পিত।

বিশ্বের শান্তিবাদী, মানবতাবাদী, প্রগতিশীল ও যুদ্ধবিরোধী কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা একত্রিত হয়ে রাশিয়ার পক্ষে সমর্থন জানায় এবং হিটলারের এ আক্রমণকে ঘৃণা জানিয়ে প্রকাশ করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৪০www.amarboi.com ~

এ সময় ঢাকা শহরের প্রগতিশীল কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবী এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিশ্ব শান্তিকামীরাও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পক্ষে হিটলারের এই নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং ঘৃণা প্রকাশ করে।

প্রগতি সাহিত্য সংঘের পক্ষ থেকে একটি বর্ধিত সভা আহ্বান করা হলো। এই সভা আহ্বানের মূল উদ্দেশ্য নাৎসিবাদ হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং এই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা। এবং এ সভায় আরও আহ্বান করা হলো সমগ্র বিশ্বের শান্তিবাদী, প্রগতিবাদী ও যুদ্ধবিরোধী শক্তি একত্রিত হয়ে এই যুদ্ধবাজ আগ্রাসী শক্তিকে পরাজিত করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অবশেষে এই সভায় আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রগতিবাদী, শান্তিবাদী, যুদ্ধবিরোধী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্র-শিক্ষক, তরুণ যুবকদের একত্রিত করে সাধারণ মানুষসহ এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করা। শেষ পর্যন্ত ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা, রাজশাহী, সিলেট ও ময়মনসিংহ এলাকা থেকে প্রবল জনস্রোতের মতো বিপুল সংখ্যক মানুষ এই মহাসম্মেলনে এসে ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করে।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং কবি, সহিত্যিক, শিল্পী, মার্কসিস্ট ও বিপ্লবীদের ভূমিকা সোমেন চন্দের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। ফ্যাসিস্ট জেনারেল ফ্রান্সিস্কো ফ্রাঙ্কো ১৯৩৬ খ্রি. ১৮ জুলাই স্পেনের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শুরু হয় দেশটিতে গৃহযুদ্ধের দাবানল। গণতন্ত্র হত্যাকারী এই অবৈধ যুদ্ধবাজ সামরিক শক্তিকে অস্ত্র, রসদ ও সমস্ত সাহায্য প্রদান করে জঙ্গিবাদ হিটলার, মুসোলিনি এবং ধূর্ত ব্রিটিশ ও ফ্রান্স সেখানে চরম জালিয়াতি করে।

দীর্ঘ দুবছর স্পেন ও স্পেনের জনগণ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। অনেক মানুষ অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও চিকিৎসাহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। বিশ্ব জনমত গড়ে ওঠে স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে। কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী, প্রগতিশীল কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী বুদ্ধিজীবী স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন জানিয়ে ইন্টারন্যাশনাল বিগ্রেড গঠন করেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীর আগমন ঘটে স্পেনে এবং অনেকে প্রাণ বিসর্জন দেয়। বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে রয়েছেন র‍্যালফ ফক্স, ক্রিস্টফার কডওয়েল ও গার্মিয়া লেরেকা, পিকাসো। পিকাসো স্পেন থেকে পালিয়ে যায় ফ্রান্সে এবং এ সময়ই তার নিজের গ্রাম গোয়ের্নিকাকে নিয়ে অমর শিল্পকর্ম গোয়ের্নিকা। ভারত থেকে মাহারাষ্ট্রীয় তরুণ গোপাল মুকুন্দ হুদ্দার ঐ বিগ্রেডে যোগদান করেছিলেন। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মার্কসিস্ট না হয়েও এই বিগ্রেডে নাম লেখাতে চেয়েছিলেন।

স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের সমর্থনে বার্সোলোনার সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহেরু ও কৃষ্ণ মেনন। এই সামরিক জান্তার বর্বোরচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বিশ্ব বিবেকের কাছে আবেদন জানান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩ মার্চ ১৯৩৭ সনে কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় কবির বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

TO THE CONSCIENCE OF HUMANITY

In Spain. the world civilization is being menaced and trampled under foot. Against the democratic government of the Spanish people, Franco has raised the standard of revolt. International Fascism is pouring men and money in aid of the revels. Moors and foreign legionaries are sweeping over the beautiful plains of Spain, trailing behind them death, hunger and desolation.

Madrid, the proud centre of culture and art, is in flames. Her priceless treasures of art are being bombed by the rebels. Even hospitals and creches are not spared. Women and c hildren are murdered, made homeless and destitute.

This devastating tide of International Fascism must be checked. In Spain this inhuman recrudescence of obscurantism of racial prejudice, of rapine and glorification of war must be given the final rebuff. Civilization must be saved from its being swamped by barbarism.

At this hour of the supreme trial and suffering of the Spanish people, I appeal to the conscience of humanity.

ফ্যাসিবাদের রক্ত লুলোপ চিত্র এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে ও কবিতায়। কবির কালান্তর প্রবন্ধ থেকে একটু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি—

তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের ওপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয় নি—এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে।

ওদিকে আফ্রিকার কান্‌গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কী রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত এবং সেই জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় করে আসে।

তারপরে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিল। যেন কোন্ মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহু পূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্যে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করে নি। তারা আসত কালো আঁধির মতো ধুলায় আপনাকে আবৃত করে, কিন্তু এ এসেছে যেন অগ্নিগিরির আগ্নেয়স্রাব, অবরুদ্ধ পাপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৪২www.amarboi.com ~

বাধামুক্ত উৎস উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্তকে রাঙিয়ে তুলে, দগ্ধ করে দিয়ে দূরদূরান্তের পৃথিবীর শ্যামলতাকে। তারপর থেকে দেখছি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি।

রবীন্দ্রনাথ একটি একটি করে বিশ্বসভ্যতার পাতা উল্টিয়েছেন—ফ্যাসিবাদের রক্তাক্ত ও কলঙ্কিত চিত্রগুলো তুলে ধরেছেন। উন্মোচন করেছেন নারকীয় ঘটনাগুলো। 'সভ্য য়ুরোপের সর্দার-পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার-লজ্জনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজির বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। আয়র্লণ্ডে রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল, অনুতিপূর্বেও আমরা তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তার পরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে-য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজমের নির্বিচার নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপের এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে'।

এরপর রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী ফরাসী কবি রেনে বেইস-এর বক্তব্য—

So after the war I was sent to Guiana....Condemned to fifteen years' penal servitude I have drained to the dregs the cup of bitterness but the term of penal servitude being completed, there remains always the accessory punishment—banishment for life. One arrives in Guiana sound in health, young, vigorous, one leaves (if one leaves), weakly, old, ill. One arrives in Guiana honest—a few months later one is corrupted. ... They (the transportees) are an easy prey to all the maladies of this land—fever, dysentry, tuberculosis and most terrible of all, leprosy.

ভাষণ ও বিবৃতিতে শুধু নয়— কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিজমের নগ্নরূপ তুলে ধরেছেন এখানে 'নবজাতক' কাব্যের প্রায়শ্চিত্য কবিতাটি উপস্থাপন করছি—

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো—
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।
দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল
ভূমিকম্পের রোল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৪৩www.amarboi.com ~

জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল।
বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার
কালীনাগিনীর দল।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিঃশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা।
প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।

রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতা 'বুদ্ধভক্তি'। কবিতাটিতে ফ্যাসিবাদের ভণ্ড-মূর্তির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। শান্তির দেবতা বুদ্ধের মন্দিরে তারা দলে দলে প্রার্থনা করতে—ভগবান বুদ্ধ যেনো তাদের শক্তি দেয় যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য। কবিতাটির কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি—

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উন্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির—
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।
তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরেগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৪৪www.amarboi.com ~

গর্জিয়া প্রার্থনা করে—
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয়বন্ধন করি দিবে ছিন্ন,
গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন,
হানিবে শূন্য হতে বহ্নি-আঘাত,
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ—
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে।
তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরো থরো।
হত-আহতের গণি সংখ্যা
তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষবাষ্পের বাণে রেধি দিবে নিঃশ্বাস—
মুষ্টি উচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে
তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরো থরো।

ফ্যাসিজমের এই নারকীয় ও পৈশাচিকতার রূপ দেখে এবং স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কের রক্তোৎসব দেখে রোমাঁ রোলাঁ হৃদয়স্পর্শী আবেদন রাখলেন—

'মাদ্রিদের ধূমায়িত প্রস্তর স্তূপ হইতে আর্তের ভয়ার্তে ক্রন্দন উঠিতেছে। যে গর্বিতা নগরী এককালে অর্ধজগতের অধিকারী ছিল এবং যাহা অধূনা পাশ্চাত্য সভ্যতার এক আলোকোজ্জ্বল কেন্দ্র—আজ আফ্রিকার মুর এবং বিদেশী বাহিনী আসিয়া তাহা দগ্ধ করিতেছে ও রক্তের প্লাবন বহাইতেছে। তাহাদের বিদ্রোহী নেতারা যে স্পেনের হিতৈষী বলিয়া দাবি করিতেছে সেই স্পেনকেই লুণ্ঠনে তাহারা রত হইয়াছে। এবং স্পেনের সভ্যতা পদতলে দলিত করিতেছে'।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ, লোরকার হত্যাকাণ্ড, রক্তক্ষরিত দেশ, আহতদের আর্তনাদ, মাটিতে ছোপ্ ছোপ্ রক্ত পাবলো নেরুদাকে খুবই ব্যথা দিয়েছে। এ সমস্ত বিষয় নিয়ে নেরুদা অনেকগুলো কবিতা লিখেছেন। এগুলো কবিতা নয় যেন প্রাচীর গাত্রে এক একটি লাল ইস্তেহার। এক একটি কবিতা যেন বিপ্লবের পোস্টার আর কোনও কোনও কবিতা যেন গুলিবিদ্ধ বুকের ক্ষত ও ছিদ্র। আমি এখানে আর একটি কবিতার ভাষান্তর উপস্থাপন করছি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৪৫www.amarboi.com ~

স্পেনের গৃহযুদ্ধের স্মৃতি, লোর্কার হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি
ঐ মৃতগুলো আমাকে দিয়েছে এত দুঃখ
এতটা দুঃখ যেন বা তারা পিটিয়েছে
আমাকে প্রতিটি অস্থি-সন্ধিতে, ঐ ব্যক্তিগত মৃতগুলো
যার মধ্যে আমরাও নিহত হই।
কেন না ওরা বাঁধলো ফেদরিকো আর মিগুয়েলকে
স্পেনের ক্রুশের সাথে
পেরেক ঢুকিয়ে দিল তাদের চোখ এবং জিহ্বার ভেতরে।
তাদের রক্ত ঝরাল, পোড়াল তাদের জীবন্ত,
তাদের বিরুদ্ধে কটুক্তি করল, অপমান করল,
তারপর তাদের বিধ্বস্ত শরীর ফেলে দিল খাদে,
এই কারণে, ঐ কারণে, কেন না ঘটনা ছিল সেরকম।
এভাবে তাদের নির্যাতন করা হলো,
ক্রুশবিদ্ধ করা হলো,
যতক্ষণ না তারা স্পেনের নিহতদের মধ্যে স্মৃত হয়,
তাদের আলখাল্লা ঘিরে মাছির ভনভন,
অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ভ্রূকুটি আর থুথু,
নাইটিঙ্গেলের ছোট্ট কঙ্কালের মতো
ভয়াবহ অস্থিশালার দিকে যাত্রারত,
রক্তপাতরত মধুর ফোঁটা যেন
মৃতদের জগতে হারিয়ে যাওয়া।
আমি সাক্ষী,
আমি ছিলাম সেখানে,
আমি সেখানে ছিলাম এবং আমি দুঃখভোগ করেছি এবং আমি
সাক্ষ্য দিচ্ছি
যদিও কেউ নেই স্মরণ করবার,
আমি একা স্মরণ করছি,
যদিও পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই কোন চোখ
আমি দেখে যাবো
আর সেই রক্তের রেকর্ড থাকবে এখানে,
সেই ভালোবাসা জ্বলতে থাকবে এখানে।
কোন বিস্মরণ নেই, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ,
আমরা আহত মুখ দিয়ে
তাদের মুখগুলো গান গেয়ে যাবে নিরন্তর

একজন মার্কসবাদী, একজন সমাজতন্ত্রী, একজন কমিউনিস্ট ও একজন বিপ্লবী কখনো হতাশা ও ব্যর্থতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পরে না। কারণ তার সামনে দু'টো

www.amarboi.com ~

পথ। একটি প্রগতির পতাকা হাতে সামনে যাওয়া, বিপ্লবে জয়ী হওয়া—অথবা শহীদ হওয়া—কিন্তু আত্মসমর্পণ অথবা নীচ দুর্বৃত্তদের পায়ের তলায় মাথা নত করা নয়—।

ফ্যাসিবাদ যে কতো বিকট, ভয়ঙ্কর ও পৈশাচিক হতে পারে এরই একটি বীভৎস চিত্র ফুটে ওঠেছে 'গণশক্তি' পত্রিকার ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে। ঐ পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত একটি রিপোর্টের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরছি—

জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে একের পর এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড গোঘাটে

গোঘাট (হুগলি), ১৬-ই সেপ্টেম্বর—...মদনকে গলা কেটে কোমর পর্যন্ত চার টুকরো করেছে...দুষ্কৃতীরা। বলি দেবার আগে মদনের শরীরে ঘি মাখিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর মাথা থেকে খুলিটা তুলে নিয়ে শাবল দিয়ে কিছুটা ঘিলু বার ক'রে নিয়ে মুখে মাখিয়ে দ্যায় তারা। ৯-ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার....স্বরূপ সরকার নামে এক বি.জে.পি কর্মী আততায়ীর হাতে গুলিবদ্ধ হয়ে মারা যায়। স্বরূপ সরকার আর.এস.এস.-এর সদস্য।....স্বরূপের খুনের অব্যবহিত পরেই...কর্মীরা স্থানীয় জনযুদ্ধ সংগঠনের (নকশালদের একটি অংশ) নেতা অসিত সরকারের খোঁজ শুরু করে। কিন্তু বাড়িতে তাঁকে না-পেয়ে....ভাই অনাথ সরকারকে....তুলে নিয়ে যায়...। তাঁকে পিছমোড়া ক'রে বাঁধে, প্রথমে চোখ দু'টি তুলে নেয়। তারপর খুলিটা তুলে নেয়, শরীরটাকে খ দিয়ে চার টুকরো ক'রে দ্যায়।...মদন তাঁর শ্যালকের মৃত্যুর খবর পেয়ে... সোজা চ'লে যায় মলিনাকে খবর দিতে। মলিনা, অশোক, অশোকের বাবা কাশিনাথ বাসে রওনা হন।....ঝর্ণা, মলিনা সেই শেষ দেখেছিলেন তাঁদের স্বামীদের...শ্বশুরমশাইকেও আর দ্যাখেনি মলিনা।...১৬ বছরের শ্রীমন্তকেও তুলে নিয়ে যায় তারা....।

[গণশক্তি, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯]

পারিবারিক ঐতিহ্য থেকেই সোমেন চন্দ স্বাদেশিক ও রাজনৈতিক আবহের চেতনায় লালিত হয়েছিলেন। সোমেনের বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনেরা অনুশীলন দল ও বিপ্লবীদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন।

নরেন্দ্রকুমার স্বদেশী স্কুলের ছাত্র ছিলেন। কল্যাণ কুমার চন্দ বলেছেন—

'গত শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকা ও তার আশপাশে শরীরচর্চার জন্য অনেকগুলি সংগঠনের সৃষ্টি হয়। লাঠি ছোরা ও ব্যায়ামের নানা শিক্ষা দেওয়া হতো এই সংগঠনগুলিতে। এখান থেকে বিপ্লবী যুবক সংগ্রহ করা হতো। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা এইরকম একটি সংস্থায় শরীরচর্চা করতেন। ১৯০৫ সালে পুলিন দাসের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির অনেকগুলি কেন্দ্র গ'ড়ে ওঠে। এই সময় ঢাকায় ন্যাশনাল স্কুলও গ'ড়ে ওঠে। বাবা সেই স্কুলে পড়াশুনা করেন। সেই সময় অনুশীলন সমিতির কোলকাতার সংগঠক প্রমথ মিত্র সেই যুগের জাতীয় নেতা বিপিনচন্দ্র পালকে সঙ্গে নিয়ে (তিনি তখন বিপ্লবীদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করতেন) ঢাকায় যান। তাঁদের অনুষ্ঠানে বাবা অংশগ্রহণ করেন এবং বিপিন পালের অনুবর্তী হয়ে যান। পরে, বিপিনবাবু বিপ্লবীদের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে নিজে সংগঠন গ'ড়ে তোলেন। বাবার বন্ধু অক্ষয়কুমার রায়, বাবা, তাঁর বন্ধুরা মিলে ঢাকায় সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন। যোগাযোগ এমন গভীর হয় যে, অক্ষয় রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বাবা কোলকাতায় এসে, বিপিনবাবুর বাড়িতে সাত বা দশদিন ছিলেন। স্বভাবতই রাজনৈতিক প্রয়োজনে'।

পারিবারিকভবে স্বাদেশিক ও রাজনৈতিক আবহ এবং বাবার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার আদর্শ সোমেন—মানসের পরিপূর্তি ঘটেছিলো। কল্যাণ চন্দ এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

'যুবা বয়সে বাবা রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের নানা কাহিনী—বাবার কাছ থেকেই দাদা প্রথম শুনেছেন। বিনয় বোসের হাডসন ও লোম্যান সাহেবকে গুলি ক'রে চ'লে যাওয়া বাবা দেখেছিলেন। অফিসঘরের পাশেই ঘটনাটা ঘটেছিল। সাক্ষী দেওয়ার জন্য বাবার উপর চাপ সৃষ্টিতে অনেকরকম চেষ্টা করেছে পুলিশ। দেখিনি—ব'লে তিনি পাশ কাটিয়েছিলেন। বাইরে না-বললেও বাসায় এসে এই ধরনের তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা বলতে বাবা ভালোবাসতেন। তিনি ভারতীয় স্বদেশী আন্দোলনে লাল-বাল-পালদের (লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল) কথা প্রায়ই বলতেন। ফলে, কিশোরকাল থেকেই দাদা স্বদেশমুক্তিতে, তাঁর জীবনবোধ ও উপলব্ধিতে গ্রহণ করেছিলেন। এদিক থেকে বাবাই তাঁর প্রথম রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু'।

আগেই উল্লেখ করেছি সোমেন চন্দ বিমাতা সরযূবালার স্নেহ-মমতায় লালিত-পালিত। এই মহিলা ছিলেন দৃঢ় ব্যক্তিত্বময়ী এবং স্বাদেশিক চেতনার দায়িত্বশীলা ও নিষ্ঠাবান। তাদের পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই রাজনীতি, অনুশীলন পার্টি ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি রাজবন্দী হিসেবে বেশ ক'বছর গ্রামের বাড়িতে অন্তরীণ ছিলেন। সরযূবালার মামা প্রফুল্লকুমার দত্ত ছিলেন অন্য এক বিপ্লবী। তিনি বিনয়-বদল-দীনেশ প্রমুখ বিপ্লবীদের দলে থেকে সক্রিয়ভাবে দলীয় কার্যে নিবেদিত প্রাণকর্মী ছিলেন। এবং এজন্য ইংরেজ সরকারের রোষানলে পড়ে, কয়েক বছর জেলও খেটেছেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত বিপ্লবী হেলেনা দত্ত ছিলেন সরযূবালার মেসোতুতো দিদি এবং তিনি বিপ্লবী দলের 'গোপনীয় কার্যক্রমের সক্রিয় কর্মী। ব্রিটিশ ও স্বৈরাচার বিরোধিতা এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ও স্বদেশী আন্দোলনের অভিযোগে তিনি বহুবার জেল খেটেছেন। সরযূবালা দেবী এ সমস্ত কার্মকাণ্ডে হেলেনা দত্তকে অতীব সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে সাহায্য করতেন। বিপ্লবীদের প্রতি সরযূবালার অসীম শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিলো এবং তিনি অতীব গোপনীয়তার সাথে রাত-বিরেতে তাদের খাবার ও আশ্রয় দিতেন। বিপ্লবী হেলেনা দত্ত পার্টির অনেক গোপনীয় কাগজপত্র প্রচারপত্র ও বই এবং পার্টির পরিকল্পনার যাবতীয় রেকর্ড সরযূবালার কাছে জমা রাখতেন। পারিবারিক রাজনৈতিক চেতনার আবহ প্রসঙ্গে কল্যাণ চন্দ লিখেছেন—

'মা-ও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। আমাদের ছোটমামা নারায়ণগঞ্জে কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িত হওয়ায় তাঁকে অন্তরীণ করা হয়। মা-র মাসতুত বোন হেলেনা দত্ত (বল) বিপ্লবী দলে থাকায় কারারুদ্ধ হন। এক মামা প্রফুল্লকুমার দত্ত, বিনয় বসুদের দলে যুক্ত থাকার অভিযোগে অনেক বছর জেল খাটেন। স্বভাবতই, দাদা যে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন হয়ে উঠবেন এবং পারিবারিক আনুকূল্য পাবেন সে-কথা বলাই বাহুল্য। দক্ষিণ মৈশণ্ডী প্রগতি পাঠাগারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৪৮www.amarboi.com ~

যোগদান এবং কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ক্লাশে অংশগ্রহণ ও গভীর অধ্যায়ন তাঁকে অতি দ্রুত একজন সচেতন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীতে রূপান্তরিত করলো।

প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা এবং স্বাদেশিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সোমেনের জীবনে সরযূবালার প্রভাব ছিলো অতীব গভীর। সোমেন বড়ো হয়ে যখন পার্টির কাজে পূর্ণোদ্যম আত্মনিয়োগ করেন সরযূবালা তাকে অনিবার উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে পার্টির গোপনীয় কর্মকাণ্ডে সোমেনকে সাহায্য করেছেন।

সোমেন চন্দের অনেক গল্পেই আমরা বাবা গরেন্দ্রকুমার ও মা সরযূবালার ছায়া দেখতে পাই। এখানে ইঁদুর ও দাঙ্গা গল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সোমেনের জীবনের আর একটি বড়ো অভিধা ছিলো মার্কসবাদী সাহিত্য এবং ফ্যাসিবাদ স্বৈরাচার বিরোধী তত্ত্বগুলো অতীব সহজে আত্মস্থ করতে পারতেন। বিশেষ করে প্রগতিশীল সাহিত্যের ধারাগুলো তিনি অতীব সার্থকতার সাথে তার গল্পে রূপ দিতে পারতেন এবং চরিত্রগুলো এই আলোকে ফুটিয়ে তুলতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এখানে বলা যায় যে, সুহৃদ কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এইভাবে— "তখনকার দিনে শিল্পের জন্য শিল্প (আর্টস ফর আর্টস শেক) এই মতবাদের লেখকের সংখ্যাই বেশি ছিল এবং তাঁরা রাজনীতির প্রভাবের বাইরে থাকতেই সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সোমেন প্রধানত দুটি কারণে ঢাকা রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। প্রথমত, একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে জোরদার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য; দ্বিতীয়ত, শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে তখনকার সাম্যবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাঁর লেখক-জীবনকেও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করবে, রচনায় স্বাতন্ত্র্য ও নতুন গতি দান করবে—এ-রকম প্রত্যাশাও ছিল। বলা বাহুল্য, এই উভয় দিক থেকেই তিনি খুব অল্পকালের মধ্যেই নিজস্ব সৃজনশীল প্রতিভাকে সম্পূর্ণতা দান করবার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছিলেন।

সময়টা ছিল যুগসন্ধির সময়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ধীরে ধীরে গণমুখী আন্দোলনের রূপ নিতে শুরু করেছে। সব স্বদেশী বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন— আন্দামানসহ দেশের বিভিন্ন জেলে ব'সেই তাঁদের মার্ক্সবাদে দীক্ষা হয়। নতুন জিজ্ঞাসা, নতুন চেতনা আর নতুন প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাঁরা জেল থেকে ফিরে আসেন। অবশ্য কেউ কেউ রাজনীতি ছেড়েও দেন—আবার কেউ কেউ মার্ক্সবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পর্টির সংগঠন মজবুত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় সোমেন ম্যট্রিক পাস ক'রে ডাক্তারি পড়া শুরু করেছেন। পূর্বেই বলেছি—যোগাযোগ হয়েছে প্রগতি পাঠচক্রের সঙ্গে। এবং সতীশ পাকড়াশীর মতো মার্ক্সবাদী সহৃদয় শিক্ষকদের সান্নিধ্য পেয়েছেন। গোর্কির 'মা' উপন্যাসটি প'ড়ে তাঁর রুশ প্রজাতন্ত্র প্রসঙ্গে ধারণা আসে। মার্ক্সবাদী তত্ত্বগ্রন্থ, বিপ্লবের রণকৌশল থেকে শ্রমিক-আন্দোলনের নানা বই পড়েন সোমেন। বুকে তাঁর গড়ুরের মতো ক্ষুধা, চোখে তাঁর বিপ্লবী শিল্পী হবার সুগভীর স্বপ্ন।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত সোমেন চন্দের সাহিত্য-জীবন ও রাজনীতিচর্চা হাত ধরাধরি ক'রে এগিয়ে চলেছিল। সাহিত্যচর্চা তাঁর প্রাণের বস্তু ছিল, একজন উৎকৃষ্ট লেখক হবেন এই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন। এইজন্য দেশবিদেশের বইপত্র সংগ্রহ ক'রে

বাংলাদেশের পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

পড়াশুনা করা তাঁর প্রতিদিনে কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক বছর ডাক্তারী পড়ার পর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা তাঁর হাতের নাগালের বাইরে থেকে যাবে—এ সত্য তিনি গোড়া থেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, সুতরাং বই পড়ার প্রচণ্ড ক্ষুধা সোমেনের মেধা ও মননে গভীর সত্তাকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলেছিল। দু'ধরনের বই-ই সোমেন সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করেছিলেন। রাজনীতি আর সাহিত্যের। ১৯৩৭-৩৮ সালের মধ্যেই সোমেন সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ক অনেক উল্লেখযোগ্য বই অধ্যয়ন করেছিলেন। রাজনীতি বিষয়ক বইয়ের ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী ও দেশবিদেশের প্রগতিশীল ও বিপ্লবী-আন্দোলন সংক্রান্ত নানা বই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প'ড়ে ফেলেছিলেন। ব্রিটেন, জার্মানি, স্পেন, ফ্রান্স, চীন, বার্মা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রগতি আন্দোলন সম্পর্কে সোমেনের রাজনৈতিক চেতনা অনেক পরিমাণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নিজের দেশের সমাজ-জীবনে মার্ক্সবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ শ্রমিক ও কৃষক-আন্দোলনে বিপ্লবী কৌশল ও বিস্তার—এসব নিয়ে তিনি যথেষ্ট ভাবতেন। এবং সুযোগ পেলেই এ-সব নিয়ে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ মার্ক্সবাদী দেশনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। বিশেষ ক'রে প্রিয়তম সতীশদার কাছে তাঁর অনন্ত জিজ্ঞাসা। বুড়িগঙ্গার পাড়ে কত সন্ধ্যায় দুটি ছায়ামূর্তি ব'সে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আলোচনা হচ্ছে বিশ্ববিপ্লব থেকে শিল্পবিপ্লবের সৃষ্টিবিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব প্রশ্নরাজি। কেন শিল্পীরা মসি ছেড়ে অসি ধরবেন? সতীশ পাকড়াশীর শান্ত, দীপ্ত, গভীর উত্তর—"অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন একজন লেখককেও কলম ছেড়ে বন্দুক ধরতে হয়।" ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে তাই স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন লেখকরা। সাহিত্য সাধনায়, লাঞ্ছিত গণমানবের মর্মকথা ফুটিয়ে তুলবার যে প্রেরণা, সেই একই প্রেরণা লেখককে গণমানবের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে।" সতীশদার কাছে এসব কথা শুনে সোমেন সেদিন দারুণ অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন। অথচ সেদিন তিনি জানতেন না যে, আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে সচেতন করতে গিয়ে একদিন খুব শীঘ্রই তাঁর মতো তরুণ লেখককেও আত্মাহুতি দিতে হবে—তাঁর শ্যামল প্রাণের রক্তে রঞ্জিত হবে বসন্তের আকাশ।

আর এই অজস্র প্রশ্নকীটের দংশনে, জানার আগ্রহে—সংসারের অন্নের সামান্য সংস্থান থেকেও কিছু অর্থ চলে যায় বইয়ের বাজারে। তখনকার দিনের ছ'আনায় পেঙ্গুইন সিরিজের বই পাওয়া যেতো, পয়সা পেলেই সোমেন এই সিরিজের অনেক বই কিনতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প'ড়ে ফেলতেন। বই পড়ার এই তীব্র ক্ষুধা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতির বই নয়, সাহিত্যের নানা সৃজনশীল তত্ত্বমূলক বইও সোমেন চন্দ এই সময় থেকেই পড়তে শুরু করেছিলেন"।

কলেজের পড়াশুনা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি, অথচ পৃথিবীর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যতটা সম্ভব গ্রহণ করে জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে হবে এই উপলব্ধিই সোমেনকে রাজনীতি ও সাহিত্যের জগতে জ্ঞানের অন্বেষণে দিনের পর দিন পরিচালিত করেছিলো। এ সময়ে তাঁর শরীর তেমন ভালো যাচ্ছিলো না, তবুও ক্লান্তি নেই বিশ্রাম নেই। আগামী

 www.amarboi.com ~

নতুন বিশ্বের যাঁরা কারিগর—বিশ্রামের অবসর তাঁদের কোথায়—এমনই এক প্রেরণাজাত শক্তিতে অবিশ্রান্ত গতিতে তখন ছুটছেন সোমেন। পাঠাগারের কাজ, বই পড়া এবং পার্টির অন্যান্য কাজকর্ম নিয়ে যেন কী একটা দুর্বার আকর্ষণপূর্ণ দিনগুলোর মধ্য দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে তরুণ সোমেন এগিয়ে চলেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা জিলা কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক জ্ঞান চক্রবর্তী লিছেছেন— '....আলোচনার ভিতর দিয়ে তাঁর এই ধারণা জন্মে যে, স্বল্প জ্ঞান নিয়ে সাহিত্যের মূল সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তখন তিনি গভীর মনোযোগের সাথে মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞান এবং সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখাগুলো আয়ত্ত করতে আরম্ভ করেন। এ সময় প্রায়ই দ্যাখা যেতো সারারাত জেগে তিনি গভীর অধ্যয়নে মগ্ন, আর ভোর হতেই ফোলা ফোলা লাল চোখ নিয়ে পার্টির কাজে ব্যস্ত। একজন ম্যাট্রিক পাস করা ছেলের পক্ষে মার্ক্স-লেনিনের দুরূহ বইগুলো থেকে তাঁদের তত্ত্বের মর্মবস্তু উদ্ধার করা সহজ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই বাধার কাছে হার মানেননি, নিজের উদ্যমেই সমস্ত কিছু আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছেন; এবং যখনই নিজে কোনো প্রশ্নের সমাধান করতে পারেননি তখনই প্রবীণ মার্ক্সবাদীদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছেন।...'

'সোমেনের প্রাণ নিহিত রয়েছে জীবনের কর্মে, তার মহৎ আত্মদানে, সেই সঙ্গে তাঁর লেখায়, তাঁর অসামান্য গল্পরাজিতে। এ গল্প শুধু শিল্পের কথা বলে না। কিন্তু যে কোনও শিক্ষানবিস গল্পকার বাঁধা পথের সরলীকরণের মোহ বিসর্জন দিয়ে যদি পরিণত ও পৌঢ় এক ভাষা ও আখ্যান-কলা উপার্জন করতে চায়, তবে সোমেনের গল্প তাকে পড়তে হবে।'

কমিউনিস্ট পাঠচক্র, রেল শ্রমিক ইউনিয়ন, প্রগতি পাঠচক্র, প্রগতি লেখক সংঘ, কমিউনিস্ট পার্টি, প্রগতি পাঠাগার এবং গঞ্জের সাধারণ মানুষের সাথে একাত্মতায় সোমেন জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং এ অভিজ্ঞতার জাড়ক রসে সম্পৃক্ত করেই তার গল্পের কাহিনী ও চরিত্র লালিত হয়েছে। আমরা যখন তার একটি রাত, সংকেত, দাঙ্গা, বনস্পতি ও ইঁদুর পড়ব তখন অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সোমেনের সৃজনী প্রতিভা দেশ ও কালের বৃত্ত অতিক্রম করে আগামীর দিকে অভিযাত্রিক হয়েছে।

"সোমেন প্রতিদিনের হোক, প্রতিঘাতী হোক—দু'ধরনের অভিজ্ঞতাকেই জীবন্ত, বিচিত্র টাইপের সঙ্গে বহুস্তরীয় মানব-চরিত্র দিয়ে এবং তাদের সুখদুঃখের অনুভব দিয়ে এমন বোঝাই করে দেন যে, তাঁর রাজনীতি তাঁর বিরোধীদের কাছেও কখনও স্পর্ধিত বলে মনে হয় না; বরং রাজনীতিকে কীভাবে উচ্চাঙ্গের শিল্প হিসেবে পরিবেশন করা যেতে পারে, সোমেনের গল্পগুলি তার অধ্যয়নযোগ্য চর্চাযোগ্য পাঠক্রম হিসেবে প্রস্তুত হয়ে যায়।" [পবিত্র সরকার— সোমেন চন্দ : জীবন, গল্পাবলী]।

আমাদের দেশে যারা সাহিত্যচর্চা তাদের সামনে বিদেশী তথা ভিন ভাষার বড়ো বড়ো লেখকদের একটা মডেল থাকে। আর এ মডেলের বৃত্তেই তারা আবর্তিত হয়। এ মডেলের বলয় থেকে বিস্ময়কর প্রতিভা ও মৌলিকত্ব নিয়ে বিস্ময়করভাবে দু'জন বিমুক্ত ছিলেন কবিতায় সুকান্ত আর ছোট গল্পে সুমেন। এজন্যই আমরা বলতে পারি—

www.amarboi.com ~

"সোমেন কখনোই ও হেন্‌রি বা মপাসাঁর মতো whip-crack ending-এর পক্ষপাতী নন, হঠাৎ তিনি কোন অভাবিত অপ্রত্যাশিত ঝল্‌কানিতে আমাদের বিমূঢ় করে দেন না, বরং গল্পের মধ্যে থেকেই ধাপে ধাপে ঘটন ও মনস্তত্ত্বের বিনুনি-বুনোট রচনা করতে করতে গল্পের শেষে আমাদের পৌঁছে দেন। ফলে তাঁর গল্পের উপসংহার আমাদের—আরোপিত 'কৃত্রিম বলে মনে হয় না।" [পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'সোমেন চন্দ গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থের 'সোমেন চন্দ : জীবন, গল্পাবলী শীর্ষক ভূমিকা]।

এই আলাদা বৈশিষ্ট্যর জন্যই সোমেন রাজনীতি করলেও তার লেখা রাজনীতির মডেল হয় নি। এবং গল্পের চরিত্রগুলোও পার্টির দাস নয়।

'কিন্তু এর প্রত্যেকটি গল্পে রাজনীতি কখনোই বক্তৃতা বা উপদেশ বা বিষোদ্‌গারের চেহারা নেয় নি, তা এসেছে কিছু রাজনৈতিক কর্মীর (অনেকে হয়তো সচেতনও নয় তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্বন্ধে) ঘর-সংসার পরিবার-পরিজনের বা সহকর্মীদের সঙ্গে দৈনন্দিন আচার-আচরণের তর্কে-সঙ্ঘাতে, রঙ্গে-পরিহাসে, রোজকার ছোটখাটো ঘটনার মধ্য থেকে উচ্ছ্রিত সুখ-দুঃখে সেই রাজনীতি যেন অত্যন্ত সহজ উপলব্ধির মতো প্রকাশ পেয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন `League Against Fascism and war' ভারতীয় শাখার তিনি সভাপতি হয়েছিলেন এবং জেনারেল ফ্রাঙ্কের স্পেন আগ্রাসনে মর্মাহত হয়ে বিবৃতি প্রদান করেন—। বিশ্বমানবতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বিবৃতি ৩ মার্চ, ১৯৩৭ সনে দ্যা স্টেটসম্যান পত্রিকায় ছাপা হয়—

'স্পেনে আজ বিশ্বসভ্যতা পদদলিত। স্পেনের জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছে। অর্থ ও জনবল দিয়ে বিদ্রোহের সাহায্য করছে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ।....আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই প্রলয়ঙ্কর বন্যাকে রোধ করতেই হবে।....স্পেনের গণ-ফ্রন্টের পাশে দাঁড়ান, জনগণের সরকারকে সাহায্য করুন, লক্ষ-কণ্ঠে ধ্বনি তুলুন—'প্রতিক্রিয়া দূর হও।' ১৯৩৭ সনের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে জাপানি বোমারু বিমানগুলো চিনের নানকিং ও ক্যান্টনের ওপর অনবরত বোমা বর্ষণ করে। ঐ সময় ৭ পৌষ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের আগ্রাসী শক্তিগুলোকে ধিক্কার জানিয়ে তীব্র সমালোচনামূলক এক ভাষণ প্রদান করেন শান্তি নিকেতনে। ঐ ভাষণে তিনি বলেন—

'আজ চিনে কত শিশু, নারী, কত নিরপরাধ গ্রামের লোক দুর্গতিগ্রস্ত—যখন তার বর্ণনা পড়ি হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।...চিনকে যখন জাপান অপমান করছে সিনেমার ভিতর দিয়ে, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে—যেমন অপমান আমাদের দেশেও হয়ে থাকে—তখন এই প্রতাপশালীর দল কোনো বাধা দ্যায়নি বরং চীনকে দাবিয়ে দিয়েছে, বলেছে চীনের চঞ্চল হবার কোন অধিকার নেই।'

এই সময় রবীন্দ্রনাথ চীন তহবিলে পাঁচশত টাকা সাহায্য প্রদান করেন। এবং প্রায়শ্চিত্ত কবিতাটির ইংরেজি ভাষান্তর পাঠিয়ে দিয়ে চিঠিতে লিখেন—'এই ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে প্রকাশ পেল—তিন শতাব্দীকাল ধরে পাশ্চাত্যের জনগণ মানবতার যে সব

www.amarboi.com ~

নীতির জন্য শহিদ হয়েছেন সেগুলো রক্ষার ভার এসে পড়েছে কতিপয় কাপুরুষ রক্ষকের হাতে, যারা নিজেদের চামড়া বাঁচাতে গিলে সেগুলো বিকিয়ে দিচ্ছে।'

রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আশাবাদী কবি ছিলেন। তিনি সব সময়ই সামনে দেখতেন সুন্দর পৃথিবী— তিনি বিশ্বাস করতেন এই নরঘাতী রক্তের প্লাবনে পৃথিবী থেকে মুছে যাবে পাপ গ্লানি—আর বিশ্বাস করতেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো মহাপাপ। তাই মডার্ন রিভিউর অক্টোবর ১৯৩৯ সনের সংখ্যায় লিখলেন—

'জার্মানির বর্তমান শাসকের উদ্ধত দুর্বৃত্ততার সর্বশেষ প্রকাশে বিশ্বের বিবেক প্রচণ্ড ঘা খেয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে দুর্বলদের ওপরে পর্যায়ক্রমিক ভীতি প্রদর্শন—রাইখ রাষ্ট্রে ইহুদি-নির্যাতন থেকে শুরু করে বীর ও প্রকৃত অর্থেই উদার চেকোশ্লোভাকিয়ার বিনাশ পর্যন্ত—তারই অনিবার্য পরিণতি এই ঘটনা। এই যে অমানবিকতা, যা একজন ব্যক্তি ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের অসার আত্মশ্লাঘাপূর্ণ খামখেয়াল চরিতার্থ করার জন্য বিশ্বকে ঠেলে দিয়েছে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে, তাকে ধিক্কার জনিয়ে আমার দেশের কণ্ঠ ইতিমধ্যেই মাহাত্মা গান্ধীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত।....

আমি শুধু এইটুকুই আশা করি, মানবতা জয়ী হবে এবং এই ভয়ঙ্কর রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ বিশ্বে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে নির্যাতিত জনগণের জীবন ও স্বাধীনতার সৌষ্ঠব।'

সোমেনকে যে ফ্যাসিস্টরা হত্যা করেছে তারাও কিন্তু এক ধরনের বিকৃত বামপন্থির লেবাস পরেই হত্যা করেছে। এই লেবাসটা হল ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাতীয়তাবাদ এবং জনগণকে অলৌকিক বিশ্বাসে মোহগ্রস্ত করা। এ বিষয়গুলো যে ফ্যসিবাদীদের অমোঘ অস্ত্র সোমেন এ সম্পর্কে বহু ভাষণে ও লেখায় সতর্ক করে দিয়েছেন। এখানে লেলিনের লেখা থেকে দুটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি—

১. "ভাবুন একবার ব্যাপারখানা, আমাদের বলা হচ্ছে কি-না সত্যিকার আন্তর্জাতিক বোধের অর্থ না-কি জার্মান-শ্রমিকরা ফরাসি-শ্রমিকদের উপর এবং ফরাসি-শ্রমিকরা জার্মান-শ্রমিকদের উপর 'পিতৃভূমি প্রতিরক্ষার' নাম করে যখন গুলি চালাবেন তখন আমাদের তা সমর্থন করতে হবে!"

২, "প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিপতি কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো জাতি দেউলিয়া বনে গেলে তাতে বরং পুঁজি লাভবানই হয়, কারণ এর ফলে পুঁজি আরও বেশি কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। অতএব, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা যত বেশি তীব্র ও 'ঘনিষ্ঠতর' হয়ে ওঠে, অর্থাৎ প্রতিযোগীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে দেউলিয়াপনার অভিমুখে যতই ঠেলে দেয়া চলতে থাকে, ততই আরও দ্রুত প্রতিযোগীকে সে পথে ঠেলে দেয়ার উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিরা বাড়তি সামরিক চাপ সৃষ্টিতেও সচেষ্ট হয়। উপনিবেশগুলোতে কিংবা তুরস্কের মতো পরনির্ভর রাষ্ট্রগুলোতে যেমন সুবিধাজনক শর্তে পুঁজি রপ্তানি করা চলে—পুঁজি রপ্তানির পক্ষে সেই ধরনের অনুকূল দেশের সংখ্যা যত কমতে থাকে (কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো স্বাধীন, স্বনির্ভর ও সভ্য দেশে পুঁজি রপ্তানি করে পুঁজি-বিনিয়োগকারী যে মুনাফা তোলে, তার প্রতিপক্ষে পূর্বোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে পুঁজি রপ্তানির ফলে সে তোলে তিনগুণ মুনাফা) ততই তুরস্ক, চীন ইত্যাদি দেশকে পদানত করার ও ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~www.amarboi.com ~

লড়াই হয়ে উঠতে থাকে হিংস্রতর। লগ্নী-পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের কালপর্বে অর্থনৈতিক তত্ত্ব এই সত্যটিই প্রকাশ করে দিচ্ছে। বাস্তব ঘটনাবলিও ফাঁস করে দিচ্ছে এই সত্যই।"

"জাতিদম্ভী-সমাজবাদ বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পিতৃভূমির প্রতিরক্ষার ধারণাটিকে স্বীকার করে নেয়া, এই যুদ্ধে সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণী ও সমাজতন্ত্রীদের 'নিজ নিজ' দেশের গভর্নমেণ্টগুলোর মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা, 'নিজ দেশের' বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারীয়-বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার সপক্ষে প্রচার ও তাকে সমর্থনের ব্যাপারটিকে অগ্রাহ্য কর ইত্যাদি ইত্যাদি। জাতিদম্ভী সমাজবাদের মূল তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক বক্তব্য যে সুবিধাবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির সঙ্গে সম্পূর্ণত মিলে যায়, এটা পুরোপুরি স্পষ্ট। এ দুটি হচ্ছে হুবহু একই প্রবণতা। ১৯১৪-১৯১৫ সালের যুদ্ধের বিশেষ পরিস্থিতিতে সুবিধাবাদই পরিণত হয়েছে জাতিদম্ভী-সমাজবাদে। শ্রেণীসহযোগিতার অভিপ্রায়ই সুবিধাবাদের প্রধান লক্ষণ। যুদ্ধের ফলে এই অভিপ্রায়টি এর যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে এসে উপনীত হয়েছে, এর স্বাভাবিক উপাদান ও 'প্রেরণার' উৎসগুলোর সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে অপরাপর কিছু অস্বাভাবিক উপাদান ও উস্কানির; বিশেষ ধরণের শাসানি ও জবরদস্তিকে কার্যকর করে তোলায় অশিক্ষিত ও ছত্রভঙ্গ জনসাধারণ বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়েছে; এ ব্যাপারটা স্বভাবতই সুবিধাবাদের অনুসারীর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছে; গতকালের বহু র‍্যাডিকাল আজ কেন দলত্যাগ করে বুর্জোয়া-শিবিরে ভিড়ে গেছে তার ব্যাখ্যাও পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছে এ-থেকে।" [তদেব]

"সুবিধাবাদের অর্থ হল শ্রমিকদের নগণ্য এক সংখ্যালঘু অংশের সাময়িক স্বার্থের কাছে জনসাধারণের মৌল স্বার্থগুলোকে বলি দেয়া, অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রলেতারিয়েতের বিপুল সংখ্যাধিক্যের বিরুদ্ধে এ হর শ্রমিকদের একটা অংশ ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে একটা মৈত্রীবন্ধন। যুদ্ধের ফলে এই ধরণের মৈত্রীজোট বিশেষ করে দৃষ্টিগোচর ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে কতকগুলো লক্ষণ দশকের পর দশক ধরে একটু-একটু করে জন্ম দিয়েছে সুবিধাবাদের, যখন শ্রমজীবী মানুষের বিশেষ সুবিধাবাদী একটা স্তরের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ ও সুমার্জিত জীবনযাত্রা তাদের 'বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন' করে তুলেছে, জাতীয় পুঁজির টেবিল থেকে কপালে জুটেছে উচ্ছিষ্টের টুকরোটাকরা এবং এভাবে দারিদ্র্য দশায় উপনীত ও সর্বস্বান্ত জনগণের অসহনীয় দুঃখযন্ত্রণা ও বৈপ্লবিক মেজাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তারা।"

১৯১৪-১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটা হল—বিশ্ব-বাঁটোয়ারার জন্য, লুঠ ভাগাভাগির জন্য, ছোট ও দুর্বল জাতিদের লুণ্ঠন ও দলনের জন্য—সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের দুই গ্রুপের মধ্যেকার যুদ্ধ। যুদ্ধের এই মূল্যায়ন করেছিল ১৯১২ সালের বাসেল ইশতেহার—বাস্তব ঘটনায় এই মূল্যায়নই সমর্থিত হয়েছে। যুদ্ধের প্রসঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে সরে যায়, সে সমাজতন্ত্রী নয়।

ভিলহেল্মের আমলে জার্মান অথবা ক্লেমাঁসোর আমলে ফরাসি যদি বলে : আমার দেশে শত্রু হামলা করলে সমাজতন্ত্রী হিসেবে আমি স্বদেশ রক্ষায় অধিকারী ও বাধ্য, তবে সে যুক্তি সমাজতন্ত্রীর নয়, আন্তর্জাতিকতাবাদীর নয়, বিপ্লবী প্রলেতারীয়ের নয়, পেটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীর। কেননা এ যুক্তিতে পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমিকের বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম অন্তর্ধান করে, বিশ্ব-বুর্জোয়া ও বিশ্ব-প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমগ্রভাবে গোটা যুদ্ধটার মূল্যায়ন অদৃশ্য হয়, অর্থাৎ—অন্তর্ধান করে আন্তর্জাতিকতাবাদ, পড়ে থাকে একটা হতভাগা জং-ধরা জাতীয়তাবাদ। আমার দেশের প্রতি অন্যায় হচ্ছে, তার বেশি কিছু নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই—এই হল এ যুক্তির শেষ কথা, এইখানেই তার পেটিবুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সঙ্কীর্ণতা।" [প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বেইমান কাউৎস্কি]

"যে ফরাসি, জার্মান বা ইতালীয় বলে—সমাজতন্ত্র জাতির ওপর বলপ্রয়োগের বিরোধী, সুতরাং আমার দেশে শত্রু হামলা করলে আমি আত্মরক্ষা করি, সে সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কেননা সে রকম লোক দেখছে শুধু নিজের 'দেশটাকে', সবার ওপরে স্থান দিচ্ছে 'নিজের'.....বুর্জোয়াকে, যেসব আন্তর্জাতিক বন্ধনসূত্রে যুদ্ধটা সাম্রাজ্যবাদী হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী লুঠের শেকলে, তার বুর্জোয়া একটা গ্রন্থি হয়ে উঠছে, তার কথা ভাবছে না।"

স্পেনের গৃহযুদ্ধের উত্তাপ এসেছে সোমেন চন্দের কবিতায়—। সোমেন চন্দ লিখেছেন—

র‍্যালক ফক্সের নাম শুনেছ?
শুনেছ কডওয়েল আর কনকোর্ডের নাম?
ফ্রেদরিকো গার্সিয়া লোরকার কথা জান?
এই বীর শহীদেরা স্পেনকে রাঙ্গিয়ে দিল,
সবুজ জলপাই বন হল লাল,
মা-র বুক হল খালি—
তবু বলি, সামনে আসছে শুভদিন।
চলো আমরাও যাই ওদের রক্তের পরশ নিতে
ওই রক্ত দিয়ে লিখে যাই
শুভদিনের সংগীত।

নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রাথমিক কর্ণধার যারা ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়্যুব, সুরেন গোস্বামী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই প্রগতিশীল লেখকদের মূল লক্ষ ও উদ্দেশ্য ছিল, পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসীবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা গড়ে তোলা। এবং জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তি।

প্রগতি লেখক সংঘের আর একটি বড় প্রেরণা ছিলো—বিশ্বশান্তির এক মানব দূত রোমাঁ রোলাঁ ও অরি বারবোসের সাংগঠনিক তৎপরতায় বেলজিয়ামের ব্রাসলেসে গঠিত সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী সংগঠন, যা 'লিগ এগেনস্ট ইম্পোরেলিজম এন্ড ওয়ার' নামে অভিহিত হয়। এই সময় সমস্ত বাংলাদেশে ও উপমহাদেশে বিভিন্ন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। যেমন স্বাধীনতা আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লব ও গণ আন্দোলন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৫৫www.amarboi.com ~

রুশ বিপ্লবের সাফল্য ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড এবং মেহনতি মানুষের মুক্তি ও আলাদিনের প্রদীপ ঘষার মতো তড়িৎ গতিতে রাশিয়ার বিজ্ঞান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জীবনের মানোন্নয়নে শুধু বিশ্ববাসীকেই তাক লাগিয়ে দেয় নি—পৃথিবী তাবৎ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও দার্শনিকরাও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি আগ্রহ ও আন্তরিক দুর্বলতা ছিল। ১৯৩০ সনে তিনি রাশিয়া ভ্রমণে যান। পৃথিবীর মানুষের কাছে রাশিয়া তখন নিষিদ্ধ দেশ। রাশিয়া পৌঁছেই তিনি ইন্দিরা দেবীকে চিঠে লেখে জানান— আপাতত : রাশিয়ায় এসেছি। না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো। (রাশিয়ার চিঠি : রবীন্দ্রনাথ)।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ১৯৪১ সনের ২২ জুন হিটলার তার সর্বশক্তি নিয়ে রাশিয়ার ওপর আগ্রাসন চাপায়। সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল। ফ্যাসিবাদের নগ্ন চেহারা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আমরা জানতে পারি—

'আমাদের উপমহাদেশের প্রগতিবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে স্বভাবই একটা চিন্তা আসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে দাঁড়াবার। রবীন্দ্রনাথ তখন মৃত্যুশয্যায়। তিনি গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত বোধ করেছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্য। প্রগতিবাদীদের অধিকাংশই ঠিক করেন যে, এই যুদ্ধে নেতিবাচক ভূমিকা নেয়া যেতে পারে না। এখন আর এটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং হিটলারের কর্তৃত্বাধীন জার্মানির সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে সীমাবদ্ধ নেই। সাম্রাজ্যাবাদকে ধ্বংস করার জন্যই হিটলারের বাহিনীকে পরাজিত করা দরকার। প্রয়োজন সোভিয়েট ইউনিয়নের জয়লাভের। ১৯৪১ সাল শেষ হবার আগেই চীনের একটা বিরাট অংশ-দখলকার জাপান হিটলার-সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ইন্দোচীন ও বার্মাকে দখল করে সমগ্র এশিয়াকে কব্জা করতে উদ্যত হয়। এক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী হিটলারের এই জার্মানী, ফ্যাসিবাদী মুসোলিনির ইটালি এবং ফ্যাসিবাদী জাপানের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধতা করাটা প্রগতিবাদীদের কাছে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হিসেবে সামনে আসে।'

ফ্যাসিবাদের এই আগ্রাসী পটভূমিকাতেই আত্মপ্রকাশ ঘটে সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির। এই সমিতির গঠন প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপধ্যায় লিখেছেন—

'২১শে জুলাই (১৯৪১) তারিখে কলকাতার টাউন হলে 'সোভিয়েট দিবস' উপলক্ষে এক বিরাট সভা হয়েছিল। সব শ্রেণীর লোকই সভায় যোগ দিয়েছিলেন, সত্যেন মজুমদার ছিলে সভাপতি। বহুদিন বাদে শহরের রাস্তা দিয়ে শ্রমিক ও ছাত্রদের বড় বড় মিছিল বেরিয়েছিল, তারা আসায় সভাস্থলে দারুণ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। এই সভায় স্থির হয় যে সোভিয়েট সুহৃদ গঠন করার জন্য একটা কমিটি নিযুক্ত করা হবে। কমিটির কর্ণধার হলেন হীরেন মুখার্জী ও স্নেহাংশু আচার্য, কমিটিতে ছিলেন দেশের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, অধ্যাপনা, রাজনীতি, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন প্রভৃতি (র) সব শ্রেণীর মানুষ। এদের মধ্যে ঐক্যসূত্র ছিল, সোভিয়েটের প্রতি সম্প্রতি আর সোভিয়েট সভ্যতা যে পৃথিবীতে আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে এই বিশ্বাস ছিল।

www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, যামিনী রায় প্রভৃতি দেশের সংস্কৃতির নায়কদের স্বাক্ষর নিয়ে একটি বিবৃতি সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। সোভিয়েট সভ্যতার তাৎপর্য আর যুদ্ধে সর্বপ্রকারে সোভিয়েটকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি এঁরা দেশকে জানান। ভারতবর্ষের সর্বত্র এই বিবৃতি নিয়ে সাড়া পড়ে যায়।

তারপর সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দুতে ছোটবড় বই আর ইস্তেহার বার করা হয়েছে। ইংরেজিতে যে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করা হয়েছিল, দেশের নানা ভাষায় তার অনুবাদ সম্পূর্ণ ও আংশিক বেরিয়েছে। লেখকরা সবাই পুরোপুরি মার্ক্সবাদী না হলেও সোভিয়েটের বন্ধু, এঁদের একত্র করাই সমিতির সাফল্য।

সোমেন চন্দ এই সময় কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ হলেও প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা ও সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে আত্মস্থ করার তার ক্ষমতা ছিল সৌরবলয়ের আকর্ষণের মতো। তাই প্রগতি লেখক সংঘ, বিশ্বশান্তি ও যুদ্ধবিরোধী মানসিকতা ও যুদ্ধবিরোধী সংঘ, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি এবং সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার বৈপ্লবিক পবিবর্তন ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনমত ও আন্দোলন এ সবকে কেন্দ্র করে সোমেন চন্দের মানস মণ্ডল গড়ে ওঠেছে।

সোমেন চন্দের এক অমর কীর্তি 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। ঢাকায় এ সমিতির কার্যকর ও সাংগঠনিক কাজ শুরু হয় ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন মানুষের কাছে এক নিষিদ্ধ দেশ। আর ঢাকায় এই সমিতি গঠন যেন এক বিস্ময়কর ঘটনা।

১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা আর জাঁকজমকের সাথে সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে আয়োজন 'সোভিয়েট চিত্র প্রদর্শনী'। এই চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সপ্তাহব্যাপী এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে আমাদের জানাচ্ছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত—

'জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সমাজ ও সভ্যতার বহুমুখী অগ্রগতির বিষয়টি তুলে ধরবার জন্যে ঢাকা শহরের সদরঘাটের সন্নিকটে ব্যাপটিস্ট মিশন হলে একটি সপ্তাহব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। আজ শুনতে অবাক লাগবে যে তখনকার দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজজীবন সম্পর্কিত চিত্রাবলি সংগ্রহ সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে যেসব বই দ্রুত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল তা থেকেই বিভিন্ন ছবি ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের সাহায্যে বড়ো আকারের প্রায় শ' খানেক ছবির এই প্রদর্শনী যথাসময়ে উদ্বোধন করা হয়েছিল। ঢাকা শহরে এই ধরনের একটি ব্যাপার তখনকার দিনে একেবারেই নতুন। লক্ষ করা গেল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিত্র প্রদর্শনী গৃহে অজস্র লোকের সমাবেশ। অধ্যাপক, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী, ক্রীড়াবিদ, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, ব্যবসায় থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ পর্যন্ত সকলেই উৎসাহের সঙ্গে এই চিত্র প্রদর্শনী দেখতে ভিড় করেছিলেন। হলঘরের প্রবেশপথে একটি টেবিলের ওপর ন্যস্ত খাতায় ফিরে যাবার সময় অনেক দর্শকই তাঁদের মন্তব্যও লিখে রেখে যেতে ভোলেন নি। মনে পড়ে সেই প্রিয়দর্শিনী কাজলরেখা

www.amarboi.com ~

সেনগুপ্তার কথা, যিনি জানিয়েছিলেন, এ রকম একটা অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে আগে আর হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন এবং নাম দিয়েছিলেন 'সোভিয়েট মেলা'। তরুণ লেখক সোমেন চন্দ ছিলেন এই প্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে সবচাইতে প্রাণবান ও উৎসাহী। প্রদর্শনী গৃহে দিনের পর দিন ভিড় বেড়েই চলেছিল অথচ চিত্রগুলোর পটভূমি ও তাৎপর্য দর্শকদের বুঝিয়ে দেবার মতো অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবক বা সাংস্কৃতিক কর্মীর সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। সোমেন ছিলেন চিত্র-ব্যাখ্যা (তা) এবং দেখা গেল যেখানেই সোমেন ছবি সম্পর্কে কিছু বলেছেন সেখানেই দর্শকরা এসে জড়ো হচ্ছেন, ভিড় বাড়ছে। ব্যাপটিস্ট মিশন হলে সোভিয়েত চিত্র প্রদর্শনীর অসামান্য সাফল্যের পর ঢাকার বাইরে অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের কয়েকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল'।

এর পরে আর মাত্র মাস দুই বেঁচেছিলেন সোমেন চন্দ।

প্রগতিশীলদের সাথে সোমেনের সম্পৃক্ততা কৈশোর তথা স্কুল জীবনেই। এরপর প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করলে তার জীবনের কানায় কানায় সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদী চিন্তা চেতনার নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তখন আন্দোলনের ঝড়ো হাওয়া। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলেও তাদের কর্মতৎপরতা চলেছে খুব নিষ্ঠার সাথে। কলকারখানা আর খেত-খামার ও শ্রমিকদের বস্তিতে তাদের বৈপ্লবিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়েছে।

সোমেন তখন কৈশোরোত্তীর্ণ যুবক। যৌবন আর বিপ্লবের অগ্নিমশাল হাতে এক বহ্নিমান কমরেড। কিছুদিন মেডিকেলে পড়ার পর চুকে গেলো পাঠের পালা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার আন্দোলন, পার্টির সাংগঠনিক কার্য, রেলশ্রমিক ইউনিয়ন আর ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে সার্বক্ষণিক প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের যজ্ঞে নিবেদিত সোমেন চন্দ।

এই কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে আমরা বিস্মিত হই—একই সাথে সোমেন রচনা করছে জীবনমুখী, বাস্তববাদী এবং বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্দীপ্ত ও জীবনের অনুষঙ্গ গল্প-কবিতা। এ সমস্ত লেখা যেনো কালিতে নয়—রক্তে এবং প্রতিটি অক্ষর যেনো প্রাচীর গাত্রে লাল ইস্তেহার।

এ সময়ে লেখা সোমেনের একটি কবিতা এখানে উপস্থাপন করছি—। কবিতাটি পড়লেই বোঝা যাবে যে, সোমেন বিশ্বাস করতো সমাজ পরিবর্তনের পালায় জনগণের ঐক্যই একমাত্র নিয়ম শক্তি। কামান বোমা বারুদ আর সামরিক অস্ত্র দিয়ে, সৈন্যাবাহিনী দিয়ে জনতাকে, জনশক্তিকে কখনও স্তব্ধ করা যায় না।

হাজারো কামান গোলা বারুদ আর বিশাল সৈন্যবাহিনী জনগণের কাছে এবং মজুর আর মেহনতি জনতার হাতুড়ি কাস্তের কাছে পরাভব মানে। তাই সোমেন লিখলেন—

কারখানার শ্রমিক আর মাঠের কৃষক
সমগ্র দেশের শোষিত মানুষ
আজ দৃঢ় বন্ধনে ঐকবদ্ধ—
কণ্ঠে তাদের এক স্লোগান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৫৮www.amarboi.com ~

মিছিলে মিছিলে এক উচ্চারণ
কারখানার সাইরেনে এক সঙ্গীত
—শোষকের মৃত্যু হোক।
আকাশে বাতাসে সাগরে নদীতে
আজ এক কল্লোল
নগর-প্রান্তর পল্লী জুড়ে
আজ এক ধ্বনি
পথিকের গানে আজ একই সুর
—শোষকের মৃত্যু হোক।
জেগেছে শ্রমিক জেগেছে কৃষক
জেগেছে ভোরের পাখী—
উঠেছে পুবের রবি
শোষকের শেষদিন এলো ঘনিয়ে
আজ জেগেছে জনশক্তি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ তখন বিপ্লবী ও কমিউনিস্টদের ওপর নির্যাতনের নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে এবং একটির পর একটি দেশ গ্রাসের জন্য লোল-জিহ্বা বিস্তার করেছে। বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট কর্মীরা চলে গেছেন আত্মগোপনে— সোমেন তখন প্রকাশ্যে সবার আগে যুদ্ধের মাঠে।

বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট কর্মীরা আত্মগোপন করলেও ট্রেড ইউনিয়ন, রেলশ্রমিক ও মেহনতি মানুষের লড়াই এবং পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন-তো থেমে যেতে পারে না—। প্রকাশ্যে এই আন্দোলনে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন সোমেন এবং রেলশ্রমিক ইউনিয়নের পুরো দায়িত্ব ছিলো তার ওপর। এসময় তার সাংগঠনিক এলাকা ছিলো ঢাকা-ভৈরব, ঢাকা-ময়মনসিংহ, মোহনগঞ্জ এবং জগন্নাথ গঞ্জ ঘাট।

সোমেনের জীবনের প্রবর্তনা যেমন পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদীর বিরুদ্ধে আন্দোলন, তেমনি মার্কসবাদী চিন্তাচেতনার বাস্তবায়ন, সমাজ প্রগতি, মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমাজ বদল ও প্রগতির পদাতিক হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া। অন্য একটি ধারা তার জীবন প্রতিষ্ঠাকে ঔজ্জ্বল্য দান করে তা হলো মার্কসীয় সাহিত্য তথা প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা। শ্রমে ঘামে সিক্ত যে মানুষ, শ্রম দিয়ে ও সর্বহারা—যারা লাঙ্গল না চালালে ফসল উৎপাদন হয় না, কলের চাকা ঘুরে না, কারখানার ভোঁ বাজে না, কালের রথ অচল হয়ে যায়—তাদের সংগ্রামী চেতনাকে নিয়ে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করা।

সোমেন যখন সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এখন আমাদের দেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং রাজনীতির জগতে বৃত্ত ভাঙার পালা—প্রগতিশীল ও মার্কসবাদীদের সৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৫৯www.amarboi.com ~

সুখের উল্লাস। গণমুখী সাহিত্য আন্দোলনের ঝড়ো হাওয়া। আন্দামানের জেলখানায় যে সমস্ত দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন দেশে ফিরে তারাও মার্কসবাদের অমোঘ মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন।

সোমেন পরিচিত হলেন মার্কসবাদী ও বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী এবং অন্যদের সাথে। গোর্কির মা, মার্কসবাদী তত্ত্ব ও রণকৌশল তাকে বিমুগ্ধ করে। এখন সোমেন যেনো—'স্পন্দিত বুকে নিজেই সে নেলিন'।

মার্কসীয় তত্ত্বের সাথে নিজকে অভিযোজনায় প্রজ্জ্বলিত করলেন প্রগতিশীল সাহিত্য সাধনায়। গোগ্রাসে পড়তে শুরু করলেন মার্কসবাদী ও বিপ্লবী বইপত্র। সোমেন তখন ঐ সমস্ত বই-ই বেশি পড়তেন, যে সমস্ত লেখকের লেখা থেকে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মতো বর্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে অগ্নিগিরির লাভাস্রোত উদগীরণ হয়। এই সমস্ত লেখা পড়ে যেনো মানুষ নির্যাতিত উৎপীড়িত মানুষের দুঃখবেদনার কথা জেনে গণমানুষের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

'প্রগতি লেখক সংঘের' মাধ্যমেই সোমেনের লেখা শুরু হয় গল্পও কবিতা—এরপর উপন্যাস ও প্রবন্ধ। প্রগতি লেখক সংঘ তখন সাহিত্যের সনাতনী বৃত্ত ভেঙে মার্কসবাদী ও জীবনানুগ সাহিত্য সৃষ্টিতে ঝড়ো হাওয়ার সৃষ্টি করেছে। এ সময়ের অবস্থাটা এই—

'সনাতনী সাহিত্যের গোঁড়ামি এবার ভাঙবে।....আমরা নবীন প্রেরণার উদ্বুদ্ধ যুবক লেখকদের নিয়ে 'প্রগতি লেখক সংঘ' গঠন করলাম। সপ্তাহে একদিন সংঘের বৈঠক হতো। কবিতা, গল্প, সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করা হতো এবং সাহিত্য বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা হতো। মিটিং-এর ব্যবস্থা করা, সকলকে খবর দেওয়া, নতুন সভ্য সংগ্রহ করার কাজে সোমেনের উৎসাহ থাকায় তারই ওপর এ সকল কাজের ভার পড়ল। সে প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকত, প্রায়ই গল্প লিখে নিয়ে আসতো। ক্রমে তার লেখা ভাবাবেগ-সিঞ্চিত বেদনার্ত অভিব্যক্তি থেকে রূঢ় বাস্তবের চেতনায় রূপায়িত হয়ে বিপ্লবখাতে প্রবাহিত হল। যা কিছু জড়, অনড়, সনাতন—যা কিছু গতানুগতিক, প্রগতিবিরোধী—সবেরই মূলে সে করল কুঠারাঘাত। ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সে লিখবে এবং নিপীড়িতগণের বিপ্লবী সংঘ গঠন করবে—এমনই তার সঙ্কল্প! পরে সে 'প্রগতি লেখক সমিতি'র সম্পাদক হয়।

সোমেনকে ঢাকার একজন প্রবীণ সাহিত্যিক বলেছিলেন, 'কী হে, তোমরা না-কি একটা প্রগতি লেখকের দল বেঁধেছ! সাহিত্যের আবার প্রগতি পশ্চাদ্‌গতি কী? সাহিত্যে রসসৃষ্টি করতে পারলেই তা প্রকৃত সাহিত্য হয়। সোমেন সৌজন্যের সঙ্গে উত্তর দেয়, 'রসবোধ তো সকলের সমান নয়, তাইতেই যত দ্বন্দ্ব-বিরোধ। সেকালের জমিদারের প্রতাপ ঐশ্বর্য শাসন শোষণ দিয়ে পল্লীগাথা রচিত হতো—একালে পল্লীবাসী প্রজার দারিদ্র্য, অন্যায়-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ফুটিয়ে তুলে সাহিত্য প্রাণবন্ত করে তুলতে হয়। প্রবীণ চায় জমিদারের প্রতিষ্ঠা, আর নবীন চায় জনগণের প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা। বুদ্ধিমান কোনো লেখক হয়তো দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে একটা মধ্যমপন্থায় মীমাংসা দিয়ে সাহিত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন।' প্রবীণ ব্যক্তিটি উষ্মাভরে বলে উঠলেন, "তোমদের সেই এক কমিউনিজমের বুলি। রাশিয়া থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৬০www.amarboi.com ~

আমদানি করা সাহিত্য এদেশে চলবে না। তোমাদের প্রগতি লেখকদের সঙ্গে এইখানেই আমার বিরোধ।" "এ শুধু আপনার মনের কথা—আপনার সাথে তর্ক করা বৃথা।"—এই বলে সোমেন চলে এলো'।

সাহিত্য ও শিল্পকলায় নন্দনলোকের নন্দিতপাঠ তত্ত্বে বিশ্বাস করত না সোমেন। সে বিশ্বাস করতো মেহনত হতেই সমস্ত শিল্পকলার উৎস। শিল্পকলায় সাধারণ্যের অবদানই অনেক বেশি। মানুষ কখন পরাজিত হয় না মানুষ কখন পেছনে যায় না। বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়—রাজা-বাদশার পরাজয় হয় কিন্তু জনগণ কখন মরে না। বিরাট বটগাছ গুড়িয়ে পড়ে কিন্তু টিকে তাকে দুর্বাঘাস। রাজা-বাদশার ইতিহাস শোষণ নির্যাতন ও অত্যাচারের ইতিহাস আর জনগণের ইতিহাস সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস, পৃথিবীকে গড়ার ইতিহাস, বিপ্লবের ইতিহাস, সামনে এগিয়ে যাবার ইতিহাস।

পুঁজিবাদী ভোগবাদী ও সামন্ত ধারণায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং শিল্পকলা মানেই ভোগ বিলাস ও বিনোদনের সামগ্রী কিন্তু আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমাজ প্রগতি ও সভ্যতার সুস্থ বিকাশের মাধ্যম। এবং শ্রমে ঘামে উষ্ণ বিশ্বাসে ভেজা নিরন্নাক্লিষ্ট মানুষের দাবি ও অধিকার আদায়ের শাণিত অস্ত্র সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

সোমেন সাহিত্যেরই এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তার লেখায় বার বার নাক্ষাত্রিক লোকের উজ্জ্বলতা নিয়ে এসেছে বিপ্লব ও মার্কসীয় চেতনা, কালি-ঝুলি মাখা মেহনতি মানুষের সংগ্রামের কথা। এসেছে অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনা।

আমরা সোমেন চন্দের সাহিত্য প্রতিভা আলোচনার সময় দেখবো যে, এই কৃষক ও শ্রমিকদের সাথে একাত্মতাও সম্পৃক্ততার প্রভাব রয়েছে তার উপন্যাস ও গল্পে। সোমেন উপন্যাস লিখেছেন বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নিপুণ শৈল্পিক যোজনায়— বিভিন্ন ছুটি ও পূজাপার্বণে সোমেন চলে যেতেন গ্রামে। গ্রামের এবং পাড়া-প্রতিবেশী ও কৃষকদের সাথে মিশে যেতেন একান্ত আত্মীয় হয়ে। তার উপন্যাসে গ্রামজীবন ও নাগরিক জীবন সম্পর্কে নির্মল কুমার ঘোষকে লিখেছেন—

'উপন্যাসখানা গ্রাম এবং শহর দু'য়ে মিশিয়ে লেখা। তবে বেশির ভাগই গ্রাম।.....গ্রাম্য অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর—এমন কি, যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতগুলো Sweet উপন্যাস রচনা করেছেন। বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কিন্তু এতোদিন সে সব সম্বন্ধে কিছু লিখিনি এই ভেবে যে, ও সব পুরোনো হয়ে গেছে, এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। কিন্তু বছরখানেক সেই নতুন দৃষ্টি ভঙ্গির পথই খুঁজে পেতাম না। এখন কতকটি পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে সেটা আমার বর্তমান উপন্যাসে বলব'।

উল্লেখ্য যে, সোমেনের গ্রামের বাড়ি আর আমার বাড়ি তেমন দূরে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে এবং অধ্যাপনা জীবনের প্রথমেও আমি সোমেনদের বলিয়া গ্রামে গিয়েছি আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন কমিউনিস্ট নেতাকর্মী ফয়েজ মাস্টার ও অধ্যক্ষ প্রণব চক্রবর্তী গ্রামের লোকদের কাছে জেনেছি সোমেন বাড়ি এসে এ বাড়ি ও বাড়ি এবং পাড়ায় পাড়ায় যেতেন। কৃষকদের সাথে একাত্ম হয়ে আলাপ করতেন। একবার তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৬১ www.amarboi.com ~

লাঙল চালাতে গিয়ে পা কেটে রক্ত ঝরিয়েছেন আর একবার যখন সোমেন গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলেন তখন দেখেন কৃষকরা ডুব দিয়ে পাট কাটতেছেন, সোমেন তাদের সাথে জলে নামতেন। এ বিষয়ে রণেশ দাশ গুপ্ত লিখেছেন—

'গ্রামবাংলার মানুষকে সোমেন চন্দ খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন ছেলে বেলা থেকেই। ঢাকা শহরে লেখাপড়া করলেও সোমেন চন্দ ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে আসতেন গ্রামে। সেখানে তিনি দেখেছিলেন গ্রামের সমস্ত স্তরের মানুষকে গভীর অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে। তিনি তার 'স্বপ্ন' এবং 'গান' দুটি গল্পে যে সব ছবি এঁকেছেন, তাতে মনে হয় বাংলার গ্রামকে তিনি বুঝিবা নখাগ্রে ধারণ করেছিলেন। ১৯৪০ সনে যখন তিনি ঢাকা শহরে রেল শ্রমিকদের সংগঠনের কাজে নামেন একজন কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে, তখনও গভীরভাবে অন্তরঙ্গ পরিচয় পেলেন শ্রমিক জীবনের। তিনি দেখলেন, শ্রমিকদের মধ্যে তার চেনা গ্রামীণ মানুষের মর্মরূপটিকে যা তখন কৃষি থেকে শিল্পে এসে ঢালাই হতে শুরু করেছে পরিবর্তনের ছাঁচে 'সংকেত' গল্পটিতে রয়েছে এর পরিচয়'।

সোমেনের গল্প ও উপন্যাসের নায়কেরা বিপ্লবের কথা বলেছে, সংগ্রাম, আন্দোলন ও মিছিল-স্লোগানের কথা বলেছে এবং বলেছে সমাজ পরিবর্তনের কথা। অবশ্যই এ মার্কসীয় আদর্শিক চেতনার উত্তাপে উজ্জীবিত হয়েই বলেছে। কিন্তু তারা আদর্শের ও তত্ত্বের বৃত্তে বন্দী হয়ে রোবট বা যন্ত্রে পরিণত হয়ে সুখে দুঃখে মানুষ হয়েছে। যন্ত্র হয়ে যায় নি। সোমেনের গল্প ও উপন্যাস তত্ত্বের প্রচার নয়, নান্দনিক ঐশ্বর্য ও শৈল্পিক সুষমায় উজ্জ্বল। এ প্রসঙ্গে অচ্যুত গোস্বামী বলেছেন—

'সে কালে প্রগতিশীল বাস্তববাদী গল্প বলে যে সব গল্প প্রকাশিত হতো সেগুলোর বেশির ভাগেই থাকতো সমাজের যান্ত্রিক বিশ্লেষণ, ফরমূলা মাফিক কাহিনী বিন্যাস এবং ঈশপীয় কাহিনীর মতো উপদেশাত্মক এবং পূর্বানুমানযোগ্য পরিসমাপ্তি। সোমেন ঐ অল্পবয়সে প্রগতিশীল ভাবাত্মক কাহিনীকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করার জন্য নিজস্ব শিল্পসঙ্গত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। হয়ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে সে এই পদ্ধতির খানিকটা আভাস পেয়েছিল। কিন্তু মূলত এ পদ্ধতির জন্ম হয়েছিল তার মনে। নিজের জীবনের তীব্র বেদনাদগ্ধ অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যয়কে রূপায়িত করার তাগিদে এর জন্ম'।

আমি বহু লেখায় বহুবার বলেছি—দেশ, সমাজ ও মানুষের কাছে শিল্পীর একটা দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকার এবং ঋণ আছে। শিল্পীরা স্বর্গলোক থেকে এসে বাস্তব স্বর্গের সুখ প্রাচুর্যের কথা বলবেন এমন নয়। মানুষের হাসি-কান্না, দুঃখ-দুর্দশা ও জীবন সংগ্রামের কথাও বলতে হবে। তাই সোমেন বলেছেন—

রেলশ্রমিক ইউনিয়ন নিয়ে কতোটুকু নিবেদিত প্রাণ ছিলেন এবং এ সংগঠনের জন্য নিজকে কীভাবে উৎসর্গ করেছিলেন এরই একটা প্রমাণ পাওয়া যায় অমৃত কুমার দত্তকে লেখা তার চিঠিতে। চিঠির কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি—

'গত কয়েকদিন রেল শ্রমিকদের নিয়ে বেশ ঝামেলায় ছিলাম। লেখার জন্য একটুও সময় পাই না। তবু লিখতে হবে, মেহনতি মানুষের জন্য, সর্বহারা মানুষের জন্য

 www.amarboi.com ~

আমাদের লিখতে হবে। র‍্যালফ ফকসের এই বই পড়ে আমি অন্তরে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। কডওয়েলের বইটিও আমাকে অনুপ্রাণিত করছে তাই না হলে কি মহৎ সাহিত্যিক হওয়া যায়। স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে তাদের আত্মবিসর্জন ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আশার কথা বাংলা সাহিত্যের তরুণ লেখকেরা এদিকে সচেতন হচ্ছে। বিপ্লবের জন্য একজন লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। গোর্কির কথাই চিন্তা করো। শৌখিন সাহিত্য করার আর সময় নেই।

রেল শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যভার গ্রহণ ও কার্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে জ্ঞান চক্রবর্তী লিখেছেন—

'ইউনিয়নের কাজও অত্যন্ত জটিল ধরনের, শ্রমিকদের ভেতরে অসংখ্য স্তরভেদ এবং তাদের সমস্যাও অসংখ্য রকমের। দিনরাত তিনি পড়ে থাকেন শ্রমিকদের ভেতরে, তাদের সমস্যাগুলো বুঝতে চেষ্টা করেন, ইউনিয়নের কর্মপদ্ধতি আয়ত্ত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে....প্রয়োজনমতো গোপন কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁর অপূর্ণ শিক্ষাকে পূর্ণ করেন।....হাজার হাজার শ্রমিকের কাছে তিনি অতি আপনার লোক হয়ে দাঁড়ান এবং প্রায় সমস্ত সমস্যা তাঁর আয়ত্তে চলে আসে।....তাঁর সারল্য, কোনো রকম গর্ব কিংবা গরিমার অভাব, এবং দু'একটি কথাই অনেক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করে দিতো।' [আগুনের অক্ষর, পৃ. ৩৫-৩৬]

অন্যত্র লিখেছেন, '৪৩ সালেই শক্তিশালী রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের তিনি সাধারণ সম্পাদক হন সর্বসম্মতিক্রমে। ২০ বছরের এক যুবকের পক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার; কারণ রেল কর্তৃপক্ষের জাঁদরেল লোকদের সাথে বসে শ্রমিকদের সমস্যাগুলো নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হতো। তাঁদের ক্ষুরধার বুদ্ধি সোমেনের দৃঢ়তা ও সরলভাবে সমস্যাগুলো উপস্থিত করার ক্ষমতার কাছে সম্পূর্ণভাবে হার মেনে যেত। তাঁকে কর্তৃপক্ষ ভয়ের চোখে দেখতেন দুটি কারণে : একটি—দৃঢ়তা ও সারল্যের জন্যে, অপরটি—তাঁর বয়সের জন্যে'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রগতি লেখক সংঘ'

হিটলারের ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বীভৎস তাণ্ডবে সমগ্র বিশ্বের শান্তিবাদী, প্রগতিবাদী ও যুদ্ধবিরোধী কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা বিচলিত হয়ে পড়লেন। এই দানবীয় শক্তির লোল জিহ্বার গ্রাস থেকে বিশ্বের মানুষ ও দেশকে রক্ষার জন্য তারা তৎপর হয়ে ওঠলেন। তাই রঁমা রঁলা, ম্যাক্সিম গোর্কি ও আঁরি বারবুসের মতো মহান শিল্পীরা ২১ জুন ১৯৩৫ সালে প্যারিসে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন এই ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য। তাদের এই আহ্বানে সাড়া দিলেন বিশ্বের বিবেকী ও প্রতিবাদী কণ্ঠ আঁদ্রে জিদ, ই. এম. ফস্টার, মালরো, অলডাস হাক্সলি, জুলিয়া রাঁদা, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্রাবি প্রমুখ সাহিত্যিক ও মনীষীবৃন্দ। এই সম্মেলনে আঁদ্রে জিদ তার ভাষণে ফ্যসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে বলিষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—

'আমার বৈরিতা আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নয়। সেই সংস্কৃতির ঝুটা রীতিনীতির বিরুদ্ধে। আমি দৃঢ়স্বরে বলি—তারাই হচ্ছে সংস্কৃতির শত্রু, যারা মিথ্যাকে সমর্থন করে এবং সেই সঙ্গে আমাদের বর্তমান মিথ্যাচারী সমাজ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। আমি দৃঢ়স্বরে বলি—সংস্কৃতির শত্রু আজ ফ্যাসিস্টরা, নাৎসীরা এবং আমাদের জাতীয়তাবাদীরা।'

জিদ তার ভাষণে উপস্থিত কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতীব সতর্কতার সাথে বলেন যে, এই চিত্র আজ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের জন্যই এবং এখন থেকে যদি প্রত্যেকটি দেশ সচেতন না হয় তবে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ছোবলে সকল দেশই আক্রান্ত হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সোভিয়েটের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলেন—

'সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সামনে আজ অভূতপূর্ব দৃশ্য মেলে ধরেছে। এর গুরুত্ব বিরাট, আশাতীত ও আদর্শস্থানীয়। এই সেই দেশ, যেখানে লেখক সোজাসুজি তাঁর পাঠকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। আমাদের যেমন স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটতে হয়, এখানে তার বদলে লেখককে শুধু স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দিতে হয়, তাঁর চারদিকের বাস্তবে তিনি একই সঙ্গে পান প্রেরণা ও পদ্ধতি—তাঁর রচনার পদ্ধতি।....এখনও আমাদের সামনে রয়েছে সংগ্রাম, এখনও গর্ভধারণকাল ও প্রসববেদনা। আমি বিরাট পটভূমিকায় আঁকা নবকালের বার্তাবাহী রচনার জন্যে প্রতীক্ষা করছি, যে রচনার মধ্য দিয়ে বাস্তবকে অতিক্রম করে লেখক তার অগ্রদূত হবেন, বাস্তবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন আগে আগে।'

প্যারিস সম্মেলন সমগ্র বিশ্বের যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিবাদী এবং প্রগতিশীল কবি। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে একটি প্রচণ্ড সাড়া পড়ে যায়। সম্মেলনের পর পরই বিলেতে কয়েকজন ব্রিটিশ ও ভারতীয় লেখক প্রগতি সাহিত্য সংঘ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময়ের পর তারা প্রগতি সাহিত্য সংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং এঁদের মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন হ্যারল্ড ল্যাস্কি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৬৪www.amarboi.com ~

হার্বার্ট রীড, মন্টেগু শ্ল্যাটার, মুলুকরাজ আনন্দ, রজনী পাম দত্ত , ই. এম. ফস্টার, সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ লেখক ও চিন্তাবিদরা।

ভারতীয় লেখকেরা ঐখানেই ভাবতেছিলেন প্যারিসের মতো একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ভারতের প্রগতিশীল, শান্তিবাদী ও যুদ্ধবিরোধীরা লেখকেরা কিভাবে ভারতে প্রগতি লেখক সংঘ গড়ে তুলতে পারে। মাত্র কয়েক মাস পর এ বিষয়ে ভারতীয় লেখকেরা একমত হলেন এবং ১৯৩৬ সালে ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস সম্মেলনকালে শিল্প ও সাহিত্যক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের শুভ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৩৬ সনের ১০ এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' (All India progressive writers' Association) আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়।

লন্ডনে সর্বভারতীয় 'প্রগতি লেখক সংঘের' মতবিনিময় ও প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্যোগ প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন—

"১৯৩৫ সালের শেষাশেষি সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। লন্ডনে একত্রে বসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন ১৯৩২-৩৩-৩৪ সালে যে আলোচনা করেছিলেন তারই পরিণতি হল এই সংস্থা। সাজ্জাদ জহীর, রাজ রাও, ইকবাল সিং, মুহম্মদ আশরয়, মুলুকরাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য এবং আরও কয়েকজনের আলোচনার জের টেনে প্রস্তাবিত প্রগতি লেখক সংঘের ইশ্‌তেহার ১৯৩৫ সালে প্রকাশ করা হয়। এতে আমার স্বাক্ষরও আছে, যদিও ১৯৩৪ সালে আমি দেশে ফিরে আসি। আমি জানি, অন্তত আরও দু'জন বাঙালি এ কাজে লিপ্ত ছিলেন—একজন হলেন প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, যিনি থাকতেন সাধারণত প্যারিসে.....,আর অন্যজন, যাঁর মুশাবিদার বিশিষ্ট চিহ্ন রয়েছে ইশ্‌তেহারে, যিনি ছিলেন ভারতীয় ছাত্রদের 'friend, philosopher and guide',... এই বিরল মানুষটির নাম জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ।"

১৯৩৫ সনের এই প্রস্তাবনা আলোকেই অবশেষে ১৯৩৬ সনের ১০ এপ্রিল মুন্সী প্রেমচাঁদের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন ভারতকন্যা রাজনীতিবিদ ও বিদ্বত ব্যক্তিত্ব সরোজিনী নাইডু। অভ্যর্থনা বিভাগের পক্ষ থেকে ভাষণ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত বাগ্মী, বিখ্যাত কবি ও সংগ্রামী দেশবরণ্য নেতা মৌলানা হাসরত সোহানী। সম্মেলনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট হিন্দি ও উর্দু কবি লেখকবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করছি —

উর্দু কবি মজাজ, অধ্যাপক আব্দুল অসাম, পণ্ডিত মাহমুদ জাফর, এলাহাবাদের সাহিত্য অধ্যাপক প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত, তরুণ গল্পকার যশপাল, কবি ফৈজ আহ্‌মদ ফয়েজ, প্রধান সাহিত্যিক ফিরাকু গোরক্ষপুরী, সুমিত্রনন্দন পন্থ, গল্পকার রসিদা জহাঁ প্রমুখ।

মুল্লুক রাজ আনন্দ প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন হলেও শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। এই সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন প্রখ্যাত উর্দু লেখক সাজ্জাদ জহীর এবং সভাপতি নির্বাচিত হন মুন্সী প্রেমচাঁদ।

 www.amarboi.com ~

এই সম্মেলন প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

'বাংলা থেকে চারজন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নিজে যেতে পারেন নি; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক ধারা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। যখন প্রবন্ধটি পড়া হয় তখন চারদিকে প্রকৃতই 'ধন্য ধন্য' রব ওঠে; বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এমন সাহিত্য সমালোচনার নিদর্শন আর কোনো প্রদেশ থেকে আসেনি। লক্ষ্ণৌয়ে সম্মেলন হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের বহু বিশিষ্ট লেখকের সঙ্গে আন্দোলনের সম্পর্ক আলোচনা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথাও স্মরণ আছে। শরৎচন্দ্র সানন্দে লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের জন্য তাঁর বাণী আমাদের হাতে দিলেন।

আমাদের দেশে প্রগতি লেখক সংঘের যোগাযোগ ছিল 'ওয়ার্লড কংগ্রেস ফর দি ডিফেন্স অব পীস' এর সঙ্গে; রঁমা রঁলা প্রমুখ। মনীষী ফ্যাসিজম যে নির্লজ্জভাবে যুদ্ধের চক্রান্ত করছিল তার বিরুদ্ধে প্রধানত লেখক শিল্পীদের নিয়ে সংগঠনের আহ্বান দেওয়ায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্যারিস, ব্রাস্‌লস, মাদ্রিদে এর অধিবেশন হয়েছিল— মুল্লুকরাজ আনন্দ ভারতীয় লেখকদের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে যোগ দিয়েছিলেন'।

'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' সম্মেলনের পর পরই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় এর শাখা গঠিত হতে থাকে। বাংলাদেশে তখন প্রগতিশীল কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে সংগঠনের তাগিদ অনুভব করা হয়েছিলো ভেতরে ভেতরে। এ বিষয়ে নেপাল মজুমদার লিখেছেন—

'বাংলাদেশে অবশ্য ইতিপূর্বেই 'প্রগতি সাহিত্য', 'গণসাহিত্য' ইত্যাদি নিয়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনা শুরু হয়েছিল, কিন্তু তা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত কোনো আন্দোলন ছিল না। তাছাড়া 'প্রগতি সাহিত্যে'র আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কেও তাঁদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় কয়েকজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী এই সর্বপ্রথম বিভিন্ন প্রগতিশীল সাহিত্যগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে সারা ভারতব্যাপী প্রগতিশীল সাহিত্যের এক সংঘবদ্ধ আন্দোলনে প্রয়াসী হলেন। সমস্ত মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং দেশে প্রগতিশীল চিন্তার অবাধ বিস্তারের সূচনা করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন'।

মোহিতলাল মজুমদার বড়ো কবি, বড়ো সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ সমালোচক ছিলেন এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার রক্ষণশীল ও নেতিবাচক ভূমিকা মেনে নেওয়া যায় না। যে উদার মানসিকতা থাকলে অন্যকে বরণ করে নেওয়া যায় তা তার ছিলো না। তার একটা ঈর্ষাকাতর ও অসহিষ্ণু মানসিকতা ছিলো। এ প্রসঙ্গে নজরুল-মোহিতলাল বিরোধের কাহিনী অনেকেই অবহিত আছেন। প্রগতি লেখক সংঘ সম্বন্ধেও মোহিতলাল উদার মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে হীনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

১৯৩৮ সালে কবি মোহিতলাল মজুমদার 'বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক' প্রবন্ধে নতুন চিন্তাকে নাকচ করার জন্য অস্ত্রধারণ করে লিখেছেন : 'সকলকে বাতিল করিয়া দিয়া প্রগতি নামক একটি অনার্য শব্দকে বিশাল বংশদণ্ডে বাঁধিয়া ভদ্রবেশী বর্বরগণের অগ্রণী হইয়া, আধুনিক নগর-চত্বরের পণ্যবীথি প্রকম্পিত করিতে হইবে। .... আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৬৬www.amarboi.com ~

যুগধর্মের সুযোগে, মানব-সভ্যতার এই অতিশয় সঙ্কটময় দুর্দিনে— ইহারা, এই রস-অধিকার বঞ্চিত হরিজনেরা জগাতে উঠিবার জন্য বিষম কোলাহল করিতেছে।'

'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ' প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা ও চিন্তাবিদ এবং বিশ্লেষক চিন্মোহন সোহানবিশ তার তথ্য সমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণী আলোচনা বলেছেন—

'বাংলাদেশে তখন 'প্রগতি লেখক সংঘের' সভাপতি ছিলেন ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। এছাড়া হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন সংঘের কাজকর্মে। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, আবু সাঈদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন লেখকরা। এঁদের অনেকেই ছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মন্মথ সান্যাল, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত প্রভৃতি সংঘের ঘনিষ্ঠরা অনেকেই ছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত। বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়ে গোপাল হালদার মহাশয়ও যোগ দিলেন লেখক সংঘে'।

১৯৩৭ সনে বাংলাদেশের অনেক জেলায় সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। প্রবন্ধ ছাড়াও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির গল্প বা কবিতা লেখার রেওয়াজ শুরু হয় এই সময়ে। মনোরঞ্জন হাজরার 'নোঙরহীন নৌকা' ও 'পলিমাটির ফসল' এবং গোপালবাবুর 'একদা' এই দিক দিয়ে অগ্রণী প্রচেষ্টা। 'প্রগতি' নামে একটি সংকলনও প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সনে (সালে)। উপরে যাঁদের নাম করা হল তাঁরা বাদে এ সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিলো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতির রচনা। এর থেকে এখনকার লেখক সংঘের ব্যাপ্তির কিছুটা পরিচয় মিলবে।

এ সব লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে প্রগতি লেখক আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধছিল বাংলাদেশে। তবু অনিবার্য প্রাথমিক স্বতঃস্ফূর্তি কাটিয়ে সত্যকার সংগঠিত আন্দোলন শুরু হয় দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনের পর। এর অধিবেশন হয় কলকাতায় ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসে। সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয় মুল্লুকরাজ আনন্দ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত সুদর্শন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ এবারেও একটি বাণী পাঠান সম্মেলনে। এতে এশিয়ার নবজাগরণের কথা তিনি বিশেষভাবেই উল্লেখ করেন। আর সাহিত্যের বিষয়ও আঙ্গিক, লোককাব্য ও শিল্প, সাহিত্যে মতবাদের প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনায় যোগ দেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, ড. আবদুল আলিম, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কবি মাজাজ, হিরণকুমার সান্যাল, আলি সর্দার জাফরি, বলরাজ সাহনী, আহমদ আলি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা লেখকবৃন্দ।

আগেই গোপন 'কমিউনিস্ট পাঠাগারের' প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এই কমিউনিস্ট পাঠাগারেরই প্রকাশ্য শাখা 'প্রগতি পাঠাগার'। উভয় পাঠাগারের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন সোমেন প্রথম থেকেই। সোমেন চন্দ পাঠাগারের প্রগতিশীল কর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে যান। আগেই বলেছি ঢাকায় সোমেন চন্দের সাথে প্রথমে সবচেয়ে আদর্শিক সম্পৃক্ততা ঘটে আন্দামান ফেরত বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর সাথে। সতীশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৬৭www.amarboi.com ~

পাকড়াশী ও সোমেন চন্দ উভয়েই আমাদের নরসিংদী জেলার একই এলাকার মানুষ। বয়সের বেশ ব্যবধানের পরও উভয়ের মধ্যে গভীর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এ প্রসঙ্গে সতীশ পাকড়াশী বলেছে—

'আন্দামান ফেরতা, টেররিস্ট বিপ্লবী দলের পুরনো কর্মী বলে সে প্রথমটায় আমার দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রথম দিনের পরিচয়েই আমি তাকে বলি,—সাহিত্য রচনার পথেও বিপ্লবের কাজ হয়। তুমি দেশের দারিদ্র্য-পীড়িত দুঃখী জনগণের আশা উদ্যমহীন জীবনের কথা দিয়ে জীবন্ত গণ-সাহিত্য তৈরি কর—তাহলে তোমার ইপ্সিত স্বাভাবিক কর্মপথেই ভবিষ্যৎ গণবিপ্লবের পথ প্রস্তুতের সহায়ক হতে পার। লেখার দিকেই তার বেশি টান এইটে বুঝেই ঐ কথা বলেছিলাম। সোমেন সব কথাই মনোযোগ দিয়ে শোনে, কিন্তু কিছু বলে না। তবু তার আগ্রহটা বোঝা যায়'।

১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি সোমেন তার দক্ষিণ মৈশণ্ডি পাড়ায় আমাদের কমিউনিস্ট পাঠচক্রে যোগ দেয়।

'গোপনে ক্লাস হতো। সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে শুনত—বেশি প্রশ্ন করত না। কৃষক শ্রমিকের জীবনকথা, কোটি কোটি দরিদ্র জনগণের মর্মব্যথা, তাদের সংগঠন, জাগরণ, মার্কস্ লেনিন প্রদর্শিত সংগ্রামের পথে সাম্যবাদের নবজীবন তাকে নতুন প্রেরণা দিল। একদিন ক্লাসের পড়ার পর তার বাসায় গেলাম। নতুন কী লিখছ জিজ্ঞাসা করায় সে একটি গল্প পড়ে শুনাল। দেখলাম, গল্পে আমার ক্লাসের পড়ার ছাপ পড়েছে। বেকার মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখ অশান্তি, তারই পাশে মুসলমান গাড়োয়ানদের দুর্গত বস্তি জীবন, অপরদিকে বাড়িওয়ালা মহাজনের ধনৈশ্বর্যপূর্ণ প্রাসাদ—ধনীর নিদারুণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ জীবনে দাম্ভিকতার ছবি ফুটেছে সোমেনের লেখায়। চাকা ঘুরছে, লেখকের বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি আর পূর্বের মতো নেই। রসবোধ নতুনতর, গল্প সৃষ্টি ও লেখনভঙ্গি আগের থেকেও সুন্দর। বেশ ভালো লাগল সোমেনকে। শান্তস্বভাব, সরল, কিন্তু গভীর ভাবের উদ্দীপনা জেগেছে প্রাণের পরতে পরতে। সোমেন কমিউনিস্ট পার্টিতে ভিড়ে পড়ল। আগ্রহশীল বিশ্বস্ত কর্মীর প্রশংসমান দৃষ্টি তার উপর। পুলিশের খাতায় এখনও নাম ওঠেনি, কাজেই 'দক্ষিণ মৈশুণ্ডি প্রগতি পাঠাগার' পরিচালনের ভার পড়ল সোমেনের উপর। সোমেনের অমায়িক স্বভাবে পাড়ার ছেলেরা তার গুণ-মুগ্ধ। 'প্রগতি পাঠাগারে'র সাপ্তাহিক বৈঠকে সোমেনের গল্প ও প্রবন্ধ হতো সবচেয়ে ভালো'।

সোমেনের কর্মনিষ্ঠা, আদর্শিক চেতনা, সততা ও দিনরাত পার্টির কাজ এবং তার বিনয় বিনম্র আচার-আচরণে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেতো। অল্পকালের মধ্যেই তিনি প্রগতি পাঠাগারের প্রাণপুরুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এবং দেখা গেল যে, ১৯৩৮ সনে তিনি প্রগতি পাঠাগারের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এ প্রসঙ্গে জ্ঞানচক্রবর্তীর জবানিতে আমরা জানতে পারি—

'সোমেন চন্দই ছিলেন এর (প্রগতি পাঠাগারের) প্রাণ এবং প্রধান উদ্যোগী। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে এখানে স্বরচিত গল্প, কবিতার আসর বসত, তাতে তাঁর তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুরা যোগ দিতেন এবং সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে চুলচেরা বিচার হতো। এখানকার আলোচনার ভেতর দিয়ে তাঁর ধারণা জন্মে যে, স্বল্প জ্ঞান নিয়ে সাহিত্যের মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৬৮ www.amarboi.com ~

সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তখন তিনি গভীর মনোযোগের সাথে মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞান এবং বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখাগুলো আয়ত্ত করতে আরম্ভ করেন। এ সময় প্রায়ই দেখা যেত সারারাত জেগে তিনি গভীর অধ্যয়নে মগ্ন আর ভোর হতেই ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে পড়ার কাজে ব্যস্ত। একজন ম্যাট্রিক পাস করা ছেলের পক্ষে মার্ক্স লেনিনের দুরূহ বইগুলো থেকে তাঁদের তত্ত্বের মর্মবস্তু উদ্ধার করা সহজ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এ বাধার কাছে হার মানেন নি, নিজের উদ্যমেই সমস্ত কিছু আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছেন এবং যখন তিনি নিজে কোনো প্রশ্নের সমাধান করতে পারেন নি তখন প্রধান মার্ক্সবাদীদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছেন।'

প্রগতি পাঠাগারের সম্পাদক হবার পর থেকেই সোমেন হাতে-কলমে রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু করেছিলেন। তাঁর হাতের লেখা সুন্দর ছিলো, গভীর রাত পর্যন্ত জেগে তিনি দেয়ালে দেয়ালে লাগানোর উপযোগী করে নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর পোস্টার লিখতেন। পার্টির নেতাদের কাছ থেকে স্লোগানের বিষয়টি জেনে নিয়ে নিজের ভাষায় পোস্টারগুলোকে জীবন্ত করে তুলতেন।

'কমিউনিস্ট পাঠচক্র' এবং 'প্রগতি' পাঠাগারের সদস্যরাই মূলত ঢাকায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। এদের পুরোধায় ছিলেন রণেশ দাস গুপ্ত। কিরণশঙ্কর সেন গুপ্ত, অমৃতকুমার দত্ত, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, সত্যেন সেন, সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ।

'প্রগতি লেখক সংঘে' সোমেন চন্দের ভূমিকা প্রসঙ্গে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বলেছেন—

'ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলন একদিন সার্থকতা লাভ করেছিল। কেননা সোমেন চন্দের মতো একজন পুরোপুরি কমিউনিস্ট লেখককে এই সংঘ একেবারে আন্দোলনের পুরোভাগে এনে দিতে পেরেছিল। ঢাকায় সোমেন তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে প্রগতি লেখক সংঘ জেলা শাখার উদ্বোধন করেছিলেন ১৯৩৯ সনেই।'

ঢাকা জেলার 'প্রগতি লেখক সংঘের' প্রথম সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় ১৯৩৯ সালে। কমিটির প্রাথমিক সভা ও কার্যকরী কমিটিতে ছিলো রণেশ দাশ গুপ্ত, সোমেন চন্দ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অমৃত কুমার দত্ত, জ্যোতিময় সেনগুপ্ত প্রমুখ। কিন্তু এর প্রচার, প্রসার, কর্মতৎপরতা, জনসংযোগ, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এবং তরুণদের প্রচণ্ড আকর্ষণে টেনে আনার প্রবল শক্তি সোমেন ছাড়া আর কারও এমন ছিলো না।

'প্রগতি লেখক সংঘের' (ঢাকায়) আনুষ্ঠানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪০ সনে গেণ্ডারিয়া হাইস্কুল মাঠে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কাজী আবদুল ওদুদ। এবং এ সম্মেলনে রণেশ দাস গুপ্তকে সম্পাদক এবং সোমেন চন্দকে সহসম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। প্রতি রোববার ১১টায় কোনো এক সদস্যের বাড়িতে সাহিত্যের আসর বসতো। নৃপেন গোস্বামী, সরলানন্দ সেন ও অচ্যুত গোস্বামী ছিলেন সংঘের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

প্রকৃতপক্ষে প্রগতি লেখক সংঘের সবচেয়ে উদ্যোগী ও অগ্রণী ছিলেন সোমেন চন্দ। তার সাংগঠনিক তৎপরতা, কর্মদক্ষতা ও কর্মচাঞ্চল্য ছিলো বিস্ময়কর। সদস্য সংগ্রহ ও লেখকদের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করতেন। তরুণদের ওপর তার একটি সম্মোহক প্রভাব ছিলো। এ প্রসঙ্গে রণেশ দাস গুপ্ত আমাদের জানিয়েছেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৬৯www.amarboi.com ~

'এই প্রস্তুতিপর্বে সোমেন চন্দ যেমন প্রগতি লেখক সংঘের গোড়াপত্তনে অগ্রণী ছিলেন, তেমনি ১৯৪০ সালে যখন সংঘ জমজমাট হয়ে উঠল, তখনও সোমেন চন্দ ছিলেন তাঁর ট্রেড ইউনিয়নের কাজের পাশাপাশি লেখক সংঘের সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক বৈঠকগুলোর সবচেয়ে নিয়মিতভাবে উপস্থিত সদস্য। আগামী বৈঠকে কারা লেখা পড়বে—এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে নির্ধারিত বৈঠকে দেখা যেত, সোমেনের ওপর লেখার ভার থাকলে তিনি ঠিক লেখা নিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর দায়িত্বটি নিখুঁতভাবে পালন করতেন বলে প্রায় বৈঠকেই তাঁর ওপর ভরসা করা হতো এবং তাঁকে লেখা আনতে বলা হত। এই তাগিদ একদিক দিয়ে তাঁর দিক থেকেও খুব কাজের হয়েছিল। দু বছরের মধ্যে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলো লিখেছিলেন, যেগুলো অধিকাংশই বৈঠকে পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল।

সংঘের বেঠকে সদস্যদের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া লেখা নিয়ে ১৯৪০ সালে একটি সহিত্য সংকলন প্রকাশ করা হয়। বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা অতিক্রমণের অর্থে নামকরণ হয় 'ক্রান্তি।' যথাসময়ে ক্রান্তি (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয় ঢাকার একটি ছাপাখানা থেকে। ছাপাখানা থেকে বই বার করে আনার ব্যাপারে সোমেন চন্দ দিবারত্রি পরিশ্রম করেন অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে মিলে। সোমেনের 'বনস্পতি' গল্পটি এই ক্রান্তিতেই প্রকাশিত হয়। সোমেন প্রায় শ'খানেক 'ক্রান্তি' নিয়ে কলকাতা যান এবং সেখানকার প্রগতি লেখক-লেখিকাদের অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এর প্রচারের বন্দোবস্ত করেন। এই সময়েই তিনি 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তাঁর 'ইঁদুর' গল্পটি দিয়ে আসেন। ১৯৪২ সালে সোমেনের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই এই গল্পটি 'পরিচয়' পত্রিকায় ছাপা হলে সাহিত্যরসিক মহলে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছিল'।

১৯৪০-এর সন্ধ্যায় ঢাকা জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অ্যাসেম্বলি হলে ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সংঘের বার্ষিক প্রীতি সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি নানা কারণে স্মরণীয়। তখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জগতের সংকট ক্রমবর্ধমান এবং আমরা প্রগতি লেখকরা, লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চিন্তা ও ধ্যান ধারণার দিক থেকে ব্যাপক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম। ১৯৪০-এর এই সভায় সভানেতৃত্বপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়েছিলেন সুকুমার রায় (পরবর্তীকালে আকাশবাণীর প্রোগাম এক্সিকিউটিভ এবং সংগীতশাস্ত্রের বই লিখে রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত) এবং বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, ভবানীপ্রসাদ দত্ত (এখন সন্ন্যাসী এবং দিল্লি রাম কৃষ্ণ মিশনের উচ্চতর পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত), নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য (দেশবিভাগের পর কিছুকাল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী ছিলেন), অনিল চক্রবর্তী, অমৃতকুমার দত্ত এবং সোমেন চন্দ। সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক অমলেন্দু বসু (উত্তরকালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্য-সমালোচক ও গ্রন্থকার)

এ ছাড়া ছিলেন লক্ষ্মৌ প্রবাসী নবেন্দু বসু (কবিতার প্রকৃতি গ্রন্থের রচয়িতা) এবং অধ্যাপক জুলফিকার আলি। এই সময় অচ্যুত গোস্বামী ছিলেন সংঘের সম্পাদক। তিনি এবং জ্যোর্তিময় দে এই সভায় অভ্যাগতদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত ছিলেন। ইতোপূর্বেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৯০ www.amarboi.com ~

অবশ্য ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে আরও দু'চারটি স্মরণযোগ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো রমনা ও পুরনো পল্টন সংলগ্ন এলাকায়। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত। অধ্যাপক পৃথ্বীশ চক্রবর্তী প্রভৃতি কোনো কোনো সভায় উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহিত করেছিলেন। এখন আমার এই ভেবে অবাক লাগে যে সাম্প্রতিককালে কলকাতার কিছু লেখক ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের প্রায় দশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে কোনো সুচিন্তিত বা বিস্তৃত আলোচনা তাঁদের কারুর কারুর প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাচ্ছে না'।

এই সংঘের জন্য প্রথম নির্ধারিত কোনো অফিস ছিলো না। অনেকদিন আসর বসেছে অচ্যুত গোস্বামীর কোর্ট হাউস স্ট্রিটের দ্বিতল বাস ভবনে। প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা বসে সোমেন চন্দের ৪৭ নম্বর লালমোহন স্ট্রিটের বাড়িতে। প্রতিটি সভাই পরিচালনা করতেন সোমেন।

১৯৪০ সনের ডিসেম্বর মাসে সংঘের প্রীতি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জগন্নাথ কলেজে এ্যাসেম্বলি হলে। সভাপতিত্ব করেন বুদ্ধদেব বসু। গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, ভবানী প্রসাদ দত্ত, নৃপেন ভট্টাচার্য, সোমেন চন্দ ও অমৃত কুমার দত্ত। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাহিত্যিক নবেন্দু বসু, অধ্যাপক জুলফিকার আলী, অধ্যাপক অমলেন্দু বসু।

পরবর্তীকালে ঢাকার রমনা ও পুরানা পল্টনে প্রগতি লেখক সংঘের বেশ ক'টি সাহিত্য সভা বসে এবং এ সমস্ত সভায় উপস্থিত থাকতেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অমিয় কুমার দাসগুপ্ত ও পৃথ্বীশ চক্রবর্তী।

১৯৪১ সালে অক্টোবর মাসে সদরঘাটের ব্যাপটিস্ট মিশন হলে সংঘের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাজী আবদুল ওদুদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সোমেন চন্দ এই সম্মেলনে সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। তার সংগঠনই ও কর্মতৎপরতায় ত্বরিত গতিতে বহু তরুণ সদস্য সংঘে সংযুক্ত হয়।

সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর ৯ জানুয়ারি ১৯৪৩ সনে ঢাকা জেলা প্রগতি সংঘের এক বর্ধিত সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার জন্য একটি বক্তব্য রচনা করেছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রতিবেদনে তিনি বলেন—

'১৯৩৯ এর দ্বিতীয়ার্ধে প্রাদেশিক প্রগতি লেখক সংঘের সংযুক্তি লাভ করে এই সংঘের জন্ম হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে সতীশ পাকড়াশী, জ্যোতির্ময় সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, সোমেন চন্দ প্রভৃতির নাম করা দরকার। প্রথম প্রথম আমাদের কাজ শুধু রবিবাসরীয় সাহিত্যিক আড্ডা জমানোতে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রগতি সাহিত্যের মর্মকথা নামে প্রগতি সাহিত্য বিশ্লেষণ করে একটি পুস্তিকাও আমরা এই সময় প্রকাশ করি। তারপর ১৯৪০-এ আমরা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সংঘের প্রায় ২০ জন লেখকের লেখা সংগ্রহ করে 'ক্রান্তি' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করি। কিন্তু এই প্রকাশের পর অনতিবিলম্বেই বাংলার সুধী সমাজ যে পরিমাণ সমাদরের সঙ্গে বইখানা গ্রহণ করলেন, তাতে আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং উৎসাহ দুই-ই বেড়ে গেল। বই প্রকাশ ছাড়াও আমরা কয়েকবার আব্দুল ওদুদ সাহেব, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভাপতিত্বে এই ধরনের বর্ধিতায়তন বৈঠকে ঢাকার সুধীসমাজকে আকর্ষণ করে আমাদের এই আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝাতে চেয়েছি। এই যাবতীয় প্রচেষ্টার ভেতরেই প্রগতি লেখক সংঘ তার একটা দৃঢ় বিশ্বাসকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছে। সেটা হল এই বিশ্বাস যে, সাহিত্য এবং শিল্পমাত্রই কেবল সমাজকে কেন্দ্র করেই ফুলে-ফলে-রসে সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের কাছে এতখানি আনন্দের খোরাক হিসেবে দেখা দেয়। এবং সর্বযুগে সাহিত্যের শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি এই সমাজকেন্দ্রিকতাকে স্বীকার করে, সমাজের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে, সমাজকল্যাণ এবং অগ্রগতির জন্য নিরঙ্কুশভাবে তাদের স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই ঐতিহ্যের কথা স্মরণ রেখে আমরা আজকের দিনের প্রগতি লেখকেরা এই কথা বলতে চেয়েছি যে সমাজকে অবলম্বন করে আমাদের সাহিত্য বা শিল্প গড়ে তুলতে হবে, তার মধ্যে যেন সে সমাজের স্বাধীনতা এবং উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার শোষণ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তাকে রূপ দিতে পারি'।

'প্রগতি লেখক সংঘের' অফিস বার বার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এর আদর্শ চেতনা ও উত্তাপের উত্তরোত্তর উত্তরণ ঘটেছে বারবারই। এর উত্তাপ শুধু ঢাকা ও পূর্ববঙ্গে নয় কলকাতা ছাড়িয়ে বাইরে ও প্রসারিত হয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে কিরণশঙ্কর সেন গুপ্ত লিখেছেন—

তিরিশের শেষা শেষি বামপন্থী রাজনীতির ঢেউ এসে লাগল ঢাকা শহরে। তার প্রভাব দেখা দিল সাহিত্যেও। একদল তরুণ লেখকের উদ্যোগে স্থাপিত হল 'প্রগতি লেখক সংঘ'। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত একটানা দশ বছর এই সংঘের কর্মোদ্যোগ ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ১৯২৮-২৯ সনে (সালে) ঢাকায় আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন ছিল প্রধানত বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' মাসিকপত্রকে অবলম্বন করে। 'প্রগতি'র লেখক গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব এড়িয়ে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহী হলেও এই গোষ্ঠীর কোনো লেখক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সাহিত্য আন্দোলনে শামিল হন নি। 'প্রগতি'র লেখকরা ছিলেন মোটামুটিভাবে বিশুদ্ধ শিল্পের সমর্থক; বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাস, অজিত দত্ত প্রমুখের তৎকালীন রচনায় যার নিদর্শন।...ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের সূচনা কাল থেকেই তরুণতর লেখকদের সাহিত্যসৃষ্টিতেও নতুন স্বাক্ষর। এই সংঘের লেখকদের তখন অনেকেই মার্ক্সবাদে তেমন অভিজ্ঞ নন এমন লেখকও বেশকিছু যোগ দিয়েছিলেন এই সংঘের মানবিক, বিপ্লবী ও কল্যাণকর আদর্শকে অনুধাবন করে। সপ্তাহে একবার সাহিত্য সভার আয়োজন হতো। এক একবার এক এক সভ্যের বাড়িতে। কখনও নারিন্দায়, কখনও দক্ষিণ শৈশিণ্ড, কখনও কোর্ট হাউস স্ট্রীট, পাটুয়াটুলী, সূত্রাপুর কিংবা গেণ্ডারিয়ায়। সভায় অনেক তরুণ মুখ দেখা যেত; পরবর্তীকালে এদেরই অনেকে প্রগতি লেখক সংঘের এবং সেই সঙ্গে মার্ক্সবাদী আন্দোলনেরও উৎসাহী কর্মী। সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন অনেক কর্মী এই সময়েই ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

.....ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সম্পাদক রণেশ কুমার দাশগুপ্তের সঙ্গে একই পাড়ায় বাস করতাম। ইনি তখন ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'

 www.amarboi.com ~

পত্রিকায় কাজ করতেন। মার্ক্সবাদী সাহিত্য সম্পর্কে তখনই তাঁর প্রচুর পড়াশুনো ছিল এবং আমরাও তাঁর কাছ থেকে বইপত্র এনে পড়তাম। এখন যেমন সর্বত্র প্রগতিশীল বইপত্র পাওয়া যায় এবং কিনেও পড়া যায়, তখন এরকম সুযোগ ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি তখন পর্যন্ত বে-আইনী এবং যে কোনো সময় যে কোনো অজুহাতে গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনাও বড় অল্প ছিল না। নতুন লেখকদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা থাকায় রণেশবাবু প্রস্তাব করলেন ঐ ধরনের একটি সংকলন যেন আমরা ঢাকা থেকে প্রকাশ করি। আরও স্থির হল যে, ঢাকা জেলা 'প্রগতি লেখক সংঘে'র লেখকরাই শুধু ঐ সংকলনে লিখবেন। তদনুযায়ী ১৯৪০ সালে বেরোলো 'ক্রান্তি' নামের ১৬০ পাতার একটি সংকলন। লেখক-সূচির অন্যতম ছিলেন : রণেশকুমার দাশগুপ্ত, সোমেন চন্দ, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সরলানন্দ সেন ও আরও কেউ কেউ। প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিপোষক এরূপ একটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ সাড়া পড়ে যায় এবং কলকাতার লেখক সমাজও এই লেখকগাষ্ঠীকে স্বাগত জানান। ঢাকা 'প্রগতি লেখক সংঘে'র পক্ষ থেকে সোমেন চন্দ এই গ্রন্থের প্রকাশক হয়েছিলেন। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গল্প 'বনস্পতি' এই সংকলনেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংকলনটি বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কয়েকজন নতুন লেখককে আমরা সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলাম। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জীবন চক্রবর্তী ও রণেন মজুমদার'।...

কোলকাতা থেকে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'প্রগতি' প্রকাশিত হয়। এ ধরনের একটি উন্নতমানের পত্রিকা ঢাকা এসে সকলেই এর প্রশংসা করে। এবং এখানকার প্রগতিপন্থীরা এ প্রসঙ্গে সোমেনকে অনুপ্রাণিত করে এ ধরনের একটি সংকলন প্রকাশের জন্য। এই উদ্যোগেই স্বয়ং সোমেনের সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় 'ক্রান্তি' নামক উন্নতমানের সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের জন্য সোমেন পার্টির কাজ, শ্রমিক ইউনিয়নের কাজও অন্যান্য কাজের সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করে 'ক্রান্তি' প্রকাশ করেছিলেন। লেখা সংগ্রহ এবং ছাপাখানার দায়িত্বও সোমেনই গ্রহণ করেছিলেন।

'ক্রান্তিকে' সোমেন নিজের সন্তান এবং নিজকে পিতা মনে করতেন। এ বিষয়ে তিনি অচ্যুত কুমার গোস্বামীকে এক চিঠিতে জানান—

'সন্তান সম্বন্ধে আপনার কোনো উদ্বেগের কারণই নেই, কারণ পিতা হয়ে আমার দায়িত্ব বড় কম নয়। সে যথারীতি বেড়ে উঠছে এবং ভূমিষ্ঠ-সম্ভাবনা পূর্ব-নির্ধারিত সময়েই হবে আশা করি। তাকে ভালোবাসি বলে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। দু'বেলা তো যেতে হচ্ছেই, তাছাড়া রণেশবাবুকে প্রুফ দেখানো, লেখা সংগ্রহ করা ইত্যাদি। অতএব মহাশয় কেবল উদ্বেগে অধীর না হয়ে কিছু কাজের ভারও গ্রহণ করুন এসে, অমন পথে বসিয়ে পালানো চলবে না।

.....কে নিয়ে মুস্কিলে পড়া গেছে, তিনি কী রকম লেখা দেন সেই ভয়ে সবিশেষ চিন্তিত আছি। আপনি যতজন সাহিত্যিকের বাড়ি পারেন Raid করে আসবেন এবং আমাদের সন্তান—সম্ভাবনাকে সবিস্তারে জানিয়ে আসবেন। হীরেন মুখার্জী এবং সুরেন গোস্বামীর ঠিকানা যে কোনো উপায়ে সংগ্রহ করে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে আসতে পারলে ভালো হয়'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৯৩www.amarboi.com ~

'প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'ক্রান্তি' পত্রিকা সোমেনের জীবনের এক অনন্য কীর্তি। ১৯৪০ সালের শেষের দিকে প্রগতি লেখক সংঘের সদস্যরা ক্রান্তি প্রকাশ করে। এরপূর্বে বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো প্রগতিশীল পত্রিকা প্রকাশ হয় নি। সোমেন একশো কপি 'ক্রান্তি' নিয়ে কলকাতা যান এবং সেখানে প্রগতিশীল মহলে 'ক্রান্তি' বিপুল সাড়া জাগায়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র সরকারের মন্তব্য আমি উপস্থাপন করছি—

'মানবতাবাদী প্রগতিশীল লেখকদের উদ্যোগে ১৯৩৯-এর মাঝামাঝি ঢাকায় 'প্রগতি লেখক-শিল্পী সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সংঘের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় সোমেন চন্দের বাড়িতেই। ১৯৪০ সালের শেষদিকে ঢাকার লেখক সংঘের কর্মীরা 'ক্রান্তি' নামের একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন—এটাই পূর্ব বাংলার প্রথম প্রগতিশীল সাহিত্য-সংকলন। সোমেন চন্দ ছিলেন এই সংকলনের প্রকাশক। ১৯৪০-এর শেষে শ'খানেক 'ক্রান্তি' নিয়ে সোমেন কলকাতা যান—উদ্দেশ্য কলকাতার সাহিত্যিক মহলে এর প্রচার। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ক্রান্তি' দেখে কলকাতার প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে সৃষ্টি হয়েছিল যথেষ্ট আলোড়ন'।

[আগুনের অক্ষরে 'সোমেন চন্দ স্মারক গ্রন্থ', সম্পাদনা—পবিত্র সরকার]

'ক্রান্তি' ছিল ১৬০ পৃষ্ঠার একটি সংকলন গ্রন্থ। যাদের লেখা নিয়ে ক্রান্তির আত্মপ্রকাশ তারা হলেন সোমেন চন্দ, রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেন গুপ্ত ও সরলানন্দ সেন।

ক্রান্তির প্রকাশকও ছিলেন স্বয়ং সোমেন চন্দ। ঢাকার সবচেয়ে বিখ্যাত ও নান্দনিক বিভার বিভূষিত এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত বাড়ি ছিলো রূপলাল হাউস। রূপলাল হাউস থেকে 'শান্তি' নামে বিখ্যাত একটি পত্রিকা বের হতো। এ পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪৭ সংখ্যার (পৃষ্ঠা ২৮৫-৮৬) ক্রান্তির একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন যোগেশচন্দ্র দেব ও সহ সম্পাদক ছিলেন তারকনাথ দাস। 'শান্তিতে' প্রকাশিত ক্রান্তির সমালোচনাটি এখানে তুলে ধরছি—

ক্রান্তি (সংকলন গ্রন্থ—ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষ থেকে প্রকাশিত। ১৪০ পৃষ্ঠা, দাম: আট আনা)

এক বছর হলো ঢাকা সহরে প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপিত হয়েছে। এই বইয়ে যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছে তাঁরা সকলেই ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক-সংঘের সভ্য। গত এক বছরে মূল প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে এঁরা যে ধরনের লিখতে চেষ্টা করেছেন এই সংকলনে প্রকাশিত রচনার থেকে সেই ধারারই একটা পরিচয় পাওয়া যাবে'।

'ক্রান্তি'তে মোট তিনটি প্রবন্ধ, দশটি কবিতা এবং চারটি গল্প স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলোর মধ্যে রণেশকুমার দাশগুপ্তের 'নতুন দৃষ্টিতে উপন্যাস' এবং অচ্যুত গোস্বামীর 'বাংলা কাব্যের গতি' সুলিখিত হয়েছে। এই প্রবন্ধ দুটিতে প্রগতিশীলতার কষ্টি-পাথরের প্রাচীন, আধুনিক এবং অতি সাম্প্রতিক উপন্যাস ও কবিতার যে মূল্য বিচার করা হয়েছে সেরূপ আলোচনা বড় একটা নজরে পড়ে না। যাঁরা অতি সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে মতামত গঠন করতে চান এ দুটি প্রবন্ধ পড়লে তাঁরা উপকৃত হবেন একথা জোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৭৪ www.amarboi.com ~

দিয়েই বলা যেতে পারে। এছাড়া নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামীর 'সাহিত্যে সৌন্দর্যবাদ' প্রবন্ধটিও উপাদেয়। এ প্রসঙ্গে তিনি যেরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, অতুল গুপ্ত, অজিত চক্রবর্তী প্রভৃতির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং 'পরিচয়', 'কবিতা', 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'পূর্ব্বাশা, 'চতুরঙ্গ' ইত্যাদি সাময়িক পত্রের দলীয় আদর্শের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন তা, যেমনই বিচিত্র তেমনি চিত্তাকর্ষক। কবিতাগুলোর মধ্যে অ্যামেরিকার কবি চাল্‌স হেনরী নিউম্যানের দুটি কবিতার অনুবাদ চমৎকার হয়েছে। এরূপ মূল্যবান অনুবাদ আরও যত করা যায় ততই ভালো। মৌলিক কবিতাগুলোর মধ্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা তিনটি তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছে। এছাড়া অমৃতকুমার দত্ত, গৌরপ্রিয় দাশগুপ্ত, অনিল চক্রবর্তী প্রভৃতির কবিতাও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। আর গল্পগুলোর মধ্যে সোমেন চন্দের 'বনস্পতি'কে অনায়াসেই এ বছরের একটি শ্রেষ্ঠ গল্পের সম্মান দেওয়া যায়। দৃষ্টিভঙ্গি, বিষয়বস্তুর অভিনবতা এবং ভাষার সংযম এই গল্পটিকে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। চীন দেশের বিখ্যাত লেখক চাং টিয়েন ইর গল্পের অনুবাদ এই বইয়ের অন্যতম আকর্ষণ। হিমাংশু রায় ও ভবানীপ্রসাদ দত্তের গল্প দুটিও মন্দ নয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে 'ক্রান্তি' প্রকাশ করে এই যুদ্ধের বাজারে অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের হাত থেকে নিস্তার না পেলেও ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সংঘের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এক বছরের মধ্যে সাহিত্যের বিভাগে তাঁরা যে তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন তা' অনেকেরই দৃষ্টান্তস্থল হতে পারে। বইয়ের উৎকর্ষতার তুলনায় আট আনা দাম খুবই কম। আমরা এই বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

'প্রগতি লেখক সংঘের' মতো এমন একটি সংগঠন পরবর্তীকালে এবং এখনও গড়ে 'ওঠেছে কি-না তা ভাববার ও গবেষণার বিষয়। সোমেন চন্দ তার সমস্ত সত্তাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন প্রগতি লেখক সংঘের জন্য।

সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর 'প্রগতি লেখক সংঘে' ভাঁটা পড়েছে এমন নয় বরং সোমেনের স্মৃতিতে বক্ষে ধারণ করা পতাকা বিজয়গর্বে ও গৌরবে ঊর্ধ্বাকাশে উড়েছে।

সোমেনের মৃত্যুর পর প্রগতি লেখক সংঘকে যারা উজ্জ্বল করে রাখার চেষ্টা করেছেন তারা হলেন—

সত্যেন সেন, সরলানন্দ সেন, অমিত সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, অজিত কুমার গুহ, মুনীর চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সরদার ফজলুল করিম, সৈয়দ নূরুদ্দিন, সানাউল হক, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, রমেশ মজুমদার প্রমুখ।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুনীর চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ ও পৃথ্বীশ চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠভাবে 'প্রগতি লেখক সংঘের' সাথে যোগাযোগ রাখতেন। বিশেষ করে মুনীর চৌধুরী এই সংঘের আসরে লেখা পাঠ করতেন এবং রণেশ দাশগুপ্ত লেখার আগ্রহের সাথে আকর্ষণীয় সমালোচনা করতেন।

'প্রগতি লেখক সংঘ' ও প্রগতিশীলদের সাথে এই যোগাযোগের কারণেই মুনীর চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ ও পৃথ্বীশ চক্রবর্তী একাধিকবার কারাবরণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৯৫www.amarboi.com ~

মার্কসবাদ ও সোমেন চন্দ

সোমেন চন্দের সাহিত্য নিয়ে আলোচনার আগে মার্কসীয় সাহিত্য নিয়ে সামান্য ধারণা নেবার প্রয়োজন আছে। সামন্ত, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্যের ধারাটাই বদলিয়েছে মার্কসিজম। আসলে মার্কসবাদী চিন্তাধারা ও রুশ বিপ্লব শুধু সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয় শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এতোদিন পর্যন্ত সাহিত্য ও শিল্পে যে কলাকৈবল্যবাদ, বিশুদ্ধ নান্দনিকতা, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ ও উপরওয়ালার যে প্রশস্তির দুর্গ তৈরি হয়েছিলো—মার্কসবাদী ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী শিল্পীরা এই দুর্গে শৈল্পিক হাতুড়ির আঘাত হানলেন। এবং তাদের এই হাতুড়ির আঘাতে এই রাজকীয় দুর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। সাহিত্যে এসে হাজির হলো নতুন মানুষ ও নতুন মুখ।

সোমেন চন্দরাই এই দুর্গে প্রথম আঘাত হানলেন এবং আমাদের সামনে মানবতাবাদী সাহিত্য, মেহনতি মানুষের সংগ্রামে প্রত্যয়ী আর এক সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিলেন।

সিদ্ধার্থ সাহা 'সোমেন চন্দের গল্প' নামক একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধে সোমেনের গল্পকে বোঝাবার জন্য যথার্থভাবেই মাও সে তুং এর 'ইয়েনান টক' নামে বিখ্যাত ভাষণের উল্লেখ করেছেন। সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে এই ভাষণ বিশ্বে এক মৌলিক ও যুগান্তকারী ভাষণ। বিপ্লবী সাহিত্য, প্রগতি সাহিত্য, গণ সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি এই ভাষণে তা স্পষ্ট করে বিশ্লেষিত ও আলোচিত হয়েছে। সিদ্ধার্থ বাবুর বরাতে এই ভাষণ আমরা উপস্থাপন করছি—যাতে করে সোমেনের গল্প ও সাহিত্য চিন্তা সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা লাভ করতে পারি।

ভাষণ এই পাঁচটি অংশে বিভক্ত। (৪) চিহ্নিত অংশটুকু আমাদের ক্ষেত্রে একান্তই প্রয়োজনীয় ব'লে তার সবটুকু নিচে উপস্থাপন করছি—মনে রাখতে হবে সমস্ত বক্তব্যই সংগ্রামী ও বিপ্লবী তথা নতুন সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্যের জন্য যাঁরা সাহিত্য করেন, বা রস সৃষ্টির তথাকথিত উন্মাদনায় আকণ্ঠভাবে ডুবে আছেন/থাকেন যাঁরা, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই এর বহির্ভূত—শুধু তা-ই নয়, আক্রমণের লক্ষ্যস্থলও বটেন। স্মর্তব্য যে, মাও সেতুং নিজেও সার্থক কবি ছিলেন।

"সাহিত্য ও শিল্পকলার জগতে শিল্প-সাহিত্যের সমালোচনা হচ্ছে সংগ্রামের অন্যতম প্রধান উপায়। শিল্প-সাহিত্যের সমালোচনা আরও ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত। আমাদের অনেক কমরেড ঠিকই উল্লেখ করেছেন যে, এক্ষেত্রে অতীতে আমরা যা করেছি তা নিতান্তই অপ্রতুল। শিল্প-সাহিত্যের সমালোচনা একটা জটিল সমস্যা, এ সমস্যাটি নিয়ে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন। এখানে আমি শুধু সমালোচনার মানদণ্ডের মূল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব। সেই সঙ্গে কমরেডদের তরফ থেকে উত্থাপিত কোনো কোনো বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে এবং কোনো কোনো ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও আমি সংক্ষেপে আমার মতামত প্রকাশ করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৬www.amarboi.com ~

সাহিত্য ও শিল্পকলার সমালোচনার দু'টি মানদণ্ড আছে—একটা রাজনৈতিক মানদণ্ড, অন্যটা শিল্পগত মানদণ্ড। রাজনৈতিক মানদণ্ড অনুসারে যা কিছুই জাপবিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও ঐক্যের সহায়ক এবং যা কিছুই জনতাকে একপ্রাণ একমন হ'তে উদ্বুদ্ধ করে, পশ্চাদ্বর্তীতার বিরোধিতা করে, আর অগ্রগতিকে দ্রুততর করে—সেটাই ভালো; অপরপক্ষে যা-কিছুই প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এবং যা কিছুই জনগণের মধ্যে বিরোধ ও নিরুৎসাহের সৃষ্টি করে, অগ্রগতিকে বাধা দ্যায়, আর জনতাকে পিছনে টানে—সেটাই খারাপ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী দেখে আমরা ভালোমন্দ বিচার করব? উদ্দেশ্য (আত্মগত অভিলাষ) দেখে—না, ফল (সামাজিক অনুশীলন) দেখে? ভাববাদীরা উদ্দেশ্যের ওপরেই বেশি জোর দেয়, আর ফলাফলটাকে অবহেলা করে; যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা ফলাফলের উপরে বেশি জোর দেয়, উদ্দেশ্যকে অবহেলা করে। আমরা এই দুইয়েরই বিপরীত। আমরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী, আমরা উদ্দেশ্য আর ফলাফলের সমন্বয়কেই কেবল স্বীকার করি, জনতার জন্যে কাজ করার উদ্দেশ্যকে জনগণের অনুমোদন লাভের ফলাফল থেকে আলাদা করা যায় না। এই দুইয়ের মধ্যে অবশ্যই ঐক্য স্থাপন করতে হবে। ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো ক্ষুদ্র চক্রের সেবা করার মনোবৃত্তি ভালো নয়; অপরদিকে, জনসাধারণের অনুমোদন লাভ না ঘটলে এবং তাঁদের উপকার করা না গেলে কেবল তাঁদের সেবা করার মনোবৃত্তিও ভালো নয়। একজন লেখক বা শিল্পীর আত্মমুখী অভিলাষ অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যটা সঠিক কি-না, সৎ কি-না—তা বিচার করার সময়ে, তিনি নিজে যে উদ্দেশ্য' ঘোষণা করেন তার উপর নির্ভর করলে চলবে না; সমাজের ও জনসাধারণের ওপর তাঁর কাজের (প্রধানত তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পকলার) ফল কী দাঁড়াচ্ছে—সেইটাই বিশ্লেষণ করতে হবে। আত্মমুখী অভিলাষকে বা উদ্দেশ্যকে বিচার করার মানদণ্ড হচ্ছে সামাজিক অনুশীলন আর তার ফলাফল। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত সমালোচনার মধ্যে আমরা সংকীর্ণতাবাদের প্রশ্রয় দিতে চাইনে। জাপবিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সাধারণ নীতির ভিত্তিতে সব ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিবিশিষ্ট শিল্পকর্ম সাহিত্য-রচনাকে আমাদের অবশ্যই সহ্য করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সমালোচনার ক্ষেত্রে নীতির প্রশ্নে আমাদের অটল থাকতে হবে—এবং যেসব শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে জাতিবিরোধী, বিজ্ঞানবিরোধী, জনগণবিরোধী, ও কমিউনিস্ট পার্টিবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়—সেই সমস্ত শিল্প-সাহিত্যকে আমাদের কঠোর সমালোচনা করতে হবে এবং তা খণ্ডন করতে হবে। কারণ এই ধরনের তথাকথিত শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও ফলাফল উভয়ই জাপবিরোধী ঐক্যের ক্ষতি সাধন করে। শিল্পগত মানদণ্ডের দিক থেকে বলতে গেলে, অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের শিল্পগত গুণ যেসব রচনায় আছে সেসব রচনা ভাল, কিংবা অপেক্ষাকৃতভাবে ভালো; আর যেগুলোর শিল্পগত গুণ অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের, সেগুলো খারাপ কিংবা অপেক্ষাকৃতভাবে খারাপ। কিন্তু এক্ষেত্রেও সমাজে এগুলো কী ফলাফল সৃষ্টি করে তা অবশ্য লক্ষ্যণীয়। নিজের সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যকে সুন্দর মনে করেন না এমন শিল্পী-সাহিত্যিক সাধারণত দ্যাখা যায় না। তাই আমাদের সমালোচনায় সব ধরনের শিল্প-সাহিত্যেরই স্বাধীন প্রতিযোগিতার স্বীকৃতি থাকা উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে সৌন্দর্য-বিজ্ঞানের মাপকাঠি অনুযায়ী সঠিকভাবে এগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমালোচনা করারও একান্ত দরকার, যাতে এই উপায়ে অপেক্ষাকৃত নিচুমানের শিল্প-সাহিত্যকে ক্রমশ অপেক্ষাকৃত উঁচুস্তরে তোলা যায়; আর জনগণের সংগ্রামের দাবি মেটাতে পারে না, এমন শিল্পকে জনগণের সংগ্রামের দাবি মেটাতে সক্ষম এমন শিল্পে রূপান্তরিত করা যায়।

রাজনৈতিক মানদণ্ড আছে, আবার শিল্পগত মানদণ্ডও আছে—এ দুটির মধ্যকার সম্পর্ক কী? রাজনীতি—শিল্পকলার সমতুল্য নয়। সাধারণ বিশ্ব-দৃষ্টিকোণও—শিল্পকলার সৃষ্টি ও সমালোচনার পদ্ধতির সমতুল্য নয়। আমরা বিমূর্ত ও সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয় শিল্পগত মানদণ্ডকেও অস্বীকার করি, তেমনি বিমূর্ত ও সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয় শিল্পগত মানদণ্ডকেও অস্বীকার করি; প্রত্যেকটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ও শিল্পগত মানদণ্ড আছে। কিন্তু যে কোনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজের যে কোনো শ্রেণীই সর্বদা রাজনৈতিক মানদণ্ডকে প্রথমে স্থান দিয়ে থাকে এবং শিল্পগত মানদণ্ডকে স্থান দ্যায় তার পরে। সর্বহারাশ্রেণীর সাহিত্য ও শিল্পকলায় যত উঁচুমানের শিল্পগত গুণই থাকুক না কেন, বুর্জোয়াশ্রেণী সেই শিল্প-সাহিত্যকে সবসময় বাতিল ক'রে দ্যায়। সর্বহারাশ্রেণীরও তেমনি অবশ্যই অতীতের সাহিত্য ও শিল্পকলার বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে সর্বপ্রথমে জনগণের প্রতি সেগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি কী এবং ইতিহাসে সেগুলোর প্রতি সর্বহারাশ্রেণীর মতামত গঠন করতে হবে। রাজনৈতিক দিক থেকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল কোনো কোনো রচনাতেও কিন্তু শিল্পগুণ থাকা সম্ভব হ'তে পারে। সেগুলোর বিষয়বস্তু যতই বেশি প্রতিক্রিয়াশীল আর সেগুলোর শিল্পগত গুণ যতই বেশি উচ্চতর হবে, জনগণের ক্ষতি করার ক্ষমতা সেগুলোর ততই বেশি। সুতরাং এই ধরনের রচনাকে বর্জন করার প্রয়োজনও সেই অনুপাতে অধিকতর। ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় নিপতিত শোষকশ্রেণীগুলোর শিল্প-সাহিত্যের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—সেগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে সেগুলোর শিল্পরূপের স্ববিরোধ। আমাদের দাবি হচ্ছে—রাজনীতি ও শিল্পকলার একত্ব, অন্তর্বস্তু ও রূপের একত্ব, বিপ্লবী রাজনৈতিক অন্তর্বস্তু ও যথাসম্ভব নিখুঁত শিল্পরূপের একত্ব। শিল্পকর্ম রাজনৈতিক দিক থেকে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন তাতে শিল্পগত গুণাবলির অভাব থাকলে তা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অতএব আমরা যেমন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের দিক থেকে ভুল এমন শিল্পকর্মের বিরোধিতা করি, তেমনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের দিক থেকে নির্ভুল কিন্তু শিল্পকর্মে শক্তিহীন এমন 'প্রচারপত্র ও স্লোগান-সর্বস্ব রীতি'র প্রতি ঝোঁকেরও বিরোধিতা করি। সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রশ্নে আমাদের অবশ্যই দুই ফ্রন্টেই সংগ্রাম চালাতে হবে।

এই দুই ধরনের ঝোঁকই আমাদের অনেক কমরেডের চিন্তায় দ্যাখা যায়। অনেক কমরেডই শিল্প-কৌশলকে অবজ্ঞার চোখে দ্যাখেন, সেইজন্য শিল্পমান উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি বর্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক সমস্যাটাই বেশি প্রবল। কিছু সংখ্যক কমরেডের রাজনীতির মূলগত সাধারণ জ্ঞানটুকুরও অভাব আছে, যার ফলে তাঁদের মনে সব রকম ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। ইয়েনানের অভিজ্ঞতা থেকে এই ধরনের চিন্তাধারার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি।

'মানব-প্রকৃতি তত্ত্ব' : মানব-প্রকৃতি ব'লে কি কিছু আছে? নিশ্চয় আছে। কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে কেবলমাত্র বাস্তবে, বিমূর্ত মানব-প্রকৃতি ব'লে কিছু নেই। শ্রেণীবিভক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

সমাজে শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানব-প্রকৃতি রয়েছে, শ্রেণী-উর্ধ্ব কোনো মানব-প্রকৃতি নেই। আমরা সর্বহারাশ্রেণীর ও ব্যাপক জনসাধারণের মানব-প্রকৃতির ধারক, আর জমিদার ও বুর্জোয়ারা জমিদারশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মানব-প্রকৃতির ধারক; খোলাখুলিভাবে তারা এ-কথা বলে না, কিন্তু আসলে তারা তাদের নিজ নিজ মানব-প্রকৃতিকেই একমাত্র মানব-প্রকৃতি ব'লে প্রতিপন্ন ক'রে থাকে। কোনো কোনো পাতি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী যে মানব-প্রকৃতির গুণগান ক'রে থাকে—তাও—হয়, ব্যাপক জনসাধারণ থেকে বিচ্যুত—না হয়, জনসাধারণ-বিরোধী। তারা যে মানব-প্রকৃতির কথা বলে, প্রকৃতপক্ষে তা বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তিত্ববাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেজন্যই তাদের চোখে সর্বহারাশ্রেণীর মানব-প্রকৃতি হলো মানব-প্রকৃতির বিপরীত। এখন ইয়েনানে কেউ কেউ এইভাবেই চিন্তা ক'রে থাকে, এবং তারা যে 'মানব-প্রকৃতি তত্ত্ব'কে শিল্প-সাহিত্যের তথাকথিত তাত্ত্বিক ভিত্তি ব'লে প্রচার করে—তা সম্পূর্ণ ভুল।

'সাহিত্য ও শিল্পের গোড়ার কথা ভালোবাসা—মানবজাতির ভালোবাসা' : ভালোবাসা গোড়ার কথা হ'তে পারে বটে কিন্তু আরো একটি বুনিয়াদি গোড়ার কথা আছে। ভালোবাসা এমন একটি ধারণা যার উৎপত্তি বাস্তব-অনুশীলন থেকে। মূলত কোনো ধারণা থেকে আমরা আরম্ভ করিনে, করি বাস্তব-অনুশীলন থেকে। আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকরা যাঁরা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকে এসেছেন তাঁরা সর্বহারাদেরকে ভালোবাসেন—কারণ সমাজই তাঁদের মধ্যে এই ধারণা জন্মে দিয়েছে যে, তাঁদের এবং সর্বহারাদের ভাগ্য এক। আমরা জাপানি-সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করি, কারণ জাপানি-সাম্রাজ্যবাদ আমাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। সম্পূর্ণ অকারণ ভালোবাসা কিংবা অকারণ ঘৃণা বলতে পৃথিবীতে কিছু নেই। তথাকথিত 'মানবজাতির প্রতি ভালোবাসা' সম্পর্কে বলা যায় যে, যেদিন থেকে মানবজাতি শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে সেদিন থেকেই সর্বাত্মক ভালোবাসা ব'লে কিছুই নেই। অতীতের সকল শাসকশ্রেণীই এই ধরণের ভালোবাসার বাণী প্রচার করছে, আর অনেক তথাকথিত ঋষি ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও একই কথা ব'লে গেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কেউই বাস্তব-জীবনে তার অনুশীলন করেননি, কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সেটা অসম্ভব। মানবজাতির প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা তখনই সম্ভব হবে, যখন সমগ্র বিশ্বজুড়ে শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। শ্রেণীভেদ—সমাজকে পরস্পরবিরোধী অনেক দলে বিভক্ত করেছে; শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার পরই একমাত্র সমগ্র মানবজাতির প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে, কিন্তু বর্তমানে তা সম্ভব নয়। আমরা শত্রুদেরকে ভালোবাসতে পারিনে, সামাজিক কদর্যতাকে ভালোবাসতে পারিনে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এসব জিনিস খতম করা। এটা একটা সাধারণ জ্ঞানের কথা। আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে এমনকি কেউ আছেন যিনি এখনও একথা বুঝেন না?

'সাহিত্য ও শিল্পকলায় সব সময় উজ্জ্বল ও অন্ধকার উভয়দিকের উপরেই সমান জোর দেওয়া হয়েছে, উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে।'—এই মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে অনেকগুলো ভ্রান্ত ধারণা। সাহিত্য ও শিল্পকলা যে সবসময় এরকম করেছে সে কথা সত্য নয়। পাতি-বুর্জোয়া লেখকদের অনেকেই উজ্জ্বল দিকের সন্ধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~www.amarboi.com ~

কখনও পাননি; তাঁরা অন্ধকার দিকটার উদ্‌ঘাটন করেছেন; সেগুলো 'স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সাহিত্য' ব'লে পরিচিত। তাঁদের কোনো কোনো রচনা কেবল দুঃখবাদ ও জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রচার করেছে। এর বিপরীতে, সমাজতান্ত্রিক গঠনের যুগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহিত্যে প্রধানত উজ্জ্বল দিকটাই প্রকাশ পেয়েছে। এতেও ত্রুটির দিকটা দ্যাখানো হয়েছিল এবং তুলে ধরবার পটভূমি হিসেবে, তথাকথিত ভালোমন্দকে 'সমান সমানভাবে' চিত্রিত করার জন্য নয়। প্রতিক্রিয়াশীল যুগে বুর্জোয়া শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিপ্লবী-জনসাধারণকে আখ্যা দিত দাঙ্গাকারী জনতা ব'লে, আর নিজেদের জাহির করত সাধু-সন্ন্যাসী হিসেবে। এভাবে তারা উজ্জ্বলতাকে দ্যাখায় অন্ধকার হিসেবে এবং অন্ধকারকে দ্যাখায় উজ্জ্বলতা হিসেবে। কিসের গুণগান করতে হবে আর কিসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে হবে সে সমস্যাটা নির্ভুল সমাধান দিতে পারেন একমাত্র প্রকৃত বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকরাই। যেসব অশুভ শক্তি জনসাধারণকে ক্ষতি করে, সেগুলোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে হবে এবং জনসাধারণের সমস্ত বিপ্লবী-সংগ্রামের গুণগান করতে হবে। বিপ্লবী-সাহিত্যিকদের এই হচ্ছে মৌলিক কর্তব্য।

'শিল্প-সাহিত্যের কাজ সমসময় স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা' : উল্লিখিত মন্তব্যটির মতোই এ-মন্তব্যও ইতিহাস-বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রকাশ করে। শিল্প-সাহিত্য যে কেবলমাত্র স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার কাজেই নিয়োজিত থাকে না, তা একটু আগেই দ্যাখানো হয়েছে। বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকদের লক্ষ্য জনসাধারণকে উদ্‌ঘাটন করা নয়, বরং তাঁদের লক্ষ্য হলো কেবলমাত্র আক্রমণকারীদের, শোষক ও নিপীড়নকারীদের এবং জনগণের উপর তাদের অশুভ প্রভাবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। জনসাধারণেরও নিজস্ব ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে; এসব ত্রুটিবিচ্যুতি জনগণের অভ্যন্তরীণ সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে শুধরে নেওয়া উচিত। এই ধরণের সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাও শিল্প-সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর অন্যতম। কিন্তু এটাকে কখনো, এক ধরণের 'জনগণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন' ব'লে মনে করা উচিত নয়। জনগণের বেলায় প্রশ্নটা মূলত তাঁদের শিক্ষিত ক'রে তোলা ও তাঁদের সাংস্কৃতিক মানকে উন্নত করার প্রশ্ন। কেবলমাত্র প্রতিবিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকরা জনগণকে 'জন্ম-নির্বোধ' এবং বিপ্লবী-জনসাধারণকে 'স্বৈরাচারী দাঙ্গাবাজ' ব'লে বর্ণনা করে।

'এখনও ব্যঙ্গ রচনারই যুগ চলছে এবং লু স্যুনের রচনারীতিরই এখনও প্রয়োজন রয়েছে।'—অন্ধকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির শাসনে বাস ক'রে, বাক্‌স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়ে, সংগ্রাম চালাবার জন্য লু স্যুন প্রবন্ধের আকারে চরম ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কশাঘাত হেনেছিলেন। তা ক'রে তিনি সম্পূর্ণ নির্ভুল কাজ করেছিলেন। আমাদেরও অবশ্য ফ্যাসিবাদীদের প্রতি, চীনের প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি, এবং জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর সমস্ত কিছুর প্রতি তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু সেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ও শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত জাপবিরোধী ঘাঁটি এলাকাগুলোতে কেবলমাত্র প্রতিবিপ্লবীদের ছাড়া সকল বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকদের পরিপূর্ণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই এইসব অঞ্চলে রচনারীতি কেবলমাত্র লু স্যুনের রীতির অনুসারী হলে চলবে না। এসব জায়গায় আমরা সোচ্চারে নির্দ্বিধায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮০www.amarboi.com ~

কথা বলতে পারি; এখানে আমাদের আবরণ সৃষ্টি ক'রে কিংবা ঘুরিয়ে-প্যাচিয়ে এমনভাবে কথা বলার প্রয়োজন হয় না, যা জনগণের পক্ষে দুর্বোধ্য। 'ব্যঙ্গ রচনার যুগেও' লু স্যুন যখন জনগণের শত্রুদের নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে জনসাধারণের জন্যই লিখেছিলেন—তখন, কখনও তিনি বিপ্লবী-জনসাধারণ আর বিপ্লবী-পার্টিগুলোর প্রতি বিদ্রুপ বা আক্রমণ করেননি, এবং এসব রচনার রীতি শত্রুদের বিরুদ্ধে রচিত রচনার রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। জনগণের ত্রুটির সমালোচনা করা প্রয়োজন একথা আগেই বলেছি, কিন্তু তা করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই সত্যিকারভাবে জনগণের পক্ষে দাঁড়াতে হবে এবং তাঁদেরকে রক্ষা করার জন্য ও শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্য প্রাণঢালা আগ্রহের সাথে কথা বলতে হবে। কমরেডদের সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করার অর্থ শত্রুদের পক্ষে চ'লে যাওয়া। তাহলে কি আমরা ব্যঙ্গ রচনাকে বাদ দেব? না, ব্যঙ্গ রচনার সবময়ই প্রয়োজনীয়। কিন্তু বিভিন্ন ধরণের ব্যঙ্গ রচনা আছে : শত্রুদের উদ্দেশ্যে, মিত্রদের উদ্দেশ্যে ও আমাদের নিজস্ব লোকদের উদ্দেশ্যে রচিত ব্যঙ্গ রচনা। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভিন্ন রকমের, বিভিন্ন ধরণের ব্যঙ্গ রচনায় বিভিন্ন মনোভাবের প্রয়োজন। আমরা সাধারণভাবে বিদ্রুপাত্মক রচনার বিরোধিতা করিনে, কিন্তু এর অপব্যবহারকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

'গুণগান করা ও গৌরব বর্ণনা করা আমার কাজ নয়' : যাঁরা উজ্জ্বল দিকের গুণগান করেন তাঁদের সৃষ্টি যে মহৎ একথা নিশ্চিত নয়, আর যাঁরা অন্ধকার দিককে চিত্রিত করেন তাঁদের সৃষ্টি যে নিকৃষ্ট একথাও নিশ্চিত নয়। আপনি যদি বুর্জোয়াশ্রেণীর শিল্পী বা সাহিত্যিক হন, তাহলে স্বভাবতই সর্বহারাদের জয়গান করবেন না, বরং বুর্জোয়াদেরই জয়গান করবেন। আপনি যদি সর্বহারাশ্রেণীর শিল্পী বা সাহিত্যিক হন, তাহলে আপনি স্বভাবতই বুর্জোয়াদের জয়গান করবেন না, বরং জয়গান করবেন সর্বহারাদের ও মেহনতী জনগণের। আপনাকে—হয় এটা, নয় তো ওটা—হ'তেই হবে। যাঁরা বুর্জোয়াশ্রেণীর উজ্জ্বল দিকের জয়গান করেন তাঁদের সৃষ্টি যে মহৎ এ-কথা নিশ্চিত নয়, আবার যারা বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্ধকার দিককে চিত্রিত করেন তাঁদের সৃষ্টি যে নিকৃষ্ট এ কথাও নিশ্চিত নয়, যাঁরা সর্বহারশ্রেণীর উজ্জ্বল দিকের জয়গান করেন তাদের রচনা স্বভাবতই মহৎ নয় এ কথা নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না, কিন্তু যাঁরা সর্বহারাশ্রেণীর তথাকথিত 'অন্ধকার দিককে' চিত্রিত করে তাঁদের রচনা অকিঞ্চিৎকর হ'তে বাধ্য। সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাস কি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করেনি? যে জনগণ মানবজাতির বিশ্ব-ইতিহাসের স্রষ্টা, তাঁদের জয়গান আমরা কেন করব না? সর্বহারাশ্রেণী, কমিউনিস্ট পার্টি, নয়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জয়গান কেন আমরা করব না? এক ধরণের লোক আছে—জনগণের স্বার্থ-রক্ষায় যারা কোনো উৎসাহবোধ করে না; সর্বহারাশ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনীর সংগ্রাম ও সাফল্যের প্রতি তারা নিস্পৃহ দর্শকের মনোভাব পোষণ করে। তারা শুধু নিজেদের প্রতিই আগ্রহশীল এবং নিজের মহিমা-কীর্তনে তারা কখনও ক্লান্ত হয় না। তাদের আগ্রহ বড় জোর নিজস্ব ক্ষুদ্র উপদলের অন্তর্ভুক্ত গুটিকতক ব্যক্তি পর্যন্ত সম্প্রসারিত। এই ধরণের পাতি-বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদীরা বিপ্লবী-জনগণের কৃতিত্ব ও গুণাবলির জয়গান করতে, বিপ্লবী জনগণের সংগ্রামে সাহস জোগাতে ও চূড়ান্ত

www.amarboi.com ~

বিজয়ের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে স্বভাবতই অনিচ্ছুক। এই ধরণের লোকেরা বিপ্লবী দলে আবর্জনাস্বরূপ; এ ধরণের 'গায়ক' বৈপ্লবিক জনগণের কাছে অবশ্যই অবাঞ্ছিত।

'সমস্যাটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির নয়, কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভুল, উদ্দেশ্য সৎ, বক্তব্য বোঝা গিয়েছে, কিন্তু আমি সুন্দর ক'রে প্রকাশ করতে পারিনে ব'লেই কেবল ফল হয়েছে খারাপ।' উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ কী, সে সম্পর্কে আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এখন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, ফলাফলের সমস্যাটা। দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা নয়? কোনো ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে কাজ করে, কিন্তু কাজের ফল কী হবে, সে সম্পর্কে আদৌ মাথা না ঘামায়, তাহলে তার কাজ হবে এমন একজন চিকিৎসকেল ব্যবস্থাপত্রের মতো, যে কেবল ব্যবস্থাপত্র লিখে দ্যায় অথচ তার ব্যবস্থা অনুযায়ী ঔষধ খেয়ে কত লোক মৃত্যুবরণ করে সে সম্পর্কে উদাসীন। অথবা, তুলনা স্বরূপ এমন একটা রাজনৈতিক পার্টির কথা ধরুন, যে পার্টি কেবল ঘোষণা প্রচার ক'রেই চলে, অথচ তা কার্যকরী করা হচ্ছে কি-না তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কি নির্ভুল? এ-ধরনের উদ্দেশ্যও কি সৎ? অবশ্য আগেই ফলাফলের কথা বিবেচনা করলেও ভুল হ'তে পারে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা যখন প্রমাণ ক'রে দ্যায় যে, নির্দিষ্ট পন্থায় ফল খারাপ হয়, তখনও যদি সেই পুরনো পন্থায় কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে উদ্দেশ্যকে কি সৎ বলা যায়? যখন আমরা কোনো রাজনৈতিক পার্টি অথবা কোনো চিকিৎসকের দোষগুণ বিচার করবো তখন আমাদের বিচার করতে হবে তার অনুশীলন এবং প্রকৃত কাজের বেলায় কী ফল পাওয়া গিয়েছে তারই ভিত্তিতে। লেখকের মূল্যায়নের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য সত্যি-সত্যিই সৎ তাঁকে অবশ্যই ফলাফল বিচার করতে হবে, অভিজ্ঞতার সার-সংকলন করতে হবে, কার্যপদ্ধতির পর্যালোচনা করতে হবে, আর সৃজনশীল রচনার বেলায়—প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে ভাবতে হবে। উদ্দেশ্য যাঁর প্রকৃতপক্ষে সৎ, তাঁকে অবশ্যই অকপটভাবে নিজ কর্মের ভুলত্রুটির সমালোচনা করতে হবে এবং সেগুলো সংশোধন করবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। ঠিক এ কারণেই কমিউনিস্টরা আত্মসমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগ করে। একমাত্র এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিই সঠিক। সেই সঙ্গে বাস্তব-অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ গুরুত্ব ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়েই কেবল সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বোঝায় তা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করা সম্ভব এবং ক্রমে ক্রমে তাকে ভালোভাবে আয়ত্তে আনা সম্ভব। কেউ যদি নিজের বাস্তব অনুশীলনে এই নীতি অনুসরণ না-করেন এবং কেবলমাত্র এই ব'লে আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে, তিনি 'সবকিছুই ঠিকমতো বুঝেন', তাহলে প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুই বুঝেননি।

'আমাদেরকে মার্ক্সবাদ অধ্যয়ন করার কথা বলা মানে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সৃজনশীল পদ্ধতির ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করা, এতে আমাদের সৃজনশীল মেজাজের ক্ষতি হবে।' মার্ক্সবাদ অধ্যয়নের অর্থ হচ্ছে পৃথিবীকে, সমাজকে, সাহিত্য ও শিল্পকলাকে পর্যবেক্ষণ করার সময় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণকে প্রয়োগ করা; এর অর্থ এই নয় যে, সাহিত্য ও শিল্পকলায় দার্শনিক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করতে হবে। সৃষ্টিশীল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮২www.amarboi.com ~

সাহিত্য ও শিল্পের বাস্তববাদ মার্ক্সবাদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মার্ক্সবাদ তার স্থান গ্রহণ করতে পারে না; ঠিক তেমনি পদার্থবিদ্যার আণবিক ও ইলেকট্রনিক তত্ত্ব মার্ক্সবাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তাই ব'লে মার্ক্সবাদ তার স্থান দখল করতে পারে না।, অন্তঃসারশূন্য, বিশুষ্ক গোঁড়া ফর্মুলা সৃজনশীল মেজাজকে বাস্তবিকই পণ্ড ক'রে দ্যায়; শুধু তা-ই নয়, তা প্রথমে মার্ক্সবাদ নিশ্চিতভাবে—সামন্তবাদী, বুর্জোয়া, পাতি-বুর্জোয়া, উদারতাবাদী, ব্যক্তিত্ববাদী, অবাস্তবতাবাদী, শিল্পের জন্য শিল্প, অভিজাত্যবাদী, অধঃপতিত ও দুঃখবাদী এবং অন্য যে-সব সৃজনশীল মেজাজ ব্যাপক জনসাধারণের ও সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী—সেগুলোকে নষ্ট ক'রে দ্যায়। সর্বহারাশ্রেণীর শিল্প-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে উক্ত সৃজনশীল মেজাজসমূহ নষ্ট ক'রে দেওয়া কি উচিত নয়? আমি মনে করি, তা-ই করা উচিত। সেগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া উচিত। আর সেগুলোর ধ্বংস সাধন করবার সময়ে নতুন কিছু গঠন করা যায়।"

এখন, উপসংহারে এসে আমাদের বলার কথা হোলো এই যে, আমাদের সাহিত্যের সমস্যা—সোমেন চন্দেরও সমস্যা ছিল—সে-সমস্যা হোলো উদ্দেশ্য ও ফলাফলের সমন্বয় সাধন। তবে সুখের কথা, স্বস্তির কথা—সোমেনের আগে ও পরে আমাদের এই পৃথিবীর বহু সাহিত্যস্রষ্টা বিশ্বের কোণে কোণে এই সমস্যার সমাধান ক'রে অব্যর্থ সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে গেছেন, এবং এখনও অনেকে করছেন। তাই আজ বোধ হয় কোনো আফসোসের জায়গা থাকে না, অফুরন্তভাবে উচ্চারণ করার— "সেই ফুল ফুটিলো কোথায়" ব'লে। বাস্তব সত্য এই, ঐতিহাসিক কারণেই সোমেন চন্দ ও তাঁর সাথীরা সেদিন মাও সেতুং-চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন নি'।

মার্কসবাদ মানুষকে মননে ও দর্শনে চিন্তাচেতনা ও বৌদ্ধিক সচেতনায় সতর্ক যুক্তিতর্ক ও বিচার বিশ্লেষণ বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলে। অসাম্প্রদায়িক মানসিক চেতনা ও দেশপ্রেম এবং জীবন উপলব্ধির খদ্ধিকতায় আলোকিত করে। একজন মার্কসবাদী, একজন কমিউনিস্ট সব সময়ই সতর্ক থাকে তার কর্মে ও কর্তব্যে এবং জীবনবোধ ও আচরণে কোনো বিচ্যুতি ঘটেছে কিনা।

বর্তমানে অনেকেই অতীব সহজে কমিউনিস্ট পার্টির টিকিট পেয়ে যায়—যার কারণে পার্টিতে অনেক ক্লেদ, গ্লানি ও আবর্জনা জমেছে। অথচ একদিন কমিউনিস্ট হতে হলে বহু ত্যাগ, সততা ও সাধনা করতে হতো এবং বহু কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়ে টিকিট পাওয়া যেত।

সোমেন এ সমস্ত পরীক্ষায় বিশ্বস্ততার সাথে উত্তীর্ণ হয়ে একজন নিরেট খাঁটি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন—। এজন্যই তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"সোমেন চন্দ একজন প্রগতিশীল লেখক ছিলেন। প্রগতিশীল অর্থে বিপ্লবী, মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী। আরও স্পষ্ট ভাষায়, একজন কমিউনিস্ট লেখক। সোমেন জানতেন এবং বলতেন, কমিউনিস্ট হওয়া সহজ ব্যাপার নয়, নানা ধরনের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি হ'লে তবেই সত্যিকারের কমিউনিস্ট হওয়া যায়। একজন মার্ক্সবাদী লেখক হওয়া আরও কঠিন ব্যাপার। প্রতিটি পদক্ষেপে বিভ্রান্তি দ্যাখা যেতে পারে, যদি-না রচনার মধ্যে ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার যথাযথ সমন্বয় ঘটে। তখনকার দিনে কমিউনিস্ট-

www.amarboi.com ~

বিরোধীরা কমিউনিস্ট-কর্মী বা লেখকদের সম্পর্কে এমন সব মিথ্যা রটনা করত, যে, সাধারণ ছাপোষা মানুষের মধ্যেও কোনো কোনো সময় বিভ্রান্তি দ্যাখা যেত। সোমেন এই বিষয়টি লক্ষ ক'রেই তাঁর নিজের জীবনে, আচরণে ও উচ্চারণে একজন পুরোপুরি কমিউনিস্ট লেখক হবার চেষ্টা করেছিলেন'।

মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট হওয়া যেমন কঠিন মার্কসবাদী লেখক হওয়া, কমিউনিস্ট লেখক হওয়া আরও কঠিন। এই ধারণার পক্ষে আমরা সদোত্তর পাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য চিন্তায়। নিজের সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্ক্সবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। আমার লেখায় যে অনেক ভুলভ্রান্তি মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্ক্সবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি। মার্ক্সবাদ যেটুকু বুঝেছি, তাতেই আমার কাছে ধরা প'ড়ে গেছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানি করেছি—জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও। .....মার্ক্সবাদ আজ আমার এ সংঘাতের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছে। এ সংঘাত হল ভাববাদ আর বস্তুবাদের সংঘাত, সমাজ জীবনে আজ যা প্রকট হয়েছে ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।"

মার্কসবাদের পথ ধরেই যে প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব এবং যে সাহিত্য থাকে মানুষের সংগ্রাম ও জীবনের বিকাশ এবং যে সাহিত্যে মানুষের প্রেম, ভালোবাসা ও ব্যথা বেদনায় পরিপ্লুত সোমেন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ সাহিত্য রচনাতেই ব্রতী হলেন। প্রথম জীবনে এই অনুভূতি আসে নি সোমেনের গল্পে কিন্তু শেষে সতীশ পাকড়াশীর সংস্পর্শে এসে তার লেখা ও জীবনে এ পরিবর্তন আসে প্রবন্ধ সংকলনে। তিনি লিখেছেন, "মহৎ কর্মপ্রেরণায় আত্মদান বৃথা যায় না। বিশ্বমানবের কল্যাণে ইংলন্ডের তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক র‍্যালফ ফক্সের (Ralph Fox) আত্মদান গণমানবের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বছর চারেক আগেকার কথা। ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে ব'সে তরুণ যুবক সোমেনের সাথে এই কথাটাই হচ্ছিল, আগ্রহভরা গভীর প্রাণে সোমেন ভাবছিল—স্পেনে গণসমষ্টির জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস—আন্তর্জাতিক বাহিনীতে—ব্রিটেনের গণসাহিত্যিক বিপ্লবী কমিউনিস্ট র‍্যালফ ফক্সের স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদান—ধনসম্পদ-মালিক ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে স্পেনের জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রাম—বিদেশি, কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও রাজনীতিকর্মীদের জীবন উৎসর্গ—এইসব টুকরো কথাগুলো একত্রে মিলিয়ে সোমেনের মনে এক অপূর্ব ভাব বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার হয়। সোমেন জিজ্ঞাসা-ভরা প্রাণে ব'লে উঠল—'সাহিত্যিকও মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল!' আমি বললাম—অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন কলম ছেড়ে তরবারি ধরতে হয়, বুকের রক্তে তখন নতুন সাহিত্য তৈরি হয়। ধন-শোষণ মদমত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

ফ্যাসিস্ট-বর্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে কবি ও সাহিত্যিকগণ তাই স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছুটে গিয়েছিলেন। সাহিত্য সাধনায় লাঞ্ছিত গণমানবের মর্মকথা ফুটিয়ে তোলবার যে প্রেরণা, সেই প্রেরণাই লেখককে গণমানবের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে। সোমেন চুপ ক'রে শুনে একটু পরে বলল—'এরাই সত্যিকার সাহিত্যিক।' রাত্রিতে আমরা ফিরলাম। সোমেন তার গুটি দুই তিন লেখক-বন্ধুদের নিয়ে নতুন সাহিত্যের কথা বলতে বলতে বাড়ি গেল।"

এক ধরণের তাত্ত্বিক মার্কসবাদীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই যে, ফ্যাসিবাদ তার শক্তির নিয়মকে মানুষকে হত্যা করে রাজ্য দখল করে। অর্থাৎ বলপ্রয়োগই তার সমস্ত শক্তির উৎস। কিন্তু এ ধরণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যথেষ্ট ফাঁকি থেকে যায়। আসলে ফ্যাসিবাদী শক্তি—

১. মানুষের হাজার বছরের লালিত অন্ধ গোঁড়ামি ও অলৌকিক বিশ্বাসকে কাজে লাগায়।

২. ধর্মীয় প্রথাবদ্ধতাকে তারা যথাযথভাবে ব্যবহার করে মানুষকে প্রগতির পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

৩. তারা মানুষকে মন্দির মসজিদ ও চার্চের দিকে টেনে নেয়।

৪. শ্রমিক শ্রেণী যাতে প্রগতিপন্থী না হতে পারে এ বিষয়ে সবসময় সতর্ক থাকে।

৫. ফ্যাসিস্টরা সংস্কৃতি বলতে বোঝায় ভোগবিলাস ও হৈচৈ।

লেলিনবাদী তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপর্যুক্ত বিষয়গুলো গ্রামচি যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন তার বক্তব্যে গ্রামচির বক্তব্যের মাত্র ক'বছর পর ১৯৩৫ সনে ডিমিট্রোভ যে বক্তব্য রেখেছিলেন এতে তাই প্রমাণিত হয়।

"কমরেডগণ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতির ত্রয়োদশ প্লেনাম অধিবেশনে অত্যন্ত সঠিকভবেই বলা হয়েছিল যে, ক্ষমতায় আসীন ফ্যাসিজম হোলো—যোগানদার পুঁজির (ফিনান্স ক্যাপিটাল) তরফের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচেয়ে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী এবং সবচেয়ে সাম্রাজ্যবাদী অংশের সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব।"

"না, ফ্যাসিজমের শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত কোনো গভর্নমেন্ট নয় বা যোগানদার পুঁজির ওপর পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর বা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যকার গুণ্ডাবাজ অংশের গভর্নমেন্টও নয়। ফ্যাসিজম—যোগানদার পুঁজিরই রাষ্ট্রশক্তি। শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবী সমাজের বিপ্লবী অংশের ওপর সন্ত্রাসবাদী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সংগঠনই হোলো ফ্যাসিজম। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিজম হোলো হীনতম সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। অন্য জাতির বিরুদ্ধে পাশবিক বিদ্বেষ জাগানোই হোলো তার কাজ।

ফ্যাসিজমের এই আসল চরিত্রের ওপর সবিশেষ জোর দেওয়া দরকার। কারণ, বেশ কয়েকটি দেশে সমাজ-সংস্কারের চটক্‌দার বুলির মোহজাল বিস্তার ক'রে ফ্যাসিজম—সঙ্কটের আঘাতে পথচ্যুত পেটিবুর্জোয়া জনতাকে নিজেদের অনুগামী করতে পেরেছে। এমনকি, শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে পিছিয়েপড়া একটা অংশকেও তারা দলে টানতে পেরেছে। এঁরা যদি ফ্যাসিজমের আসল শ্রেণীচরিত্র এবং প্রকৃতি বুঝতে পারতেন তাহলে কখনই তাকে সমর্থন করতেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮৫www.amarboi.com ~

দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা—তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও আন্তর্জাতিক অবস্থান অনুসারে বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিজমের বিকাশ ও ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে।"

"ফ্যাসিজমের ক্ষমতায় অধিরোহণ একটা বুর্জোয়া গভর্নমেন্টের আত্মবিসর্জন ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আশার কথা বাংলা সাহিত্যের তরুণ লেখকরা এ বিষয়ে সচেতন হচ্ছে। পরিবর্তে আর একটি বুর্জোয়া গভর্নমেন্টের স্থান অধিকারের মতো সাধারণ ঘটনা নয়। এ হোলো বুর্জোয়াশ্রেণীর আপন শ্রেণী-আধিপত্য বজায় রাখার এক ধরণের রাষ্ট্ররূপ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বদলে আর এক ধরণের রাষ্ট্ররূপ, প্রকাশ সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব স্থাপন। এই পার্থক্য উপেক্ষা করাটা গুরুতর ভুল হবে। এই ভুলের ফলে ফ্যাসিস্টদের ক্ষমতা দখলের আশঙ্কার বিরুদ্ধে শহর ও গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপকতম অংশের সমাবেশ গড়তে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী অপারগ হবেন; বুর্জোয়াদের নিজেদের শিবিরেই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে তারও সুযোগ নিতে পারবেন না। কিন্তু আজকের দিনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রী দেশগুলোতেও বুর্জোয়াশ্রেণী ক্রমবর্ধমান হারে যেসব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা অবলম্বন করছে—যার ফলে মেহনতি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে; পার্লামেন্টের অধিকার খর্ব হচ্ছে, ভুয়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে; এবং বিপ্লবী আন্দোলনের উপর দমননীতি তীব্রতর হয়ে উঠছে—ফ্যাসিস্ট-একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথে সে সবগুলোর গুরুত্ব ছোটো ক'রে দ্যাখাটা মোটেই কম গুরুতর বা কম বিপজ্জনক ভুল নয়।"

"কমরেড়গণ, যোগানদার পুঁজিওয়ালাদের কোন সমিতি একদিন ব'সে ঠিক ক'রে ফেলল, অমুক তারিখে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব কায়েম করা হবে—ফ্যাসিজমের ক্ষমতা দখলের ব্যাপারটাকে অত সব সরল প্রক্রিয়া মনে করাটা ভুল হবে। আসলে, পুরনো বুর্জোয়া দলগুলোর বা ঐসব দলের একটা বিশেষ অংশের সঙ্গে পারস্পরিক, এক একসময় গুরুতর লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সাধারণত ফ্যাসিজম ক্ষমতা দখল করে; এমনকি কখনও কখনও ফ্যাসিস্টদের নিজেদের শিবিরের অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে, অনেক সময় জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও অন্যান্য দেশে আমরা যে রকম দেখেছি—সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্য দিয়েও ফ্যাসিজম ক্ষমতা হস্তগত করে। ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব কায়েম হওয়ার আগে বুর্জোয়া গভর্নমেন্টগুলো সাধারণত—যে কতকগুলো প্রাথমিক স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, তারা যে একের পর এক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা চালু ক'রে ফ্যাসিজমের ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত ক'রে দ্যায়, উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো এ সত্য থেকে যেন আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে না ফ্যালে। যাঁরা বুর্জোয়াশ্রেণীর এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করেন, যাঁরা ফ্যাসিজমের বিজয় রুখতে পারবেন না, বরং তার জয়ের পথকেই প্রশস্ত করেবেন।"

"জনসাধারণের ওপর ফ্যাসিজমের যে প্রভাব রয়েছে, তার উৎসটা কী? ফ্যাসিজম যে জনসাধারণকে আকর্ষণ করতে পারছে, তার কারণ হল এই যে, তারা গলাবাজি ক'রে জনসাধারণের জরুরি প্রয়োজন ও চাহিদার কথা বলছে। ফ্যাসিজম শুধু যে জনসাধারণের বদ্ধমূল কুসংস্কারকেই উস্‌কিয়ে তোলে তা নয়, তারা তাঁদের সুস্থ চেতনা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮৬www.amarboi.com ~

তাঁদের ন্যায়বোধ এমনকি অনেক সময় তাঁদের বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতিও আবেদন জানায়।"

"ফ্যাসিজম সবচেয়ে চরম সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই কাজ করে। কিন্তু একটা নিপীড়িত জাতির স্বার্থরক্ষকের ছদ্মবেশে তারা জনসাধারণের সামনে হাজির হয়"—

"জনসাধারণকে অবাধে শোষণ করাই ফ্যাসিজমের লক্ষ্য। কিন্তু দস্যু বুর্জোয়াশ্রেণী, ব্যাংক, ট্রাস্ট ও রাঘববোয়াল পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের যে সুগভীর ঘৃণা রয়েছে—তার সুযোগ নিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে পুঁজিবাদবিরোধী গলাবাজি ক'রে তারা জনসাধারণের কাছে আবেদন জানায়, এমন সব দাবি উপস্থিত ক'রে, রাজনৈতিকভাবে অপরিপক্ব জনসাধারণের কাছে সেই মুহূর্তে সবচেয়ে লোভনীয় বোধ হয়। জার্মানিতে—'সমষ্টির মঙ্গল ব্যক্তির মঙ্গলের ঊর্ধ্বে'; ইতালিতে—'আমাদের রাষ্ট্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নয়, যৌথ (কর্পোরেট) রাষ্ট্র'; জাপানে—'শোষণমুক্ত জাপান গঠনের জন্য'; আমেরিকায়—'ধনসম্পদ অন্যের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে হবে'— ইত্যাদি হচ্ছে তাদের বুলি।".

"ফ্যাসিজম—জনসাধারণকে—সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ, সব থেকে ভাড়াটিয়া মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের গ্রাসে তুলে দ্যায়, কিন্তু জনসাধারণের দরবারে তারা হাজির হয় 'সৎ এবং দুর্নীতির ছোঁয়াচহীন গভর্নমেন্ট' গঠনের দাবি নিয়ে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্টসমূহ সম্পর্কে জনসাধারণের সুগভীর মোহমুক্তির উপর ভর ক'রে ফ্যাসিজম কপটভাবে দুর্নীতির নিন্দা করে (উদাহরণ—জার্মানিক বারমাট্-সক্লারেক কেলেঙ্কারি, ফ্রান্সের স্টাভিস্কি কেচ্ছা প্রভৃতি অসংখ্য ঘটনা)।"

"বুর্জোয়াশ্রেণীর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মহলের স্বার্থেই ফ্যাসিজম—পুরনো বুর্জোয়া পার্টিগুলোর ওপর বীতশ্রদ্ধ জনসাধারণকে মাঝপথে পাকড়াও করে। বুর্জোয়া গভর্নমেন্টের উপর আক্রমণের তীব্রতা এবং পুরনো বুর্জোয়া দলগুলো সম্পর্কে আপসহীন মনোভাব দেখিয়ে তারা এসব সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।"

"নৈরাশ্যবাদ ও কপটতায় ফ্যাসিজম—অন্য সমস্তরকম বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াকে ছাড়িয়ে যায়। একটা দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ফ্যাসিজম তার প্রচারের ধরণ ঠিক করে। অভাব-অনটন, বেকারী ও জীবনের অনিশ্চতায় হতাশাগ্রস্ত পেটিবুর্জোয়া জনতা, এমনকি শ্রমিকশ্রেণীর একাংশও সহজেই ফ্যাসিজমের 'সমাজতান্ত্রিক' এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভাওতাবাজির শিকার বনেন।"

"শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের ওপর, বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর—হামলাকারী পার্টি হিসেবেই ফ্যসিজম ক্ষমতায় আসে। কিন্তু এই ক্ষমতা দখলের ব্যাপারটাকে 'সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে', সমগ্র জাতির 'মুক্তির জন্য, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে 'বিপ্লবী আন্দোলন' ব'লে ফ্যাসিজম চিত্রিত করার প্রয়াস পায়। (স্মরণ করুন—মুসোলিনির রোম-'অভিযান', পিলসুড্স্কির ওয়ারশ-'অভিযানের' কথা; স্মরণ করুণ জার্মানিতে হিটলারের জাতীয় সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের কথা প্রভৃতি)।

কিন্তু ফ্যাসিজম যে-মুখোশই ধারণ করুক না কেন, যে-চেহারাতেই তারা হাজির হোক না কেন, যে পথ ধ'রেই তারা ক্ষমতা দখল করুন না কেন—

www.amarboi.com ~

ফ্যাসিজম হোলো— শ্রমজীবী জনতার ওপর মূলধনের হিংস্রতম আক্রমণ;
ফ্যাসিজম—নিরুঙ্কুশ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ আর পররাজ্য হরণের যুদ্ধ;
ফ্যাসিজম—জঘন্যতম প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লব;
ফ্যাসিজম হল— শ্রমিকশ্রেণী ও প্রত্যেকটি মেহনতকারী মানুষের ক্রুরতম শত্রু।"
সোমেন বলেছেন—

'বিপ্লবের জন্য একজন লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। গোর্কির কথাই চিন্তা কর। শৌখিন সাহিত্য করার দিন আর নেই। একজন মার্কসিস্ট, একজন বিপ্লবীর এবং একজন কমিউনিস্টের এ-ই হচ্ছে মৌলচেতনা। সমাজ পরিবর্তন করতে হলে বিপ্লব করতে হবে। এবং এই বিপ্লব শুধু মিছিল স্লোগান ও আন্দোলন এবং সভাসমিতিতে বক্তৃতায় হবে না। এর জন্য চাই মনস চেতনা ও মানসিক পরিবর্তন'।

মানুষের সংগ্রাম, সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ আন্দোলন, সংগ্রাম ধর্মঘট সমাজ পবিবর্তন, অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার দাবি তুললেই যদি রাজনীতির দোহাই দিয়ে শিল্পের জগৎ থেকে বাতিলের পরোয়ানা জারি করা হয়—তবে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠবে কি বিষয়বস্তু নিয়ে সাহিত্য রচনা করা হবে।

উপর্যুক্ত অভিধাটিকে যদি অন্য কোটি থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা যায় তবে প্রশ্ন থেকে যায়—রাজনীতির বিষয় নিয়ে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, রচনা করলে তা সাহিত্য হবে না কেন?

মানুষ একটি দেশে ও একটি সমাজে বাস করে, সেদেশ ও সমাজে যদি রাজনীতি থাকে তবে একজন কবি ও সাহিত্যিক এই রাজনীতির বলয় ও আবহ হতে কী মুক্ত থাকতে পারবেন? তাই সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ অবশ্যই জ্ঞাত-অজ্ঞাত বা সচেতনভাবে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। এজন্যই এখানে কার্লমার্কসের উক্তি প্রযোজ্য—

My our existence is a social activity. For this reason, what I myself produce I produce for society and the consciousness of acting as a social beings.

পৃথিবীর যতো বড়ো ও যতো মহৎ সাহিত্যই হোক না—লৌকিক ও সামাজিক এবং রাজনীতি ও অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে তা হতে পারে না।

মার্কসীয় তত্ত্বের অভিধা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে শ্রমজীবী মানুষই যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাতা এর ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন নিরূপণ করতে হবে। সোমেন চন্দ এই তত্ত্বটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন শ্রমজীবী মানুষের সাথে হৃদ্ধিক একাত্মতায়। তাই তিনি জানিয়েছেন যে, গত কয়েকদিন রেল শ্রমিকদের নিয়ে বেশ ঝামেলায় ছিলাম। লেখার জন্য একটুও সময় পাই না। তবু লিখতে হবে, মেহনতী মানুষের জন্য, সর্বহারা মানুষের জন্য, আমাদের লিখতে হবে। র‍্যালফ ফক্সের বই পড়ে আমি অন্তরে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। কডওয়েলের বইটিও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই না হলে কি মহৎ সাহিত্যিক হওয়া যায়? স্পেনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮৮www.amarboi.com ~

পপুলার ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে তাঁদের আত্মবিসর্জন ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আশার কথা বাংলা সাহিত্যের তরুণ লেখকরা এদিকে সচেতন হচ্ছে। বিপ্লবের জন্য একজন লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। গোর্কির কথাই চিন্তা কর। শৌখিন সাহিত্য করার আর সময় নেই'।

সোমেন চন্দ তার গল্প ও উপন্যাসে জীবনকে দেখার, জীবনকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। মানুষের সামনে দেশ আছে, সমাজ আছে—রাজনীতি ও অর্থনীতি আছে এবং মানুষের একটা জীবন আছে—। মানুষ জীবনকে ভালোবাসে এ ও সত্য কথা। জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হতে পারে না। মানুষের প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা, আবেগ-অনুভব নীতি ও ধর্মবোধ সবকিছুই জীবনকে কেন্দ্র করে। তাই জীবনকে উপেক্ষা করে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি হতে পারে না। জীবনবাদী ও বাস্তববাদী রুশ নন্দনতাত্ত্বিক চের্নোশেভস্কি এজন্যই বলেছেন—

"মানুষের কাছে জীবনই সবচেয়ে প্রিয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং শিল্প সাহিত্য ও রাজনৈতিক ধারণাতেও মানুষ যে অভিধার জীবনযাপন করে এবং যা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সেখানেও জীবনেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। মানুষের কর্মকাণ্ড ও আবেগ অনুভূতি এবং ভালোবাসা সবকিছুই জীবনের অনুষঙ্গ ও জীবন কেন্দ্রিক। মানুষ মরবে বা বাঁচবে এবং প্রেমে ও বিচ্ছেদে জীবনের প্রতি ছান্দিক আকর্ষণের অভিধা। এই জীবনকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করাই সাহিত্য'।

সাহিত্য কোনো তত্ত্ব আদর্শ-উদ্দেশ্য এও বেদবাক্য নয়। লেখাটাও একটা উদ্দেশ্য বিশেষ করে লেখাতো মানুষের জীবনের চাওয়া-পাওয়া, আবেগ-অনুভূতি এবং সুখ-দুঃখ ও ব্যথা- বেদনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই ড. ভবতোষ দত্ত বলেছেন—

'রাজনীতি চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা সমাজ জিজ্ঞাসা চালিত হয়েই করেন। রাজনীতিক কোন বিশিষ্ট সত্যকে অনুসরণ করতে বাধ্য হন সমাজ কল্যাণের প্রেরণাতে। যিনি মূলত স্রষ্টা শিল্পী তিনি রাজনৈতিক বিশ্বাসেরই রূপ রচনা করবেন। সোমেন যে মূলত প্রকৃতিতে শিল্পী, তার প্রমাণ অন্য শ্রেণীর গল্পেই আছে। তিনি তার রাজনীতি নির্ভর সমাজ জিজ্ঞাসাকে গল্পের রূপ দিলেন'।

কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় নয়—কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন, প্রগতিশীল রাজনীতি করেছেন এবং সোমেন দেখিয়েছেন 'রাজনীতিকে কিভাবে উচ্চাঙ্গের শিল্প হিসেবে পরিবেশন করা যেতে পারে, সোমেনের গল্পগুলো তার অধ্যয়নযোগ্য চর্চাযোগ্য পাঠক্রম হিসেবে প্রস্তুত হয়ে যায়'।

এজন্যই সোমেনের লেখা আদর্শভিত্তিক হয়েও যান্ত্রিক রূঢ়তা আর প্রচারধর্মিতার জোয়ারে বৈষম্য লাভ করেনি। মানবিকতার উষ্ণ পরশে এবং জীবন সংগ্রামের স্পন্দনে তার সাহিত্য আমাদের যেমন টিকে থাকার, বাঁচার ও সংগ্রামের প্রেরণা দেয় তেমনি সোমেন পরিপূর্ণ মানুষকে এঁকে আমাদের সামনে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৮৯www.amarboi.com ~

সোমেন চন্দের মৃত্যু

পৃথিবীতে অনেক কবি সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিককে হত্যা করা হয়েছে—। এসব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোনটা বিষপানের মাধ্যমে, কোনটা প্রকাশ্যে রাজসভায়, বধ্যভূমিতে গুলি করে আবার কাউকে ফাঁসির মাধ্যমে। কিন্তু মার্কসবাদী বিপ্লবী ও সাহিত্যিক সোমেন হত্যাকাণ্ড অন্য মাত্রিক। এ হত্যাকাণ্ড কোন গুপ্ত হত্যাকাণ্ড বা সামরিক অভ্যুত্থান নয়— প্রকাশ্য রাজপথে, দানবীয় উল্লাসে এক পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড।

আমরা আগেই অলোচনা করেছি—১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নে আগ্রাসন চালায়। সমগ্র বিশ্বের মার্কসবাদী ও শান্তিবাদী এবং যুদ্ধবিরোধী কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীরা এই ফ্যাসিবাদী শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। আমাদের বাংলাদেশে 'প্রগতি লেখক সংঘ' 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' নামে একটি সংগঠন করে। সোভিয়েতের পক্ষে প্রচার চালায়। বিপ্লবী সোমেন চন্দ রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের দায়িত্ব পালনের পরও অতীব নিষ্ঠা, সততা উদ্যমের সাথে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির দায়িত্ব পালন করতেন।

সোমেন চন্দের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সাংগঠনিক ক্ষমতা, জনপ্রিয়তা, কর্মতৎপরতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আদর্শিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতা এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী মানসিকতার জন্য জাতীয়তাবাদী আর. এস. পি ফরোয়ার্ড ব্লক সোমেনকে সহ্য করতে পারত না। আদর্শিক কারণে মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তখন চরমে পৌঁছে।

৮ মার্চ ১৯৪২ সালে মার্কসবাদী তথা প্রগতি সাহিত্য সংঘ ও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি ঢাকায় ফ্যাসিবাদবিরোধী এক কর্মীসম্মেলন আহ্বান করে। এই অনুষ্ঠানের স্থান নির্ধারিত হয় সূত্রাপুরের সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে। কোলকাতা হতে অতিথি হিসেবে এই সম্মেলনে যোগদান করেন জ্যোতিবসু, বঙ্কিম মুখার্জি ও স্নেহাংশু আচার্য।

জাতীয়তাবাদী ও ফ্যাসিবাদ সমর্থক আর, এস, পি ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা কর্মীরা বল্লম, রামদা ও তলোয়ার নিয়ে এই সম্মেলন বানচালের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু শত বাধা সত্ত্বেও ফ্যাসিবাদ বিরোধী কর্মীরা মিছিলে মিছিলে স্লোগানে স্লোগানে সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে আসতে থাকে এবং সম্মেলন স্থান লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।

সেদিন বেলা আড়াইটায় ঢাকা রেলওয়ে কলোনী থেকে রেলশ্রমিকদের একটি বিরাট মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে সোমেন সম্মেলন স্থলে যাত্রা করেন এবং বিকেল তিনটায় স্লোগান দিতে দিতে মিছিলটি লক্ষ্মীবাজার হৃষিকেশ রোডে পৌঁছা মাত্রই আর. এস. পি-র গুণ্ডারা রামদা, তলোয়ার, বল্লম ও লোহার ডাণ্ডা নিয়ে মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই নর পিশাচ ঘাতকেরা আঘাতের পর আঘাত করে সোমেনকে মাটিতে ফেলে দেয়, চোখ দু'টি উপড়ে ফেলে এবং জিহ্বাটা টেনে বের করে কেটে ফেলে, পেটচিড়ে নাড়িভুড়ি বের করে দেয়। পৈশাচিক নৃত্যে তার দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে। আহত হয়েও সোমেন রক্তিম পতাকা হাতে স্লোগান দিতেছিলো। এবং এই রক্তিম পতাকা হাতেই মার্কসবাদী সোমেন, বিপ্লবী সোমেন, মেহনতি মানুষের সংগ্রামে অটল বিশ্বাসী সোমেন শহীদ হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৯০ www.amarboi.com ~

সোমেনের মৃত্যুতে তার বন্ধু কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তার অপ্রকাশিত লেখা 'সোমেন চন্দ : মার্কসবাদী বিপ্লবী ও লেখক' প্রবন্ধে বলেন—

সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি আয়োজিত প্রদর্শনীও নানা জায়গায় সভাসমিতির ব্যবস্থা করার ফলে স্থানীয় জনসাধারণের একাংশের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম ও চিন্তাধারা সম্পর্কে আগ্রহের সঞ্চার হয়। এই দিকে দৃষ্টি রেখে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি ঢাকায় ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করে। সূত্রাপুরের সেবাশ্রম মাঠে আয়োজিত এই সভায় ঢাকেশ্বরী মিল ও অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের অজস্র শ্রমিক, ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও স্কুলের ছাত্র, মহিলা সমিতির কর্মী ও সাধারণ লোক যোগ দিলে এই সম্মেলন বিশাল আকার ধারণ করে। কলকাতা থেকে যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতি বসু (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী), তখনকার বাংলার পার্টির সর্বশ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট বক্তা বঙ্কিম মুখার্জি এবং স্নেহাংশু আচার্য (পশ্চিমবঙ্গের সদ্যপ্রয়াত অ্যাডভোকেট জেনারেল)। এই দিনটি ছিল ১৯৪২ সনের (সালের) ৮ মার্চ। ওই দিন সোমেনের পার্টির অন্যান্য কাজ সেরে দুপুরের দিকে সম্মেলন মণ্ডপে উপস্থিত থাকবার কথা। এই দিনটিতে সোমেনের পিতামাতা ঢাকায় ছিলেন না, মাত্র কয়েক দিনের বসবাসের জন্য গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। ৮ মার্চ সোমেন খুব ভোরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। অন্যান্য দিন বহু বছরের সঙ্গী বাইসাইকেলটি নিয়ে পথে নামতেন এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় দ্রুত যাবার জন্যে এটি ছিল তাঁর বাহন। কিন্তু ৮ মার্চ বাইসাইকেলটি ঘরে রেখেই তিনি বেরিয়ে যান কেননা ই-বি রেলওয়ে শ্রমিকদের নিয়ে একটি মিছিল করে সম্মেলন মণ্ডপে আসবেন এই ছিল অভিপ্রায়। তিনি তখন জানতেন না এই দিনটি তাঁর বুকের খুনে লাল হয়ে থাকবে চিরকালের জন্য।

সোমেন হত্যাকাণ্ড গোপন কিছু নয় এবং যারা তাকে হত্যা করেছে তাদের যে গোয়েন্দা দিয়ে বের করতে হতো এমন কিছু নয়। প্রকাশ্যে দিবালোকে, শত শত লোকের সামনে সোমেনকে হত্যা করা হয়েছে। গুলি করে এক মুহূর্তে তাকে হত্যা করা হয়নি। এমনকি এসময়ও সোমেন মুষ্টিবদ্ধ লাল পতাকা হাতে বলেছে তোমরা আমাকে একবারে হত্যা করা কিন্তু আমার হাত থেকে লাল পতাকা কখনও নিতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত রক্তিম পতাকা আর সোমেনের রক্তাক্ত পতাকা এক হয়ে গেলো। এই হত্যাকাণ্ডের সময় একজন প্রত্যক্ষদর্শী পুরো ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তার বর্ণনায়—পৃ. ৪৮ ...রবিবার। সূত্রাপুর সেবাশ্রমের প্রাঙ্গণে ফ্যাসিবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে। সম্মেলনের কাজ তখনো আরম্ভ হয় নাই; কিন্তু আরম্ভ হতে আর দেরীও নাই। কলিকাতার যেসব নেতা এই সভাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলেন তাঁহারা ইতিমধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছেন। প্যাণ্ডেলের ভিতর লোক জমিয়া গিয়াছে—কম করিয়াও অনেকক্ষণ হইল তিন হাজারের কোঠা অতিক্রম করিয়াছে। টিকিট বিক্রয়ের ভার ছিল আমার উপর এবং আমার অনভ্যস্ত হাতে এত বড় ভীড় সামলাইতে একেবারে হিমসিম খাইয়া যাইতেছিলাম। বেশ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই ফ্যাসীবিরোধী স্বাধীনতাকামী জনতা একটা নতুন সংকল্প গ্রহণের জন্য সমবেত হইতেছিলেন।

একজনের কাছে এক সঙ্গে বত্রিশখানি শ্রমিক-টিকিট বিক্রয় করিলাম। এবং পরক্ষণেই সেই লোকই আরও বত্রিশখানি একই টিকিট কিনিয়া লইল। বোধ করি এই

www.amarboi.com ~

টিকিটগুলিরই সাহায্য লইয়া এক নাতিক্ষুদ্র দল প্যাণ্ডেলের ভিতর প্রবেশ করে। তাহাদের হাবভাব দেখিয়া এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের মুখে ফ্যাসীবাদী ধ্বনি শুনিয়া স্বেচ্ছাসেবকরা গোলমালের সম্ভাবনা দেখিয়া তাহাদের রাজপথে বাহির করিয়া দেন।

ইহা সূত্রপাত মাত্র। অনতিবিলম্বেই দেখা গেল, একদল ভদ্রবেশী বিক্ষোভকারী প্যাণ্ডেলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দৃষ্টি তাহাদের হিংস্র, তাহাদের সঙ্গে হকিস্টিক, লোহার ডাণ্ডা এবং ছোরা। তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই যখন আর অবকাশ রহিল না, তখন শান্তিপ্রিয় ফ্যাসিবিরোধী সভাকে বিশৃঙ্খলার হাত হইতে রক্ষা করিবার সংকল্প লইয়া সম্মেলনের অপ্রস্তুত স্বেচ্ছাসেবকেরা লৌহাস্ত্রের বিরুদ্ধে নগণ্য ইট এবং লাকড়ী লইয়া বিক্ষোভকারীদের প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। একটা সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। ইতিমধ্যে কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া পড়ায় স্বেচ্ছাসেবকরা শান্তিরক্ষার ব্যাপারে তাহাদের আর কোন দায়িত্ব নাই বুঝিয়া ফিরিয়া আসেন। টিকিট বিক্রয় বন্ধ করিয়া আমিও সভামণ্ডপে ঢুকিলাম! কিন্তু সেখান হইতেই চাঞ্চল্যকর খবর পাইলাম যে আততায়ীরা পুলিশের বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়াই প্যাণ্ডেলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পুলিশের আমলাতান্ত্রিক রক্ত এ ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারে নাই। রিভলভার টিপিয়া তাহারা যে বুলেট নিক্ষেপ করিয়াছে তাহাতে একজন আততায়ীর জীবনান্ত ঘটিয়াছে এবং তাহার সঙ্গীরা শবদেহ লইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে।

গোলমাল কমিয়া আসিল। সভার কাজও ফ্যাসিবিরোধী ধ্বনির ভিতর দিয়া আরম্ভ হইয়া গেল। কিন্তু সভার কাজ নিরুদ্বেগে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। একজন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া আমাকে গেটে যাইতে বলিলেন। সেখানে নাকি অনেকেই টিকিট চাহিতেছেন। কর্তব্য পালনে চলিলাম।

আজ এতদিন পরেও কোনক্রমেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না, পথে আসিতে আসিতে যে সংবাদ শুনিলাম তাহার পরও আমি কি করিয়া মাটির উপর দাঁড়াইয়াছিলাম। 'সোমেন চন্দকে মেরে ফেলেছে' এই কথা কয়েকটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তো নীচের পৃথিবী অনায়াসে ধ্বসিয়া যাইতে পারিত, বা চোখের সামনে নীল আকাশ মুছিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু পরিষ্কার মনে পড়িতেছে, খবরটা শুনিয়াও আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, প্রথমে একটু মূহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলাম। একবার ভাবিয়াছিলাম, খবরটা অবিশ্বাস করিব। কিন্তু সঙ্গীদের মুখ চোখের অবস্থা দেখিয়া তাহাও পারিলাম না। তারপর কেমন করিয়া পারিয়াছিলাম জানি না, কিন্তু নিজের মুখে, জিহ্বা সঞ্চালন করিয়া সোমেনের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে এই খবরটা আমিই পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। চারিদিকের সবাই শোকাভিভূত; বক্তৃতার সাময়িক বিরাম ঘটিয়াছে, তবু অত বড় জনতার সভা একেবারে নিথর; কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর কাছে সংবাদ সরবরাহ করা হইল। বাঘ চঞ্চল হইয়া উঠিল; তিনি লাফাইয়া প্লাটফর্মের উপরে উঠিলেন। স্বাধীনতা ও সংস্কৃতিধ্বংসী যজ্ঞানুষ্ঠানের এই প্রথম উল্লেখযোগ্য শিকারকে উপলক্ষ করিয়া তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, তাহাতে জ্বালা আর তীব্রতার অভাব ছিল না, কিন্তু কম্পোচ্ছ্বাসে তাঁহার গলাও রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

আমার কাছে সভা তখন মুছিয়া গিয়াছে। সোমেনের বলিষ্ঠ তরুণ চেহারাটাই বার বার মনে পড়িতেছিল। আমি তাহার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। আমি তো জানিতাম সে

সাধারণ নয়; আমি তো জানিতাম বাংলা সাহিত্যে একদিন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আসন গ্রহণের সম্ভাবনা তার ছিল; সে বিশ্বের নিপীড়িত জনসাধারণের বিপ্লবী প্রচেষ্টার মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে ডুবাইয়া দিয়া তাহার সাহিত্যিক সত্তাকে পরিণত করিয়া লইতেছিল। চোখের উপর দেখিতে পাই, রেল লাইনের উপর দিয়া অত্যন্ত দ্রুতবেগে সে চলিতেছে। অগোছালোভাবে কাপড়টা পরা, ধূসর রং-এর একটা জামা গায়ে। আর তার প্রশস্ত ললাট এবং কমলালেবুর রং এর মতো গাল ঘামে একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। অথবা মনে পড়ে অনেক রাতে স্তূপীকৃত কাগজপত্রের মধ্যে একটা অপরিচ্ছন্ন লণ্ঠনের সামনে দাঁতে কলম চাপিয়া সোমেন বসিয়া আছে। বিপ্লবের বীজ যাহাদের মধ্যে আছে সেই শ্রমিকজীবনের মূলসূত্রটা আজও হয়তো তাহার সাহিত্যিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় নাই; সেইটাই আবিষ্কারে মগ্ন বিপ্লবী সাহিত্যিকের পাশ কাটাইয়া অবজ্ঞাত রাত্রির সুদীর্ঘ-নিঃশ্বাস চলিয়া যাইতেছে।

সোমেনকে শেষ দেখিয়াছিলাম শব-পরীক্ষাগারে। পুরনো কোঠাটা রক্তে ভরিয়া গিয়াছে; রক্ত আসিয়া জমিয়াছে বাইরের সিঁড়ির উপর। শেষবারের মতো দেখিলাম সোমেনের মৃত বাহু এখনো আগের মতোই সুডোল রহিয়াছে; প্রশস্ত বক্ষ এখনো সঙ্কুচিত হয় নাই; স্থির চোখের ভিতর বিপ্লবীর দাহিকাশক্তি তখনো যেন নিভিয়া যায় নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, অমন নিটোল সুপুষ্ট শরীরটা আঘাতের পর আঘাতে কী বীভৎসই না দেখাইতেছে!

মার্ক্সবাদীদের সাথে জাতীয়তাবাদীদের দ্বন্দ্ব যখন খুবই উত্তেজনাকর অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে, তখন ৪২ সালের ৮ মার্চ মার্ক্সবাদীরা ঢাকা জেলার ফ্যাসিবিরোধী কর্মী সম্মেলন নামে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এর অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলে সূত্রাপুরে। কলকাতা থেকে বঙ্কিম মুখার্জি ও স্নেহাংশু আচার্য সম্মেলনে সভাপতি ও অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্য ঢাকা আসেন। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে কর্মীরা সম্মেলন স্থানে উপস্থিত হন। একে বানচাল করার জন্যে আর. এস. পি. ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীরা বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। তাদের অনেকের হাতেই ছিল বিভিন্ন ধরনের ধারালো অস্ত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঢাকার শত শত কর্মী দলবদ্ধ অবস্থায় এতে যোগদান করেন। সূত্রাপুরের সেবাশ্রমের অঙ্গন লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। বেলা আড়াইটার সময় রক্তপতাকা হাতে সোমেন চন্দ রেল শ্রমিকদের একটি দল নিয়ে ঢাকা রেলওয়ে কলোনী থেকে রওনা হন সম্মেলনে যোগদারে জন্য। প্রায় ৩টার সময় এ শোভাযাত্রাটি স্লোগান দিতে দিতে যখন লক্ষ্মীবাজার-হৃষিকেশ দাস রোড়ের মোড়ে এসে পৌঁছে, তখন ছোরা, ভোজালী, লোহার ডাণ্ডা এসব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একদল লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপরে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে শোভাযাত্রাটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তখন এরা বেছে নেয় সোমেনকে। ভোজালী দিয়ে পর পর আঘাত করে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয়, চোখ দুটি উপড়ে ফেলে, জিভ টেনে বের করে তা কেটে ফেলে দেয়, পেট চিরে নাড়িভুড়ি বের করে দেয় এবং অট্টহাস্য করে পশুর মতো তারা তাঁর ছিন্নভিন্ন দেহের ওপর নাচতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতা ছিল, সোমেন স্লোগানের পর স্লোগান দিয়ে যাচ্ছিলেন, শেষ পর্যন্তও রক্তপতাকা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৯৩www.amarboi.com ~

সোমেন ঠিক লক্ষ্মীবাজারের হৃষিকেশ রোডের মোড়ে নিহত হয়েছিলেন কি-না, এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ও মন্তব্য আছে। ১৯৬৪ সনে আমি যখন তৃতীয়বর্ষ অনার্সের ছাত্র তখন প্রায়ই বেরতী মোহন লেনে যেতাম—সেখানে যীতেনদা (যীতেন ঘোষ), সুনীলদা থাকতেন। একদিন তাদের সাথে সোমেন প্রসঙ্গে আলোচনা ওঠে। সুনীলদা ও রণেশদার বক্তব্য অনুসারে সোমেন ঠিক হৃষিকেশ দাস রোডের মোড়ে নিহত হয় নি—হৃষিকেশ দাস রোডেই তাকে হত্যা করেছিল আর. এস. পার্টির নরপিশাচরা। হাতে বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ লাল পতাকা নিয়েই সোমেন শহীদ হলেন। আমরা গর্বভরে উচ্চারণ করি ফ্যাসিবাদ বিরোধী ভারতে রক্তিম পতাকা হাতে প্রথম শহীদ হলেন সোমেন চন্দ।

এরপরও অনুষ্ঠিত হয় ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্মেলন। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ঐ সময়ই একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনের সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জী পত্রিকাগুলোতে প্রকাশের জন্য একটি বার্তা পাঠায়। আমরা এখানে তা'তুলে ধরছি—

"The Dacca Anti Fascist conference which was successfully held yesterday, myself presiding, was preceded by the tragic death of stabbing of Somen Chanda, a progressive writer and Secretary E.B. Railway Workers' Union. Apprehending Serious danger the police opened fire which also resulted in one death. Mr. Samsul Huda, Mr. Jyoti Bose, Mr. Snehanshu Acharya, Mr. Suren Goswami and myself did not Altogether escape assault while procceding to the pandal."

সোমেন হত্যা প্রসঙ্গে তার মাসীমা বীণা বিশ্বাস স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেন—

"সোমেনের মা-বাবা গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলে। বাড়িতে বৃদ্ধা ঠাকুরমা ছিলেন। রাতে অনেকগুলো দরমা এনে সোমেন ঘরে ঢোকায়; উদ্দেশ্য—পরের দিন মিছিলে প্ল্যাকার্ড করা হবে। ঠাকুরমা বলে, এগুলো দিয়ে কী করবি—শম্ভু উত্তর দ্যায়— তোমাকে নিয়ে আলাদা ঘর বাঁধবো।

পরদিন অর্থাৎ ৮ মার্চ সকালেই সোমেন বেরিয়ে যায়। যদিও আমাদের সঙ্গে মাসতুতো বোনের (লিলি) বিয়েতে নারায়ণগঞ্জ যাবার কথা ছিল। কিন্তু সম্মেলন ব'লে—যাবে না বলে। এদিনও সোমেন সকাল সকাল সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায়। মামার বাজারে যাবার কথা ছিল—যায়নি। সোমেন দেড়টা নাগাদ ফিরল। মাছ ছিল না—তবুও ঘি ও তরকারি দিয়ে ভালোই খেল। তারপর সাইকেল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চ'লে গেল। সেই শেষ যাত্রা।

আমরা তার বেরিয়ে যাবার পর বেরুলাম। স্টেশনে লাল পতাকার শ্রমিক মিছিল ক'রে আসছে—কী আনন্দ হল! আমরা সব দেখতে দেখতে গেলাম।"

গোকুল চক্রবর্তী ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠকও নেতা। সম্মেলনের তিনিও ছিলেন একজন উদ্যোক্তা। সোমেনের ওপর তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'যুবক কমিউনিস্ট সাহিত্যিক সোমেন চন্দের মৃত্যু' শিরোনামে। তার বিবরণে আমরা জানতে পারি—

 www.amarboi.com ~

"ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকার সূত্রাপুর বাজারের কাছে সেবাশ্রমের মাঠে—রায় বাহাদুর সত্যেন দাসের বাড়ির সন্নিকটে। এখানে বলাই বাহুল্য কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধিতে সেই সময়ে আর.এস.পি, বি.ভি., শ্রীসংঘ প্রভৃতি দলগুলো চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং ছোটখাটো ছুতানাতায় কমিউনিস্টদের সাথে সংঘর্ষ বাধাত এবং কমিউনিস্ট কর্মীদের নির্দ্বিধায় খুন করতেও কুণ্ঠিত হতো না।"

সম্মেলন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

'অদ্ভুত সাড়া প'ড়ে গেছে ঢাকা শহরে। ফ্যাসিবিরোধী স্লোগানে মিছিলে দৈনিক পত্রিকার উপরে হাতে লেখা পোস্টারে ছেয়ে গেছে সারা শহর। চারিদিকে একটা উন্মাদনা।'

সোমেন চন্দের মৃত্যু একটি বিস্ফোরক ঘটনা। তার মৃতুতে দেশবরণ্য কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা একটি লিখিত বিবৃতি দেন। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে ছিলেন—

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, আবু সৈয়ীদ আয়ুব, প্রমথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতির্ময় ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখার্জি, আবদুল কাদের, কামাক্ষাপ্রসাদ চ্যাটার্জি, হিরণকুমার স্যানাল, সুবোধ মুখার্জি, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, সরোজ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত ও বিষ্ণু দে।

এই বিবৃতি ২৩-৩-৪২ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—পুরো বিবৃতিটি এখানে উপস্থাপন করছি—

'সম্প্রতি ঢাকা হইতে এক মর্মান্তিক সংবাদ আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ যখন শ্রমিকদিগের একটি শোভাযাত্রা লইয়া ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলনে যোগ দিতে যাইতেছিলেন তখন তাহাকে নৃশংসভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হইয়াছে। আমরা জানি যে, শ্রীযুক্ত চন্দ মার্ক্সপন্থী আন্দোলন এবং জনগণের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। লেখক হিসেবে ন্যায়ত এবং স্বভাবত তিনি যে ফ্যাসিস্টবিরোধী হইবেন ইহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। যে সমস্ত সংবাদ আসিয়াছে তাহা হইতে বোঝা যায় যে, তিনি এবং তাঁহার সহকর্মীরা তাঁহাদের রাজনৈতিক বিপক্ষ দলের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। একথা নিশ্চিত সত্য যে, পূর্ব হইতে চিন্তা করিয়া ও সম্পূর্ণ অকারণেই তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে এবং সম্ভবত তাঁহার বিপক্ষ দলই এই কার্য করিয়াছে। বাংলার রাজনৈতিক জটিলতা আমাদের নিকট দুর্বোধ্য। বিশেষ করিয়া ঢাকায় যে প্রতিহিংসার বিষাক্ত বাষ্প সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক আকাশকে দূষিত করিয়া তুলিয়াছে, আমরা তাহার পশ্চাতের মনোবৃত্তি অনুধাবন করিতে অক্ষম।

সোমেন চন্দ একজন উদীয়মান এবং বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি যে মাত্র লেখক ছিলেন তাহা নয়, তিনি তাঁহার নিজের চিন্তাধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুরূপভাবে দেশের ও দশের সেবায় যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার প্রকৃত উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে। ফ্যাসিবাদের কুৎসিত মূর্তি দেখিয়া প্রত্যেক দেশের সাহিত্যিকরা ফ্যাসিবাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৯৫www.amarboi.com ~

প্রতি নিজেদের ঘৃণা জানাইয়াছেন। ভারতবর্ষে আমরা আমাদের সভ্যতার অভ্যন্তরে এই দুষ্ট ক্ষত সম্পর্কে তীব্রভাবে এবং এক বাক্যে নিজেদের মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছি। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অপেক্ষা এত তীব্রভাবে সম্ভবত আর কেহই ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করেন নাই। এই দুর্দিনে দেশের মধ্যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী দল সংগঠন করিতে সোমেন চন্দ যে অগ্রসর হইবেন তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই থাকিতে পারে না। মাত্র এই কারণেই এবং এই অভিযোগেই গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তাঁহাকে আত্মবলি দিতে হইয়াছে। আমাদের একজন নির্ভীক সহকর্মীর মৃত্যুতে আমরা সন্তপ্তচিত্তে দেশের জনসাধারণের নিকট এই রক্তলিপ্সা এবং বিষকলুষ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে একবাক্যে তীব্র ঘৃণা জ্ঞাপন করিতে আবেদন জানাইতেছি'।

১১ মার্চ ১৯৪২ সনে অন্য আর একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে আনন্দ বাজার পত্রিকা। এই বিবৃতি প্রদান করেন

১. শ্রী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
সাধারণ সম্পাদক,
নিখিল ভারত সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি

২. সুধীন্দ্র প্রামাণিক
সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

৩. নন্দলাল বসু
সেক্রেটারি,
ভারতীয় লেবার পার্টি

৪. গোপাল হালদার
সেক্রেটারি,
নিখিল ভারত কিষণ

৫. অরুণ ভট্টাচার্য
সেক্রেটারি,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন।

তাদের বিবৃতি এখানে উপস্থাপন করছি—

১১ মার্চ ১৯৪২, নিখিল ভারত সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুধীন্দ্র প্রামাণিক, ভারতীয় লেবার পার্টির সেক্রেটারি নন্দলাল বসু, নিখিল ভারত কিষাণসভার সেক্রেটারি গোপাল হালদার এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সেক্রেটারি অরুণ ভট্টাচার্য সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য এই বিবৃতি দেন :

ঢাকার ই.বি. রেলওয়ে শ্রমিক সংঘের সেক্রেটারি কমরেড সোমেন চন্দকে কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করার সংবাদে এবং তথাকার ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন পণ্ড করার চেষ্টা হইয়াছে জানিয়া সমস্ত শ্রমিক সংঘ এবং ফ্যাসিবিরোধীগণ এবং আমাদের মনে হয় দেশের সর্বত্র প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিই স্তম্ভিত হইয়াছেন। আমরা বিস্তারিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৯৬www.amarboi.com ~

বিবরণের অপেক্ষায় রহিয়াছি এবং উহা না-জানা পর্যন্ত আমরা এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এবং পুলিশের গুলিচালনা সম্পর্কে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশে বিরত হইতেছি। পুলিশের গুলিচালনা সম্পর্কে অবশ্য এখন তদন্ত হইতেছে। কিন্তু যে সংক্ষিপ্ত সংবাদ জানা গিয়াছে, উহা হইতেও অনেক তথ্য জানিতে পারা যায় এবং যে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে আমাদের কমরেডদের এরূপ কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা সম্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে সম্যক ধারণা করা সম্ভব নয়। যাহাতে এরূপ জঘন্য অপরাধ পুনরায় সংঘটিত হইতে না পারে তদুদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত দেশের সমস্ত দায়িত্বশীল নেতৃবন্ধুদেরই কালবিলম্ব না করিয়া একত্রে পরামর্শ করা কর্তব্য।

ইতিমধ্যে ইতিহাসের বর্তমান সন্ধিক্ষণে সমস্ত ফ্যাসিস্ট বিরোধীগণের আজ ঐক্যবদ্ধ হওয়া কর্তব্য। বর্তমান ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীলতার দিনে ফ্যাসিস্ট বিরোধীগণ এবং যাঁহারা সুনিশ্চিতভাবে ফ্যাসিস্ট তাঁহারা যখন প্রকাশ্যেই কার্য শুরু করিয়াছেন, তখন সম্মুখে যে দুর্দিন সমাগত তাহার ভয়াবহ রূপই এই ঘটনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ফ্যাসিস্টপন্থী জাপানিগণ যখন আমাদের প্রিয় জন্মভূমির নিকটবর্তী হইয়াছে, সেই সময়ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মিত্রগণ ও স্বাধীনতা যাঁহারা ভালোবাসেন, যাঁহারা প্রিয় বলিয়া মনে করেন এবং যাঁহারা উহা প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্টদের নিকট বিসর্জন দিতে চাহেন না, তাঁহাদের সকলেরই আজ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিন আসিয়াছে। সোমেনের রক্ত আজ আমাদের যে বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে উহা কখনোই ছিন্ন হইবে না। যাঁহারা ভদ্র নিষ্কলুষ রাজনৈতিক জীবনযাপন করিতে চাহেন, আমাদের বিশ্বাস, অন্ততপক্ষে তাঁহারা নিশ্চয়ই এরূপ ফ্যাসিস্ট অপকৌশল ও জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইবেন।

গ. সোমেন হত্যা ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নেপাল মজুমদার লিখেছেন—

"কিন্তু সোমেনের রক্ত বৃথায় গেল না। সোমেনের মৃত্যু সংবাদ দেশের প্রতিটি বিরোধী লেখক শিল্পীর মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ২৮শে মার্চ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ এবং তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য স্মরণসভা ডাকা হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভায় বাংলার তৎকালীন বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতেই প্রগতি লেখক সঙ্ঘকে—'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সঙ্ঘ' নামে পুনর্গঠিত করার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

সোমেনের মৃত্যু সংবাদ ত্বরিৎ গতিতে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যুর ঠিক পরের দিনই অথাৎ ৯ মার্চ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন তাদের এক কার্যকরী সভায় মিলিত হয় এবং এই নারকীয় ও লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের নিন্দা প্রকাশ করে। তা ছাড়াও এই হত্যাকাণ্ডের বেসরকারি তদন্তের দাবি জানায়। এই সভার বিবরণ ১১ মার্চ ১৯৪২ Hindustan Standard পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

In a meeting of the working committee of the B.P.S.F held on the March the following resolution was accepted.

The attention of the Working Committee is drawn to the unhappy incident what has occurd at Dacca. This meeting

www.amarboi.com ~

condemns the act of murder, whoever or whatever organisation may be responsible for it.

It also condemns emphatically the action of the police.

It urges upon the minisry the necessity of insisting a non-official investigation commitee regarding the firing which took place at Dacca.

'অরণি' তখনকার দিনের আর একটি নামকরা পত্রিকা। এর সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি সোমেনের মৃত্যু প্রসঙ্গে লিখেন—

ঢাকা হইতে সম্প্রতি একটি দুঃসংবাদ আসিয়াছে। গত ৮ই মার্চ ঢাকা শহরে স্থানীয় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির উদ্যোগে একটি ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।....সংবাদে প্রকাশ, প্রায় পঞ্চাশজন যুবক বলপূর্বক সম্মেলনের প্যাণ্ডেলের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবকেরা তাহাদের বাধা দেয়, ফলে স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত এই যুবকদের এক সংঘর্ষ হয়।....ইহার কিছু সময় পরে একরামপুরে ই বি রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলনে যাইবার মুখে অতর্কিতে আততায়ী কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। গত সপ্তাহের আর একটি সংবাদে প্রকাশ, গত ২১শে ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা শহরে সুদর্শন লাল নামক স্থানীয় কলেজের জনৈক সাম্যবাদী ছাত্র ছুরিকাঘাতে গুরুতররূপে আহত হন।

....লক্ষ্য করিবার বিষয় নিহত শ্রমিককর্মী সোমেন চন্দ এবং আহত ছাত্রকর্মী সুদর্শন লাল উভয়েই আন্তরিকভাবে ফ্যাসীবাদবিরোধী এবং ফ্যাসিস্টবিরোধী জনযুদ্ধে যোগদানের সমর্থক বলিয়া পরিচিত। ফ্যাসিস্ট জাপানের আক্রমণ হইতে স্বদেশ এবং দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য ইহারা সর্বশক্তি লইয়া যুদ্ধে যোগদান করিতে কৃতসংকল্প।....ফ্যাসিস্ট জাপানের সম্ভাব্য আক্রমণে যখন ভারতবর্ষ এবং ভারতের জনসাধারণ বিপদাপন্ন, তখন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বস্বপণ করিয়া যোগদান করিতে তৎপর ফ্যাসিস্টবিরোধীদের সম্মেলন যাহারা পণ্ড করিতে সচেষ্ট এবং ফ্যাসিস্টবিরোধী জনসৈনিককে খুন করিতে প্রস্তুত তাহারা যে পরোক্ষে জাপানের গুপ্তচরের ভূমিকায়ই অভিনয় করে তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

ঘ. জাতীয়তাবাদী, ফ্যাসিবাদী ও বঙ্গীয় বিধান সভা সোমেন হত্যা সম্বন্ধে নানা বিতর্কিত ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশ করে। সম্মেলনে অংশগ্রণকারী জ্যোতিবসু, বঙ্কিম মুখার্জি এম. এল. এ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, স্নেহাংশু আচার্য এবং শামসুল হুদা এ সমস্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ করে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বিবৃতি দিয়েছেন।

সোমেন চন্দের মৃত্যু বুদ্ধদেব বসুকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিলো। সোমেনের মৃত্যুর পর পরই তিনি একটি কবিতা এবং 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য—

তরুণ সাহিত্যিক ও একনিষ্ঠ ফ্যাসিস্টবিরোধী কর্মী সোমেন চন্দের নৃশংস হত্যার জন্য দায়ী, তার তীব্র নিন্দা ক'রে এই পৈশাচিক মনোবৃত্তি যে আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে তাতে মর্মান্তিক বিক্ষোভ ও শঙ্কা প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৯৮www.amarboi.com ~

করেছেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের প্রথম সম্মেলনে উপস্থিত শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রে সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই প্রতিশ্রুত শত্রুকে রুখবার জন্য লেখক ও শিল্পীদের আসন্ন গুরুদায়িত্ব এক বাক্যে অঙ্গীকার করেন। তারপর সোমেন চন্দের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত 'প্রাচীর' নামক একটি কবিতা সংগ্রহের গান ও কবিতাগুলো ফ্যাসিস্ট বিরোধী আদর্শের জয়গানে মুখরিত।

ঢাকায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলনে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। সোমেনের এই অকালমৃত্যু এবং ফ্যাসিজমের বর্বরোচিত কাণ্ডে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেন—

.....যখন এ বছরের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে ঢাকার ফ্যাসিস্টরা স্বভাববিদ্ধ ধরণে প্রতিহিংসা নেয় এবং শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিবেদিত তরুণ ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন লেখক সোমেন চন্দকে নৃশংসভাবে হত্যা করে, তখন রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্বিশেষে লেখক ও শিল্পীরা ধিক্কার দিয়ে ওঠেন। বহুজনের স্বাক্ষরযুক্ত এই ইস্তেহারে একবাক্যে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করা হয়। শুধু নিন্দা নয়, আরও কিছু বেশি—আমাদের জনগণকে অবহিত করা হয় তেমনভাবে আমাদের প্রিয় দেশের অভ্যন্তরেও ফ্যাসিবাদ বিচরণ করছে এবং তাকে উৎপাটিত করার জন্য কেমনভাবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

তখনকার দিনে সংবাদপত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ দিকপাল ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই তৎপরতায় কোলকাতায় সোমেন হত্যার এক বিশাল শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তিনি সভাপতিত্ব, করেন।

এই সভায় ফ্যাসিবাদী গুণ্ডাদের দ্বারা সোমেন চন্দের নারকীয় হত্যার তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদ প্রকাশ করা হয়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী একটি লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে সেদিনকার দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও অধ্যাপক এবং গবেষক ও সমালোচকদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত কয়েকজনের নাম—

বিখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়, অতুল গুপ্ত, আবু সাইয়িদ আয়ুব, সত্যেন মজুমদার, হীরেণ স্যানাল, সজনী কান্ত দাস, নরেশ সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণুদে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন প্রমুখ।

জ্ঞান চক্রবর্তী সোমেন হত্যার দিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তার বিখ্যাত বই 'ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ'। এ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন—

'সোমেন চন্দের এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি বড় বড় শহরে এবং আরও অনেক জায়গায় সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিকদের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের সমস্ত ভাষায় প্রায় প্রতিটি পত্রিকাতেই এই হত্যাকাণ্ডের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া মন্তব্য, বহু সংখ্যক বিবৃতি, কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসু এই হত্যাকে উপলক্ষ করিয়া যে কবিতাটি রচনা করেন তাহা তাঁহার জীবনের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৯৯www.amarboi.com ~

সোমেন হত্যাকাণ্ডে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের আহ্বানে ১৭ মার্চ নিখিল বঙ্গ সোমেন দিবস পালন করে।

২৯ মার্চ ঢাকা জেলা ছাত্র ফেডারেশন, জেলা কৃষকসভা ও ই.বি. রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আহ্বানে বিরাট শোভাযাত্রা ঢাকা শহর পরিক্রমার পর, ছাত্রনেতা অমূল্য চন্দের সভাপতিত্বে করোনেশন পার্কে এক সভা অনষ্ঠিত হয়। বক্তৃতা করেন অজিত রায়, শিশির পাল, নির্মলেন্দু চ্যাটার্জি ও কিরণ রায়।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ২৯-৩-১৯৪২ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকা একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটি এখানে উপস্থাপন করছি—

'গত ২৮শে মার্চ অপরাহ্নে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট লাইব্রেরি হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখকগণের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে ফ্যাসিজমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া স্বাধীনতাকামী দেশবাসী ও লেখকগণকে আপদকালীন কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হইতে বলেন। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু সভাস্থলে একটি কালোপযোগী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী, অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার স্যানাল, শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার, কবি আবদুল কাদের ও ছাত্রকর্মী দেব বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক ও ছাত্রসম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একযোগে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করিতে আহ্বান করেন। শ্রীযুক্তা সুজাতা মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রবৃন্দের দুইটি গান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। উপসংহারে শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীগণকে বর্তমান সংকট সম্পর্কে সচেতন হইতে অনুরোধ করেন। সভাস্থলে ফ্যাসিস্টবিরোধী এবং জনযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপক বহু সুন্দর সুন্দর প্রচারপত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত, গোপাল হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে (আহ্বায়ক) লইয়া একটি সংগঠন কমিটি গঠিত হয়। ঢাকার তরুণ লেখক ও শ্রমিক কর্মী সোমেন চন্দের শোচনীয় মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়'।

ঢাকা জেলার সোভিয়েত সুহৃদ সংঘের যুগ্ম সম্পাদক শ্রী কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রী অচ্যুত গোস্বামী, ঢাকা জেলা কৃষক সমিতির অফিস সম্পাদক শ্রী রঞ্জিত সিংহরায়, ঢাকা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রী অজিত রায় এবং ই.বি রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জনাব মুহম্মদ কিফায়েত উল্লাহ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্ন বিবৃতি দিয়েছেন :

'গত ৮ই মার্চ রবিবার অপরাহ্নে সূত্রাপুরাস্থিত সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনের সকল কর্মসূচীই সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই সাফল্যের মূল্যস্বরূপ তরুণ সাহিত্যিক এবং শ্রমিক নেতা কমরেড সোমেন চন্দকে চিরতরে হারাইতে হইল। পুলিশের গুলিচালনায় অপর একজনও নিহত হইলেন। সম্মেলনকে পণ্ড করিবার জন্য যে সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামির পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহার স্বরূপ জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!১০০www.amarboi.com ~

বৈকাল ৫ ঘটিকা। সম্মেলন মণ্ডপে তিল ধারণের স্থান নাই। নির্বাচিত সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি আর একটু পরেই মণ্ডপে উপস্থিত হইবেন। এমন সময় প্রায় দেড় শত গুণ্ডা প্রকৃতির লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিনা প্রবেশপত্রে বলপূর্বক সম্মেলন মণ্ডপে প্রবেশ করিতে ও সম্মেলন ভাঙিয়া দিতে চেষ্টা করে। স্বেচ্ছাসেবকরা নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করিয়া নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া তাহাদের বাধা দেন এবং কয়েকজন আহত হইয়াও তাহাদিগকে হটাইয়া দিতে সমর্থ হন। গুণ্ডার দল তখন রাজপথ হইতে মণ্ডপ লক্ষ করিয়া ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকে।

ই.বি. রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক এবং ঢাকা জিলা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সহসম্পাদক সোমেন চন্দ সেই সময়ে এক্রামপুর অঞ্চল দিয়া রেল শ্রমিকদের এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়া সম্মেলনে যোগদান করিতে আসিতেছিলেন। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া একদল লোক সোমেন চন্দের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে রক্তপতাকা ছিনাইয়া লয়, উহা ছিঁড়িয়ে ফ্যালে এবং কমরেড চন্দকে পুনঃপুন আঘাত করিতে থাকে।

কমরেড চন্দের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স মাত্র ২১ বৎসর হইয়াছিল। এই তরুণ বয়সেই তিনি গল্প লেখক হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে কৃতসংকল্প এই শ্রমিককর্মী গুণ্ডাদের হস্তে প্রাণ হারাইল বটে, কিন্তু শহিদের এই রক্ত ব্যর্থ হইবে না—ঘৃণ্য হত্যাকারীর উদ্দেশ্য ত্বরায় বিফল প্রতিপন্ন হইবে'।

'পরিচয়' সম্পাদক ১৩৪৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লিখেছেন—

'লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর পটভূমিকায় একটি মাত্র লোকের মৃত্যু তুচ্ছ ব্যাপার মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বিশেষ পরিবেশে একজনের মৃত্যু বহু মৃত্যুর চাইতে বেশি অর্থবহ হ'তে পারে। সোমেন চন্দের মৃত্যু এই জাতীয়। সোমেনের বয়স বেশি হয়নি, কিন্তু এই অল্প বয়সেই মূল্যবান কাজ ক'রে সে তার তরুণ জীবনকে বিরল সম্পদে ঐশ্বর্যবাদ করেছিল। এই সংখ্যার গত সংখ্যায় ইঁদুর নামে যে গল্পটি প্রকাশিত হয় তাতে তার জীবনের একটি মাত্র দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় আমাদের আশ্চর্য ক'রে দেয়, কিন্তু এই তার পুরো পরিচয় নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব জীবনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে তার অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার প্রতিভাস মাত্র। এই অভিজ্ঞতাকে সজীব ও গভীর করেছিল বিশেষ একটি আদর্শ। সোমেন মার্ক্সবাদী ছিল। এই মার্ক্সবাদের প্রেরণাতেই সে ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নির্ভীকভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে প্রাণ দিতে হল এই বর্বরতার যূপকাষ্ঠে। সব থেকে শোচনীয় ব্যাপার এই যে, সোমেনকে যারা হত্যা করেছে তারা জার্মান ইটালীয় বা জাপানি নয়, তারা আমাদেরই দেশের লোক। ফ্যাসিস্ট বর্বরতার প্রভাব কী রকম ব্যাপক ও তার বিরুদ্ধে আমাদের কতখানি সতর্ক হওয়ার দরকার আছে এই ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আশার কথা এই যে, সোমেনের মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি। তার প্রমাণ পেলাম তার নামে উৎসর্গীকৃত 'প্রাচীর' নামে যে কবিতা সংগ্রহ দক্ষিণ কলকাতা ছাত্র সঙ্ঘ প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

করেছে তার থেকে। দেশের আবালবৃদ্ধবণিতার উচিত—যে পথে সোমেন অগ্রণী হয়ে প্রাণ দিল সেই পথে তার অনুসরণ করা। সমগ্র দেশের সামনে আজ এই একমাত্র পথ।'

১৯৪২ সালে ১ আগস্ট ১৫ কোর্ট হাউস স্ট্রিটে দ্বিতলে স্থাপিত হলো 'সোমেন-প্রদ্যোত পাঠাগার'। ক্রমে এটি কমিউনিস্ট পার্টির জেলা লাইব্রেরি হিসাবে পরিচালিত হয় এবং বৃহৎ আকার নেয়।

১৯৩৯ সালে, ভাষা আন্দোলনের সময়, মুসলিম যুবলীগের গুণ্ডারা এই লাইব্রেরি আক্রমণ ক'রে ধ্বংস করে।

কলকাতায় ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিটে, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'সোমেন পাঠাগার' গঠন করা হয়। ১৯৬২-৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হ'লে এটি উঠে যায়।

'কবিতা' পত্রিকা তখনকার দিনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী পত্রিকা। এই পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় (১৯৪৯) বুদ্ধদেব বসু সম্পদকীয়তে লিখেন—

ঢাকায় তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দর হত্যার সংবাদে বাংলার মনীষী মহলে যে উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে তা একান্তই সঙ্গত।

প্রথমত: সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে এ হত্যাকাণ্ডের পিছনে পূর্বসংকল্প ছিল এবং এর নিছক নৃশংসতাও অকথ্য।

দ্বিতীয়ত: নামহীন আততায়ীর রক্তাক্ত ছুরিকার আঘাতে যিনি প্রাণ হারালেন তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ প্রগতিশীল সাহিত্যিক, তার উপর গণআন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কর্মী। ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘ থেকে প্রচারিত ক্রান্তি বইটিতে তাঁর রচনায় সাহিত্যের স্বাদ ছিল এবং তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব পূর্ণতায় মঞ্জুরিত হতে পারলে নানা দিক দিয়েই তিনি তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব পূর্ণতায় মঞ্জুরিত হতে পারলে নানা দিক দিয়েই তিনি তাঁর সমসাময়িক জীবনে আপন স্বাক্ষর এঁকে দিতে পারতেন। এই হত্যার সংবাদে মর্মাহত হন নি, সাহিত্যিক ও ছাত্র সমাজে এমন কেউ যে নেই তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তাঁরা শুধু অকালে বিনষ্ট জীবনটির জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি; যে জঘন্য মনোভাব এই হত্যার জন্য দায়ী তারও তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তারপর সম্প্রতি ছাত্র সমাজ একই সঙ্গে নিহতদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও হত্যাকারীর প্রতি তাঁদের ঘৃণা প্রকাশ করেছেন 'প্রাচীর' নামক কবিতার সংগ্রহটি সোমেন চন্দের স্মৃতিতে উৎসর্গ করে। এ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অত্যন্ত শোভন হয়েছে, কারণ প্রাচীর বইটিতে বাংলার অনেক কবি তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যে মনোভাব সংস্কৃতি ও প্রগতির শত্রু। আমরা আশা করি ঢাকা থেকে সোমেন চন্দের বন্ধুরা তাঁর সম্বন্ধে একটি স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ করবেন, তাতে তাঁর নিজের কিছু কিছু রচনা ও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বন্ধদের প্রীতিতর্পণ সংগৃহীত হতে পারে। বইটি আকারে যদি ক্ষুদ্র হয় তবুও আজকের দিনে তার মূল্য হবে প্রচুর।

সোমেন হত্যার পর ২৩ মার্চ ১৯৪২ আনন্দবাজার পত্রিকায় আরও একটি বিবৃতি প্রকাশ পায়। এই হত্যাকণ্ডের ঘৃণা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান করেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি নীরেন্দ্রনাথ রায়, কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত, হিরণকুমার স্যাণাল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত প্রমুখ। বিবৃতিতে তারা বলেন—

'তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ যখন শ্রমিকদিগের একটি শোভাযাত্রা লইয়া ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সম্মেলনে যোগ দিতে যাইতেছিলেন তখন তাঁহাকে নৃশংসভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হইয়াছে। আমরা জানি যে, শ্রীযুক্ত চন্দ মার্ক্সবাদী আন্দোলন এবং জনগণের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। লেখক হিসাবে ন্যায়ত স্বভাবত তিনি যে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী হইবেন তাহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। যে সমস্ত সংবাদ আসিয়াছে তাহা হইতে বোঝা যায় যে, তিনি এবং তাঁহার সহকর্মী তাঁহাদের রাজনৈতিক বিপক্ষদলের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।....'

সোমেন চন্দ হত্যাকে উপলক্ষ করে অশোক মিত্র একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম 'ক্ষতবিক্ষত সেই মৃতদেহ'। অশোক মিত্রের লেখায় শুধু সোমেন চন্দ নয় যুগ কাল এবং ইতিহাস চেতনার উত্তাপ ও সঞ্চারিত হয়েছে। প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি—

'....পঞ্চাশ বছর ধ'রে একটু একটু ক'রে চুইয়ে পড়া অভিজ্ঞতা, কে জানে, সেই পুরনো দিনগুলিই ফিরে আসছে কি—না। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার ফিকে হয়ে যাওয়া আতঙ্ক কাহিনী, ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে, শব-ব্যবচ্ছেদের পালা ঘোচবার পর সোমেন চন্দর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ নিজেদের অঞ্চলে ফিরিয়ে আনতে হবে, সন্তর্পণ শোকযাত্রা, ছমছম আতঙ্ক, গৃহস্থ সম্প্রদায় ভরে ঘরের মধ্যে সিঁধোনো, কমরেডদের প্রেতস্বরে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা : কে জানে, জনশ্রুতি, গুণ্ডাশাহির জিঘাংসার এমন-কি সাময়িক নিবৃত্তিও ঘটেনি, কে জানে তারা না-কি মৃতদেহটি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে বুড়িগঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়ার মতলব ভাঁজছে, তাই অতি সন্তর্পণে, চারিদিকে, সতর্ক দৃষ্টি রেখে, শহিদ নিয়ে শহিদের ঘরে ফেরা। সেই আতঙ্কের দিনগুলিই কি পুনরাবর্তন করবে? হঠাৎ আশপাশে ফ্যাসিবাদমন্যদের নতুন ক'রে গজানো আস্ফালন, দম্ভোক্তির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত তাদের এক কিমাশ্চর্য অতঃপরম যুক্তি : পূর্ব ইয়োরোপ থেকে পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিকাঠামো ইত্যাদিকে গলায় গামছা পরিয়ে বিদায় দেওয়া হয়েছে, অথচ আমাদের দেশে এই উটগুলোকে এখনো তড়পাচ্ছে, অচিরে একটা বিহিত করতে হয়। যদি আমরা সজাগ না-থাকি, ফ্যাসিবাদ ফের হয়তো মাথা তুলবে আমাদের স্বভূমিতেই, সোমেন চন্দ থেকে সফদর হাশমি পর্যন্ত কাহিনীতে একই প্রবাহমানতা। সোমেন চন্দ যে প্রেরণা জুগিয়ে দিয়েছিলেন, ক্রান্তির লগ্নে আমরা প্রমাণ দাখিল করতে পারব তো তা অনিঃশেষ? অন্যথা ইতিহাস ক্ষমা করবে না আমাদের।'

সোমেন চন্দ গল্প লিখতেন, কবিতা লিখতেন, উপন্যাস লিখতেন এবং দানবীয় ফ্যাসিবাদ এ জন্য তাকে হত্যা করেনি। সোমেনকে হত্যা করা হয়েছে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য, আন্দোলন ও মিছিল-স্লোগানের জন্য—। এ প্রসঙ্গে অশোক মিত্র বলেছেন—

www.amarboi.com ~

শ্রেণীযুদ্ধে মায়া-মমতার স্থান নেই, সোমেন চন্দকে কুপিয়ে হত্যা ক'রে দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা করা হল; বাড়িতে ব'সে সাহিত্যচর্চা কর আপত্তি নেই, কিন্তু রাস্তায় নেমে এসে মজুর খ্যাপালে রেহাই নেই কারও, পৃথিবীর ইতিহাস সঙ্ঘবদ্ধ মানুষ শেষকথা বলবে না—মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তেই দেওয়া হবে না, গুণ্ডাশাহী শেষকথা বলবে।

সোমেনকে পৈশাচিক হত্যার পর তার মৃত দেহ নিয়ে যাওয়া হল মর্গে। এ প্রসঙ্গে আমরা জানতে পারি—

'সোমেন চন্দের মৃতদেহ পুলিশ-হেফাজতে মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। মর্গের ভেতর থেকে সেই শবদেহ বার ক'রে নিয়ে আসেন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, রণেশ দাশগুপ্ত, দীনেশ দত্ত (সেই সময়কার কমরেড), ও আমি নিজে। এখন ভাবতে অবাক লাগে যে, কবি কিরণশঙ্করের মতো নির্বিরোধী স্বল্পকথার মানুষ কী এক অদ্ভুত আবেগে সেই মর্গে গিয়ে সোমেন চন্দের ছিন্নভিন্ন শবদেহের পাশে দাঁড়ান। আর মনে পড়ে, রণেশ দাশগুপ্তের থমথমে নির্বাক মুখখানা। অনেকের ধারণা, সেই সময়ে কমিউনিস্টরা ভয়ে সোমেনের মৃতদেহ সাদা চাদরে মুড়ে ঘোড়ার গাড়ির ওপর চাপিয়ে চুপে চুপে সেই শবদেহ লালবাগ শ্মশানে সৎকার করতে যান। এটা একটা সাঙ্ঘাতিক ভ্রান্ত ধারণা।.....

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, সোমেন চন্দের মৃতদেহ থেকে (মর্গ থেকে বার করার পর) যে ভয়ঙ্কর গন্ধ বেরুচ্ছিলো—সে অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ কাঁধে বহন ক'রে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। তারপর দাঙ্গা-হাঙ্গামা হ'তে পারে (আর.এস.পি-র গুণ্ডারা করতে পারে) আশঙ্কা ক'রে পুলিশ মিছিল করতে দ্যায়নি। তাই সোমেন চন্দের মৃতদেহ কাপড়ে ঢেকে ঘোড়ার গাড়ির ওপর স্থাপন ক'রে লালবাগ শ্মশানে নিয়ে শেষ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। সেই শবদেহের সাথে যাঁরা শ্মশানে গিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, রণেশ দাশগুপ্ত, প্রশান্ত সেন, গোপাল দে, কালি সূত্রধর, আমি নিজে এবং আরও অনেকে—বিশেষত, তাঁতিবাজারের কমরেডরা ও গ্যাণ্ডারিয়ার কমরেডরা। লালবাগ শ্মশানঘাটে কমরেড জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখার্জী, স্নেহাংশু আচার্যও উপস্থিত ছিলেন। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী শ্মশানঘাটে সোমেন চন্দের উপর এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন।'

২৮ মার্চ ১৯৪২ বিকেলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের আয়োজনে সোমেন হত্যাকণ্ডের প্রতিবাদে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখকদের নিয়ে এক প্রতিবাদ ও শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি হলে। এই সভায় কবি বুদ্ধদেব বসু সোমেনের ওপর একটি কবিতা পাঠ করেন।

সোমেন হত্যার কিছুদিন পর 'প্রাচীর' নামে ফ্যাসিস্টবিরোধী একটি সংকলন বের করা হয়। উৎসর্গ পত্রে ছিলো

'সোমেন চন্দের স্মৃতিতে'

এই সংকলনে বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেনের কবিতা ছিল বিশেষ আকর্ষণ। দুটি কবিতাই এখানে উপস্থাপন করছি—

www.amarboi.com ~

প্রতিবাদ: বুদ্ধদেব বসু

করেছি শপথ
কতদিন মনে-মনে
ঘৃণারে করিব ঘৃণা।
তীব্র তার তাপ
লক্ষ্যেরে স্পর্শে না, শুধু আপনারি অন্তর -কটাহে
ধূম্র-নীল অন্ধ দাহে
ফেনিল সর্পিল
বিষ-বাষ্প উথলায়।
তার চেয়ে ভালো ক্ষমা, তার চেয়ে উপেক্ষা ধারালো
এ-কথা বুঝেছি মনে মনে।
ঘৃণ্যজন শুধু ঘৃণ্য নয়
অতি তুচ্ছ সে যে,
অত্যন্ত অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু প্রাপ্য নেই তার।
ঘৃণার উত্তরে ঘৃণা বর্বরের নীতি,
আমি যদি ঘৃণা করি, আমিও যে সঙ্গী হবো তবে
ঘৃণিতের ক্লেদলিপ্ত কলঙ্কিত শয্যার।

তাই আমি নিঃশব্দে সয়েছি
মূঢ়তার অত্যাচার, হীনতার প্রবল আক্রোশ।
যে-বীভৎস ইতরতা চলে বঙ্গভূমে
সমালোচনার ছদ্মবেশে,
যে-পশুত্ব জীবনের অন্তঃপুর লক্ষ্য ক'রে হানে
পুতিগন্ধ রসিকতা অশ্লীল উল্লাসে
তারও জঘন্যতা
অনায়াসে উপেক্ষা করেছি।
এমনকি, যারা
এ-কুৎসিত রঙ্গালয়ে উৎসাহী দর্শক
ট্রামে কিংবা বাস্-এ দেখা হ'লে
ঘাড় নেড়ে ভদ্র হেসে বলেছি তাদেরও ঃ
'কী খবর? আছেন তো ভালো?
বহু দুঃখ স'য়ে বহু যুদ্ধ ক'রে
অন্তরে বিলীন ক'রে অসংখ্য আক্ষেপ
বুঝেছি ঘৃণার চেয়ে ঘৃণ্য কিছু নয়,
ঘৃণিতের উপেক্ষা করাই
জেনেই মনুষ্যধর্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আজ বিশ্বগ্রাসী বর্বরবাহিনী
ত্যাগ ক'রে ভদ্রতার শেষ স্বচ্ছ আবরণটুকু
ছিন্ন ক'রে ভণ্ডামির ভব্য বেশ
ভুলে গিয়ে লোকলজ্জা—সাধুতার অন্তিম আশ্রয়—
চলে দলে-দলে
প্রলয়ের করাল কল্লোলে
যত ক্রুর ততই সে মূঢ়,
যত দম্ভ তত হিংসা তার
আসুরিক তেজে স্ফীত হত্যার পিপাসা
উলঙ্গ উদ্ধত।
নারীহত্যা শিশু হত্যা ভ্রূণহত্যা ক'রে
তৃপ্তি নেই তার।
যা কিছু সুসভ্য শান্ত, যা-কিছু সুন্দর,
এ জীবনে যা-কিছু চরম মূল্যবান
তারি পরে প্রচণ্ড আক্রোশে
দাঁতে দাঁত ঘষে।
রাজপথে স্তূপীকৃত গ্রন্থাবলী দিয়ে
সজায়ে নারকী চিত্য সভ্যতার শবদাহ করে,
ধ্বংস করে বিদ্যালয়, বিদ্যার্থীর রক্তে করে স্নান।
যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়, যাঁরা মহাপ্রাণ
কবি যাঁরা শিল্পী যাঁরা জ্ঞানী যাঁরা

অরাজক অন্ধকারে একমাত্র আলোর ইশারা,
অত্যাচারে অপমানে নির্বাসনে
রক্তচক্ষু শাসনে ত্রাসনে
তাঁদের বিনাশ এর শৌচিক ব্রত।
রয়েছে উদ্যত
রক্তলোভী সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা—
যারা চায় শান্তি স্থিতি, মুক্তির তপস্যা যারা করে
তাদের হৃৎপিণ্ড 'পরে
যে কোনো মুহূর্তে বিদ্ধ হবে
ক্ষিপ্ত কুক্কুরের
বিষাক্ত দাঁতের মতো।

আজ এই ক্রান্তিকালে নিজেরে শুধাই ফিরে-ফিরে
ক্ষমা? এরও ক্ষমা আছে? এ উন্মত্ত হননবৃত্তিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীরবে সহিতে পারে এত বড়ো মানবমহিমা
জানি না সম্ভব কিনা
এই শুধু জানি
যারা মুছে দিতে চায় সে-অমৃতবাণী
যার অঙ্গীকার
মানুষের চিরন্তন উত্তরাধিকার,
উদ্দীপ্ত তরুণ প্রাণে
ঘাতকে অস্ত্র যারা হান,

মানুষের যে-মূল্য পরম
তারে করে পদাঘাত যাদের বিক্রম তাদের দুঃসহ পাপে
তীব্র অভিশাপে
যদি না দহিতে পারি অগ্নেয় ঘৃণায়,
যদি না ঝঙ্কারি' ওঠে ধিক্ ধিক্ আমার বীণায়
তবে ব্যর্থ কবিজন্ম—মনুষ্যত্ব, তাও তবে বৃথা,
পশুত্বের প্রতিবাদে নিখাদে রেখাবে আজ হোক উদ্দীপিতা
আমার কবিতা।

'সোমেন চন্দের স্মৃতিতে' উৎসর্গ করা সময় সেনের কবিতার শিরোনাম হল—নববর্ষের প্রস্তাব।

নববর্ষের প্রস্তাব: সমর সেন

শীতকাল; দূরে বিস্মরণী বরফ পাহাড় ঢাকা
গুমোট কুয়াসা সহরে জম্‌কালো আসর থেকে ফিরি,
এদিকে ওদিকে চকের প্রান্তে দেখি
খড়কুটোয় ছোট ছোট আগুন জ্বালে ভিখিরিরা,
সেঁকে দিন-শেষের চাপাটি, কোথায় কুসিট,
উপরে মহাশূন্য, মারণমন্ত্র পড়ে উত্তরে হাওয়া;

তারপর কী দারণ গ্রীষ্ম!
রাশি রাশি গোলাপ ফোটে আর ঝরে,
সৌখীন দৃশ্য।
সুখ বাড়ন্ত, এদিকে দিন বেড়ে চলে
দুরারোগ্য ক্ষতের যন্ত্রণায়,
উৎসব ত অতিক্রান্ত,
স্মরণের মাছি ঘোরে
পথপ্রান্তে নিঃস্ব কতো জরদগব ভিখিরীকে ঘিরে।

www.amarboi.com ~

(২)

সমাজে মধ্যপদ ধীরে ধীরে লোপ পায়
বণিকেরা প্রাকার বানায়,
দিনে দিনে চক্রবৃদ্ধি হারে
নিরন্ন বেকারের মজুরের ভিখিরীরা সংখ্যা বাড়ে,
সারি সারি রক্তমুখ সৈন্য চলে যমের দক্ষিণ দুয়ারে,
দিন হতে দিনে, মৃত্যু হতে আর এক মৃত্যুতে এ কী যাত্রা,
প্রবল মড়কে, শেষহীন নরকে তার শেষ যাত্রা।
অনেকদিন পরে গুমোট আকাশ আজ কথা কয়:
পিতৃপুরুষের স্বার্থবোধে পেয়েছিলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার;
আজ আদিম জোয়ারে যখন ভেসে যাবে সংসার
কোন্ মাচায় বাসা তখন বাঁধবে আবার?
দিগ্বিজয়ী অন্ধকারে শুভবুদ্ধি আলো,
কে জ্বালবে বলো?

(৩)

সত্তার কৌলীন্য খোয়াবে না কোনো দিন
এই গর্বে জিইয়ে থাকে বুদ্ধিজীবীরা।
বিশ্বকে বিচলিত করার সাহস রাখে না,
চিন্তিত দর্শক, হয়ত বোঝে
দুনিয়াদারীর দুর্দিন, বাজার অন্ধকার,
পথে জম্‌কালো স্তব্ধতা;
বেগতিক দেখে মহাত্মাদের প্রস্থান,
নিশাচরের নাচ নির্জন হাটে।

(৪)

ঘরে ফিরি, আলো জ্বেলে কুলুঙ্গীতে রাখি
এ অন্ধকারে আরো অনেক অন্ধকার জমে!
চলিত সভ্যতার মোড়ে বিপরীত মতামতে ধাঁধা লাগে,
কোন্ ঘাটে তরী ভিড়াই?
নতুন মানুষের জন্মে
আবার জন্মমৃত্যু প্রেমের কারাগার রচে,
বিষে বিষ অক্ষয় হয়।
স্বার্থপর ও অর্থহীন শরীরের কারবার
যদি না গড়ি নতুন বিশ্ব সংসার।
অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি
অনেক লোক যেখানে
সেখানে সত্তার নতুন সূর্য ওঠে,
কালের ঘোলাটে জলে জোয়ার লাগায়
সম্ভব হয় অনেকের খেয়া পারাপার,
গভীর জলে একের শবদেহ ডোবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমেন চন্দের সাহিত্য চিন্তা

এক:

সোমেন চন্দের সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভিক পর্বে পারিবারিক প্রভাব যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি রয়েছে আন্দামান ফেরত বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর। এ প্রসঙ্গে সতীশ পাকড়াশী তার 'অগ্নিযুগের কথা' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমি তার পুরো লেখাটাই এখানে উপস্থাপন করছি—

'মহৎ কর্মপ্রেরণার আত্মদান বৃথা যায় না। বিশ্বমানবের কল্যাণে ইংলন্ডের তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক র‍্যাল্‌ফ্ ফক্সের (Ralph Fox) আত্মদান গণমানবের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বছর চারেক আগেকার কথা। ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে ব'সে তরুণ যুবক সোমেনের সাথে এই কথাটাই হচ্ছিল—আগ্রহভরা গভীর প্রাণে সোমেন ভাবছিল,— স্পেনে গণসমষ্টির জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস—আন্তর্জাতিক বাহিনী—বৃটেনের গণ-সাহিত্যিক, বিপ্লবী কমিউনিস্ট র‍্যাল্‌ফ্ ফক্সের স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদান—স্পেনের জনগণের ধন-সম্পদের মালিক ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম, বিদেশি কবি, সাহিত্যিক অধ্যাপক ও রাজনীতিকর্মীদের জীবন উৎসর্গ—এইসব টুকরো টুকরো কথাগুলো একত্রে মিলিয়ে সোমেনের মনে এক অপূর্ব ভাব বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার হল। সোমেন জিজ্ঞাসা-ভরা প্রাণে ব'লে উঠল—'সাহিত্যিকও মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল!' আমি বললাম, অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন কলম ছেড়ে তরবারি ধরতে হয়—বুকের রক্তে তখন নতুন সাহিত্য তৈরি হয়। ধন-শোষণ মদমত্ত ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে কবি ও সাহিত্যিকগণ তাই স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছুটে গিয়েছিলেন। সাহিত্য-সাধনায় লাঞ্ছিত-গণমানবের মর্মকথা ফুটিয়ে তোলবার যে প্রেরণা, সেই প্রেরণাই লেখককে গণমানবের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে। সোমেন চুপ ক'রে শুনে একটু পরে বলল, 'এরাই সত্যিকার সাহিত্যিক'। রাত্রিতে আমরা ফিরলাম। সোমেন তার গুটি দুই-তিন লেখক-বন্ধুদের নিয়ে নতুন সাহিত্যের কথা বলতে বলতে বাড়ি গেল।

এরা সবাই ছোট ছেলে—২০/২২-এর বেশি বয়েস কারও নয়। সবেমাত্র কলেজের পড়া ছেড়েছে। কেউ গল্প লেখে, কেউ কবিতা, কেউবা একটা-আধটা প্রবন্ধ। একে অন্যকে প'ড়ে শোনায়। স্থানীয় মাসিকপত্রে মাঝে মাঝে প্রকাশ করার সুযোগও পায়।

ঢাকা শহরে ছোট-বড় অনেক মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবকদের তথাকথিত রাজনীতিক বিপ্লবী সঙ্ঘ আছে। এরা কোনো দলেই যায় নাই। সোমেন একদিন বলে, দলের টানাটানি আমাকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে যাই নাই—কেবল মারামারি রেষারেষি ওদের কাজ, আমার ভালো লাগে না।

আন্দামান-ফেরতা, টেররিস্ট বিপ্লবী দলের পুরনো কর্মী ব'লে, প্রথমটায় সে আমার দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রথম দিনের পরিচয়েই আমি তাকে বলি—সাহিত্য-রচনার পথেও

www.amarboi.com ~

বিপ্লবের কাজ হয়। তুমি দেশের দারিদ্র্যপীড়িত দুঃখী জনগণের আশা-উদ্যমহীন জীবনের কথা দিয়ে জীবন্ত গণসাহিত্য তৈরি কর—তাহলে তোমার ইপ্সিত স্বাভাবিক কর্মপথই ভবিষ্যৎ গণবিপ্লবের পথ প্রস্তুতির সহায়ক হ'তে পারে। লেখার দিকেই তার বেশি টান—এইটে বুঝেই ঐ কথা বলেছিলাম। সোমেন সব কথাই মনোযোগ দিয়ে শোনে, কিন্তু কিছু বলে না। তবু তার আগ্রহটা বোঝা যায়।

১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি সোমেন তার দক্ষিণ মৈশণ্ডী পাড়ায় আমাদের কমিউনিস্ট পাঠচক্রে যোগ দ্যায়। গোপনে ক্লাশ হতো। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সে শুনত। বেশি প্রশ্ন করত না। কৃষক-শ্রমিকের জীবনকথা, কোটি কোটি দরিদ্র জনগণের মর্মব্যথা, তাদের সংগঠন, জাগরণ, মার্ক্স-লেনিন প্রদর্শিত সংগ্রামী পথে সাম্যবাদের নবজীবন তাকে নতুন প্রেরণা দিল। একদিন ক্লাশের পড়ার পর তার বাসায় গেলাম। নতুন কী লিখছে জিজ্ঞাসা করায় সে একটি গল্প প'ড়ে শোনাল। দেখলাম, গল্পে আমার ক্লাশের পড়ার ছাপ পড়েছে। বেকার মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখ অশান্তি, তারই পাশে মুসলমান গাড়োয়ানদের দুর্গত বস্তি-জীবন, অপরদিকে বাড়িওয়ালা মহাজনদের ধনৈশ্বর্যপূর্ণ প্রাসাদ, ধনীর নিদারুণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ জীবনের দাম্ভিকতার ছবি ফুটেছে সোমেনের লেখায়। চাকা ঘুরেছে। লেখকের বিষয়বস্তু দৃষ্টিভঙ্গি আর পূর্বের মতো নাই। রসবোধ নতুনতর। গল্পসৃষ্টি ও লেখনভঙ্গি আগে থেকেই সুন্দর। বেশ ভালো লাগলো সোমেনকে। শান্ত স্বভাব, সরল, কিন্তু গভীরভাবে উদ্দীপনা জেগেছে প্রাণের পরতে পরতে। সোমেন কমিউনিস্ট পার্টিতে ভিড়ে পড়ল। আগ্রহশীল বিশ্বস্ত কর্মীর প্রশংসমান দৃষ্টি তার উপর। পুলিশের খাতায় এখনও নাম ওঠে নাই, কাজেই দক্ষিণ মৈশণ্ডীর 'প্রগতি পাঠাগার'-এর পরিচালনার ভার পড়ল সোমেনের উপর। সোমেনের অমায়িক স্বভাবে পাড়ার ছেলেরা গুণমুগ্ধ। প্রগতি পাঠাগারের সাপ্তাহিক বৈঠকে সোমেনের গল্প ও প্রবন্ধ হতো সবচেয়ে ভালো।

তখন ঢাকায় ৬/৭-টি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র ছিল। মধ্যযুগীয় ভাবধারা-মিশ্রিত আধুনিক বুর্জোয়া মতের গল্প, প্রবন্ধ, আর্ট অস্পষ্ট রাজনীতি ছিল ঐ কাগজগুলোর উপজীব্য। প্রগতিশীল নতুন লেখনগণ অজ্ঞাতকুলশীল ও অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল—তেমন লেখন-প্রতিভাও এদের ছিল না। এই লেখকদের সংগঠিত ক'রে প্রতিক্রিয়াশীল বড় বড় সাহিত্যিকদের মাঝে একটা নতুন সাহিত্য চক্র দাঁড় করানোই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। নতুন গণসাহিত্য সৃষ্টির কাজে রণেশ দাসগুপ্তের উৎসাহ, রচনা-ক্ষমতা, ও জ্ঞানবুদ্ধি যথেষ্ট প্রখর। এই যুবক মেধাবী লেখকের জোরেই আমরা 'ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের কাজে অগ্রণী হলাম। বিভিন্ন পাড়ায় অজানা লেখকদের সঙ্গে সংঘ গঠনের কথাবার্তা চললো। সনাতনী সাহিত্যের গোঁড়ামি এবার ভাঙবে।... আমরা নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ যুবক লেখকদের নিয়ে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' গঠন করলাম। সপ্তাহে একদিন সঙ্ঘের বৈঠক হোতো। কবিতা, গল্প, সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করা হোতো এবং সাহিত্য বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা হত। মিটিং-এর ব্যবস্থা করা, সকলকে খবর দেওয়া, নতুন সভ্য সংগ্রহ করার কাজে সোমেনের উৎসাহ থাকায় তারই উপর এ সকল কাজের ভার পড়ল। সে প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকত, প্রায়ই গল্প লিখে নিয়ে আসত। ক্রমে তার লেখা ভাবাবেগ-সিঞ্চিত বেদনার্ত অভিব্যক্তি থেকে রূঢ় বাস্তবের চেতনায় রূপায়িত

দুনিয়ার পাঠক এক হও!www.amarboi.com ~

হলে বিপ্লবখাতে প্রবাহিত হল। যা কিছু জড়, অনড়, সনাতন—যা কিছু গতানুগতিক, প্রগতিবিরোধী—সবেরই মূলে সে করল কুঠারাঘাত। ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সে লিখবে এবং নিপীড়িতগণের বিপ্লবী সঙ্ঘ গঠন করবে—এমনই তার সঙ্কল্প! পরে সে 'প্রগতি লেখক সমিতি'র সম্পাদক হয়।

সোমেন গল্প লিখতো। ঢাকার মাসিক ও সাপ্তাহিকে মাঝে মাঝে তা বের হতো। শ্রীহট্টের একটি মাসিকপত্রে এবং কোলকাতার কোনো কোনো মাসিকপত্রেও তার গল্প প্রকাশিত হতো। অনেক গল্প—খাতাতেই থাকতো। অজানা লেখকের লেখা কেই-বা নেবে?

সোমেনের বন্ধুরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নারীজীবনের মাধুর্য এবং অজানার সুন্দর পরিকল্পনা নিয়ে কবিতা ও সাহিত্য রচনা করত—পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ লিখত। প্রগতি লেখকদের দলে ভিড়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হোলো, লেখক-প্রতিভার স্ফুরণ হোলো, তারা ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠল—আত্মগত ভাবসৃষ্টির স্থানে বস্তুগত ভাবপ্রকাশের দ্যোতনা হোলো তাদের মনে, সমাজ-মনের সত্যিকার পরিচয় রূপায়িত হলে উঠল তাদের নতুন লেখায়—নতুন ভাবধারায়, নতুন চিন্তায় ও আলোচনায়। এক কথায় সকলেই গণমানবের দরদী সাহিত্যিক হয়ে পড়লো। সোমেন ঐ দলের অগ্রণী কর্মীরূপে তাদের আগে আগে চলেছিল।

সোমেনকে ঢাকার একজন প্রবীণ সাহিত্যিক বলেছিলেন, 'কী হে, তোমরা না-কি একটা প্রগতি লেখকের দল বেঁধেছ! সাহিত্যের আবার প্রগতি পশ্চাদ্‌গতি কী? সাহিত্যে রসসৃষ্টি করতে পারলেই তা প্রকৃত সাহিত্য হয়। সোমেন সৌজন্যের সঙ্গে উত্তর দ্যায়, 'রসবোধ তো সকলের সমান নয়, তাইতেই যত দ্বন্দ্ব-বিরোধ। সেকালের জমিদারের প্রতাপ ঐশ্বর্য শাসন শোষণ দিয়ে পল্লীগাথা রচিত হতো—একালে পল্লীবাসী প্রজার দারিদ্র্য, অন্যায়-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ফুটিয়ে তুলে সাহিত্য প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে হয়। প্রবীণ চায় জমিদারের প্রতিষ্ঠা, আর নবীন চায় জনগণের প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা। বুদ্ধিমান কোনো লেখক হয়তো দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে একটা মধ্যমপন্থার মীমাংসা দিয়ে সাহিত্য প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন।' প্রবীণ ব্যক্তিটি উষ্মাভরে ব'লে উঠলেন, 'তোমাদের সেই এক কমিউনিজমের বুলি। রাশিয়া থেকে আমদানি করা সাহিত্য এদেশে চলবে না। তোমাদের প্রগতি লেখকদের সঙ্গে এইখানেই আমার বিরোধ।' 'এ শুধু আপনার মনের কথা—আপনার সাথে তর্ক করে বৃথা'—এই ব'লে সোমেন চ'লে এলো।

১৯৪০/৪১ সালের ঢাকার অনেক কমিউনিস্ট জেলে গেল—অনেকে গোপনে কাজ করার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। সোমেন তখন বৈপ্লবিক কাজে আরও তৎপর হয়ে উঠলো। সাহিত্যচর্চার অবসর বড় একটা রইলো না। সে ঢাকা রেলওয়ের মজুর ইউনিয়নে যোগ দিয়ে কাজ করতে লাগলো; মজুরের বস্তিতে, কারখানার গেটে, এঞ্জিন-শেডের কাছে কয়লার ধোঁয়ার নিচে দাঁড়িয়ে শোষিত শ্রমক্লান্ত মজুরদের সঙ্গে কথা কয়—ইউনিয়নের লাল পতাকার তলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে উৎসাহ দ্যায়। রেল-মজুররা তাদের তরুণ-নেতা সোমেনকে বিশ্বাস করতো—ভালোবাসত। ফ্যাসিস্ট বর্বরতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উদ্দীপনা তারা পেয়েছিল তাদের নেতা কমরেড সোমেনের কাছ থেকে।

সোমেন আগে একবার ঢাকেশ্বরী মিলে কিংবা নারায়ণগঞ্জের পাটকলে গিয়ে মজুরের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হ'তে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু লেখক সঙ্ঘের থেকে তাকে তখন ছাড়া যায় নাই। পার্টির স্বার্থে আমরা তাকে লেখক সঙ্ঘে রাখা অপরিহার্য মনে করেছিলাম। লেখক সঙ্ঘের স্বার্থেও ফ্যাসিবিরোধী বিপ্লবী সাহিত্যিকের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল।

মাঝে মাঝে সে ঢাকা শহরের আশেপাশে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ একঘেঁয়ে জীবনের সন্ধান নিতো। মজুর-কৃষকের লাঞ্ছিত অনাদৃত জীবন থেকে সে গণ-সাহিত্য রচনা করার প্রেরণা পেয়েছিল। 'সাহিত্যকে শ্রমিক-বিপ্লবের সহায় হতে হবে। ফ্যাসিজম ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে—' আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সঙ্ঘের বিশ্ববিখ্যাত সম্পাদক ডিমিট্রভের লেখকদের প্রতি ঐ নির্দেশ সোমেনের জীবনে প্রতিফলিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দ্যাখা গিয়েছিল।

তার অন্তরের প্রেরণা সাহিত্য রূপ দেওয়ার আগেই ফ্যাসিস্ট ঘাতকের ছুরি তার বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে দিল। প্রতিক্রিয়াশীল বর্বর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল উন্নত গণতন্ত্রবাদের সংগ্রামে তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক সোমেন চন্দ মৃত্যুবরণ ক'রে হল—স্পেন, সোভিয়েট, ও চীনের আত্মদানকারী গণসাহিত্য-স্রষ্টাদের পথের সাথী।

রেলওয়ে মজুর সঙ্ঘ গঠনের কাজে সোমেন এমন কৃতিত্বের পরিচয় দেয় যে, তাকেই ইউনিয়নের সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়।

প্রথম থেকেই সোমেনের লেখার দিকে ঝোঁক ছিল ব'লে কমিউনিস্ট-পরিচালিত প্রগতি লেখক সঙ্ঘে তার ডাক পড়ে সবার আগে, সেও তার সাহিত্য-সাধনার স্বাভাবিক কর্মপথে আগ্রহশীল প্রাণে যোগ দিয়ে নিজের লেখন-প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ক'রে নেয়। রাজনৈতিক কর্মপ্রেরণা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—বিপ্লবী গণ-আন্দোলনকে বাদ দিয়ে শুধু সাহিত্য সাধনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে সে পারে নাই। ফ্যাসিস্ট দানবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টায় সকল শক্তি নিয়েই অগ্রসর হওয়া তার কাম্য ছিল—তার জন্যই সে সাহিত্য ছেড়ে শ্রমিক সংগঠনে লেগে যায়। তার লেখক-বন্ধুদেরও সোমেন প্রথমে টেনে আনে নতুন লেখক সঙ্ঘে। পরে তাদের কমিউনিজমের বিপ্লবী রাজনীতিতেও আকৃষ্ট ক'রে তোলে। এইখানেই বাইশ বছরের যুবকের প্রতিভা ও কর্মকুশলতার পরিচয়। লেখা দিয়ে ভাববিপ্লব আর কাজ দিয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়—সোমেন তা শিখেছিল।

ঢাকা জেলা ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলন রেল মজুরদের একটি মিছিল নিয়ে আসার সময় প্রকাশ্য রাজপথে ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক গুণ্ডার দল সোমেনকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে। তারা তাকে ভোজালি দিয়ে আঘাত করেছিল—মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরেছিল—চোখ উপড়ে দিয়েছিল। লাল পতাকা হাতে নিয়ে সে এসেছিল—লাল পতাকার নিচে দাঁড়িয়েই সে মরেছে। সোমেনের বুকের রক্তে লাল পতাকা উজ্জ্বল রঙিন হয়ে রইল; লাল ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখতে গিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে যত লোক মৃত্যুর কোলে শুয়েছে—সোমেন তাদের পাশেই ঘুমিয়ে পড়ল। স্পেনে আন্তর্জাতিক বাহিনীর

www.amarboi.com ~

হাতে নিহত র‍্যাল্‌ফ্ ফক্স ও অন্যান্য শহিদের আদর্শে যে জীবন আরম্ভ—তাঁদের স্মরণপথেই সে জীবনের অবসান। ভারতে তার তুলনা মেলে না।

সোমেন সাহিত্য-প্রতিভা ছিল, কিন্তু তা বিকাশের সময় হল না— গণসংগঠনের বিপ্লবী কর্মকুশলতা ছিল কিন্তু প্রকাশের সময় হোলো না। বিপ্লবের শত্রুর নির্মম আঘাতে তরুণ বয়সেই তার জীবনান্ত হয়ে গেল। তবু এ জীবনের রক্তরেখায় বিপ্লব এগিয়ে চলবে উদ্বুদ্ধ গণজীবনের পথে।"

কোন কোন কলা কৈবল্যবাদী ও নন্দন তত্ত্ববিদ সোমেনের লেখার ওপর অভিযোগ করে বলেছেন যে, সোমেনের লেখা উদ্দেশ্য প্রধান। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সোমেনের লেখা এসেছে তার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন, রেল শ্রমিক ইউনিয়ন করেছেন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করেছেন এবং মিশেছেন কৃষক, শ্রমিক, মজুর ও মেহনতি মানুষের সাথে। গ্রাম-বাংলাকে দেখেছেন দু'চোখ ভরে দরিদ্রজীর্ণ কুটিরে জীবন কাটিয়েছেন। চাষা-ভুষাদের সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন। আর সেখান থেকেই এসেছে তার গল্পের কাহিনী ও চরিত্র এবং ঘটনা।

সোমেন জীবন বিমুখ শিল্পী ছিলেন না। প্রতি পলে পলে তিনি মানুষ ও সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতা তা তিনি তার লেখনীর মধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এখানে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের প্রসঙ্গে গোর্কির উক্তি উল্লেখ্য—

'লেখক হচ্ছেন তাঁর স্বদেশ ও স্ব-সমাজের যেন চক্ষু, কর্ণ, আর হৃদয়। এক কথায় তাঁর যুগের তিনি বাণী বা প্রতিধ্বনি। তিনি যথাসাধ্য সবকিছু জানবেন। অতীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকবে যত বেশি, ততই তিনি নিজের যুগকে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন—ততই তিনি তাঁর কালের সর্বজনীন বিপ্লবী রূপ ও তাঁর কর্তব্যের পরিধি তীব্রভাবে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। জনগণের ইতিহাস তাঁর জানা উচিত, শুধু উচিত বললেই হবে না, তাঁকে তা জানতেই হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে জনগণের মনোভাব কী—তাও তাঁকে বুঝতে হবে। নৃতত্ত্ববিদ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের পণ্ডিতরা আমাদের জানিয়েছেন, জনগণের চিন্তাধারাই প্রকাশ পায়—গল্প, কাহিনী, উপখ্যান, প্রবচন, প্রবাদবাক্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। বস্তুত প্রবাদবাক্য ও প্রবচন জনসাধারণের চিন্তনে-ভাবনের নিখুঁত ও সুন্দর প্রকাশ।'

সোমেন চন্দের সামনে ছিলো দেশ, সমাজ ও মানুষ—এবং বড় আদর্শ ও চেতনা এবং নিয়ামক ছিলো মার্কসবাদী চেতনা। এখান থেকে সরে দাঁড়ানোর মানুষ তিনি ছিলেন না। নাম করার জন্য খ্যাতি অর্জনের জন্য তিনি সাহিত্য সাধনা করেন নি। পড়াশুনাও করতেন মার্কসবাদী ও ফ্যাসিবাদী বিরোধী গল্প ও উপন্যাস। কমিউনিস্টদের গোপনীয় ক্লাসে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনতেন মার্কসবাদী বিপ্লব ও সমাজ পরিবর্তনের কথা।

সোমেন চন্দের বন্ধু, সহ সংগ্রামী সরমানন্দ সেন সোমেনের পড়াশুনা, সংগঠন তৎপরতা ও সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে লিখেছেন—

'বোধহয় ১৩৪৬ সন। বর্ষার দিন। আমাদের প্রগতি লেখকদের একটা সান্ধ্য-আসর জমত ভিক্টোরিয়া পার্কের সবুজ ঘাসের উপর। আসর মানে সাহিত্যচর্চার সভা নয়, অমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক-আধটুকু খোসগল্প করা। সোমেনের সঙ্গে এখানেই আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পাই। লাল বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে দিয়ে রোজই সে আসতো এই সভায়। কথা কমই কইতো। হাসি-ঠাট্টার ভিতরও একে অপরকে আমরা বিদ্রূপ-বাণে জর্জরিত করতাম। এই বিদ্যায় সকলে সমান দক্ষ নয়। কিন্তু দুর্বল এবং আক্রান্তকে সাহায্য করতো সোমেন। নিজেকে বাঁচিয়ে প্রতিপক্ষকে বাণ ছোড়বার মতো বল যদি কারও না থাকতো, সোমেন তার সাহায্যে ছুটে আসতো। পৃথিবীর শোষিত ও নির্যাতত জনগণের জন্যে তার অন্তরে কতখানি দরদ ছিল, এর থেকেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়।....তার চরিত্রের চুম্বক-শক্তি দিয়েই সে আমাকে ভালোবেসে তার হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল।

বলেছি, সোমেন অল্পভাষী ছিল। এই কচি বয়সে তাই ব'লে সে মুখে হাঁড়ি দিয়ে ব'সে থাকত না। তার মৃদু হাসি আজও আমার চোখে ভেসে ওঠে। কেবল হাসিই নয়—আহার, উৎসব ভ্রমণ, এবং সঙ্গীত দিয়ে জীবনকে মুখর ক'রে উপভোগ করতে জানতো সে।

শুধু সোমেন আর তার বাবা শহরের বাসায়। আমি নিমন্ত্রিত। জানতাম না সোমেনের মা এখানে নেই। নম্বর খুঁজে বাড়ি বার ক'রে বেলা বারোটায় দরজায় ধাক্কা দিতেই সোমেন এসে উপস্থিত। হাতে ঊনুনের কালি। মুসুরির ডাল, ইলিশ মাছের ঝোল—সোমেনের হাতের রান্না—এই নিয়ে নেমতন্ন। গভীর আন্তরিকতা না থাকলে আজকের বুর্জোয়া সমাজে এমন নেমতন্ন সম্ভব হয় না।

সোমেনের পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তবু তার বাবা তাকে এত স্নেহ করতেন যে, রুগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তাকে চাকরি করতে কিছুতেই মত দিতেন না। কিন্তু সোমেন তার বাবার কষ্ট বুঝতে পেরেছিল। মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমাকে বলেছিল, একটা কাজ ঠিক ক'রে দিন, নয়তো morale ভেঙ্গে যাবে।.....শেষে বোধ হয় কোথাও কাজে ঢুকেও ছিল। ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পগুজব ক'রে সময় কাটাতে পারতো না সে। আমাদের গল্পের সময়েও তার চঞ্চল এবং নিপুণ হাত নারিন্দার সেই লাল দোতলা বাড়িটার স্টৌভ ধরাচ্ছে, প্যান-পেয়ালা মেজে ধুয়ে টুংটাং আওয়াজে চক্‌চকে ক'রে এনেছে, পাঁচ মিনিটের ভিতর চা-তৈরির উদ্যোগপর্ব প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছে এবং এর আগে কোঠাঘরের যেখানে যত জঞ্জাল জমেছিল সব ঝাঁটা দিয়ে সাফ ক'রে সমস্ত ঘরে একটা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ডেকে নিয়ে এসেছে সোমেন। সব কাজই গুছিয়ে করার অভ্যাস ছিল তার, যেমন অভ্যাস ছিল গুছিয়ে শব্দযোজনা করার।

এত অল্প বয়সে এমন ডেভেলপ্‌মেন্ট, এমন অনুভূতি, শিল্পকলা সৃষ্টির এমন আশ্চর্য ক্ষমতা—আগে বুঝতে পারিনি। পারলে তার সান্নিধ্যকে আরও কাজে লাগাতে পারতাম, সার্থক ও সফল করতে পারতাম তার সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ককে।

ক্ষুদ্র পরিসর—মাত্র একুশটি বছরের সমষ্টি—এরই ভিতর মানবজাতি ও মানবসভ্যতার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার জ্ঞান, দেশের কোটি কোটি ক্ষুৎপীড়িত নর-নারীর ভাগ্যকে ফিরিয়ে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং তারই জন্য তার স্বেদাক্ত শরীরের শ্রম সাধনা—যারা তার দুই চোখের তারায় উদ্ভাসিত বিপ্লবের বহ্নিশিখা দ্যাখেনি, দ্যাখেনি সেই দৃষ্টিতে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হস্তের স্বাক্ষর, তারা তা বিশ্বাস করতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১১৪www.amarboi.com ~

বৈশাখের কাঠফাটা রোদ। শহরে দাঙ্গা। রাজপথ দিনদুপুরে জনশূন্য। মানুষের পাশ দিয়ে মানুষ গা ঘেঁষে চলতে ভয় পায়। বুক কাঁপে। তেমন বিপদসঙ্কুল অঞ্চলেও সোমেন চলেছে দেশের কাজ করতে, হিন্দু-মুসলমানের ভিতরে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনতে। দাঙ্গা ব'লে তার ছুটি নেই। আমাকে বলেছিল, রোঁলার I will not rest পড়েছেন?"

সোমেন পার্টির কাজ করতেন, রেল শ্রমিক ইউনিয়ন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, সংগঠনের কাজে সবসময়ই ত্বরিৎ গতিতে ছুটাছুটি করতেন, পার্টিকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, পোস্টার, ব্যানার লিখতেন কিন্তু এর মধ্যে পড়াশুনার কমতি ছিল না। বিপ্লবের বই, মার্কসবাদের ওপর বই, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল লেখকদের বই তিনি দাঁড়িয়ে, রান্না-ঘরে এমন কি সাংগঠনিক কাজের ফাঁকে ফাঁকেও গ্রোগ্রাসে পড়তেন।

সোমেনের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় সমীন্দ্রকুমার হোড় তার সম্বন্ধে লিখেছেন—

'খুব সম্ভব ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হবে। একদিন খুব সকালে সোমেনের বাসার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সোমেন বাইরে দাঁড়িয়েছিল—হঠাৎ ডাক দেওয়ায় সাইকেল থেকে নামতে হল। তখন অতটা খেয়াল করিনি—কিন্তু এখন বুঝতে পারি, সোমেনের একটা আকর্ষণ করবার ক্ষমতা ছিল—বাস্তবিকপক্ষে কেউ বোধ হয় কখনও ওকে হাসিমুখ ছাড়া দ্যাখেনি। সেই শীতের সকালে সোমেন হাসিমুখে আমাকে ডাকল। ঘরে ঢুকেই দেখলাম ভীষণ অগোছালো ঘরে দুটি তক্তপোষ। ডান দিককার তক্তপোষের ওপর অনেকগুলো বই ছড়নো রয়েছে। আমি বললাম, 'তুমি এত অগোছালো হয়ে থাক কেন?' ও বলল, 'ওটা আমার বিছানা নয়—ওখানে গোঁসাইজি থাকেন'—এই ব'লে ভীষণ হাসতে শুরু করল। তারপর কথায় কথায় বলল, 'একটা জিনিস খাবেন?' আমি উত্তর দেবার আগেই কিছুটা খেজুরি গুড় এবং মুড়ি নিয়ে এসে আমার সামনে রাখল। বলা বাহুল্য তখন আমি ওকে ওদের বাড়ির সম্বন্ধে নানান প্রশ্নে জর্জরিত ক'রে তুলছিলাম, যেমন—জমি আছে কি-না, ক'টি খেজুরের গাছ আছে ইত্যাদি। আমার পাশে একটা টেবিলের ওপর একখানা Penguine series-এর বই প'ড়ে ছিল—দেখলাম 'The floating Republic'। আমি বললাম—'সোমেন তুমি নিশ্চয়ই ভীষণ পড়াশুনা কর, না?' এইবার সোমেনের মুখের হাসি থেমে গেছে। 'কোথায় আর পড়া হয় বলুন? বিদ্যে তো ম্যাট্রিক—ভালো ভালো ইংরেজি বই প'ড়ে ভালো বুঝি না। ইস্ কী বলবো কমরেড, যদি ইংরেজি ভাষাটা জানতাম!'—ও ব'লে যাচ্ছিল। ওর মুখের দিকে খুব ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলাম। বেশ একটা অনুশোচনার ছাপ। আমি বললাম, 'এর কোন মানে হয় না। তুমি তো ইংরেজি জানো তবুও। অনেকে যে আছে একদম জানে না।' সোমেন বলল, 'কোথায়, এই দেখুন না, caudwell-এর illusion and reality-খানা প'ড়ে ভালো বুঝতে পারলাম না—এর কোনো মানে হয়'?

তখনকার দিনের 'penguine' সিরিজ ছিলো বিখ্যাত ও লোভনীয়। সোমেন যে কোনো উপায়ে হোক এই 'penguine' সিরিজের বই সংগ্রহ করে আগ্রহের সাথে পড়তেন। সোমেনের এই পড়াশুনার আগ্রহ সম্বন্ধে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন—

তখনকার দিনের ছয় আনায় পেঙ্গুইন সিরিজের অনেক বই কিনতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলতেন। বই পড়ার একটা তীব্র ক্ষুধা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে পাগল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

করে তুলেছিলো। শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতির বই নয়, সাহিত্যের নানা সৃজনশীল তত্ত্বমূলক বইও সোমেন চন্দ এই সময় থেকেই (১৯৩৭-৩৮ থেকে) পড়তে শুরু করেছিলেন। কলেজের পড়াশুনা বেশিদূর অগ্রসর হয় নি, অথচ পৃথিবীর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যতটা সম্ভব গ্রহণ করে জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে হবে এই উপলব্ধিই সোমেনকে রাজনীতি ও সাহিত্যের জগতে জ্ঞানের অন্বেষণে দিনের পর দিন পরিচালিত করেছিলো।

কিরণসেন গুপ্ত আরও লিখেছেন—

'সোমেন খুব অল্প বয়সে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নানা দেশের লেখকদের বই পড়তে শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রিয় লেখকদের তালিকায় ছিলেন : ডস্টয়েভস্কি, পুশকিন, গোর্কি, শলোকভ, টমাস মান, অর্নেস্ট টলার, হোমিংওয়ে, ইগনৎসিয়া সিলোনে, হেনরী [অরি] বারব্যুস, লাউডইগ [লাডউইগ?] রেনে; বার্নাডশ, কডওয়েল, এইচ জি ওয়েলস্।'

কোন কোন সমালোচক বলেছেন রাজনীতি লেখকের শৈল্পিক সত্তাকে হনন করে। কিন্তু সোমেন চন্দ এ বিষয়ে ছিলেন ব্যতিক্রমী ও অনন্য। রাজনৈতিক আদর্শের বলয়ে থেকেও কি করে সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ সোমেন চন্দ। এ প্রসঙ্গে অচ্যুত গোস্বামী বলেছেন—

"একটা জিনিস আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে, নিজের যোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতার পরিমাপ না ক'রেই প্রত্যয়ের গভীরতাবশত এবং রোমান্টিক অনুভাবনাবশত সোমেন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসেবে সে যে কতখানি সার্থকতা অর্জন করেছিল তার আমি ঠিক খবর রাখিনি, তবে সে সম্পর্কে আমার মনে কিছু সন্দেহ আছে। তবে সোমেনের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে কখনো-সখনো তার এলাকার দু'একজন শ্রমিকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তখন লক্ষ করেছি, শ্রমিকরা—অন্তত যেসব শ্রমিক তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছে—তারা তাকে খুবই ভালোবাসে। সেইটে আমার কাছে খুব স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়েছে। কারণ তার চরিত্রের স্বাভাবিক মাধুর্য এবং স্বার্থচিন্তাহীন উদারতার সঙ্গে যারই পরিচয় ঘটেছে, তার পক্ষে তাকে না-ভালোবেসে থাকতে পারা কঠিন। সোমেন ট্রেড ইউনিয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের কতখানি লাভ হয়েছিল আমি ঠিক জানি না, কিন্তু শিল্পীসত্তা হিসেবে সোমেন লাভবান হয়েছিল। আমার বিবেচনায় এটি একটি দুর্লভ ঘটনা। মার্ক্সবাদীরা অবশ্য ব'লে থাকেন যে, সার্থক লেখক হ'তে হ'লে রাজনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণ করা দরকার। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে, এর বিপরীতটাই সত্য। সার্থক লেখক রাজনৈতিক কর্মে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে তার লেখার ধার নষ্ট হয়ে গেছে এ-রকম ঘটনা আমার চোখে পড়েছে। এটা বোধ করি স্বাভাবিকও। রাজনৈতিক কর্মী—জীবনকে দ্যাখেন তাঁর আন্দোলনের প্রয়োজনের নিরিখে; লেখক—জীবনকে দেখেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে, জীবনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা বশত। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, সোমেন চন্দ একজন ব্যতিক্রম, যেমন আর একজন ব্যতিক্রম হচ্ছেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। রাজনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণের ফলে সোমেনের সাহিত্য-জীবনের গতির পরিবর্তন ঘটেছিল। এবং তার রচনায় ভাবের এবং উপকরণের গভীরতা

www.amarboi.com ~

প্রকাশমান হয়েছিল। তার শেষ-পর্যায়ের গল্পগুলোতে যে অনেক শ্রমিক-চরিত্রের ভিড় দেখা যায়, বা তার রাজনৈতিক কর্মের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়—তা নয়। রাজনৈতিক কর্ম এবং নতুন প্রত্যয়বোধ তার কাহিনীতে এক ধরণের স্পর্শকাতরতা এবং বেদনাবোধের জন্ম দিয়েছে এবং এই নতুন অনুভূতির প্রকাশই তার শেষের দিকের গল্পগুলোকে স্মরণীয় ক'রে রেখেছে।'

নিজের লেখা সম্বন্ধে সোমেন 'সবুজ বাংলার কথা' পত্রিকার সম্পাদক নির্মলকুমার ঘোষকে লিখেন—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি দেখেছি, 'সবুজ বাংলার কথাও পেয়েছি। ভালো লাগল, আপনার কথাগুলি চমৎকার তাতে আপনার এবং পত্রিকার নীতি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে, বিশেষত—'অর্থনৈতিক পীড়নের দুঃসহ ক্লেশ যাদের মনে সৃষ্টি করেছে কোন প্রচণ্ড ক্ষোভ—যে ক্ষোভ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির লাভা প্রভাবে এক একদিন আত্মপ্রকাশ করে—নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অসাম্য ও বঞ্চনার অহমিকা,—যৌবনের পথনির্দেশ তো তারাই দেবে।' আর 'মানুষের সমাজ গড়ে ওঠবার পর থেকে আজ অবধি প্রায় একই নীতি সর্বদেশে অনুসৃত হয়ে এসেছে। এর ফলে সর্বসাধারণের কল্যাণ হয়ে থাকুক আর নাই থাকুক একথা অনস্বীকার্য যে লাভ ও সুবিধার কথা বলতে গেলে আঠারো আনারই মালিকানা জনকয়েক লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে।'— 'আজ বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে,—যে বিপ্লব দেবে আমুল সংস্কার। খুবই ভালো লাগলো, আমি নিজেই অনুভব করছি যেন। আশীর্বাদ করুণ, আমার এই বিপ্লবের অনুভূতি কেবল আমার সাহিত্য সাধনার সর্বাঙ্গে যেন জড়িয়ে থাকে।

আর এই বিপ্লবের অনুভূতি কেবল আমার নয়, আরও অনেক সাহিত্যসেবকের মনেই জেগেছে মনে হয়, তার মধ্যে হয়তো অনেকেই প্রকাশ করতে পারছে না, বা অনেকের কণ্ঠই ক্ষীণ হয়ে গেছে তথাকথিত সাহিত্য-ডিক্টেটরদের গোলমালে, কিন্তু সেই অনুভূতির অস্তিত্ব আছে অনেকের মনেই—এসব দেখে মনে হয়, আগামী দশ বছরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হবে এক উজ্জ্বল অধ্যায়, একটা বৈপ্লবিক অপূর্ব সৃষ্টি'।

৯-১২-১৯৩৮ সনে সোমেন 'সবুজ বাংলার কথার' সম্পাদক নির্মল ঘোষকে অন্য আর একটি চিঠি লিখেন—। ঐ চিঠিতে তিনি বলেছেন—

"....সেদিন একখানা বই এনেছি, বইটি পুরোনো—লেখকের নামই শুধু আগে জানতাম। জোসেফ ম্যাজিনির Duties of man; এই বই প'ড়ে একটা ভয় হয়, সেটা আপনাকে বলি। ম্যাজিনি যখন বেঁচে ছিলেন, সে আজকের কথা নয়। সমাজ-ব্যবস্থায় অনুরূপ হয়েও এবং এত আগেও এ-রকম অনেক চিন্তাশীল লোকদের লেখায়, বক্তৃতায় সোস্যালিজমের আভাস পেয়েও সেখানে আজ ফ্যাসিজম। এই দেখে মনে হয়, ভারতেও তা-ই হবে।..... কাল নয় বৃটিশের হাত থেকে ছাড়া পেল, কিন্তু পরশু গিয়ে পড়বে ধনীদের হাতে....ইতি—আপনাদের সোমেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২১৭www.amarboi.com ~

দুই

সোমেন চন্দের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' ঢাকার প্রতিরোধ পাবলিশার্স থেকে ডিসেম্বর ১৯৪২ খ্রি: প্রকাশিত হয়। প্রকাশক অমৃতকুমার দত্ত।

এই গ্রন্থের গল্পগুলো হচ্ছে—

১. রাত্রিশেষ
২. স্বপ্ন
৩. একটি রাত
৪. সংকেত
৫. দাঙ্গা
৬. ইঁদুর

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বনস্পতি' কোলকাতার মডার্ন পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রকাশক শরৎচন্দ্র দাস। প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৪৩

এ গ্রন্থের গল্পগুলো হচ্ছে—

১. মরুদ্যান
২. ভালো না লাগার শেষ
৩. অমিল
৪. সত্যবতীর বিদায়
৫. সিগারেট
৬. পণ
৭. প্রত্যাবর্তন
৮. অকল্পিত
৯. মহাপ্রয়াণ
১০. প্রান্তর
১১. বনস্পতি

সোমেন চন্দের কয়েকটি গল্প 'শিরোনাম' যুক্ত কোন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। তবে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যেমন—

শিশু তপন	সাপ্তাহিক 'দেশ', ১৯৩৭
অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন	সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি', ১৯৩৭
মরুভূমিতে মুক্তি	সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি', ১৯৩৭
রাণু ও স্যার বিজয়শঙ্কর	পাক্ষিক 'সবুজ বাংলার কথা', কার্তিক ১৩৪৫
এক্স-সোলজার	পাক্ষিক 'সবুজ বাংলার কথা', অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
পথবর্তী	মাসিক 'শান্তি', কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
মুহূর্ত	সাপ্তাহিক 'অরণি', জুলাই ১৯৪২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবর্তীকালে এই গল্পগুলো দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত 'সোমেন চন্দ ও তার রচনা' সংগ্রহ এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়।

সোমেন চন্দ 'বন্যা' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসটি নির্মলকুমার ঘোষ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'বালিগঞ্জে' প্রকাশিত ধারাবাহিক রচনা। প্রকাশ কাল মাঘ ১৩৪৬—পৌষ-মাঘ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

উপন্যাসটি গ্রন্থকারে প্রকাশ করেন দিলীপ মজুমদার ১৯৭৫ খ্রি:। এবং গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন কোলকাতার 'নবজাতক' প্রকাশনী ১৯৭৯ খ্রী:।

সোমেন চন্দ দু'টি একাঙ্কিকা লিখেছেন এবং একাঙ্কিকা দুটি প্রকাশিত হয়েছে ঢা থেকে প্রকাশিত 'শান্তি' পত্রিকায়। প্রকাশ যথাক্রমে ১৩৪৭ বৈশাখ ও ১৩৪৭ শ্রাবণ। একাঙ্কিকা দুটি হচ্ছে—

১. বিপ্লব

২. প্রস্তাবনা

এ পর্যন্ত আমরা সোমেন চন্দের তিনটি কবিতা পেয়েছি। কবিতা তিনটি হচ্ছে—

১. রাজপথ

২. জনশক্তি

৩. শুভদিনের সংবাদ শোন।

কবিতাগুলো মাসিক 'শান্তি' ও বলাকা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল যথাক্রমে

আশ্বিন—১৩৪৬, মাসিক শান্তি

মাঘ—১৩৪৬, মাসিক বলাকা

চৈত্র— ১৩৪৬ মাসিক বলাকা

এ সব ছাড়াও সোমেন চন্দের কিছু চিঠিপত্র আছে, যেগুলোতে তার জীবন মানস ও কর্মপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

সোমেন চন্দ মার্কসবাদী শিল্পী, তার লেখায় নিরেট বাস্তবতার মধ্যে ও অজস্র নান্দনিক ঐশ্বর্য দান করেছেন ফলে তা যান্ত্রিক না হয়ে শিল্প হয়েছে। তবে সোমেন আন্দোলনে ও সংগ্রামে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ পরিবর্তনে প্রত্যয়ী। সমস্ত বাধা ও বিপর্যয় এড়িয়ে বিপ্লবে সফল হওয়াই মার্কসবাদী শিল্পীর প্রত্যয়। তার কবিতা ও গল্পে সাহিত্য সম্বন্ধে তার এ মানসিকতা ফুটে উঠেছে। কবিতায় সোমেন বলেছে—

উর্বর জমির সোনার ফসল
অনুর্বর জমিতেই ছড়ানো রীতি—
মূর্খেরা দরও বোঝে না।
নিজ বাসভূমি ছেড়ে পরবাসী হলে—
আপশোষ কেন। পরবাসী তো ঈশ্বরেরই পৌষ্যপুত্র।—
ইংরেজকে জানো না?

www.amarboi.com ~

হে কৃষ্ণ, বৃথা আলস্য,
বার বার বলি, নিদ্রাই সারবস্তু নয়।
আকাশের দিকে লক্ষ রেখো:
কবে আবার ঝড় আসবে?
এখানে স্বর্ণলঙ্কা,
(ভয় নেই, এ যুগে রাজায় রাজায় যুদ্ধ আর বাধে না)
প্রতি দ্বারপথে নরম সোনার আলো,
পথে-বিপথে কাউন্টার পাশে
ঝক্-ঝকে-তক্-তকে স্বর্ণকান্তি মানুষের ভীড়—
এরা এঞ্জেল।
সুপ্রশস্ত পথের ধূলোয় স্বর্ণরেণু।
উর্বর জমির সোনার ফসলের
আবার বৈজ্ঞানিক চাষ এখানে।
'সুলতা, তোমার কিছু শীতের পোশাক চাই তো?'

সমাজ পরিবর্তনে সোমেনের যে স্বপ্ন তা ইঁদুর গল্পে রূপায়িত হয়েছে—

ভাবনার রাজ্যে পায়চারি করে আমি আমার মীমাংসার সীমান্তে এসে পৌঁছুলুম সেই মধ্যাহ্নে সেখানে রাখলুম দৃঢ় প্রত্যয়। আকাশের নীলিমায় দুই চোখকে সিক্ত করে আমি দেখতে পেলুম চওড়া রাস্তার পাশে সারি সারি প্রকাণ্ড দালান, তার প্রতি কক্ষে সুস্থ সবল মানুষের পদক্ষেপ, সিঁড়িতে নানারকম জুতোর আওয়াজ। মেয়ে পুরুষ মিলিত চিৎকার ধ্বনি পৃথিবীর পথে পথে বলিষ্ঠ দুয়ারে হানা দেয়। বলিষ্ঠ মানুষ প্রসব করে। আমি দেখতে পেলুম ইলেকট্রিক আর টেলিগ্রাফ তারে অরণ্য। ট্রাকটর চলেছে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে—অবাধ্য জমিকে ভেঙেচুরে দলে-মুচড়ে, সোনার ফসল আনন্দের গান গেয়ে আর যন্ত্রের ঘর্ষণে ও মানুষের হর্ষ ধ্বনিতে এক অপূর্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি হলো। এক্কা যে বাতাস মাটির মানুষের প্রতি উপহাস করে বিপুল অট্টহাসি হাসছে। সেই বাতাসের হাত আজ করতালি দেয় গাছের পাতায় পাতায়। কেউ শুনতে পায়? যারা শুনে তাদের নমস্কার।

বনস্পতি গল্পে সতীনমিত্রের বক্তৃতায় সোমেন কণ্ঠই ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হয়েছি—

ভাইসব, সমাজের যারা পরগাছা—যারা আমাদের গায়ের রক্ত শুষে শুধু বসে বসে খায় তাহাদের উপরে ফেলার দিন এসেছে আজ। ভাইসব আমাদের জিনিস দিয়েই ওরা মোটর হাঁকায়, ব্যাংকে লাখ লাখ টাকা জমা রাখে কিন্তু আমরা না খেয়ে মরি। এ অত্যাচার কেন আমরা সহ্য করবো? কেন সহ্য করবো।

তিন

সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিশু তপন' সোমেন চন্দের প্রথম গল্প। সোমেন তখন মাত্র সতেরো। বলতে গেলে এক কিশোরের রচনা। কিন্তু এই কিশোরের

www.amarboi.com ~

শেখাতেই প্রকাশ পেয়েছে সূক্ষ্ম মানবিক দৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধ, মনোবিন্যাস এবং পারিবারিক আবহ ও ট্র্যাজিক বেদনাবোধ। অবশ্যি এ বয়সের মানসিক বিন্যাসকে ট্র্যাজিক না বলে দুঃখবোধ বা করুণ বলাই শ্রেয়।

গল্পের চরিত্রগুলোর বয়সও অল্প।

"এরা সবাই ছোট ছেলে—২০/২২-এর বেশি বয়স কারো নয়। সবেমাত্র কলেজের পড়া ছেড়েছে। কেউ গল্প লেখে, কেউ কবিতা, কেউ-বা এক-আধটা প্রবন্ধ। একে অন্যকে প'ড়ে শোনায়। স্থানীয় মাসিকপত্রে মাঝে মাঝে প্রকাশ করার সুযোগও পায়।"

'শিশু তপন' থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে উপস্থাপন করলেই ধরা পড়বে সোমেন চন্দের মানসিক স্বচ্ছতা, ভাষার সারল্য ও শৈল্পিক ঐশ্বর্যের সংযমিত এবং প্রকাশ ভঙ্গির নৈপুণ্য।

১. তাই ভাবি, ভগবান যে আমার এত সুখ দিলেন, এত সুখ আমি রাখবো কোথায়? আচ্ছা তুমিই বলো বীণা, এত ঐশ্চর্যের মাঝে দাঁড়িয়েও কিসের অভাবে মনটা আরও নিবিড় হ'তে পারে না?

২. টিলার উপরে উঠিবার সময় তপন ক্লান্ত হইয়া পড়িলো। ঘর্মাক্ত মুখে লাল আভা পড়িয়া তাহাকে ভারী সুন্দর দেখাইলো।

৩. পরের বৎসর । বর্ষাকাল। বিদ্যুৎ চমকাইয়া মেঘ ডাকে। ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসে। বিশ্বপ্রকৃতি মুখর হয়, ঘন কালো আকাশের অবিশ্রান্ত বারি-পতনের অপরূপ শব্দে।

৪. "তোমার নাম কি খোকা!"

"তপন"

"তোমার মা নেই বুঝি!"

নরম জায়গায় আঘাত পড়িলো। তপনের মুখ করুণ হইয়া গেল।

৫. উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে প্রলয় নৃত্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নিচে মাটির বুকে বিয়োগ-বিধুর এক শিশু-চিত্তের বেদনা; মনে করিতেও কষ্ট হয়।

এ গল্পের ভাষা, পরিমিতিবোধ, প্রকাশে সংযত এবং শৈল্পিক ঔচিত্যবোধের কথা ভাবলে মনে হয় না যে, এগুলো কোন কিশোর বা বালকের লেখা।

সোমেনের দ্বিতীয় গল্প 'ভালো না লাগার শেষ'। স্নিগ্ধ নির্মল প্রেম ও প্রকৃতি এবং আধুনিক দাম্পত্য জীবন নিয়ে এই গল্প। গল্পের বর্ণনায় আমরা পাই—

—"এখানে এই খোলা মাঠে, নরম ঘাসে গাছের ছায়ায়, আকাশের নিচে বসলে পর চোখে কেমন যেন নেশা লাগে, হাত-দু'টি কাকে যেন হাতড়ায়। অদিতি সবুজ ঘাসের ওপর পা ফেলতে ফেলতে বললো, 'একটা কথা এখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি, তুমি কেমন আছো?'"

গল্পটির একজন কথক আছে। তার আত্মজবানীতে কাহিনী চরিত্র ও ঘটনার স্ফুরণ ঘটেছে। আত্মজবানীতে প্রকাশ পেয়েছে এক কিশোরীর মৃত্যুতে অন্য এক কিশোরের শোক গাঁথা। সমস্ত গল্পটিতেই ফুটে ওঠেছে এই কিশোরের আবেগ উৎকণ্ঠা ও হৃদয়ের মর্মযাতনা। যেমন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ছোটবেলায় শুনিয়াছি—রূপকথার রাজপুত্র সোনার কাঠি স্পর্শ করাইয়া রাজকন্যার নিদ্রা ভাঙিয়া দ্যায়। বুড়া ঠাকুরমার মুখে ইহা শুনিয়া মনে হইতো, নিছক একটি কাহিনী। কিন্তু বয়স হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল জনহীন পুরীর মাঝে অনুপম সৌন্দর্যলক্ষ্মী রাজকন্যা ও তেজস্বী রাজপুত্রের সাক্ষাৎকার ক্রমশই অপরূপ হইয়া উঠে।

সেইরকম একটি জীবন্ত কাহিনী ছোটবেলায় দেখিয়াছিলাম।"

আত্মস্মৃতির এই মর্মবেদনা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে পাঠকেও বিচলিত করে তোলে।

"অচলায়তন ও নির্জনতার মাঝে একটি প্রাণের বিসর্জন, কতটুকু তাহার মূল্য জানি না। জানি পৃথিবী টলিবে না এই ঘটনায়।....উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে প্রলয় নৃত্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নিচে মাটির বুকে এক বিয়োগ-বিধুর শিশুচিত্তের বেদনা, মনে করিতে কষ্ট হয়।"

'ভালো না-লাগার শেষ' সোমেনের দ্বিতীয় গল্প এবং মিষ্টি মধুর একটি প্রেমের গল্প। এক কথক চরিত্রের জবানীতে গল্পের কাহিনী ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ ঘটেছে। রমলার চরিত্রটি নানা বিবর্তনে নিজেকে উন্মোচন করেছে। রমলার মানসিক নানা উত্থানপর্তন এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বে গল্প পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

'রমলার আজ মন ভালো নেই। বলেছিতো এত বিরক্তি আর অবসাদ আর কোন দিন আসেনি।

গল্পটিতে দেখা যায় নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর প্রথমে দীর্ঘ বিচ্ছেদে আর মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এরপর অনেক ঘটনার পর দু'জনের মিলন এই নিয়ে গল্পের যবনিকা।

গল্পের শেষে অদিতি বলেছে—

বৃথাই এতদিন প্রফেসরি করলুম রমলা। অনেক আগেই এটা আমার জানা নিশ্চয়ই উচিত ছিলো যে, মেয়েরা কিছুই মুখে মুখে বলেনি তাদের ডাকাতি করতে হয়। অর্জুনের মতো হরণ করতে হয়।

'পথবর্তী' মালতী ও সুব্রত-এর রোমান্টিক প্রেম নিয়ে লেখা। গল্পের সংঘাতটা এসেছে বংশ মর্যাদা নিয়ে। অভিজাত্যের গর্বে গর্বিত মালতীর বাবা সুব্রত-এর সঙ্গে মালতীর বিবাহে অসম্মতি জানায়। গল্পের গাঁথুনি শিথিল—চরিত্রগুলো পূর্ণতা পায় নি। সুব্রত ব্যর্থ হয়ে প্রেমপত্র বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। তার বেদনাবিধুর অশ্রুসিক্ত বিদায়ে মালতী নির্বাক হয়ে থাকে।

মালতীর বাবা ব্রজকিশোর বাবুর আভিজাত্য ও দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় এভাবে—

'নলহাটির চৌধুরীদের মেয়ের বিয়ে হবে একটা সামান্য... তোমার আত্মীয় বলে হাত খোয়াতে যাবো? অর্থ অসামর্থ্যের সুযোগ নিচ্ছ?

মেয়েকে জলে ভাসিয়ে দিলেও তা'হবে না, কক্ষোনো না, মরে গেলেও না।

অতিথিকে আদর যত্ন করা মানেই কী তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়া?

গল্পে মালতী ও সুব্রত-এর হৃদয় উন্মোচনের কিছু কিছু অংশ এখানে উপস্থাপন করছি—

আরও অনেক কিছু বললেন ব্রজকিশোরবাবু! কতোক্ষণ পরে সুব্রত প্রণাম করে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১২২www.amarboi.com ~

লীলাবতীকে পাওয়া গেল। কিন্তু কোন রকমেই মালতীর দেখা পাওয়া গেল না।

সুব্রত স্টেশন এলো। টিকেট করে একটা নির্জন কামরা বেছে নিলো। তারপর হুইস্‌ল দিয়ে গাড়ি ছাড়ল, শহরের সীমা ক্রমে বিলীন হয়ে গেল।

সুব্রত জানালায় মুখ রেখে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো। দু'পাশে তখন মাঝে মাঝে জলচিহ্নাঙ্কিত খোলা মাঠ, ধু ধু করে। আরও দূরে একটানা গাছের সারি, মধ্যে উঁচু তালগাছ।

মাঠ ভরা মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্র ঝিম্ ঝিম্ করে।

সে এক টুকরো কাগজ নিয়ে লিখতে বসলো। মালতীকে লিখতে চোখে জল ভরে এলো। সে কাগজটা তুলে জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে ছেড়ে দিল।

প্রবল বাতাসের বেগে সেই চিঠি পড়লো এক বাবলা গাছের ছায়ায়। প্রান্তর পার হয়ে সেখানে গভীর বনানী—অজস্র বুনো-ফুলের গন্ধ, তার মাদকতা, বাঁশঝাড়ে কিচ্‌কিচ্ আওয়াজ, পাখির ডাকে মুখরিত আকাশ, হিংস্র প্রাণীদের নির্ভয় বিচরণ, আর নির্জনতার গন্ধে ভরপুর।

গাড়ী চলে গেল।

আর মালতীকে লেখা সেই চিঠি বাবলা গাছের ছায়ায় বসে বুনোফুলের গন্ধ শুঁকতে লাগলো'।

গল্পের শুরুতেই সোমেন খুবই মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এবং মাত্র দু'একটি টানে গল্পের আবহ ও চরিত্রগুলোর পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন—

শীতের এক সুগভীর কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরবেলায় অত্যন্ত ময়লা কাপড় দিয়ে বাঁধা একটা পুঁটুলি হাতে করে এক বৃদ্ধা, রাজকুমার রায়ের প্রকাণ্ড ফটকওয়ালা বাড়ীর ভিতরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রথমে ঢুকতে একটু দ্বিধা করেছিলো, কারণ এ-বাড়ীতে সে এই প্রথম পদার্পণ করছে, কিন্তু মুহূর্ত পরেই সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে এক নিঃসংকোচ কলেজ-বালিকার মতই চাকর-বাকরের ছুটোছুটি আর কোলাহল-কাতর উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। বৃদ্ধার চেহারা এমন কাদাকার যে হঠাৎ দেখলে ভয় হয়। উঁচু কপাল, তুবড়ানো নাক, মাংসল মুখ অথচ চোখ দুটি অত্যন্ত ছোট এবং গর্তে বসানো। মাথার চুল ছোট করে ছ্যাঁটা, বয়স পঞ্চাশের বেশি হলেও গায়ের চামড়া এখনো যথেষ্ট ঢিলে হয়ে আসেনি।

বৃদ্ধা কারুর আশায় এদিক-ওদিক চেয়ে শেষে একটা চাকরকে ডেকে বললো, 'আচ্ছা, এটা আমাদের রাজুর বাড়ি না?'

'রাজু! রাজু কে।' এই বলে চাকরটা আবার নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

রাজু কে । তবে কি এটা রাজুর বাড়ী নয়? বৃদ্ধা মনে মনে খানিকটা অসহায় বোধ করলো। কিন্তু বাইরে সে—ভাব সম্পূর্ণ ঢেকে রেখে আর একজনকে ডেকে বললো, 'আচ্ছা, এটা আমাদের রাজুর বাড়ী নয়?'

নিচে কোলাহল শুনে সপত্নীপুত্র রাজকুমারের স্ত্রী মনোরমা উপর থেকে নেমে এলো— তার একটি অবয়ব বর্ণনা সোমেনের ভাষায়—

ঝি মতির মা খন্ খন্ করে বললো, 'রাজু-টাজু কেউ এখানে নেই গো।'

www.amarboi.com ~

কিন্তু এমন সময় ভেতর থেকে মনোরমা বললো, 'কে রে মতির মা?' এই বলে আর মতির মা'র উত্তরের অপেক্ষা না করে ধীরে ধীরে ভারী শরীরখানা নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। তার চোখে চশমা, হাতে অনেকগুলি চুড়ি, গায়ে আঁটো-সাঁটো সেমিজ, চওড়া নক্সি-পেড়ে শাড়ি। বুড়ীকে দেখে মনোরমা আশ্চর্য হলো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই বিস্ময়ের ভাব দমন ক'রে ফেললো, বরং চোখের ওপরে ভ্রূ কুঁচকে এসেছে।

একগাল হেসে সত্যবতী বললো, 'বৌ, কেমন আছো? আচ্ছা, তোমাদের কতকাল দেখিনে, তোমাদের কথা ভেবে-ভেবে হয়রান হয়ে গেলুম, ঈশ্বরকে কতো বলি, ঠাকুর, আমার এমন ছেলে, ছেলের বৌ, সব থাকতে আমি ষাটের বুড়ী, কেন এত কষ্ট করে মরি? ছেলে তো আমার এমন নয় যে কক্‌খনো ডাক-খোঁজ করে না। আমার রাজুর মতো ছেলে কারুর হয়? কক্‌খনো হয় না, এই আমি বলে দিচ্ছি। এই তো সেবার'—এক দুই তিন চার....সত্যবতী হাতে কর গুণে বললো, 'পাঁচটা টাকার জন্যে দু-অক্ষর লিখে পাঠিয়ে দিলুম, আর অমনি তোমায় কি বলবো বৌ, আর অমনি যেন হাওয়ার গাড়িতে চড়ে টাকা এসে হাজির।' বলতে বলতে সত্যবতীর দম বন্ধ হয়ে এলো।

এই ধনী পরিবারের সাথে একাত্ম হয়ে যাবার জন্য এবং এ বাড়িতে জীবন যাপনের জন্য যতোগুলো গ্রাম্য স্থূল ক-াকৌশল ও ফিকির ফন্দি আছে যাদুবিদ্যা বা মন্ত্র পড়ার মতো সত্যবতী একে একে সবই প্রয়োগ শুরু করে দিলো—।

ছোট বাচ্চারা মায়ের আচলে মুখ লুকিয়ে এই অনাহূত ও কদর্য চেহারার বৃদ্ধাকে দেখে যেমন ভয় তেমনি উৎসাহও দেখালো—। এমনকি সত্যবতী নানা ফন্দি-ফিকিরে মনোরমাকেও আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছে—।

ইতিমধ্যেই প্রায় সারা বাড়িতে সাড়া পড়ে গিয়েছে। বাড়ির সমস্ত ছেলেমেয়েরা—মন্টু-ঘেন্টু-জিতু-বেলা-হেলা ইত্যাদি সবাই এসে বুড়ীকে ঘিরে দাঁড়ালো। সকলের ছোট জিতু এই কুৎসিত বুড়ীকে আর কখনো দেখেনি, সে মনোরমার আঁচল ধরে নাকি সুরে বললো, 'কে ঠাকুমা?'

সত্যবতী হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে বললো, 'আয় ভাই আয়, তোদের নাম কি রে ভাই? আরে আয় না? না এই রাজকন্যের মতো সুন্দরী বৌকে দেখে পছন্দ হচ্ছে না?' সত্যবতী একটু পরিহাস করলো। ওদিকে মনোরমার শীতলতাও তার দৃষ্টি এড়ায়নি। সে তাকে খুশি করবার জন্যে বললো,

মনোরমা সংক্ষেপে গম্ভীর স্বরে বললো, 'না, কোন অসুখ করেনি।'

মনোরমা এই চাচ্ছে সত্যবতীর কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য কিন্তু তাই বলে সত্যবতী রেহাই দেবে কেনো—সে একটি একটি করে তার মোহের জাল বিস্তার করছে—

সত্যবতী চোখ বড়ো করে বললো, 'বৌ, আমি বলে দিচ্ছি, তোমার কোন অসুখ করেছে, তুমি না বললে আমি শুনবো কেন? দাঁড়াও, আমি ওষুধ দিয়ে দেবো।' সত্যবতী বছর দুই আগে নাকি কালী পেয়েছিলো, তাঁর আশীর্বাদে একটা মূল্যবান ওষুধও পেয়েছিলো, তাই সত্যবতী মনোরমাকে অভয় দিলো।

এবার সত্যবতী তার মোহের জাল শুধু মনোরমার ওপর নয়— বানুর ওপরও বিস্তার করার চেষ্টা করলো—এবং দক্ষ অভিনেত্রীর মতো বললো—

www.amarboi.com ~

—'কিন্তু ছাই পোড়াকপাল আমার',—সত্যবতী বলা-নেই কওয়া-নেই হঠাৎ কপালে করাঘাত করে বললো, 'হা ঈশ্বর! যার জন্য এতদূর এলাম তাকেও ভুলে গিয়েছি। রাজু কোথায় বৌ, আমার রাজু?'

মনোরমা বসবার ঘর দেখিয়ে দিলো।

সত্যবতী তর্ তর্ করে অমনি সেই ঘরের দিকে ছুটলো, পুঁটুলিটা কোথাও রাখবার জায়গা এখনো হয়নি, আর রাখবেই বা কোথায়? কোথাও এতটুকু পরিষ্কার জায়গা আছে কি? সেটা কাঁখে করেই সত্যবতী বসবার ঘরে ঢুকলো, কিন্তু ছেলের চেহারা দেখে তার দুই চক্ষু স্থির, আহা, কী চেহারা হয়েছে গো! ননীর শরীর যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেই তক্‌তকে সোনার বরণ রঙই বা কোথায়, মাথায় সেই গভীর কালো চুলই বা কোথায়? রাজকুমার চেয়ারে বসে অনেক খাতাপত্র দেখছেন, সামনেই দুটি চেয়ারে বসে আরও দুটি লোক। সেই লোকগুলির সামনেই সত্যবতী হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বললো, 'রাজু, তোর এ কী চেহারা হয়েছে বাবা? তোর এমন অসুখ, আমায় আগে জানাসনি কেন? কেন জানাসনি বল? আমি কি তোর কেউ নই? ঈশ্বরকে কত বলি, হে ঠাকুর, সবই তো দিয়েছো, তবে আর একটি মনোবাঞ্ছা যদি পূর্ণ করতে। আজ উনি বেঁচে থাকলে!'

হঠাৎ এ ধরনের নাটকীয় পরিস্থিতিতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো রাজকুমার। সোমেনের বর্ণনায়—

ব্যাপারটা প্রথমে রাজকুমার ভালো করে বুঝতেই পারেনি, হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিলো। একটু পরে লজ্জায় আর রাগে মাটির সঙ্গে মিশে গেলো। সত্যবতীকে দুই হাত দিয়ে ধরে সে বললো, 'আহা, এখানে কেন মা? এখানে কেন মা? এখান থেকে যাও, অন্য সময় হবে।' সে সত্যবতীকে ঘরের বার করে দিলো। সত্যবতী তখনো শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো, একহাতে পুঁটুলিটা ধরে আর এক হাতে কাপড়ের আঁচল দিয়ে নাক-চোখ মুছতে লাগলো।

বাড়িতে অবস্থানের পর থেকেই সত্যবতী নানা উপদ্রব শুরু করে দিয়েছে যেমন—

১. কিছুক্ষণ পরে ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে এক নতুন বিভ্রাট এসে হাজির। কেমন একটা পচা গন্ধ পেয়ে সত্যবতী নাকে কাপড় দিলো, দূর থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখলো, ঘরের অন্ধকার কোণের দিকটিতে একটা চড়াই মরে পড়ে রয়েছে। 'আ রামো। এমন কাণ্ড তো জীবনেও দেখিনি।'—সত্যবতী অমনি দৌড়ে মনোরমার কাছে গেলো, গিয়েই একদমে বললো, 'বৌ, তুমি জেনে-শুনে যে এমন একটা কাণ্ড করবে তা আগে জানিনি।'

মনোরমা সেদিনের বাজারের হিসেব লিখছিলো, চাকর সামনে দাঁড়িয়ে, চশমা-শুদ্ধ ভারী মুখখানা তুলে চোখ দুটি বরাবর সত্যবতীর চোখের ওপর স্থাপন করে সে বললো, 'কি হয়েছে?'

সত্যবতী হাত-পা চোখ-মুখ সব একসঙ্গে নেড়ে হতাশার সুরে বললো, 'হবে আর কি! যা হবার তাই হয়েছে। একটা চড়াই মরে পড়ে রয়েছে ঘরে। বৌ, তুমি বেছে-বেছে এমন একটা ঘর কেন আমায় দিলে বলো তো? আমার রাজু তো ঈশ্বরের ইচ্ছেয় আর ঘরের অভাব নেই।'

www.amarboi.com ~

২. পরদিন সুদীর্ঘ এক ঘণ্টাকাল স্নানের পর বারান্দা ধরে নিজের ঘরে যাবার সময় এমন একটা ঘটনা ঘটলো যাতে সত্যবতী একটা তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়ে তুললো। ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়, ঝি মতির মা'র কাপড়ের আঁচলটা তার সদ্যস্নাত শরীরে হাওয়ার মতো একটু এসেছিলো মাত্র। সত্যবতী অমনি হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো, 'আ-মর মাগী, ছুঁয়ে দিলি যে, কেন ছুঁয়ে দিলি বল? ওমা গো, আমায় ছুঁয়ে দিলো গো, আমি এইমাত্র চান করে এলাম, আর অমনি ঝি-মাগী আমায় ছুঁয়ে দিলো, আবার বলে কিনা, আমরা ছোটলোক নই গো, অদেষ্ট মন্দ বলেই আজ ঝি-গিরি করে খাই। বলে কিনা কায়েত, কায়েত না আরও কিছু, ও—কথা বললেই আমি বিশ্বেস করি।'

রাজকুমার পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থার চরম বিপর্যয়ে—। ঘরের অশান্তি চরম বিপর্যয়ে ওঠেছে। ডাক্তারের কথা সত্যবতীর কানে আসতেই সে মনে করেছে যে, রাজকুমারের অসুখ।

সত্যবতী অমনি তার বর্তমানের বিষয়টি ভবিষ্যতরে জন্য স্থগিত রেখে একটি তেজস্বিনী ঘোড়ার মতোই ছুটতে ছুটতে ওপরে গিয়ে হাজির হলো, শুনতে পেলো রাজকুমার বলছে :

—'আমি আর কী করবো বল? এক ছেলে জুয়ো খেলেন, আর এক ছেলে স্বদেশী করেন, আর এক মেয়ে বিয়ে করতে চান না, আর এদিকে তো ভাঁড়ার ঘর শূন্য, ঋণে গলা পর্যন্ত ডুবে গেছি। লোকে তাদের ছেলেপিলের আশা কেন করে! বুড়ো বয়সে অকর্মণ্য হয়ে গেলে বসে বসে খাবে বলেই তো? আর আমার ঘরে এসব কী?'

সত্যবতী বুঝতে পারলো, রাজকুমার কিছুক্ষণের জন্য ভারী অস্থির হয়ে পড়েছে। হবেই তো! এত বড় একটা সংসার ওই একটা লোকের মাথায়ই তো! সত্যবতী ঘরের ভিতর ঢুকে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো, বললো, 'রাজুরে, তোর এ কী হলো বাবা? আমায় আগে বলিস নি কেন? শত হলেও তো আমি তোর মা, মা'র কাছে সব কথা আগে বলতে হয়।'

সকলে অবাক! মনোরমা হতবুদ্ধ।

সত্যবতী বিনিয়ে বিনিয়ে বললো, 'হে মা কালী, ছেলেকে আমার ভালো করে দাও। আমার রাজু ভালো হলে জোড়া পাঁঠা বলি দেবো, আমার ছেলেকে ভালো করে দাও! এতদিন ধরে এসেছি, মা'র সঙ্গে দেখা করবার নামটি নেই, আমার ওপর রাগ করবে না, তো কি। মাগো, তোমার কাছে কতো অপরাধই না করেছি, তাই বাছার আমার এমন অসুখ করেছ। তোমার দুটি পায়ে ধরি মা, বাছাকে আমার ভালো করে দাও!' সত্যবতীর দুই চোখ দিয়ে দর্ দর্ করে জল পড়তে লাগলো, চোখের জলে বুক ভেসে গেল। কান্নার বেগ খানিকটা কমলে সে সকলকে এই বলে আশ্বাস দিলো যে মা কালীর কৃপায় সে তার রাজুর অসুখ এক ঘণ্টার মধ্যে সারিয়ে দেবে'।

এই পরিবারের শত উপদ্রবের পরও হয়তো সত্যবতীর আশ্রয় মিলতো কিন্তু বিড়ম্বনা ঘটলো ভূতপ্রেতের গল্প নিয়ে। অবশেষে বিষয়টি অন্য প্রান্তিকে গড়িয়ে পড়লো- যা অসহ্য।

'সত্যবতীর বিদায়' গল্পটিতে দেখা যায়— আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র শহরে এসেও সত্যবতী গ্রাম্য কুসংস্কার অলৌকিক বিশ্বাস ভূত প্রেতে ও মন্ত্রের প্রভাব জড়িয়ে রাখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২২৬www.amarboi.com ~

চায়। বিত্তহীন সহায় সম্বলহীন, আশ্রয়হীন বৃদ্ধাসত্যবতী ধণী সপত্নীপুত্রের গৃহে আশ্রিতা। করুণা নয়, কৃপা নয়— বা আবেদন নিবেদনও নয়—এখানে সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যদিও সে অধিকার ও আত্মবোধের দম্ভ প্রকাশ করে কিন্তু তার ভেতরে ভেতরে আশ্রয় হারাবার একটি ভয়ও আছে।

সত্যবতী সপত্নীপুত্রের বাসায় আশ্রয় পেলেও তার ভেতরে নিয়ত প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। সপত্নী পুত্রের শিশুদের সে আতঙ্কিত করে তুলেছে প্রেত-পিশাচ, ব্রাহ্মণ-দৈত্য ও ভূতের গল্প শুনিয়ে। শিশুগুলো ভয়ে মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে ওঠেছে। শেষ পর্যন্ত সত্যবতী বিতাড়িত হয় কিন্তু এর পরও তার প্রতিহিংসা বৃত্তি প্রশমিত হয় না। সাত সকাল বের হয়ে পড়ে পথের সন্ধানে, আশ্রয়ের সন্ধানে। পথে সে জিজ্ঞাসা করে 'তোমাদের বাস শিয়ালদায় যাবে'?

সোমেন চন্দ এখানে সত্যবতীর মানসিক জটিলতা, বাচ্চাদের আতঙ্কিত হওয়া এবং সপত্নীপুত্রের মনোবিশ্লেষণ করেছেন খুব দক্ষতার সাথে।

সত্যবতীর জীবন ট্র্যাজেডি এখানেই যে, সে নাতি-নাতনিদের ভয়ঙ্কর ধরণের ভূত প্রেতের কাহিনী শুনাতো কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেই ভূত হয়ে বাড়ি হতে অন্তর্নিহিত হলো—

পরদিন মনোরামা সত্যবতীর ঘরের দিকে ছুটে গেল। সত্যবতী তখন জয়ন্তীর দৈহিক দুর্দশার কথা নিয়ে ঝি মতির মা'র সঙ্গে গভীর আলাপে রত। মনোরমা বললো, 'আপনি এসব কী সুরু করে দিয়েছেন শুনি? ছেলেপেলে বলেও একবার মায়া হয় না? আমাদের কি মেরে ফেলবেন?...এতটুকু মান-সম্মান জ্ঞান নেই? গেঁয়ো ভূত।'

—ভূত।'

সত্যবতী অবাক হয়ে মনোরমার দিকে চাইলো, তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলো। যে কোন মুখভঙ্গীতেই তাকে এমন বিকৃত দেখায়, যেন মনে হয় সর্বদাই সে রেগে রয়েছে : ছোট পোড়া কপালের নীচে জলভরা চোখ দুটি বাঘের চোখের মত জ্বল জ্বল করে। ওপরের পাটির কালো দুটি দাঁত নীচের ভারী ঠোঁটের গায়ে বারে বারে আঘাত খেতে থাকে, যেন একটা কালো চক্‌চকে মেশিন, হাস্‌ফাস্‌ করে চলেছে, দম আটকে রেখে মাঝে—মাঝে শ্বাস ফেলছে।

তারপর এক পরিচ্ছন্ন ভোরবেলায়—বাড়ীর একটা লোকও তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি, কিন্তু দূরে বড়ো রাস্তায় ট্রাম—বাসের শব্দ প্রবল হয়ে উঠেছে—সত্যবতী তার কালো ইস্পাতের মতো শরীরে একখানা নামাবলী জড়িয়ে মাথায় নববধুর মতো প্রকাণ্ড ঘোমটা টেনে, নিজের ছোট পুঁটুলিটা কাঁখে স্থাপন করে পথে বেরিয়ে পড়লো। এমন দুঃসাহসিকতার অভিনয় সে তার জীবনে আরও অনেক করেছে, স্বামীর মৃত্যুর পর গ্রামের বিপুল শত্রুসংখ্যার সঙ্গে একা যখন যুদ্ধ করেছে, তখন অত্মরক্ষার্থে কতো দুঃসাহসিক কাজে তাকে লিপ্ত হতে হয়েছে। আজও তার অন্যথা হতে পারে না। রাজপথে পড়ে' সত্যবতী যাকে কাছে পেলো তাকেই জিজ্ঞেস করলো : 'হ্যাঁ গো, শেয়ালদায় কতো নম্বর বাস যায় বলবে?'

এমন কোলাহল-ভরা রাজপথে সত্যবতীর কণ্ঠস্বর ভারী ক্ষীণ শোনা গেল! সে বাসের কণ্ডাক্টরদের জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁ গো, তোমাদের বাস শেয়ালদায় যাবে?'

www.amarboi.com ~

'সংকেত ও অন্যান্যগল্প' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা হয়েছিলো—

প্রত্যেক উদীয়মান সাহিত্যিকের মতো সোমেন চন্দেরও ইচ্ছা ছিল, তার ছোটগল্পগুলি একত্র করে একটি বই বার করার। প্রায় দুই বছর আগেই বই বার করার মতো গল্প তার জমেছিল। কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে, তার গল্পের রূপ এমন ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এমন একটা স্তরে তার লেখা উঠছে, যার ফলে কয়েকদিন অপেক্ষা করে বই বার করলে সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বাংলা সাহিত্যে তাকে আমরা পরিচিত করতে চেয়েছিলাম এক নূতন রূপস্রষ্টা হিসাবে। আমাদের দেশের কমিউনিস্ট সাহিত্যের উন্মেষ দেখাতে চেয়েছিলাম তার প্রথম বইখানিতে।

কিন্তু ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের ছুরিকাঘাতে সোমেন চন্দ প্রাণ হারালো। আমাদের পরাধীন দেশে সহস্র তরঙ্গময় স্বাধীনতার লড়াইকে যারা এতদিন ব্যাহত করতে চেষ্টা করে এসেছে, তারাই আজকাল ফ্যাসিস্টদের চরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই ফ্যাসিস্টপন্থীরা তাদের লোভ ও নীচতার আগুনে বাংলা সাহিত্যের সবে-ফুটে-উঠতে-থাকা ফুলটিকে পুড়িয়ে মারলো।

সোমেন চন্দ তার বই বার করতে পারলো না। আমাদের কামনাও অতৃপ্ত রয়ে গেল। শিল্পী তার তুলির কয়েকটা টান দিয়েই আমাদের অনেক আশার শিল্পরূপকে অসমাপ্ত রেখে চলে গেল। তার মৃত্যুটা এতটা আকস্মিক যে, নানাদিকে ছড়িয়ে রাখা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গল্পগুলিকে খুঁজে বার করার একটা ইঙ্গিতও সে দিয়ে যেতে পারেনি।

তবু আমরা অনেকগুলি গল্প একত্র করেছিলাম। ভেবেছিলাম, তার সম্পূর্ণ লেখার একটি সঙ্কলন বার করবো। কিন্তু দেখলাম যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় এতবড় কর্মটিতে হাত দেবার আগে একটি ছোট বই বার করে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সেই হিসেবেই কয়েকটি মাত্র গল্প নিয়ে একটি বই প্রকাশ করা হলো। যৌবনের সন্ধিক্ষণে মাত্র কিছুকাল—তারই মধ্যে পরিবর্তনের ধারাটি এলায়িত; আধুনিক সাহিত্যের রূপান্তর গণসাহিত্যে—তারই এগিয়ে চলার স্পষ্ট পদধ্বনি, আর বেশি কিছু নয়, কারণ ফ্যাসিস্টরা তরুণ বয়সী শিল্পীকে হত্যা করেছে।

গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সাথেই 'পরিচয়' পত্রিকায় এর ওপর একটি সমালোচনা লিখেন বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পুরো সমালোচনাটি এখানে উপস্থাপিত হলো—

সোমেন চন্দের এই বইখানা বার হওয়া নিতান্ত দরকার ছিল। যাঁরা তাঁর অপরিণত বয়সে শোচনীয় প্রাণনাশের কথা জানেন তারা তাঁর সাহিত্যিক পরিচয় পেয়ে খুশি হবেন। আর যাঁরা প্রগতি সাহিত্যে বিশ্বাসী এবং ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্প্রদায়ের লেখক, তাঁরা দুঃখিত হবেন এমন অকালে বাংলার লেখকগোষ্ঠী একজন নতুন কর্মিষ্ঠ দৃষ্টিবান এবং পরিণতিকামী সাহিত্যিক হারালো।

সংকেত কয়েকটি গল্পের সংকলন, যে গল্পগুলো বন্ধুরা বাছাই করে একত্রে প্রকাশ করেছেন। সোমেন চন্দের আরো কিছু লেখা আছে যা প্রকাশ করার যোগ্য। আশা করি পরের বইয়ে 'ক্রান্তি'-তে 'বনস্পতি' নামে যে গল্পটি বেরিয়েছিল সেটি নির্বাচিত হবে। সোমেনের বইখানি পড়ে বার বার এই কথা মনে হয়েছে যে তার লেখার পিছনে ছিল

www.amarboi.com ~

সদাজাগ্রত মন এবং বলিষ্ঠ ও ঋজু দৃষ্টিভঙ্গি। কথাগুলো মামুলি অর্থে ব্যবহার করছি না। কারণ সোমেন আর পাঁচ জন তরুণ সাহিত্যিকের মত স্বপ্ন দেখেছে সত্যি, কিন্তু সে স্বপ্ন-কামনা অতৃপ্ত আত্মরতি নয়, যৌবনসুলভ বিষাদ-বিভুক্ষাও নয়। সে চেয়েছিল সাহিত্যে গণশক্তির স্ফুরণ সঞ্চারিত করতে।

প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য রচনায় অবশ্য তার পূর্বেও কেউ কেউ হাত দিয়েছেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সেসব লেখায় দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে প্রকাশের কারুকার্যটাই প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে সমবেদনা থাকলেও এবং স্থানীয় পরিবেশ চমৎকার ফুটলেও পটভূমির প্রসারে সমষ্টির মূলসূত্রটি হারিয়েছে। কোন জায়গায় বা চরিত্র জীবন্ত হয়েছে, কোথাও বা সাহিত্যিক বেশি নজর দিয়েছেন তুলির আঁচড়ে, রঙের সমন্বয়ে। সবগুলোরই মূল্য আছে, কিন্তু কেবলমাত্র নির্যাতিতের বেদনা ও ব্যর্থতাবোধে যে সাহিত্যের জন্ম, তার রস সাহিত্যে-ভিয়ানের অতিরিক্ত মিষ্টতায় সংক্রামিত হবার আশঙ্কা রাখে।

এই বইখানিতে সোমেন চন্দের শিল্পপ্রতিভার পরিচয় খুব বেশী না থাকলেও একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যায়—তার সমাজচৈতন্য এবং ঐতিহাসিক মূল্যবোধ তাকে কোন পথে চালিত করেছিল এবং যে পথে সে অগ্রসর হচ্ছিল, সেটা তার স্বনির্বাচিত—সাম্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ। সে পথের সাহিত্যিক বিপত্তি সে জানত; গল্পগুলোর অসম্পূর্ণ উজ্জ্বলতাই তার প্রমাণ। আমার মনে হয় এই অল্প পালিশের কাজটুকু খুলতো কিছু সময় থাকলে।

গল্পগুলোর মধ্যে তার মননশক্তির ও রচনাভঙ্গির একটা যেন ক্রমিক ইতিহাস পাচ্ছি। 'রাত্রিশেষ' ও 'স্বপ্ন' সুন্দর লেখা কিন্তু এখানে গতানুগতিকতার আভাস রয়েছে। এদের মধ্যে যে লঘু কোমলতার স্পর্শ রয়েছে সেটা মাটির সঙ্গে আল্‌গা সংযোগের ফল। 'একটি রাত' গল্পে সোমেন তার বক্তব্য খুঁজে পেয়েছে, পেয়েছে বিপ্লবী মনের দ্বন্দ্ব ও চিন্তাসূত্র। আর একটা জিনিস লক্ষ করার মতে—সেটা হল, গল্পের শেষ মোচড়। 'সংকেত' গল্পটিতে এসেছে তার নিজস্ব অভিসংকেত, পুঁজিবাদে অনাস্থা, শোষণ নীতির বিরুদ্ধে মাত্র তীব্র প্রতিবাদ নয়, সংঘবদ্ধ প্রয়াসের কামনা। গল্পের শেষটা কিন্তু ছায়াচ্ছন্ন, তাই ইঙ্গিত জোরালো হয়েও আবার ম্লান। দাঙ্গায় পেলাম বিরোধী শক্তির প্রতিক্রিয়া, সাম্প্রদায়িকতার সস্তা মোহ, অজ্ঞতার ভয়াবহ চোরাবালি, যার ওপরে শ্রেণীভেদহীন গণশক্তির ইমারত খাড়া করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই গল্পটিতে সোমেনের সন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় পাই।

'ইঁদুর' অবশ্য তার সার্থকতম রচনা, শেষ গল্পে সে প্রমাণ করছে যে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থরোপিত বনস্পতির কোটরে ও ফাটলে যেসব অস্বস্তিকর ইঁদুরের উৎপাত, তার গভীর কারণ রয়েছে মাটির নিচে, মূল শিকড়ে সযত্নে চাপা দেওয়া। সোমেন চন্দের এই লেখাটি থেকে অনেক আশাপ্রদ কথা মনে হয়েছিল। কারণ এই সঙ্গে সে এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছিল যেখানে বক্তব্য শিল্পে রূপায়িত হয়ে যায়। ইতিহাসের ব্যাখ্যায়, বিশ্লেষণ বৃত্তির সাহায্যে, বিদ্রূপের উত্তাপে ও আন্তরিকতায় সে নিজের রচনাকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিল। এবং তারচেয়ে বড় কথা আমাদের দৈনানুদৈনিক কুশ্রিতা, দৈন্যবোধের জয় করে সে সুশ্রী ও সবল ভবিষ্যতের অনিবার্য ইঙ্গিত পেয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই শেষ করলে বোঝা যায় যে, সোমেন চন্দ শুধু এখানেই থামত না। এই মন নিয়ে আরো ভাবত এবং মেশাতে পারত প্রকাশের তাগিদকে কর্মের প্রেরণায়। তার ভাষায় সজীবতা, ভাবের সংযম ও উপমার নতুনত্ব আপনিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মনে হয় নতুন যুগের গণসাহিত্য রচানায় সে একটি মৌলিক অধ্যায় যোগ করতে পারত।

তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সৃষ্টির নমুনা 'ইঁদুর' গল্পটি তর্জমা করা উচিত অথবা 'সংকেত'। এদের চেয়ে নীচু দরের গল্প 'নিউ রাইটিং'-এ স্থান পেয়েছে।

১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে 'অরণি' পত্রিকায় গোপাল হালদার গ্রন্থটির ওপর 'সংকেত' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি এখানে তুলে ধরছি—

....এমন একটা বিস্ময়ের জন্য সচরাচর আমরা প্রস্তুত থাকি না। পৃথিবীতে কীট্‌স একবারই জন্মিয়াছে। কিন্তু স্বল্পায়ু প্রতিভা আরো জন্মে—সোমেন চন্দের গল্প শেষ করিয়া ইহাই বেশী করিয়া মনে পড়ে। এই গল্পগুলিতে সেইরূপ প্রতিভার-ই স্বাক্ষর রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য যাহা তাহা এই যে, ইহাতে বাহুল্য নাই। বাইশ বছরের যুবকের লেখা—অথচ আশ্চর্য রকমের পরিণত তাহার কল্পনা। যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সুস্থির। উচ্ছ্বাস নাই, কিন্তু আনন্দে টলমল। স্বচ্ছ, উজ্জ্বল আর স্বচ্ছন্দ। পঁচিশ বছরের সোমেনের মধ্যে তাহার কিন্তু চিহ্ন দেখি না। কারণ বোধ হয়, সোমেনের সৌন্দর্য-পিপাসা অত তীক্ষ্ণ ছিল না; সোমেন কীট্‌সের মতো রূপকাতর ছিল না। পীড়িত বা রূপমুগ্ধ কীট্‌স অসুস্থ না হলে সৃষ্টিতে আরো সংযম রক্ষা করিতে পারিতেন। আর প্রাণ-যাত্রায় এমন আকুলিত না হইলে সোমেনও রূপমুগ্ধই থাকিয়া যাইত, জীবনের প্রেম-রসের সন্ধান এই বয়সে পাইত না। কারণ সোমেন শুধু `fine writing'-এর নেশায় মাতাল হইয়া যায় নাই `fine doing'-এর প্রেরণায়ও সে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল। এই জন্যই সোমেনের এই বাইশ বছরের জীবন জানিবার মতো। সে জীবনী, সে কাহিনী, তাহার সামান্যতা ও অসামান্যতা সব প্রকাশ করিবার দায়িত্ব তাহার সহকর্মী ও বন্ধুদের উপর।

কিন্তু কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝা দরকার। সোমেনের কল্পনায় বাহুল্য নাই, তাহার লেখাও স্বচ্ছ এবং স্বচ্ছন্দ। তবু এই কথা বারে বারে মনে হইবে—তাহার প্রতিভা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। যাহা সম্ভাব্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহা বুঝিতে পারি কোথাও একটু সামান্য রেখার ভঙ্গিতে, সামান্য দুই-একটু ভাষার ত্রুটিতে, কোথাও বা গল্পের সামান্য একটু ঢিলে-ঢালা গড়নে। হয়ত তাহা সোমেনের সময়াভাবের জন্য, হয়ত বা তাহা সোমেনের বয়সের জন্য। কিন্তু সোমেন সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই বিদায় লইয়াছে। তবু ইহা না ভাবিয়া পারা যায় না।

এইখানেই তাহার সঙ্গে কীট্‌সের জীবনের মিল—তাহারও রহিল 'An inheritance of unfulfilled renown.

নইলে কীট্‌স ও সোমেন এক জাতের নয়। বরং সোমেনের গল্প পড়িতে পড়িতে যাহার কথা বেশী মনে পড়ে, সে কীট্‌স নয়—গোর্কি। জানি না কেন। সোমেন অবশ্য স্পষ্টই গোর্কির প্রতিভা স্বীকার করিয়াছে—'একটি রাত' গল্পটিতে গোর্কির বিশেষ রূপেরই উল্লেখ আছে,—বাংলাদেশের কোন্ প্রাণবাস লেখকই বা গোর্কির প্রতিভা অস্বীকার করিতে পারে? তবু দুই প্রতিভার প্রভেদ অনেক। গোর্কির মধ্যে রূঢ়তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

রহিয়াছে, থাকিবেই তো, পৃথিবী যে বড় রূঢ়। তাঁহার মধ্যে আনন্দ বড় কম, জীবনানন্দ তাঁহার প্রাণে সাড়া জাগায় নাই, জীবনবেদনাই তাঁহাকে বেশী সাড়া দিয়াছে। আর তাহা ছাড়া, গোর্কি যেন হৃদয়হীন, সংসারকে হৃদয়হীন বলিয়াই তিনি জানিয়াছেন। সোমেন ছিল এইসকল বিষয়ে অন্য রকমের। তাহার কলমের টানে টানে বাংলাদেশের মায়ের ও মেয়ের প্রাণের বেদনা ফোটে—সে 'ইঁদুর' গল্পেই হউক, আর 'একটি রাতের' কাহিনীতেই হউক। অথচ সে বাঙালী সাহিত্যিকদের মতো এ বিষয়ে উচ্ছ্বাস-বহুল বা অশ্রুমুখ নয়। শ্লেষ তাহার কম নয়। পৃথিবীর তুচ্ছতা ও হৃদয়হীনতা সে কম দেখে নাই। তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু সহজ মানবতা তবু সে ভুলিতে পারে নাই, সহজ হৃদয় দিয়াই তাহাও মানিয়া লইয়াছে। তাই 'রাত্রিশেষের' মত অমন গল্পও সে স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারিল। যথেষ্ট কল্পনা উহাতে, যথেষ্ট রোমান্স। তবু খাঁটি তাহার পিছনকার সত্য। যে রোমান্স জীবনের নিকট হইতে পলায়ন নয়—এ তেমনিতর রোমান্স। জীবনের লাবণ্যরেখা ইহাতে ধরা পড়ে—যাহা বাস্তব নয় শুধু, সত্যও। সোমেন চন্দ ইহাকে স্বীকার করিতে বাধা পায় নাই—তাহা শুধু বয়সের গুণে নয়। যৌবনের চোখে যে রোমান্টিক রং থাকে তাহা প্রায়ই হয় স্বপ্নবিলাসী। স্বপ্নের সৌন্দর্য অপেক্ষা স্বপ্নের মোহ থাকে যৌবনের মনে। আর মোহ অপেক্ষা সৌন্দর্যই সোমেনের গল্প দুটিতে ফুটিয়াছে। স্বপ্ন সে দেখিত। সুন্দর স্বপ্ন, উজ্জ্বল স্বপ্ন সে দেখিত, বয়সের গুণে নয়—প্রাণের গুণে, প্রেমের বলে। সে জীবনরসের রসিক হইয়া জন্মিয়াছিল আর জীবন সত্যের প্রেমিক হইয়া উঠিতেছিল। তাহারই প্রমাণ, একদিকে যেমন 'দাঙ্গা' কিংবা 'সংকেত' আর একদিকে তেমনি 'ইঁদুর'। 'দাঙ্গা' কিংবা 'সংকেত' পড়িতে পড়িতে সন্দেহ থাকে না, এ প্রত্যক্ষ জীবনের সাক্ষ্য। আর 'ইঁদুর' পড়িতে পড়িতে সংশয় থাকে না—সোমেনের জীবনবোধ সত্য হইয়া উঠিয়াছে। আর তাহার পথ নাই—সে তাহার প্রতিভার একেবারে মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে এইবার এই সত্য মানিয়া লইতেই হইবে—সম্মুখে পা বাড়াতেই হইবে।....

সোমেনের লেখাগুলিতে আগাগোড়া সাহিত্যের ছাপ। তাই সাহিত্যিক সহযাত্রীরা স্বভাবতই বলিবেন,—'সোমেন আমাদের, এই তাহার পরিচয়। সে কম্যুনিস্ট ছিল, না ছিল ফ্যাসিস্ট, তাহা বাজে কথা। আসল কথা সে গল্প লিখিয়াছে, আর সে গল্প লিখিতে জানিত।' কথাটা মিথ্যা নয়, তবে কথাটা অর্ধ সত্য। আর অর্ধ সত্যের মতো মিথ্যা আর কি হইতে পারে? সোমেনের জীবন এই লেখা কয়টির মধ্য দিয়াই ঘোষণা করিতেছে, এই অসত্যের অসারতা—নিছক 'সাহিত্যসৃষ্টির সংকীর্ণতা ও অগভীরতা', শুধুমাত্র 'সাহিত্যিক বিচারের' অম্পূর্ণতা। কারণ, তাহার গল্পগুলির মধ্যে শুধু সাহিত্যের সোনার ছাপ নাই আছে জীবন-প্রেমিকের প্রাণের ছাপ, আছে জীবনের রক্ত-স্বাক্ষর। সাহিত্যের সোনার ছাপের অপেক্ষা অনেক বেশী দামী জীবনের স্বাক্ষর। তারই জোরে সাহিত্য টিকে, তারই অভাবে সাহিত্য ফ্যাকাশে হইয়া যায়। হাজার কথায়ও এই সত্য উড়িয়া যাইবে না—সোমেন চন্দ ছিল জীবনের সৈনিক।....

সোমেনের জীবন ও চেতনা যাহা বলিয়া গেল—তাহাকে তাই কানে না তুলিয়া লাভ নাই। সেকথা এই যে, সে কম্যুনিস্ট, সে বিপ্লবী। কারণ, এ যুগে যাহা সত্য তাহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপ্লবের সত্য। তাই বিপ্লবের প্রাণস্পর্শ যে সাহিত্যিক যত লাভ করিবেন, তাঁহার সৃষ্টি প্রয়াসও ততই সত্য হইবার সম্ভাবনা—যদি তাঁহার সৃষ্টিশক্তি থাকে। প্রতিবিপ্লবের তাড়নায়ও সাহিত্যিকেরা সৃষ্টিতে নামিতে পারেন, কারণ প্রতিবিপ্লবেরও একটা শক্তি আছে। বরং আজ দশ বৎসর ধরিয়া তাহার দাবাদাবিই তো চলিয়াছে বেশী। তাই প্রতিবিপ্লবের তাড়নায়ও সাহিত্য হয়। কিন্তু তাহাতে ইতিহাসে আশ্বাস থাকিবে না, থাকিবে না সৃজনের সত্য মানবতার নূতন পরিচয় আর মানবাত্মার নূতন স্বাক্ষর। তেমনি শুধু বিপ্লবের দশকেরাও একটা সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন, করেনও। কারণ, বিপ্লবের খেলোয়াড়ের অপেক্ষা বিপ্লবের দর্শকেরা খেলা দেখে বেশি, উপভোগ করে বেশি। খেলোয়াড় তো প্রায়ই থাকেন ঘর্মাক্ত আর রক্তাক্ত—তিনি খেলিয়াই যান। কিন্তু এমন খেলোয়াড়ও আছেন যিনি খেলিতে খেলিতে খেলার সত্যকেও জানেন, সেই সত্যকে আবিষ্কার করিবার জন্যই খেলায় নামিয়া পড়েন। আর খেলার মধ্য দিয়া সেই সত্যই ফুটাইয়া তুলিয়া চলেন। সেই খেলোয়াড়ের কাছে খেলা শুধু উপভোগের জিনিস নয়—উপলব্ধির বস্তু। বিপ্লবের চার আনার বা দশ টাকার গ্যালারির দর্শকের পক্ষে সেই বোধ মিলিবে কোথা হইতে? উপভোগের লেখা আর উপলব্ধির লেখায় প্রভেদ একেবারে গুণগত—মূল্য তাহাদের স্বতন্ত্র'।

সোমেনের জীবন এই সংকেত বাণীই ঘোষণা করে—তাহার সহধর্মী সাহিত্যিকদের কাছে, বাংলাদেশের পথ-হারা আর ঠিকানা-ভোলা ফ্যাসিস্টবিরোধী অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কাছে। সোমেন বোধ হয় ছিল তাহাদের সকলকার অনুজ। কিন্তু বিপ্লবের ও সাহিত্যের সৃষ্টিলোকে সোমেন—এখন পর্যন্ত একমাত্র সোমেন-ই বোধ হয় আমাদের সকলের অগ্রজ।

সরদার ফজলুল করিম সোমেনের একজন সহযাত্রী ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি আত্মগোপন ও জেলে কাটিয়েছেন। মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনে রণেশ দাশ, মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্যদের সাথে সরদার ফজলুল করিমের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়। সোমেন চন্দ ও তার সাহিত্যকর্মকে তিনি গভীর ভাবে জানতেন। প্রতিরোধ পত্রিকায় তিনি 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' এর ওপর একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধটি এখানে উপস্থাপন করছি—

১৯৪২ সনের মার্চ মাসে সোমেন চন্দ যখন নিহত হয়, আমাদের মোছলমান ছাত্র সমাজের বৃহত্তর অংশ তখন নিজেদের নেতৃবৃন্দের মান-অপমানের পরিমাণ নির্ধারণ লইয়া ব্যস্ত। কোন বিশিষ্ট নেতাকে পুষ্পমাল্য প্রদান বা অপর কাহাকেও কালো পতাকা প্রদর্শন, ইহাই ছিল আমাদের রাজনীতির তখনকার বৈশিষ্ট্য। আমাদের সেই চেতনাহীন অবস্থাতে সোমেন চন্দের মৃত্যুকে আমরা হয়তো ঠিকভাবে দেখিতে পারি নাই। এমনি সময়ে শুনেছিলাম সোমেনের মৃত্যুর কথা। ঢাকা শহরের চির পুরাতন দাঙ্গা ব্যতীত সেইদিন তাহাকে কিছু ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু তথাপি সেই অবস্থাতেও পরিচিত অপরিচিত কাহারো কাহারো মুখে সোমেন চন্দের মৃত্যু-সংবাদের সাথে বক্র হাসি দেখিয়া সন্দেহ জাগিয়াছিল।

তাহার পরে বাহিরের আলো বাতাসে আসিলাম—বক্র হাসি সেদিন কাহারা হাসিয়াছিল, কেন হাসিয়াছিল পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। সোমেনের কাহিনীতো পৃথিবীর

www.amarboi.com ~

ইতিহাসে নতুন নহে। জীবনের কল্যাণের বিরোধী গুণ্ডার দল অনেক সোমেনকে হত্যা করিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের জয়কে ওরা রোধ করিতে পারে নাই। সেদিনও কাপুরুষ ফ্যাসিস্ট গুণ্ডার দল সোমেনকে হত্যা করিয়া সোমেনের জীবনের আদর্শকে নষ্ট করিতে পারে নাই। তাই আজ যদি দিনের আলোতে তাহাদের কাউকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে জোর গলায় বলিতাম : সোমেনের সংকেত-ধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে—তোদের দিন শেষ হইয়াছে। দুঃখের বিষয়— দিনের আলোয় আজ আর উহারা বাহির হয় না—পৃথিবীর জনগণের অগ্রগতির প্রতিটি শক্তিতরঙ্গ ওদের বুকে শেল হানিয়াছে—চোরা গর্তে উহারা আত্মরক্ষার পথ খুঁজিয়াছে। তাই আজকাল নিশাচরের বেশে ওদের দুর্বল ছোবল ওদের বিলোপের আভাস দেয়।

সোমেন চন্দ যখন মারা যায় তখন তাহাকে চিনিতাম না—চিনিবার পর্যায়ে তখন ছিলাম না। সোমেনকে চিনিলাম তাহার 'সংকেত ও অন্যান্য গল্পের' বই প্রকাশ হইবার পরে। বইখানা হাতে লইতে প্রথমে সংকোচ ছিল যথেষ্ট—অবহেলাও সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের বাজার বাংলা গল্প উপন্যাসে ভরিয়া গিয়াছে—এত বই। কত আর পড়া যায়? আর নিছক একই সুরের বিভিন্ন দুর্বল প্রকাশ। তাই সোমেনের 'সংকেত' হাতে আসার পরেও অনেকদিন যাবৎ অপঠিত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার পর সত্যই 'সংকেত' একদিন পড়িতে আরম্ভ করিলাম। 'রাত্রিশেষ' সংকেতের প্রথম গল্প। বৈষ্ণবদের আখড়ার কাহিনী। পড়িতে আরম্ভ করিয়া তেমন ভাল লাগিল না। পড়িতে পড়িতে কিছুদূর যাইতে একখানে টের পাইলাম, নিজের অজ্ঞাতে ভাল লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। সোমেন একস্থানে চাঁদনী রাতের বর্ণনা করিতেছে। ".....আজ এতোক্ষণে মাত্র চাঁদ উঠিয়াছে। বনানী কথা বলিতে সুরু করিয়াছে। পায়ে হাঁটা শাদা পথ টুকরো জ্যোৎস্নায় মনোরম। সৌন্দর্য আহরণের নেশায় চোখ বুজিয়া আসে—পা ফেলা মন্থর—দেহ শিথিল..." দেখিলাম আমার অবহেলায় ভাঙ্গন ধরিয়াছে। মনে মনে ভাবিলাম কয়েকটি মাত্র লাইনে বেশ তো বর্ণনাটি দিয়াছে। পিছনের পাতা উল্টাইয়া সোমেনের জন্ম-মৃত্যুর তারিখটা দেখিতে ইচ্ছা হইল। দেখিলাম জীবনের পরিধি মাত্র বাইশ বছর। চমক লাগিল। এ গল্প তাহা হইলে নিশ্চয়ই ষোল—সতের বছর বয়সে লেখা। আহা, লেখাটার যদি তারিখ থাকিত। গল্পটা শেষ করিলাম। কাহিনীর তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই, কিন্তু সংযত হাতের প্রকাশ-ক্ষমতা যেভাবে গল্পটার মাঝে মাঝে উঁকি দিয়াছে তাহাতে বিস্ময় আরো বাড়িল। গল্পটার শেষের দিকে এক জায়গায় সোমেন গাঢ় সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার বর্ণনা দিয়াছে—"...বাহিরে অন্ধকার আরো গাঢ়তায় চাপিয়া আসিয়াছে। একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ। কিছুদূরে কামার বাড়ির লোহা ঠুকিবার আওয়াজ..." চমৎকার লাগিল। লাইন তিনটি পড়িতে যাইয়া আমাদের গ্রামের বাড়ির বিশিষ্ট একটা জায়গার কথা মনে পড়িল, যেখানটায় দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার সময়ে কামার বাড়ির লোহা ঠোকার শব্দ শোনা যায়। তিন লাইনে সোমেন সব ছবিটা আঁকিয়া দিল। আজ আবার লাইন তিনটার পানে চাহিয়া সোমেনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, যে সম্ভাবনাকে গুণ্ডা পশুর দল বর্বরভাবে হত্যা করিল, সেই সম্ভাবনার ছবিকে স্পষ্ট দেখিতে পাই। দ্বিতীয় গল্প 'স্বপ্ন' ও 'রাত্রিশেষ'-এর সুরেই লেখা—কিন্তু এখানে গল্পটির মধ্যে

www.amarboi.com ~

উপমা শক্তির নতুনত্বের যেমন খবর পাইলাম, তেমনি তাহার দরকার মত কাহিনীর মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির অদ্ভুত হাতেরও স্পর্শ অনুভব করিলাম। এই গল্পে একখানে সোমেন রাত্রিকে বলিয়াছে 'সাপের দেহের মত পিচ্ছিল নিস্তব্ধ'। এবার বইখানা দরদের সহিত জোর করিয়া ধরিলাম—সোমেন গতানুগতিক নয়, সোমেন নতুন পথের যাত্রী।

তাহার পরে 'একটি রাত'। প্রায় এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া কেবল খুঁজিতে লাগিলাম যদি গল্পটার রচনার তারিখটা পাইতে পারি—যদি আগের দুইটা গল্পের সাথে এই গল্পের সময়ের ব্যবধানটা ও অবস্থা নিরূপণ করিতে পারি। সেদিন পারি নাই। আজো জানি না সোমেন 'রাত্রিশেষ' ও 'স্বপ্ন' কবে লিখিয়াছিল—ইহার পরে তাহার মনে ভাবের বন্যা কিভাবে বহিয়াছিল। সঠিক জানিতে পারি নাই। কিন্তু আভাস পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত নির্মল ঘোষকে লিখিত সোমেনের যে ক'খানি চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একখানে ১৯৩৮ সনের শেষের দিকে সোমেন এই বলিয়া লিখিল : "গ্রামের অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর, এমন কী যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতগুলো Sweet উপন্যাস রচনা করেছেন, বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমি। কিন্তু ওসব পুরোনো হয়ে গেছে—এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। বছর খানেক আগে সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কোনই পথ খুঁজে পেতাম না—এখন কতকটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে।' ১৮ বছর বয়সে সে এই চিঠি লিখিয়াছিল। কাজেই এরও দুই-এক বছর আগে হয়ত লিখিয়াছিল 'স্বপ্ন' ও 'রাত্রিশেষ'। তাই আজ কেবল সোমেন সম্বন্ধে মনে হয়, জীবনের গতি কত সবল ও দ্রুত হইলে ঐ সময়ে এই বয়সে, এই দৃষ্টিভঙ্গি রূপ পাইতে পারে। ....গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সুকুমার। সাম্যবাদে বিশ্বাসী সে—তার কর্মীও। ঘরে শুধু বৃদ্ধা মা। ঘরের অভাব-অভিযোগ কত স্পষ্ট—কিন্তু সুকুমারের কর্মে বাধা নাই- "সুকুমারের কাছে কতো লোক যে আসে তার ইয়ত্তা নেই। সারাদিন ডাকাডাকি লেগেই আছে। সর্বদা যারা আসে তাদের মধ্যে গ্লাস ওয়ার্কসের সামসুর একজন...।" বৃদ্ধা মা ছেলের কাজকর্ম দেখিয়া চোখের জল ফেলেন—কিন্তু ছেলের জন্য তৃপ্তি ও তাদের অনুভূতি তাহার মনকেও ভরিয়া তোলে।....এই সুকুমারের জীবন-কাহিনী বিশেষ করিয়া তাহার একটি রাতের কথা, সে রাত্রিতে পুলিশ আসিয়া সুকুমারের বাড়ি ঘেরাও করিল। তাই সোমেন শুধু নতুন পথের যাত্রীই ছিল না—সে ছিল নতুন দিনের অগ্রদূত—আমাদের দেশের প্রথম বীর সৈনিক। ইহার পরের গল্প তিনটি 'সংকেত', 'দাঙ্গা', 'ইঁদুর'।

'একটি রাত'—এ যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের সাক্ষাৎ পাইলাম, শেষের এই গল্প তিনটি তাহারই উন্নততর ও পূর্ণতর প্রকাশরূপ হইয়া রহিয়াছে। 'সংকেত' ও 'ইঁদুর' দুইটিই বড় গল্প। 'ইঁদুর সম্বন্ধে আজ আর কিছু বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ অসঙ্কোচে শিল্পের উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন। সোমেনের শক্তির প্রমাণের ইহার পরে আর প্রয়োজন হয় না। 'ইঁদুর' ইংরেজিতে অনূদিত হইয়া আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রাদেশিক গল্পে পরিণত হইয়াছে। ঢাকার সোমেন আজ শুধু বাংলার সোমেন নয়—সে আজ ভারতের সোমেন। 'ইঁদুর' গল্পের প্রথম পাঠে আমার মনে যে তৃপ্তির শিহরণ জাগিয়াছিল, তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমার জন্মায় নাই। তাহার কতকগুলি জায়গা ভুলিতে পারি না—কেবল পড়িতে ভাল

www.amarboi.com ~

লাগে। গরিব মধ্যবিত্ত পরিবার। সোমেনের নায়ক গরিব মা বাপের মধ্যে সন্ধ্যার পূর্বে মান-অভিমান হইয়াছিল! গভীর রাত্রে ইঁদুরের উৎপাতের মধ্যে তাহাদের মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইয়াছে। সোমেনের নায়ক এইখানটায় বলিতেছে : "বাবা মাকে ডাকলেন নাম ধরে। ভারী চমৎকার মনে হলো—মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলাম—আর আমার প্রতি ভালবাসা কামনা করতে লাগলাম তার কাছ থেকে...।" কিন্তু এই স্থানটি! সোমেনের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সংযত নায়কের মনের অবস্থার কি অভিনব প্রকাশ: "মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলাম...।" সোমেনও ছিল গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখময় কাহিনী—সেই দুঃখের সংসারেও — জীবনের যে স্ফুলিঙ্গ তৈরি হইতেছে, তাহার এমনি সরস মধুর সাহিত্যিক প্রকাশ আর কি কোথাও পাইয়াছি? তারপর সেইখানটা, সোমেনের নায়ক (একি সোমেন নিজে?) রেল ইউনিয়ন হইতে ফিরিয়া আসিতেছে—শশধর, ইয়াসিন, সুরেন—সোমেনের আপনার জনের মধ্যে হইতে সোমেনের নায়ক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিতেছে : "আমি ফিরে এলাম। সাম্যবাদের গর্ব—তার ইস্পাতের মতো আশা, তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলাম..."

'সংকেত' গল্পটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করা প্রয়োজন। 'সংকেতে' সোমেনের সাহিত্যিক শক্তির কতখানি প্রকাশ হইয়াছে তাহাই একমাত্র বিচার্য নহে। কিন্তু সেদিক দিয়া বলিতে গেলেও গ্রামের অধিবাসী ও তাহাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের পরিচয় ও তাহার সাহিত্যিক প্রকাশ 'সংকেতে' আছে। কিন্তু সংকেতের অপর যে দিকটা সে আমাদের দেশের সর্বহারা মজুর ও কিষাণদের জাগরণের সংকেত—ধ্বনির প্রকাশ।... কোন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করিয়াছে। মিলের মালিক তাহাদের ধর্মঘট শক্তিহীন করিয়া দিবার জন্য দূর গ্রাম হইতে লোভ দেখাইয়া কৃষকদের লইয়া আসিয়াছে। নতুন সংগৃহীত শ্রমিকগণ মিলের মধ্যে ঢুকিতে চাইলে কলের ধর্মঘটী মজুরগণের নেতা তাহাদের বুঝাইয়া বলিতেছে যে, যেন তাহারা তাহাদেরই ভাইদের মুখের ভাত কাড়িয়া না লয়—দুঃখ-দুর্দশা তাহাদের উভয়েরই সমান—উভয়ের উপরই শোষণ সমানভাবে চলিয়াছে—মিলের ম্যানেজার হতভম্ব হইয়াছে কি করিতে সে কি করিল? শ্রমিকের শক্তি সে আরো জোরালো করিয়া দিল। সোমেনের 'সংকেত' কৃষক—মজুরের একতাবদ্ধতার যে সংকেত আমাদের দেশে পাইতেছি তাহরই প্রকাশ।

'দাঙ্গা' সম্বন্ধে কোন বিশেষণই বোধ হয় যোগ্য হইবে না। ঢাকা শহরের ১৯৪০-৪১ সনের দাঙ্গার সময়ে প্রায়ই ঢাকাতে ছিলাম। সোমেনের 'দাঙ্গা' পড়িয়া শেষ করিয়া আবার সেই অবস্থা হুবহু মনে পড়িল—সেই 'আল্লাহ আকবর' 'বন্দেমাতরম'-এর মুহুর্মুহু ধ্বনি—বাড়িকে বাড়ি পোড়াইবার সেই অমানুষিক দৃশ্য। সোমেনের এই গল্প সেই সময়ে হয়তো কোথাও প্রকাশ হয় নাই—হয়তো এই বইতেই ইহার প্রথম প্রকাশ—নচেৎ দেশের সেই দুর্দিনে বাংলার সাহিত্যিক জগৎ ঢাকার অবস্থা সম্বন্ধে নিছক নিস্তব্ধ। প্রতিবাদের শব্দ কাহারো লেখনী হইতে তখন বাহির হয় নাই—কোন সমাজেরই না—না হিন্দু, না মোছলমান। হয়তো একমাত্র সোমেনের হাত হইতে বাহির হইয়াছিল সমবেদনা ও প্রতিবাদের এই তীক্ষ্ণ বাণ—। 'দাঙ্গা'-র একটা স্থান—সোমেনের নায়ক অশোক দাঙ্গার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

বিরোধিতা করে, তাহাতে তাহার ছোট ভাই অজয় ক্ষেপা : অজু কর্কশ স্বরে বললো, "তোমার তো বলবেই"—আবার মৃদু স্বরে—"তোমরা হিন্দুও নয়— মোসলমানও নয়।" নায়ক অশোক জবাব দিল : "আমরা ইহুদির বাচ্চা না রে?" তাহার পর আর একস্থানে... মাটির দিকে চেয়ে অশোক মনে মনে বললে, 'আগামী নূতন সভ্যতার যারা বীজ, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমি যোগ দিয়েছি—তাদের সুখ-দুঃখ আমারও সুখ-দুঃখ। আমি যেমন বর্তমানে সৈনিক, আগামী দিনেরও সৈনিক বটে। সেজন্য আমার গর্বের সীমা নেই। আমি জানি আজকের চক্রান্ত সেদিন ব্যর্থ হবে-প্রতিক্রিয়ার ধোঁয়া শূন্যে মেলাবে। আমি আজ থেকে দ্বিগুণ কর্তব্যপরায়ণ হলাম—আমার কোন ভয় নেই।" পড়িয়া ভাবিলাম দেশকে, তাহার জনগণকে কতখানি দরদ দিয়া ভালবাসিলে লেখক এমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিক হইতে পারে— তাহাদেরই জন্য শহীদ হইতে পারে। আর আমাদের দেশের যাহারা সাহিত্যের পবিত্র প্রাসাদে বসিয়া মনে করেন, দেশের জনগণের সমস্যা লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না—দেশের সমস্যাকে সাহিত্য রূপ দেওয়া মানে প্রোপাগাণ্ডা করা, তাহার অন্ততঃপক্ষে সোমেনের 'দাঙ্গা' পড়িয়া দেখিতে পারেন।

টলার ও র‍্যাল্‌ফ ফক্সের জীবনী পড়িয়া সোমেন একদিন লিখিয়াছিল : "ফক্স সবচেয়ে গৌরবজনকভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে—কিন্তু যদি আরো কিছুকাল বেঁচে থাকত!" আজ সোমেনের স্মৃতি—বার্ষিকী উদ্‌যাপন করিতে যাইয়া তাহার নিজের কথাই সম্বন্ধে কেবল বলিতে ইচ্ছা করে : কিন্তু যদি আরো কিছুকাল বেঁচে থাকত! তবু সোমেন আজ নাই—কিন্তু তাই বলিয়া আমরা হতাশ হইব না। সোমেনের মৃত্যুদিনে মুষ্টিবদ্ধ হাতে আমরা আজ এই প্রতিজ্ঞা লইব, যেন তাহার আদর্শের বীজ লক্ষ-কোটি হইয়া আমাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে; জীবনের যে ইঙ্গিত সোমেন তাহার জীবনে পাইয়াছিল—আজ যাহার সুস্পষ্ট আভাস সোমেনের ও হাজার লক্ষ জনগণের রক্তের মধ্য দিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতিষ্ঠা যেন আমরা করিতে পারি—কেননা একমাত্র তাহার প্রতিষ্ঠাতেই হইবে সোমেনের জীবনের নব প্রতিষ্ঠা।

চার

সোমেন চন্দের 'অমিল' গল্পটি এখনো ভালো করে আমাদের পাঠক, গবেষক ও সমালোচকের দৃষ্টিতে আসেনি। বর্তমানে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক এবং এমন কি ব্যক্তিগত জীবনেও রয়েছে শ্রেণী চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, ভয়াবহ বিপর্যয় ও দুর্যোগ। এরপরও রয়েছে জাতিগত বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ ও ঈর্ষাপরায়ণতা, জঙ্গীবাদের উগ্র তৎপরতা, পারমাণবিক শক্তির গর্বে স্ফীত পরাশক্তি অন্য রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তার, বাজার দখলের পায়তারা হিসেবে যুদ্ধের আগুনের লেলিহান শিখা প্রজ্জ্বলিত করে দেয়া—সেখানে 'অমিল' গল্পটি আমাদের সামনে যেমন শ্রেণী চরিত্রের বৈষম্যের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তেমনি শান্তি ও যুদ্ধ বিরোধী চেতনার এক মানবিক আবহ গল্পটির মধ্যে রয়েছে একটি অতীব সূক্ষ্ম ইঙ্গিত।

সোমেনের অন্যান্য গল্পে যেভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে এই গল্পেও শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে—। গল্পে গরিব মেয়ে ভারতীর মাধ্যমে দুটি তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে—

 www.amarboi.com ~

১. বড়োলোক তথা উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে প্রয়োজনবোধে একটা ভাবগম্ভীর আবহে কথাবার্তা হয়তো চলতে পারে এবং সাময়িক আন্তরিকতা ও ভালোবাসা গড়ে ওঠতে পারে কিন্তু যাকে আমরা হৃদ্যিক ভালোবাসা বলি এবং নির্মল মানসিক ঘনিষ্ঠতা কখনো গড়ে ওঠতে পারে না।

২. ভারতীর উক্তিটা যেনো একটি বিস্ফোরণ—

ঘৃণা জিনিসটাকে আমি খুব ঘৃণা করতাম কিন্তু এখন একটু দরকার বোধ করছি—।

শ্রেণী সংগ্রাম আর শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে সোমেনকে শুধু সচেতন শিল্পী বললেই হবে না শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণে তার অভিজ্ঞা ও প্রজ্ঞা এবং শিল্পচৈতন্যের প্রগাঢ়তায় নান্দনিক ঐশ্বর্যে ভাস্বর হয়ে ওঠেছে। অন্যথায় এমন সুন্দর একটি গল্প লিখতে পারছেন।

এই অভিজ্ঞতা আর প্রভাব আলোকেই সোমেন দেখিয়েছেন যে, আকাশ আর পাতালে যেমন ব্যবধান, অমাবস্যা আর পূর্ণিমাতে যে ব্যবধান, আলো আর অন্ধকারে যে ব্যবধান—ধনী আর গরিবে একই ব্যবধান।

ধনীর দুলালী রেখা উচ্চবিত্তের উপচানো ঐশ্বর্যতার মধ্যে লালিত। দরিদ্র পরিবারের মেয়ে ভারতী আর রেখার মধ্যে গড়ে ওঠেছে বন্ধুত্ব। কিন্তু ব্যবধান যে দুস্তর ব্যবধানই থেকে যায়। অমিলের যে আর মিল হয় না নিপুণ কলাবন্ধনে সোমেন তা' উপস্থাপন করেছে। অভিনয়ে চারিত্রিক অনুষঙ্গের মাত্রিকতায় ভারতীকে স্বর্ণালঙ্কার ধার দিয়েছিল। রেখা—এবং ঐ রাতে রেখা নিজের বাড়িতে যত্নে আপ্যায়নের আতিশায্যে অভিভূত করেছিল ভারতীকে। শুধু তাই নয় গাড়ি করে বাড়িতে ও পৌঁছে দিয়েছিল—। কিন্তু দু'জনের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বে বিস্ফোরণ ঘটল পরের দিন। যখন রেখা ভারতীর ফেরত দেয়া গহনায় একটি স্বর্ণের হার খুঁজে পেল না।

তাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও ভালোবাসায় এখানেই চিড় ধরলো—অবিশ্বাস ও সন্দেহের আগুনে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বিষবাণ নিক্ষেপ করল রেখা। এবার ভারতী বুঝতে পারল সামাজিক অবস্থানে তাদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর কত দৃঢ় ও কত প্রকাণ্ড। রেখার তীব্র ও কটু আক্রমণে আহত হল ভারতী।

রেখা পরে হারটি তাদের ঘরেই খুঁজে পেলো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলো ভারতীর কাছে। এবার ভারতীর সামাজিক ও শ্রেণী সচেতনতা জাগ্রত হলো। তার মনের সুপ্ত অগ্নিগিরির লাভা স্রোত যেনো উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠল—। ক্ষোভে, অপমানে দুঃখে আহত হয়ে কেউটের মতো মাথা তুলে ফোঁস করে ওঠলো ভারতী। বুঝতে পারল সামাজিক ও শ্রেণী পার্থক্যের 'অমিল' কতোটুকু।

ভারতী চলে গেল। রেখা বাণ্ডিলটা খুললো। কিন্তু কতক্ষণ পরে এসে যা দেখলো তাতে ভারতী রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। রেখা উদ্বিগ্ন হয়ে কি খুঁজছে।

—'কি হয়েছে?'

—'একটা হার পাচ্ছিনে।'

—'একটা ছাড়া আরও ছিল নাকি!'

রেখা আশ্চর্য হয়ে বললো, 'ছিল নাকি মানে? আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

ভারতী শুষ্ক স্বরে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে—'

www.amarboi.com ~

—'আরে, না না, আমি কি মিথ্যে বলছি তোর কাছে?'

ভারতী কি যে করবে ভেবে পেল না, একটু দেখবার আশায় বাইরে গেল। একটু পরে কতকগুলো মেয়ে এসে জুটল।

—'কি হয়েছে রে?'

রেখা সব বললো'।

এরপর শুরু হল বাঙালি মেয়েদের মুখরোচক চপল চটুলতা। তাদের তীব্র তীক্ষ্ণ ও তির্যক আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত করলো গরিব অথচ সৎ ভারতীকে। সোমেন অতীব দক্ষতার সাথে এই দৃশ্যটা বর্ণনা করেছেন। শুধু বাইরের অবস্থা নয় সোমেন এখানে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও করেছেন। একদিকে রেখার অন্যান্য বান্ধবীদের কলহাস্য মুখরতা অন্যদিকে ভারতীর মানসিক বিপর্যয় ও বিষন্নতা—

'একটা মেয়ে মুচকি হেসে আস্তে বললো, 'আমার ঠাকুরমা একটা কথা প্রায়ই বলেন, অভাবে স্বভাব নষ্ট। যদিও সকলের বেলায় তা নয়।'

রেখা বলল, 'অন্য কিছু হলে আমার আফসোস হতো না, কিন্তু জিনিসটা বিলেতের গোল্ড স্মিথ কোম্পানীর, দাদা এনেছিলেন। তাই দুঃখ হয়। কি যে করি এখন!'

—'কি আর করবে? আরও ভাব করো গে।'

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকতে ভারতী কিছুটা শুনে ভয়ে আর বিস্ময়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। এমন যে হবে সেটা কখনও ভাবতে পারেনি। তবু সে অনেকগুলো কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে গিয়ে বললো,

—'বাসায় একবার খুঁজে দেখিস্ না ভাই—'

—'এতো ভুলো মন নয় আমার। আর এই তো প্রমীলাও তো দেখেছে। অন্য জিনিস হলে আমি কিছু বলতাম না, কিন্তু এ যে—আর এতই যদি টাকার দরকার ছিল, আমি কি চাইলে দিতে পারতাম না?'

ভারতী একবার প্রতিবাদ করতে চাইলো কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

ভারতী গরিব, আর্থিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত কিন্তু সে সৎ। এই সততাই তাকে শক্তি জুগিয়েছে—রেখার উচ্চবিত্তের গগনস্পর্শী দর্প চূর্ণবিচূর্ণ করে ধুলোয় নামিয়েছে। এবং ভারতী এবার এই সততার সাহসেই কেউটের মতো মাথা তুলে দাঁড়ায় রেখাকে পরাভূত করেছে—

পরের দিন এর চেয়েও বেশি আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো।

রেখা এসে হাত ধরে বললো, 'তোরই কথা সত্যি হলো, বাসায় সেটা পেয়েছি। কিন্তু তোকে অনেক কষ্ট দেয়া হলো, আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার মতো যেন ভারতী অনুভব করলো। মুখে বললো, 'ব্যাপারটা খুব হাস্যকর বোধ হচ্ছে।'

—'হ্যাঁ, তুই আমাকে মাপ কর ভাই!'

—'ক্ষমা কাকে বলে তা আমাদের মতো লোকের জানবার কথা নয়, তার অর্থও ভালো ক'রে বুঝিনে, আরও অনেক জিনিস না বোঝার মতো!'

রেখা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

ভারতী বললো, 'কিন্তু এটা একাধিকবার প্রমাণিত হলো যে, বড়লোক এবং গরিবে এমনি খুব দরকার বোধে গম্ভীর আবহাওয়ার মধ্যে কথাবার্তা হয়তো চলতে পারে কিন্তু ভাব যাকে বলে, মানসিক ঘনিষ্ঠতা যার নাম, তা কখনও হতে পারে না।'

—'কেন?'

—'কেন তার অনেক কারণ। প্রধান কারণ হলো, এক পক্ষ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে একজন সম্রাটের চেয়েও বেশি সচেতন।'

—'কথাটা হয়তো সত্যি নয়।'

—'তুমি কিছুমাত্র দ্বিধা না করে আমাকে সকলের কাছে চোর বলে চালিয়ে দিলে কি মনে করে?'

—'ভুল হয়েছিলো বলেই তো!'

—'এ একটা হাস্যকর কথা, ধনীদের সস্তা অজুহাত।'

—'বললামই তো, ভুল।'

—'আবার সেই কথা!' ভারতী উষ্ণ হ'য়ে বললো, 'এই যে সকলে চোর বলেই জানলো, আমার দারিদ্র্যের সুবিধা নিয়ে অনেক ধারণাই করলো, তার কি হবে, কি কৈফিয়ৎ দেবে তুমি? আমাদের আত্মসম্মান নেই? না, সেটা তোমার ওই পেন্সিলকাটা জাপানী কলের চেয়েও সস্তা?'

—'এখন ব্যাপারটা যখন সত্যি নয়—'

দীর্ঘ কলেবরের উদ্ধৃতি উপস্থাপনের বহর দেখে অতিষ্ঠ হবারই কথা। তবে এই উদ্ধৃতি আমার লেখার জন্য নয়—প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার জন্য সোমেন যে তীরের ফলার মতো তীক্ষ্ণ সংলাপ ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে নাকাল করতে পারে এই নৈপুণ্য ও দক্ষতা দেখার জন্য।

গল্পের শেষ সংলাপ যা ভারতীর মুখ থেকে বের হয়ে আসলো তা শুধু তীরের তীব্র ফলা নয় এ যেনো বিষমাখা ফলা।

ভারতী রাগে লাল হয়ে বললো, 'আমার সাথে তুমি কথা বলো না। ঘৃণা, জিনিসটাকে আমি খুবই ঘৃণা করতাম, কিন্তু এখন একটু দরকার বোধ করছি।' ভারতী আর কিছু না বলে সে-জায়গা ছেড়ে চলে গেল।

সোমেনের সারা জীবনই সংগ্রামের আগুনের উসকালো শিখায় উৎক্ষিপ্ত। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেমন তার ঘৃণা তেমনি তার ভেতরে রয়েছে সুকুমার বৃত্তি, মানবিক অনুভূতির গাঢ় প্রগাঢ়তা, আবেগ ঘন হৃদ্যিক উষ্ণতা। এবং তখনই আমরা উপলব্ধি করতে পারবো সংগ্রামে, বিপ্লবে, যুদ্ধবিরোধী সোমেন আর মানবিক ঔদার্য ও প্রেম ভালোবাসার মাধুর্যে ভরা রক্তমাংসে গড়া এক পরিপূর্ণ সোমেন।

এই পৃথিবীতে, সমাজ ও সংসার জীবনে আমরা চাই প্রেম ও ভালোবাসা। চাই একটু সুখের শান্তির নীড়, চাই একটু নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু কারা আমাদের রক্তিম গোলাপকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়, প্রিয়াকে হরণ করে। প্রেম ও ভালোবাসা হনন করে শ্বেতকপোতের বক্ষ বিদীর্ণ করার জন্য তীর নিক্ষেপ করে!

www.amarboi.com ~

এই হন্তারককে আমরা ঘৃণা করি কিন্তু ঘৃণাও শেষ কথা নয়— ঘৃণার বারুদে আগুন জ্বালিয়ে প্রেম শান্তি আর ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলাই আমাদের মূল কথা। 'প্রান্তর' গল্পে সোমেন এই বক্তব্যই তুলে ধরেছেন। গল্পের কেন্দ্রিয় নারী চরিত্র সতী ও লাবণ্যলতা। তারা দু'জন অসম বয়সী।

লাবণ্যলতা অশীতিপর। সে মনোরমার সৎ শাশুড়ি—। মনোরমা গৃহকর্ত্রী তবে বিধবা। মনোরমার চার ছেলে। ছোট ছেলে অজয় কমিউনিস্ট পার্টি করে। একদিন পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায় গোপনীয় কমিউনিস্ট পার্টি করার জন্য।

লাবণ্য লতার অতীত স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস আর অজয়ের স্ত্রী সতীর উৎকণ্ঠা এবং প্রত্যেকটি চরিত্রকে সোমেন মমতা সুন্দর দরদ দিয়ে এঁকেছেন—

"কার হাতের স্পর্শ টের পেয়েই চমকে মুখ তুলে দেখি, তোর ঠাকুরদা! বড়ো আরামে তার হাতে ভর দিয়ে ঘরে ব'সে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। সেদিন মনে হল, এ সংসারে আমি আর একা নই; এমন একজন কেউ আছে, যে আমাকে ভালোবাসে। শুনে তোর হাসি পাবে জানি, বিয়ের পর প্রায় সারাটা জীবন কাটিয়েও যখন কারুর এই প্রথম ভালোবাসার কথা মনে হয়। কিন্তু বুড়ো বয়সে এমন এক ভীমরতি হোলো! সমস্ত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমি ভুলে গেলাম। বুড়ো বয়সে এমন এক রাজ্যের রাণী আমি হলাম, যে রাজ্যে ঢোকবার অধিকার কারুর ছিল না। সে বললে, ওগো, তুমি আগে আমায় জানাওনি কেন? তোমার শরীর এমন খারাপ, এভাবে বিনে-চিকিচ্ছেয় দিন কাটালে যে একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে। আর, কোন্ চিকিচ্ছে ব'লে তখন মনে ভেবেছিলাম, সেই কথাই বলি। রাতে যখন কোন কারণে বাইরে যাবার দরকার হয়েছে, তোর ঠাকুরদা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সেই হাতে ভর দিয়ে, আমি, কোথায় যে যেতে হবে সে-কথা ভুলেছি। শুনে হাসবি, শুধু বাইরে যাবার জন্যে সেই বুড়ো বয়সে মিথ্যে কথা বলার লোভ সামলাতে পারিনি। রাত্তিরে জলতেষ্টা পেলে তার হাতে জল খেয়ে এমন স্বাদ পেয়েছি, রোজই জলতেষ্টা পেয়েছে। খাওয়ার সময় কাছে ব'সে থেকে খাওয়ানোর কী যে আনন্দ হয়েছে, তা বলতে পারিনে।"

"সতী চুপ করিয়া শুনিতেছিল। লাবণ্যলতা বলিতে লাগিলেন, এমনি ক'রে অনেকদিন কাটলো, তিন-চার মাসের কম নয়। সেদিন জ্যোৎস্নারাত। গভীর রাতে কী কারণে যেন বাইরে বার হলাম, তোর ঠাকুরদা কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী সুন্দর জ্যোৎস্না, তুমি দেখতে পাচ্ছো, বউ? আমি সবই দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু কিছু আবছা, কিছু অস্পষ্ট। হঠাৎ তোর ঠাকুরদা আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, তুমি আমায় দেখতে পাও, বউ? বোন, শুধু সেই রাতটাতেই সবচেয়ে বেশি ক'রে আমি আমার মহিমা টের পেয়েছিলাম। তারপর চোখও ভালো হোলো, শরীরও সারলো, কিন্তু যা আবার হারালাম, তা আর কিছুতেই সারবার নয়। তার ভয়ানক জ্বর হোলো, মাত্র তিনদিনের জ্বরে তাকে আমার ঘোমটার আড়াল থেকে বিদায় দিলাম। তারপর কত বছর আজ হয়েছে, শকুনের আয়ু নিয়ে আজও বেঁচে আছি, কিন্তু সারাজীবনে, শুধু তোর কাছেই বলি বউ, সারাজীবনে সে-ই ক'টা দিনের কথা কখনও ভুলতে পারিনে।"

"সতী বৃদ্ধা লাবণ্যলতার কুঞ্চিত হিমশীতল দেহের উপর ঢলিয়া পড়িলো। বউদি?— সতী ফিরিয়া তাকাইলো। ঘরের বারান্দায় এই রাত্রে একাকী পায়চারী করিতেছে নীলা। নীলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও!১৪০www.amarboi.com ~

বলিলো, কোথায় যাচ্ছো ভাই, বৌদি? উত্তর আসে—ঠাকুরমার জ্বর হয়েছে, সে কি জানো না? বোধহয় জ্বরে ছট্‌ফট্ করছে এখন, একটু দেখতে যাই।— নীলা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলো, বলিলো, চলো, আমার ঘরে শোবে চলো। সতী তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলো। নীলা দেখিলো, তাহার দুইচোখে জল, ইলেক্‌ট্রিক আলোয় চিক্‌চিক্ করিতেছে।"

সোমেনের গল্পগুলো আলোচনা করলেই বুঝা যায় যে, তার বয়স কম হলেও তিনি অভিজ্ঞা ও প্রজ্ঞায় ঋদ্ধ হয়েই সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আর লেখার একটা পূর্ণ প্রস্তুতি ছিলো—অন্যথায় তার পক্ষে 'সংকেত', 'দাঙ্গা', 'ইঁদুর' ও 'বনস্পতি' লেখা সম্ভব হতো না। এজন্যই দেখা যায় রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি নিবেদিত হয়েও তিনি এমন কলা নৈপুণ্যে সার্থক গল্প রচনা করতে পেরেছেন। তার গল্পের কাঠামো, চরিত্র সৃষ্টি এবং বুনন বিন্যাসের দিকে তাকালে বোঝা যায় মানুষের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব।

'তার দেহ-মন-শ্রেণী-আদর্শ-বিশ্বাস সব কিছু নিয়েই সাহিত্যে উদ্ভাসিত হয়—তা তিনি জেলে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন—এই জায়গাতেই সাহিত্যের সবচেয়ে বড় জোর। কিন্তু রচনা-পদ্ধতি—সমাজতন্ত্রীয় বিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট রেখেও সাহিত্য রচিত হ'তে পারে। সচেতনভাবে খানিকটা সে ধরনের চেষ্টা তিনি করেছিলেন ১৯৩৮-এর পর থেকে।"

সোমেনের 'একটি রাত' তার আদর্শিক চিন্তায় লালিত। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র সুকুমার। সে ট্রেড ইউনিয়ন করে। এবং পড়াশুনার প্রতি তার গভীর আকর্ষণ। এই গল্পে উল্লেখ রয়েছে র‍্যালফ ফক্সের 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক নীতি'।

মহান শিল্পী গোর্কির প্রতি সোমেনের অসীম দুর্বলতা ছিলো। সুকুমার যেনো 'সোমেনেরই প্রতিধ্বনি। সুকুমার মনে করে তার মা একদিন 'মা' উপন্যাসের পাভেলের মা হয়ে ওঠবে। ট্রেড ও ইউনিয়ন কর্মী বন্ধুদের সামনে সুকুমার

"সুকুমার বললে, 'বুঝলেন না! আপনারা পাভেল কে জানেন?

—'পাভেল?'

—'সে কি, গোর্কির 'মা' পড়েননি?'

—'হুঁ পড়েছি পড়েছি!'

—'ইনি সেই পাভেলের মা, সেই মা।' সুকুমার মা-র দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।"

গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসের মা ও পাভেলের প্রসঙ্গ এভাবেই গল্পে উঠে আসে। আমরা ঘটনাক্রমে লক্ষ করি সুকুমারের মায়ের উত্তরণ। তিনিও গোর্কির 'মাদার' উপন্যাস পড়েন, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর যোগ্য মা হয়ে ওঠার প্রয়াস টের পাই। ভয়ানক খুশি হয়ে সুকুমার বলে—

"তুমিও এই বই পড়ছো, মা? দোষ আছে কে বললে? কিছু দোষ নেই। তুমি সত্যিসত্যি পাভেলের মা হ'তে পারবে। আমি অবিশ্যি পাভেল হ'তে পারিনি।"

সুকুমার শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়। গ্রেফতারের পূর্বমুহূর্তে শীতের রাতের বর্ণনায় সোমেনের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়—

"বাইরে কিছু কিছু কুয়াশা পড়ছে, কোনো গাছের চারদিকে একটা মোটা আংটির মতো মনে হয়, বাড়ির সামনের আঙিনায় যে শেফালি গাছটি একটা ছোলা মুরগির মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৪১www.amarboi.com ~

আজও বেঁচে আছে, তার অবশিষ্ট কয়েকটি ডাল থেকে কিছু ফুল একটি দুটি ক'রে আঙিনার কর্কশ শরীরে ঝ'রে পড়ছে। এমন সময় বাইরে হঠাৎ একটা গোলমাল, কতকগুলো ভারী পদশব্দ, হিন্দি বাংলায় মিশ্রিত বুলি, দরজায় ধাক্কাধাক্কি। লাথির শব্দও শোনা যায়। তাড়াতাড়ি বই বন্ধ ক'রে সুকুমার দ্রুত জানালার তাকের কাছে গেল। ওদিকে মা-ও জেগে যায়।"

'একটি রাত' সোমেনের আর একটি জীবন ঘনিষ্ঠ ও শিল্পসুন্দর কবিতা। আমরা জানি অভিজ্ঞতার বাইরে গেলেই শিল্পীকে হাস্যাস্পদ হতে হয়। এবং শিল্পও হয়ে ওঠে একটি কদাকার পিণ্ড। আগেই উল্লেখ করেছি যে, সোমেনের গল্পগুলো তার জীবন থেকে পাওয়া এবং অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া।

'একটি রাত' গল্পটিতে গোর্কির বিশেষ রূপেরই উল্লেখ আছে,—বাংলাদেশের কোন্ প্রাণবান লেখকই বা গোর্কির প্রতিভা অস্বীকার করিতে পারে? তবু দুই প্রতিভার প্রভেদ অনেক। গোর্কির মধ্যে রূঢ়তা রহিয়াছে, থাকিবেই তো, পৃথিবী যে বড় রূঢ়। তাঁহার মধ্যে আনন্দ বড় কম, জীবনানন্দ তাঁহার প্রাণে সাড়া জাগায় নাই, জীবনবেদনাই তাঁহাকে বেশি সাড়া দিয়াছে। আর তাহা ছাড়া, গোর্কি যেন হৃদয়হীন, সংসারকে হৃদয়হীন বলিয়াই তিনি জানিয়াছেন। সোমেন ছিল এইসকল বিষয়ে অন্য রকমের। তাহার কলমের টানে টানে বাংলাদেশের মায়ের ও মেয়ের প্রাণের বেদনা ফোটে—সে 'ইঁদুর' গল্পেই হউক, আর 'একটি রাতের' কাহিনীতেই হউক। অথচ সে বাঙালী সাহিত্যিকদের মতো এ বিষয়ে উচ্ছ্বাস—বহুল বা অশ্রুমুখ নয়। শ্লেষ তাহার কম নয়। কিন্তু পৃথিবীর তুচ্ছতা ও হৃদয়হীনতা সে কম দেখে নাই। তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু সহজ মানবতা তবু সে ভুলিতে পারে নাই, সহজ হৃদয় দিয়াই তাহাও মানিয়া লইয়াছে। তাই 'রাত্রিশেষের' মত অমন গল্পও সে স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারিল। যথেষ্ট কল্পনা উহাতে, যথেষ্ট রোমান্স। তবু খাঁটি তাহার পিছনকার সত্য। যে রোমান্স জীবনের নিকট হইতে পলায়ন নয়—এ তেমনিতর রোমান্স। জীবনের লাবণ্যরেখা ইহাতে ধরা পড়ে—যাহা বাস্তব নয় শুধু, সত্যও। সোমেন চন্দ ইহাকে স্বীকার করিতে বাধা পায় নাই—তাহা শুধু বয়সের গুণে নয়। যৌবনের চোখে যে রোমান্টিক রং থাকে তাহা প্রায়ই হয় স্বপ্নবিলাসী। স্বপ্নের সৌন্দর্য অপেক্ষা স্বপ্নের মোহ থাকে যৌবনের মনে। আর মোহ অপেক্ষা সৌন্দর্যই সোমেনের গল্প দুটিতে ফুটিয়াছে। স্বপ্ন সে দেখিত। সুন্দর স্বপ্ন, উজ্জ্বল স্বপ্ন সে দেখিত, বয়সের গুণে নয়—প্রাণের গুণে, প্রেমের বলে। সে জীবনরসের রসিক হইয়া জন্মিয়াছিল আর জীবন সত্যের প্রেমিক হইয়া উঠিতেছিল। তাহারই প্রমাণ, একদিকে যেমন 'দাঙ্গা' কিংবা 'সংকেত' আর একদিকে তেমনি 'ইঁদুর'। 'দাঙ্গা' কিংবা 'সংকেত' পড়িতে পড়িতে সন্দেহ থাকে না, এ প্রত্যক্ষ জীবনের সাক্ষ্য। আর 'ইঁদুর' পড়িতে পড়িতে সংশয় থাকে না—সোমেনের জীবনবোধ সত্য হইয়া উঠিয়াছে। আর তাহার পথ নাই—সে তাহার প্রতিভার একেবারে মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে এইবার এই সত্য মানিয়া লইতে হইবে—সম্মুখে পা বাড়াইতেই হইবে।....

সোমেনের গল্প পার্টির আদর্শ হোক আর গ্রাম বা লোকজীবন এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হোক সব কিছুই তার জীবন থেকে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। সোমেন নিজেই বলেছেন—

www.amarboi.com ~

"গ্রামের অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর, এমন কী যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতগুলো sweet উপন্যাস রচনা করেছেন, বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমি। কিন্তু ওসব পুরানো হয়ে গেছে—এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। বছর খানেক আগে সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কোনই পথ খুঁজে পেতাম না—এখন কতকটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে।"

জীবন থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে তার সাহিত্য বলেই সোমেন জীবন ও মানুষকে নতুন জগতের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন—

...গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সুকুমার! সাম্যবাদে বিশ্বাসী সে—তার কর্মীও। ঘরে শুধু বৃদ্ধা মা। ঘরের অভাব-অভিযোগ কত স্পষ্ট—কিন্তু সুকুমারের কর্মে বাধা নাই- "সুকুমারের কাছে কতো লোক যে আসে তার ইয়ত্তা নেই। সারাদিন ডাকাডাকি লেগেই আছে। সর্বদা যারা আসে তাদের মধ্যে গ্লাস ওয়ার্কসের সামসুর একজন...।" বৃদ্ধা মা ছেলের কাজকর্ম দেখিয়া চোখের জল ফেলেন—কিন্তু ছেলের জন্য তৃপ্তি ও তাদের অনুভূতি তাহার মনকেও ভরিয়া তোলে। ...এই সুকুমারের জীবন-কাহিনী—বিশেষ করিয়া তাহাদের একটি রাতের কথা, সে রাত্রিতে পুলিশ আসিয়া সুকুমারের বাড়ি ঘেরাও করিল। তাই সোমেন শুধু নতুন পথের যাত্রীই ছিল না—সে ছিল নতুন দিনের অগ্রদূত—আমাদের দেশের প্রথম বীর সৈনিক। ইহার পরের গল্প তিনটি 'সংকেত', 'দাঙ্গা', 'ইঁদুর'।

পুরো গল্পের আবহে গোর্কির মা উপন্যাসের উত্তাপ ছড়িয়ে আছে। বীণাচরিত্রে ছড়িয়ে আছে প্রেমিক সত্তার উষ্ণতা এবং মা যেনো সত্যিই পাভেলের মা। আমি এখানে বীণা ও সুকুমারের মায়ের একটা মানসচিত্র তুলে ধরছি—

১. "আজ বাড়ির সকলকে উপেক্ষা ক'রে যেন প্রকাশ্য রাজপথে নেমে সুকুমারের ঘরে ঢুকে দেখলো ঘরময় ইতঃস্তত ছড়ানো নানা জিনিসপত্র, বই-কাগজ। সেই রাশি রাশি বই আর কাগজের স্তূপে মুখ গুঁজে বীণার চোখে জল ভ'রে এলো, চুলের খোঁপা তার খুলে গেল, পিঠ থেকে কাপড়ের আঁচল খ'সে গেল।"

২. "আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল পরদিন। সেদিন দুপুরবেলায় ভীষণ বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। বিকেলবেলায় তা খানিকটা থামলো বটে, কিন্তু বৃষ্টি টিপটিপ ক'রে পড়তেই লাগলো। সেদিনের পাইকারি ধরপাকড়ে শহরে একটা বেশ উত্তেজনারই সৃষ্টি হয়েছে। বিকেলে শতশত শোভাযাত্রাকারী বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে মুখে প্রতিধ্বনি দিয়ে নগরের অনেক পথ অতিক্রম করলো। মা বুঝতে পেরেছিল, এরা কার এবং কেন।"

এই গল্পে সুকুমার সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও সামাজিক ঘাত-সংঘাত পরিহার করে একজন যথার্থ বিপ্লবী এবং গোর্কির মা উপন্যাসের পাভেল হয়ে ওঠেছে এবং মা যথার্থই পেলগায়া নিলভানার প্রতিরূপ হয়েছে।

হা-হা করে হেসে সুকুমার বললে, 'দেখুন, মা কেমন রেগেছে।' সুকুমার তার হল্‌দে দাঁতগুলো বের করে হাসলো।

সুরেন মুখ বাড়িয়ে বললে, 'আমাদের কিছু দোষ নেই, মা।' মা দাঁতে দাঁতে চেপে বললে, 'উহুঁ, তোমাদের কিছু দোষ নেই, তোমরা সব শান্ত সুবোধ বালক!' তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুকুমারের দিকে লক্ষ করে বলল, 'তোরা মনে করিস আমি কিছুই বুঝিনে কিন্তু আমি সব বুঝি!'

এই শুনে সকলেই হেসে উঠলো। সুরেনের গলাটাই শোনা যায় সবচেয়ে বেশি। সে আস্তে কথা বলতে পারে না। যত বাজে বা হাস্যকর কথাই হোক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে সে কথা বলবে। জামার বোতাম তার কোন কালেই থাকে না। তবু বোতাম লাগানোর বৃথা চেষ্টা করতে করতে সে বললে, 'কী বোঝেন, বলুন, আমরা সবাই শুনি।'

মা তার দিকে একদৃষ্টে চাইলো, এই মধুর স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় মুখের কাঠিন্য চেষ্টা করলে দূর করতে, কিন্তু চেষ্টা করেও যেন পারলো না।

সুকুমার বলল, 'বুঝবে না! আপনারা পাভেলকে জানেন?'

—'পাভেল?

—'সে কী, গোর্কির 'মা' পড়েননি?'

—'হুঁ, পড়েছি, পড়েছি।'

—'ইনিও সেই পাভেলের মা, সেই মা!' সুকুমার মা'র দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।

সোমেন আত্মপ্রচারের জন্য বা একজন বড়ো লেখক হবেন এ মানসিকতা নিয়ে সাহিত্য চর্চা করেন নি— তার সামনে ছিলো দেশ সমাজ ও মানুষ। সমাজ পরিবর্তন মেহনতি মানুষের জীবন পরিবর্তন, বিপ্লবে সফলতা এই ছিলো তার চিন্তাচেতনা ও ধ্যান-ধারণা। আমরা যখন তার 'একটি রাত' পড়বো অথবা তার ইঁদুর, দাঙ্গা, সংকেত ও বনস্পতি পড়বো তখনই উপর্যুক্ত বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাবো। এবং বিমলা প্রসাদের বক্তব্য এখানে উল্লেখ্য যে,

'একটি রাত' গল্পে সোমেন তার বক্তব্য খুঁজে পেয়েছে, পেয়েছে বিপ্লবী মনের দ্বন্দ্ব ও চিন্তাসূত্র। আর একটি জিনিস লক্ষ করার মত— সেটা হল গল্পের শেষ মোড়ে। 'সংকেত' গল্পটিতে এসেছে তার নিজস্ব অভিসংকেত পুঁজিবাদ অনাস্থা শোষণনীতির বিরুদ্ধে মাত্র তীব্র প্রতিবাদ নয় সংঘবদ্ধ প্রয়াসের কামনা।--- 'দাঙ্গায়' পেলাম বিরোধী শক্তির প্রতিক্রিয়া সাম্প্রদায়িকতার সস্তা মোহ, অজ্ঞতার ভয়াবহ চোরাবালি, যার ওপরে শ্রেণীভেদহীন গণশক্তির ইমারত খাড়া করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই গল্পটিতে সোমেনের সন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় পাই'।

মানুষের নৈতিক জৈবিক চাহিদা আর উষ্ণ রক্তস্রোতের তীব্রতা ফুটে ওঠেছে 'অন্ধ শ্রী বিন্যাসের অনেক দিনের একদিন গল্পে'। আমার ধারণা গল্পটি শুধু সোমেনের নয় বাংলা সাহিত্যের ও একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক গল্পের মতো দৈহিক গন্ধের আমেজ থাকলেও দুটি গল্পের আবহ ও প্রকৃতি আলাদা।

শ্রী বিলাস কর্মহীন। অক্ষমতা আর আত্ম অভিমানের অহং আস্ফালন সর্বস্ব এ চরিত্র। তাই অন্তরের মত্ত আশা তার গর্তে বন্দি ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফুলে ফুঁসে ওঠে। বার বার সোমেনের গল্পে যৌন চাহিদা ও জৈবিক চাহিদার তাগিদ এসেছে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবে বিকারে নয়। ভাবতে অবাক লাগে সোমেন জৈবিক চাহিদার তাগিদকে মার্জিত ও পরিশীলিত রূপে প্রকাশ করেছেন।

শ্রী বিলাসের স্ত্রী বিন্দু বুঝে সন্তানকে স্তন্যদান করতে হবে। স্বামীর আবদারকেও বরণ করে নিতে হবে। আমি এখানে বিন্দুও শ্রীবিলাসের কিছু উক্তি উদ্ধৃত করছি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

না, না, আমাকে আর ডেকো না। এই বয়সে আর অত সোহাগের ডাক ভালো লাগে না। একটা রাতও.....

—অত অহঙ্কার ভালো নয়।

—আরে এতে অহঙ্কারের কী হোলো?

শ্রীবিলাস শক্ত গলায় বললে— তুই কি সারারাত ওখানেই দাঁড়িয়ে কাটাবি?

বিন্দু চুপ ক'রে রইলো।

—আমি, চোখে দেখতে পাই না ব'লে মজা পেয়েছিস বুঝি? খুব মজা না, খুব মজা?

কাছেই ছিল লাঠি, শ্রীবিলাস ভয়ানক রেগে সেটা ছুড়ে মারলো আন্দাজে। বিন্দু এবার হেসে উঠলো। লাঠিটা গায়ে লাগেনি। সে তা উঠিয়ে রেখে দিলে ঘরের এককোণে।

....সে তাড়াতাড়ি কাছে এলো, হাঁটু গেড়ে বসলো, তার হাত ধ'রে বললে—চুপ চুপ, কেন এমন করছো? এই দ্যাখো, আমি একটুও ভয় পাই না তোমাকে।

শ্রীবিলাসের চেঁচামেচি এক মুহূর্তে গেল থেমে, ব্যথা গেল উড়ে। বিন্দু দরজা বন্ধ করলো।

আবার ভোরও হলো, কেউ না-উঠতেই শ্রীবিলাসও উঠলো, আকাশে না-দ্যাখা সূর্যকে প্রণামও করলো, পরলোক-বিষয়ক একটি গানও ধরলো'!

'অন্ধ শ্রী বিলাসের অনেক দিনের একদিন' গল্পটি অগ্রগতি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্মল ঘোষের কাছে পাঠায়। নির্মল ঘোষ এই গল্পটি পাঠ করে যে মন্তব্য করেন তা' এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য—

"অধুনা-লুপ্ত সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে সে 'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন' নামে একটি গল্প পাঠায়। সেই প্রথম লেখা পাঠ করেই আমার মন ওঠে চমক দিয়ে, —পাকা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। তারপর হল পত্রযোগে আলাপ। ক্রমে তাঁর আরো অনেক গল্পই ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হল। রচনার ভেতর যা প্রকাশ করতে পারতো না, তা লিখে পাঠাতো। অজস্র চিঠিপত্রের ভেতর দিয়ে আমাদের অন্তরঙ্গতা জমে উঠল।"

সোমেন চন্দের গল্প বলার ঢঙটা অভিনব। তার বুনন নিপুণ। মহৎ ও বড়ো মাপের চিত্রশিল্পী যেমন অল্প একটু টানে বৃহৎ ও ব্যাপককে ফুটি তুলেন সোমেন কথায় বাণী বিন্যাসে তাই করেছে। মাঝে মাঝে তার গল্পে প্রেম প্রকৃতি চরিত্র ও ঘটনা এবং স্থান কাল এমনিভাবে অভিযোজিত হয়েছে যে, তা' প্রতীকি ও চিত্রময়তা অফুরন্ত নান্দনিক ঐশ্বর্যে মূর্ত হয়ে ওঠেছে—। আমি এখানে 'রাত্রিশেষ' গল্প থেকে একটা উদাহরণ তুলে ধরছি—

'রাত্রি দশটা হইবে। সকলেই কিছু না কিছু বলিতেছিল; চুপ করিয়াছিল কেবল ললিতা। সে ঘরের ভিতর বসিয়াছিল। বৈঠক হইতে নিঃশব্দে চিত্ত উঠিয়া গেল। আজ এতক্ষণে মাত্র চাঁদ উঠিয়াছে। বনানী কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। পায়ে হাঁটা সাদা পথ টুকরা জ্যোৎস্নায় মনোরম। সৌন্দর্য আহরণের নেশায় চোখ বুজিয়া আসে; পা ফেলা মন্থর, দেহ শিথিল। কিন্তু বুকে হাত রাখিয়া সে হাঁটিতে লাগিলো। পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্রের উৎস উপভোগে বঞ্চিত এক অনাগত আত্মা জ্যোৎস্নালোকিত শুকনো বালুচরে নিঃশ্বাস না ফেলিয়া ঘুমাইতেছে'।

www.amarboi.com ~

'রাত্রিশেষ' গল্পে রতন' চিত্ত ও ললিতার মানসিক দহনের প্রহরগুলো সোমেন দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। অনেকেই রাত্রিশেষ, স্বপ্ন ও একটি রাত গল্পকে অপরিণত হাতের গল্প বলেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এ সোমেনের প্রতি এক অবিচার।

মনন বিশ্লেষণ, আত্মসমীক্ষা ও নিসর্গ চেতনায় গল্পটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে চিত্তের উদগ্র আগ্রহ এবং ললিতার অবদমিত মনোবিকলন। সাথে রয়েছে নিসর্গ চেতনা। রতনের গান না গাওয়ার বিষয়টিও এখানে বিশ্লেষণযোগ্য—।

আমি এখানে গল্প থেকে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি—

রতন চারিদিকে চাহিয়া মুখ বাড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল—'বলি শোন। সে অনেক দিনে কথা। তখন আমাদের এখানে রাধা বলে একটি মেয়ে ছিল। ওর একবার অসুখ হল, সে ভয়ানক অসুখ, মেয়েদের যেসব কঠিন রোগ হয়। কবরেজ চিকিৎসা করত। এতে হল না দেখে দু'ক্রোশ দূরের মাধবদি, সেই যে যেখানে খুব বড় রথের মেলা বসে, সেখান থেকে মহিম ডাক্তারকে আনানো হল, সে বুড়ো এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু যার আয়ু সত্যি ফুরিয়ে এসেছে তাকে কী আর বাঁচানো যায়? যায় না। ডাক্তারদের সাথে রোগীর নীতি মেলে না। তখন এমনি খারাপ অবস্থা যে একটু টুঁ শব্দ করাও ভালো নয়। তাছাড়া রোগীর মনে মরবার ভাব জেগেছে, প্রশ্রয় দেওয়াও ভালো নয়। ক্ষান্ত হলাম। কিন্তু সে সময় রাধার মুখের যে অবস্থা, যে কাতরতা দেখেছি, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত গান গাওয়া হয়নি, হবেও না।'

কতক্ষণ পরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। আকাশে ধূসরতা, ছায়ার সঙ্গে বাতাস মিলিয়া যেন ভারী হইয়া গেছে। বনপথ স্তব্ধ।

চিত্তর দুটি চোখ কাহাকে যেন এতক্ষণ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, পায় নাই সে হঠাৎ উঠিয়া বলিল,

ললিতাকে খুঁজে পেলোনা, চিত্ত কি যেনো একটা মানসিক বিষণ্নতা নিয়ে ফিরতেছিলো। একটা অভাববোধ আর হাহাকার তাকে কোন শূন্যে নিক্ষেপ করে দিলো—

চিত্ত চলিয়া আসিল। ধূলা উড়াইয়া রাখাল ছেলেগুলি গরু লইয়া ফিরিতেছে। কুকুরগুলি পথে আসিয়া দাঁড়ায়, আর অনর্থক ঘেউ ঘেউ করে।

সে আনমনে ধীরে ধীরে হাঁটিতেছিল। পথের পাশে সরকার বাড়ীর খোলা পুকুর, জলে ভরা।

হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল এক কলসী জল কাঁখে ললিতার মতোই কে যেন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেছে। চিত্ত আর একটু কাছে গিয়া ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিল, হ্যাঁ, সে-ই। বুকটা তাহার কেমন যেন করিয়া উঠিল।

তাহাকেই সে খুঁজিয়াছিল।

চিত্ত যে পথের উপর দাঁড়াইয়াছে, ললিতকে সেখান দিয়াই যাইতে হইবে। সে ধীরে ধীরে আসিয়া কাছ দিয়াই যাইতেছিল, চিত্ত বলিল, 'এই সন্ধ্যে বেলায় জল নিচ্ছ যে?'

ললিতা নীরবে একটু হাসিল। ভারী সুন্দর, চোখ দুটি ছোট হইয়া আসে, লালাভ গালে টোল পড়ে, চামড়ার টানে চিবুকটি সরল হইয়া যায়।

www.amarboi.com ~

চিত্ত বলিল, 'বারে, বোবা নাকি?'

—'না গো না। বোবা কেন হতে যাব।' ললিতা আবার হাসিয়া সামনে অগ্রসর হইল।

দেখা যায়, সচকিত কতটুকু ফর্সা নগ্ন-পা, মাথা-ভরা চুল, চলমান, জল ভারে বাঁকা দেহলতা। ছায়ায় স্নিগ্ধতা ঘিরিয়া রহিয়াছে।

চিত্ত সেখানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পথের বাঁকে অদৃশ্য হইবার আগে ললিতা আর একবার চাহিয়াছে'।

ললিতাও চিত্তের মনের মধ্যে যে একটা চুরি চুরি ভাবে চলতেছিলো-তা' উভয়ের হৃদ স্পন্দনে ধরা পড়লেও কেউ প্রতিরোধের চেষ্ট করে নি। তবে রতন কি তাদের পরিণতি দেখার সুযোগ খুঁজতেছিলো! তাই কোন এক আগুন্তুকের আগমনে রতন ললিতা ও চিত্তকে চিত্ত বিনিময়ের সুযোগ দিলো—

—'তোমরা একটু বসো, আমি আসছি।' রতন লোকটির কাছে গিয়া কী কথা বলিতে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইল।

ললিতা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এবার চিত্তর দিকে মুখ তুলিয়া হাসিল।

চিত্তও হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তুমি বাইরে গেলে অতবড় ঘোমটা দাও কেন?'

—'এমনি।'

—'পাছে আমরা দেখে ফেলি, না?'

—'দুৎ, তার জন্য নয়। সে বালাই কার থাকে? যার—' ললিতা মাঝখানে থামিয়া গেল। চোখের দৃষ্টি করুণ।

চিত্ত সেদিকে কান না দিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, খুব বুঝি রূপ না? খুব সুন্দরী?'

ললিতা মুচকি হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, খুব সুন্দরী। পুকুরে জল আনতে গিয়ে জলে যখন ছায়া পড়ে, প্রথমে ভয়ানক কাঁপতে থাকে, ছায়াগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তরপরে একটু পরে ভাঙা ছায়া জোড়া লাগে, আশ্চর্য হয়ে দেখি, সে কী অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে কলসী কাঁখে করে দাঁড়িয়ে আছে, আমার দিকে চেয়ে হাসছে। জলকে নেড়ে দিতে ভয় করে, তাহলে ঢেউ হবে, আর মেয়েটি হারিয়ে যাবে। আমার জল ভরা আর হয় না। শেওলাভরা সিঁড়ির উপর বসে পড়ি। আর চেয়ে থাকি— 'ললিতা আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—'ইস, এত অহঙ্কার। তারপর আর আছে?'

ললিতা বলিল, 'নিশ্চয়ই আছে। সে আর একদিন বলব।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চিত্ত বলিল, 'সেদিন আমাদের বাড়িতে গিয়ে গান গাইলে, চমৎকার গান, সেই থেকে তোমায় আমি চিনি। কতো বছর এখানে এসেছো?'

এরপর সোমেন অতীব দক্ষতার সাথে ললিতার মানসিক শূন্যতার চিত্র আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন—

'রাত্রি দশটা হইবে। সকলেই কিছু না কিছু বলিতেছিল; চুপ করিয়াছিল কেবল ললিতা। সে ঘরের ভিতর বসিয়াছিল। বৈঠক হইতে নিঃশব্দে চিত্ত উঠিয়া গেল। আজ এতোক্ষণে মাত্র চাঁদ উঠিয়াছে। বনানী কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। পায়ে হাঁটা শাদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

পথ টুকরা জ্যোৎস্নায় মনোরম। সৌন্দর্য আহরণের নেশায় চোখ বুজিয়া আসে; পা ফেলা মন্থর, দেহ শিথিল। কিন্তু বুকে হাত রাখিয়া সে হাঁটিতে লাগিল। পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্রের উৎস উপভোগে বঞ্চিত এক অনাগত আত্মা জ্যোৎস্নালোকিত শুকনো বালুচরে নিঃশ্বাস না ফেলিয়া ঘুমাইতেছে।

বহিরাবরণ তাহার মা, নিজের মূঢ়তায় অন্যকে মরিবার বেদনায় এখনও বোধকরি তাহার চোখের জল শুকায় নাই।

—'তবে কি?' ললিতা তাহার দিকে কতোক্ষণ চাহিয়া কী মনে করিয়া অঙিনায় গেল, কাহাকে যেন খুঁজিল, তারপর বাঁশের খুঁটি চাপিয়া নিঃশব্দে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। এখন মাথার উপরে চাঁদ, জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করে উঠানটি, গাছের নীচে সেই ভাঙা নরম আলো। পৃথিবী ভরিয়া রূপের প্রবাহ বহিয়া গেছে, সেদিকে চাহিয়া চক্ষু বুজিয়া আসে, বুকে নিঃশ্বাস ভরিয়া উঠে।

কিন্তু বাহিরের পৃথিবীর তুলনায় মনের কোণ শূন্য, কেবল শূন্য। সেই মরুভূমিতে কাহার হাতের স্পর্শ, ঐ জ্যোৎস্নার মত নরম, বুলাইয়া গেছে। কিন্তু কী জানি কেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, যেন চিত্তর সেই আগ্রহের মূলে শ্মশানবাসী খেয়ালই বেশি।

পিছনের দরজার চৌকাঠ ধরিয়া রতন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ললিতা দেখে নাই, টের পাইলে সে হয়তো ভীষণ চমকিয়া উঠিত।

পরদিন ভরা দুপুর মাথায় করিয়া চিত্ত আসিল জল খাইতে। অন্তত তাহার কথায় এই বোঝা যায়। ললিতা তখন রাঁধিতেছিল, হাসিয়া বলিল, 'কেন গো এমন অসময়ে?'

পরিবেশ, প্রকৃতি ও মানুষের মনো বিশ্লেষণের জন্য সোমেন অনেক সংলাপও বক্তব্য জুড়ে না দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো অস্ফুট বর্ণনা দিয়েছেন-।

আজ অনেকদিন পর চিত্ত পুকুরের পারে ছিপ লইয়া বসিল। কাছে একটা লোকও নাই। কেবল পার ঘেঁষিয়া কয়েকটা গরু ঘাস খাইতেছে'।

চিত্ত যে ললিতার মনচুরি করে রতনের সর্বনাশ ঘটিয়েছে তা সে বুঝেছে—কিন্তু বিষয়টা বাইরের উত্তেজনায় প্রকাশ না করে একটি গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়েছে—

'আমাদের বাড়ীতে একটা কুকুর ছিল, দিশি কুকুর, গায়ের রং সবখানেই কালো কেবল পা আর মুখ ছাড়া, সেখানে শাদা রং। মাঝারি গোছের দেহের আয়তন, পা দুটি খাটো, লেজটিও কে যেন কেটে দিয়েছিল। সে যাই হোক আমরা কুকুরটাকে খুব ভালোবাসতাম। ওটাও আমাদের খুব পোষ মেনেছিল, আমরা যা খেতাম সব ওকে দিতাম, দরকার হলে ভালো জিনিস আমিও ওকে খাওয়াতাম। ওর শোবার জায়গা পর্যন্ত করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, একদিন হল কী, আমারই ছোট বোনকে সে অনর্থক কামড়ে দিল। আমরা তো সকলেই অবাক, এ কেমন করে হয়।'

ভিতরের ইঙ্গিত ধরিয়া কোনরকমে বিরক্তি চাপিয়া চিত্ত উঠিয়া পড়িল, রতন ইহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধরিল বলিল,—'যাচ্ছো কেন, শেষটুকু শুনে যাও।'

'তারপর আমরা ভাবলাম এ কেমন করে হয়। এতকাল থাকে, বাড়ির লোকের মতই আদর করেছি, খাবারে দিয়েছি, ভালোবেসেছি, সে কেন এরকম করলে? কৃতজ্ঞতা বলে কোন জিনিসই কী নেই? এছাড়া মানুষ বেঁচে কী করে? তাই যদি না থাকে তাহলে তো আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি, তুমিও আমাকে মেরে ফেলতে পার, ললিতাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

পারে। তারপর অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, পৃথিবীতে এমন একশ্রেণীর জীব আছে যারা খুব প্রিয়জনের বুকেও ছুরি বসাতে পারে, এতটুকু দ্বিধা করে না, যাদের শিরা-উপশিরায় বিভীষণের রক্ত, চোখে কংসের দৃষ্টি, তার মধ্যে গর্জন করে ওঠে অনির্বাণ ক্রোধ, বিদ্বেষ আর দৈহিক চাহিদার তপ্ত লালসা'।

তার স্ত্রী বিন্দু ধনীগৃহের কাজের মেয়ে। পরের বাড়িতে শ্রমদিয়ে ক্লান্ত হয়ে নির্লিপ্তদেহে বাড়ি ফিরে। কিন্তু শ্রীবিলাসের দেহ কামনা ও ভোগের উষ্ণতায় কনায় কনায় ভরে ওঠে। শারীরিক এ উষ্ণতা বিন্দু বুঝে। তার উক্তি—

"ঘরে শুয়ে আছে তিন ছেলেমেয়ে। ওরা বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু ওগো, তোমার চোখে কি ঘুম নেই? তোমার চোখের আগুন নেবাও, আমি তো আর পারি না।"

শেষপর্যন্ত বিন্দুর নিক্ষিপ্ত শীতল দেহকে আশ্রয় করে অক্ষম অন্ধ শ্রীবিলাস তার তাপতপ্ত দেহেকে তৃপ্ত করে। বিন্দুর প্রতিরোধের উপর জয়ী হয় শ্রীবিলাস। গল্পের শেষে আমরা দেখি—

"আবার ভোর হল, কেউ না-উঠতেই শ্রীবিলাসও উঠলো, আকাশের না-দেখা সূর্যকে প্রণামও করলো, পরলোক বিষয়ক গানও ধরলো।"

ঐ তাদের মতো, যার তলে ভয়ানক খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওপর দেখে কিছুই বোঝা যায় না। এছাড়া অন্য কিছুই না!' চিত্ত আর পারিল না, জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

ললিতা দ্রুত ঘরে গিয়া দু'হাতে চোখের জল চাপিল'।

সোমেন যদি অপরিণত লেখক হতো তবে উত্তেজনায় চিৎকার করতো—অনেক জল ঘোলা করতো, তার উচ্চস্বরে অনেক লোক সমাগম হতো—কিন্তু এসবের কোনটাই হল না—।

একটা করুণ এবং অব্যক্ত বেদনার মধ্য দিয়েই, রতনের নিঃসীম শূন্যতা আর হৃদয়ের গভীর দহন ও তীব্র আর্তনাদের মধ্যে গল্পের সমাপ্তি ঘটলো—

বাহিরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। আলোর স্পর্শে বিবশ পৃথিবী। গাছপালা সব যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এদিকে রাত্রি বাড়িয়া চলে। কাহারও চোখে ঘুম নাই আজ। রতন তেমনি বসিয়া আছে, চোখ দুটি যেন কী এক নেশায় নিবিড়।

তখন রাত্রির শেষ প্রহর। লোক এখন আগের মতো নাই। রতনের চোখের নিবিড়তা আরো গভীর হইয়াছে, বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস উঠিতেছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়াও যাহাকে খুঁজিতেছিল তাহাকে পাইল না। ললিতা নাই। রতন তাড়াতাড়ি অঙিনায় অসিয়া দেখিল চিত্তও নাই।

সে রাগে ঠোঁট কামড়াইতে লাগিল। ভাঙা জ্যোৎস্না অঙ্কিত পথের উপর দিয়া তাড়াতাড়ি নদীর খেয়াঘাটে গেল। বর্ষার বিল, নদীর সঙ্গে এক হইয়া ধু-ধু করে।

শূন্যতায় বাতাস হা হা করে।

এই শেষ রাতের পৃথিবীতে রতন অনেকক্ষণ স্তব্ধের মতো দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দু'-একটা জেলেনৌকা এদিক সেদিকে ঘুরিতেছে। তাছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রতন ফিরিয়া আসিল। আখড়া কিছুদূর আছে। তাহার পিছনে একটা কুকুর আসিয়া জুটিল, সেটা হয়ত প্রথম হইতেই সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। রতন এই মুহূর্তে হঠাৎ উহাকে দেখিয়া ভয়ানক রাগিয়া গেল, পথ হইতে একটা ঢিল কুড়াইয়া ছুড়িয়া মারিল কুকুরটার দিকে, কিন্তু লাগিল না। কুকুর পিছন দিকে দৌড় দিল'।

সোমেনের গল্পে পাওয়া যায় নতুন স্বাদ, নতুন গন্ধ। তার জীবন পরিধি স্বল্প লেখাও কম কিন্তু আবেদন ঋদ্ধ ও অন্তঃস্পর্শী। সোমেন আমাদের গ্রামীণ ও লোকায়াত জীবনকে যেন বেড়াজাল দিয়ে টেনে এনেছেন। এবং আমাদের উপহার দিয়েছেন হাজার বছরের চিরন্তন বাংলা ও বাংলার মানুষকে। আর তার কাহিনী, ঘটনা ও চিত্র এবং চরিত্রগুলো জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। এ জন্যই বলা হয়—

'রাত্রিশেষ' সংকেতের প্রথম গল্প। বৈষ্ণবদের আখড়ার কাহিনী। পড়িতে আরম্ভ করিয়া তেমন ভালো লাগিল না। পড়িতে পড়িতে কিছুদূর যাইতে টের পাইলাম, নিজের অজ্ঞাত ভালো লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। সোমেন একস্থানে চাঁদনী রাতের বর্ণনা করিতেছে। "....আজ এতোক্ষণে মাত্র চাঁদ উঠিয়াছে। বনানী কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। পায়ে হাঁটা শাদা পথ টুকরা জ্যোৎস্নায় মনোরম। সৌন্দর্য আহরণের নেশায় চোখ বুজিয়া আসে—পা ফেলা মন্থর—দেহ শিথিল..." দেখিরাম আমার অবহেলায় ভাঙন ধরিয়াছে। মনে মনে ভাবিলাম কয়েকটি মাত্র লাইনে বেশ তো বর্ণনাটি দিয়াছে। পিছনের পাতা উল্টাইয়া সোমেনের জন্ম-মৃত্যুর তারিখটা দেখিতে ইচ্ছা হইল। দেখিলাম জীবনের পরিধি মাত্র বাইশ বছর। চমক লাগিল। এ গল্পটা শেষ করিলাম। কাহিনীর তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই, কিন্তু সংযত হাতের প্রকাশ-ক্ষমতা যেভাবে গল্পটার মাঝে মাঝে উঁকি দিয়াছে তাহাতে বিস্ময় আরো বাড়িল। গল্পটার শেষের দিকে এক জায়গায় সোমেন গাঢ় সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার বর্ণনা দিয়াছে—"....বাহির অন্ধকার আরো গাঢ়তায় চাপিয়া আসিয়াছে। একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ। কিছুদূরে কামার বাড়ির লোহা ঠুকিবার আওয়াজ..." চমৎকার লাগিল। লাইন তিনটি পড়িতে যাইয়া আমাদের গ্রামের বাড়ির বিশিষ্ট একটা জায়গার কথা মনে পড়িল, যেখানটায় দাঁড়াইয়া সন্ধ্যায় সময়ে কামার বাড়ির লোহা ঠোকার শব্দ ঠিক শোনা যায়। তিন লাইনে সোমেন সব ছবিটা আঁকিয়া দিল। আজ আবার লাইন তিনটার পানে চাহিয়া সোমেনের ছবিকে স্পষ্ট দেখিতে পাই। দ্বিতীয় গল্প 'স্বপ্ন' ও 'রাত্রিশেষ'-এর সুরেই লেখা—কিন্তু এখানে গল্পটির মধ্যে উপমা শক্তির নতুনত্বের যেমন খবর পাইলাম, তেমনি তাহার দরকার মতো কাহিনীর মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির অদ্ভুত হাতেরও স্পর্শ অনুভব করিলাম। এই গল্পে একখানে সোমেন রাত্রিকে বলিয়াছে 'সাপের দেহের মতো পিচ্ছিল নিস্তব্ধ। এবার বইখানা দরদের সহিত জোর করিয়া ধরিলাম—সোমেন গতানুগতিক নয়, সোমেন নতুন পথের যাত্রী।

'স্বপ্ন' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকীতে সোমেন চন্দ গ্রামীন তথা লোকজ সমাজ ও জীবনে শুধু চোখ দিয়ে দেখেন নি—অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। তাই লোকজ সমাজের আচার-আচরণ বিশ্বাসও ধ্যানধারণা এবং সংস্কারকে তিনি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। স্বপ্ন গল্পে লোকজ জীবনের বিশ্বাস ও সংস্কার শিল্পিত রূপ পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধ কানাইয়ের বারান্দায় প্রতিদিন গল্পের আসর বসে। শঙ্কর নিয়মিত শ্রোতা—গল্প বলে যায় কানাই—আর মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করে গল্পের ভেতরের গোপন তত্ত্ব ও রূপকধর্মিতা। শঙ্কর গল্পের কাহিনীতে শুনেছে যে ভোর রাতের 'স্বপ্নে' নৌকা দেখলে মানুষ মরে যায়—

চারিদিকে চোখ বড়ো করিয়া চাহিয়া কানাই বলিল, 'তারপর লোকটা নদীর পারে এসে দাঁড়ালো, হুঁ, এখন পার হবে কী করে? মহা মুশকিল! অথচ সেখানে বসে থাকলেও চলবে না, পার হতে হবে! কী আর করা, বসে রইলো। সময় যায়—'সময়ান্তরে কানাইর একটা অভ্যাস, দুমিনিটে বলিয়া চার মিনিট বিশ্রাম করা—এমনভাবে সে কথাটি বলিয়াছে, সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'নৌকো!'

—'হ্যাঁ। লোকটা চেঁচিয়ে বললে, ও মাঝি, আমার পার করে দেবে? মাঝি বললে, পারবো না। দাও না একটু? না না, আমাদের অনেক কাজ, নলহটির হাটে ভোরবেলাতক না পৌঁছুলে চলবে না। দাও না গো। এই ভর সন্ধ্যেয় ঠেকেছি বলেই না। পয়সা দেবে? হুঁ, মাঝি বললে কিনা পয়সা দেবে? তাছাড়া আর উপায় কী? সে বললে, দেবো। তখন তো পারে ভিড়লো এসে। আর—' উপসংহার করিবার মতো অত্যন্ত নীচু স্বরে কানাই বলিল, 'আর লোকটা গিয়ে উঠলো সেই নৌকায়।'

সব চুপচাপ। কেউ একটি কথা বলিতেছে না। সকলেই তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। বুঝি কানাইর এই বিরতি আর সহিতে না পারিয়াই একজন বলিয়া উঠিল, 'তারপর?' কানাইর মুখে এবার হাসি—বাঁ দিকের চোখটি ছোট হইয়া আসিয়াছে, বাঁ দিকের গালে রেখা আঁকিয়া গিয়াছে। সকলে জানে এ ধরনের হাসি তাহার খারাপ। সেই উপসংহারের কথা কানাই কখন বলিবে কে জানে। হুঁকাটা আর একজনের হাতে দিয়া বৃদ্ধ আদিনাথ বলিল, 'দূর!'

কিছুক্ষণ পরে কানাইর নীরব হাসি থামিয়াছে। সুতরাং আশা করা যায়, এবার কিছু সে বলিবে। আর বলিল ঠিকই।— 'তারপর, বুঝলে মামা, ঠিক এমন সময় স্বপ্নটা গেল ভেঙ্গে আর তার কদিন পরে লোকটা মারা গেল।'

—'মারা গেল!'

—'হ্যাঁ, সামান্য জ্বর হয়ে মারা গেল। নৌকার স্বপ্ন এমনি খারাপ! কেউ একবার দেখলে তো রক্ষে নেই, বুঝতে হবে, একদিনের মধ্যেই তার ভবলীলা শেষ।'

শ্রোতার দল ভয়ে স্তব্ধ। পরস্পরের প্রতি চাহিবার সাহসও আর নাই। স্বপ্নে নৌকা দেখিলে আর রক্ষা নাই, দু'একদিনের মধ্যেই মৃত্যু! সেই লোকটার মৃত্যুর সাক্ষী ঐ বয়োবৃদ্ধ কানাই নিজে, তাছাড়া বইতেই যে লেখা আছে। অথচ এখন কানাই—কী রকম হাসিয়া হাসিয়া আলাপ করিতেছে দ্যাখো, যেন কিছুই হয় নাই তাহার, ভয় বা অস্বস্তির চিহ্ন মাত্র নাই'।

গল্পের এতোটুকু শুনেই ভীত কম্পিত ও কাতর হয়ে গেলো শঙ্কর। বার বার সে ভাবতে হয়ে লোকটা শেষ পর্যন্ত স্বপ্নে নৌকা দেখে মরেই গেল। শঙ্কর লোকজ সংস্কার ও বিশ্বাস নিমজ্জিত।

আঘাতটা সবচেয়ে বেশি লাগিয়াছিল, শঙ্করের মনেই। সারাক্ষণ সে প্রায় চুপ করিয়া শুনিয়াছিল, উঠিয়াও আসিল নিঃশব্দেই। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, চারিদিকে পিট্‌পিটে অন্ধকার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৫১ www.amarboi.com ~

বাতাসের শন্ শন্ শব্দ। দুইপাশে ঝোপঝাড়, গাছপালা, অন্ধকারের সঙ্গে উহাদের পার্থক্য ধরা যায় অল্প। একটি আলো দেখা যায় না কোথাও। সাপ-টাপ পড়িয়া থাকে, অন্ধকারে পা ফেলিয়া শেষে কামড় খাইয়া মরা—নাঃ, এত রাত করাটা ভালো নয়। মালা হয়তো শঙ্কায় রাত্রি জাগিতেছে, নাঃ, এত রাত—! কিন্তু এত রাত কী সে আর ইচ্ছা করিয়া করে? কে জানে, নৌকার স্বপ্ন অত খারাপ! ইস, লোকটা মারাই গেলে শেষে'!

শেষ পর্যন্ত এই স্বপ্ন যেনো বাস্তবে রূপ নিলো শঙ্করের জীবনে। আর সোমেন তা অতীব দক্ষতার সাথে শৈল্পিক সৌকর্যে বর্ণনা করেছেন—। শঙ্করের অবচেতন মন আর মনন বিশ্লেষণ করেছেন খুব দক্ষতার সাথে।

শেষরাতের স্বপ্নে নৌকা দেখলে মৃত্যু অনিবার্য—শঙ্করের মনের ওপর তা গভীর প্রভাব বিস্তার করলো—। তার ভাবনায় এখন শেষরাত স্বপ্ন নৌকাও মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন কিছুই নেই। সে একটা ভীষণ ঘোরে পড়ে গেল। মাঝে মাঝে চেতনা অবসন্ন হয়ে আসে—দুর্ভাবনা আর চিন্তার জটিলতার জল ছিন্ন করতে পারে না।

সোমেন যেনো শঙ্করের ওপর লোকবিশ্বাস, সামাজিক সংস্কার আর শঙ্করের মানসিক সঞ্চালনের ওপর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চালিয়েছে। শঙ্কর বুঝে ওঠতে পারে না। একি তার ওপর দিয়ে একটি অধ্যায় চলছে।

চিরপরিচিত পথে শঙ্কর বাড়ি যাত্রা করছে—কিন্তু মনে হচ্ছে এ পথ যেনো তার কাছে অচেনা—। গল্পের বর্ণনায়—

'তাহার বাড়ী যাইতে একটা জায়গা আছে, খুব নীচু, উঁচু আ'লে পথ সঙ্কীর্ণ, শঙ্কর সেখান দিয়াই পথ হাঁটিতেছিল। বর্ষাকালে এখানে জল হয়, এমন কী নৌকা চলাচল করে—নৌকা? স্বপ্ন দেখিতেছে না তো! নিজের চোখে মুখে গায়ে একবার হাত বুলাইয়া দেখিল শঙ্কর। না, স্বপ্ন নয়; ভাবিতেছিল শুধু। চাহিয়া দেখিল, দুইপাশ খালি, কোন ঝোপ-ঝাড় নাই, পায়ের নীচে পথের সঙ্কীর্ণতা অনুভব করা যায়।

বাড়ীর একেবারেই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, কোথা হইতে কান্নার রোল ভাসিয়া আসিতেছে শোনা গেল। কে মারা গেল কে জানে! যে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে, এবার গ্রামশুদ্ধ উচ্ছন্ন করিয়া দিবে। কোন সময় কার পালা আসে কে বলিতে পারে। সাপের দেহের মতো পিচ্ছিল নিস্তব্ধ রাত্রি, গাঁয়ে চৈত্রের বাতাসে আজ কান্নার সুর'।

শঙ্করের মনে ভাবনার ঝড়, তীব্রদ্বন্দ্ব—স্বপ্ন কী সত্য! কখনো ভাবে স্বপ্ন সত্য আবার ভাবে স্বপ্নতো শুধু স্বপ্ন। শঙ্করের ভাবনার স্তরে জটিল জালে আরও জটিল হয়ে পড়ে—মনে হয় এ জটিলতার জাল সে কখনো খুলতে পারবে না—। সোমেনের এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অতীব সূক্ষ্ম।

'কানাইদার ওটা গল্প, ওরকম স্বপ্ন তো সে কতোই দেখিয়াছে, দূর! নাঃ, নৌকার স্বপ্ন তো সে কোনকালেই দেখে নাই; দেখিলে নিশ্চয়ই মরিত, তখন কোথায় থাকিতে ঐ মালা, কোথায় থাকিত এই ঘর-বাড়ী। কিন্তু লোকটা? লোকটা মারাই গেল শেষ পর্যন্ত? সামান্য জ্বরে আবার মারা যায় নাকি কেউ? আর সামান্য জ্বর! কপালে ছিল মৃত্যু, কে ঠেকাইবে তা? নৌকা না, তেমন স্বপ্ন সে কখনও দেখে নাই, কানুদা মিথ্যা বলে না, দেখিলে নিশ্চয় সে মরিত। দূর তাহার আবার ভয় কেন? কস্মিনকালে স্বপ্নই সে দেখে না, তা আবার—দূর!

www.amarboi.com ~

শঙ্করের মানসিক বিভ্রান্তি ঘটেছে—স্বপ্ন, নৌকা, মৃত্যু—এ সব ভাবনার স্তরের জটিলতা সে কোন মতেই খুলতে পারছে না। স্ত্রী মালার সাথে সে অশোভনীয় আচরণ করে, অগ্নিমূর্তি ধারণ করে কথা বলে। শঙ্করের ভাবনার অন্ত নেই—একটির পর একটি করে সে জটিল আবর্তে খাবি খেতে খেতে নিমজ্জিত হয়ে যায়—

মাটির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বসিয়া রহিল, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া তাহার এমনকি কথা বলিবার শক্তিও যেন নাই। এই তো শেষ রাতে একটু ঘুম আসিয়াছিল, তাতে আবার কী স্বপ্ন—ভাবিতেও সারা শরীর ভয়ে অসাড় হইয়া আসে। কানাই যা বলিয়াছে, তা সত্যি? সত্যি হইলে তো—শঙ্করের চিন্তার পথ রুদ্ধ হইয়া আসে। সে তো যাইতে চায় নাই, তবু জোর করিয়া লইল। কোথা হইতে আসিল নদী, কোথা হইতে আসিল নৌকা, আর সে-ও বা কী করিয়া ঠিক সেখানেই গিয়া পড়িল, আর যত ষণ্ডা-গুণ্ডা মাঝিগুলি জোর করিয়া তাহাকে নৌকায় উঠাইয়া লইল, সে তো যাইতে চায় নাই। এখন সে মরিবে, এতো জানা'।

সোমেনের দক্ষতা ও গল্পের একটা মৌলিকত্ব এখানেই যে, শঙ্করকে সংস্কারের কাছে অন্ধবিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে দিতে চায় না। সে বাঁচতে চায়—জয়ী হতে চায়— জীবন যুদ্ধে পরাজিত হতে চায় না। সংগ্রামইতো জীবন—।

'শঙ্কর আজ বেশ আগেই বাড়ি ফিরে এলো—এবং রান্নাঘরে উঁকি দিয়া শঙ্কর বলিল, 'আব্দুল এসেছিলো?'

তাহাকে এই অসময়ে আসিতে দেখিয়া মালা তো অবাক, কিন্তু সে বিস্ময়ের ভাব চাপিয়া বলিল, হ্যাঁ। কিন্তু কে এসব!'

—'বারে, খাবো! অনেকদিন পরে আব্দুলের সঙ্গে যখন দেখা হলো, বললাম, আজ দুধ যা হয় দিয়ে এসো আব্দুল, যা লাগে দেবো। ভাবলাম, গাই আমাদের কবেই বা বিয়াবে, কবেই বা সে দুধ খাবো? তাই কিনলাম। ভালো করিনি?'

মাথা নাড়িল মালা।

—'দুদিনের জন্যে সংসারে আসা, কেন খামোকা কষ্ট করতে যাবো? কষ্ট করে লাভ? আজ বাদে কাল যাবো মরে; কেউ থাকবে না—' জীবন সম্বন্ধে পরম দার্শনিক হইয়া উঠিল শঙ্কর, বলিল, 'তবে কষ্ট করে লাভ? পরাণটাকে দুঃখ দিয়ে লাভ? চাচা আপন পরাণ বাঁচা!' নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল শঙ্কর, কিন্তু কতোটুকু হাসিয়াই আর পারিল না। আপন পরাণ বাঁচা! কেন? সে কী মরিতে চলিয়াছে নাকি? কে বলে সে মরিবে? লোকটা কে? কেন?

ইস্ কী রোদ! মাথা ঘুরাইয়া দিবে যেন!

শঙ্কর তাড়াতাড়ি দাওয়ায় গিয়া বসিল, হাত-পা তেমনি অসাড় হইয়া আসিতেছে, যেন বাকী নাই তাহার। রৌদ্রে খাঁ খাঁ করিতেছে সামনের উঠানটি। গাছপালা সব নেশায় বুঁদ, উহাদের পাতায় পাতায় ঝিম্ ঝিম্। নেহাৎ কিছু না হইলে মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কে আর এরূপ বদলায় না। মালা তাহার কাণ্ড দেখিয়া আশ্চর্য হয়, আগের মতো তেমন কথা বলে না, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, চোখ দুটি মাঝে মাঝে দারুণ কাতর হইয়া ওঠে, কিন্তু কী খাওয়া রে বাপু! দিন নাই রাত্রি নাই—কেবল খাওয়া'।

www.amarboi.com ~

বাস্তবে যে সাপ মানুষের পিছু নেয় একে এড়িয়ে রক্ষা পাওয়া যায় কিন্তু স্বপ্নে সাপ পিছু নিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। শেষরাতের স্বপ্ন, নৌকা, মৃত্যু, স্বপ্নের ফলাফল এ সমস্ত লোকজ বিশ্বাস ও সংস্কার গ্রাম জীবনের প্রতিটি মানুষের রক্তের প্রতিটি কণিকা ও মস্তিষ্কের কোষে কোষে মিশে গেছে—। এই জটিল আবর্ত থেকে শঙ্কর জীবনব্যাপী হবার চেষ্টা করেও মুক্তি পাচ্ছে না—

'তখন রাত শেষ হইয়া আসিয়াছে। একটু শীত শীত করে। শঙ্করের হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, দম যেন তাহার বন্ধ হইয়া আসিতেছে। মাথার ভিতর বোঁ বোঁ করে, সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়াছে, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল সে।— খামোখাই নদীর ধারে সে গিয়াছিল আর দেখা দিয়াছিল নৌকা, সে তো যাইতে চায় নাই, তবু তাহাকে জোর করিয়া উঠাইয়া লইয়াছিল।

হাত-পা তাহার দারুণ হিম হইয়া আসে, শঙ্কর আর একটুও নড়িতে পারে না। এতটুকুও নড়িতে পারে না, এতটুকু শক্তি তাহার শরীরে এখন নাই। তবু তো দেখা দিল সেই মস্ত নৌকা, আর সেই মিশ্‌কালো রঙের ষণ্ডা-গুণ্ডা মাঝিগুলি তাহাকে জোর করিয়াই উঠাইয়া লইল! এখন জোর করিয়াও নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয় তাহার : কানাই মিথ্যা বলে না, সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে সেই লোকটাকে! সে-ও তেমনি মরিতে বসিয়াছে নাকি! সত্যি তো তাই! চেষ্টা করিয়াও শঙ্কর উঠিতে পারিল না। চিৎকার করিতে গেল, পারিল না, গলার স্বরও আজ ভয়ে পালাইয়াছে। নইলে সে চিৎকার করিয়া বলিত : 'মালা, ও মালা, স্বপ্ন দেখে আমি মরছি, আর তুই বেঘোরে ঘুমুচ্ছিস? হারামজাদী, শীগগির আয়'!

'বনস্পতির' আত্মপ্রকাশ ঘটে গোপাল হালদারের লেখা ভূমিকা বক্ষে ধারণ করে। ভূমিকাটি এখানে উদ্ধৃত হলো—

সোমেন চন্দের গল্প-সংগ্রহ হাতে লইলে, এই কথাই প্রথমে মনে জাগে যে, সোমেন ছিল এক সম্ভাবনা। কিন্তু সে যে কত বড় বেদনার কারণ, সোমেন চন্দের গল্পগুলি শেষ করিয়া ভাবিতে হয় তাহাই।

আমাদের মতো অনেকের কাছে সোমেন চন্দ তাহার পরিচয় লিখিয়া গিয়াছে অন্য ভাষায়। সেই লিপি রক্ত লেখা। পৃথিবীর দাবিকে সে বুক দিয়া স্বীকার করিয়াছে, আমরা জানি উহাই তাহার লেখা। আর উহাই তাহার সত্তার সংকেত। কিন্তু প্রথম যে দিন সোমেন চন্দের 'ইঁদুর' গল্পটি পড়িয়াছিলাম সেদিন আমাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তারপরে সোমেন চন্দের প্রথম গল্পসংগ্রহ 'সংকেত' আমাদের হাতে আসিয়া পড়িল। সেদিন সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া উঠিল আমাদের সেই বিস্ময়—বাইশ বছরের যুবক কি করিয়া জানিল এই জীবনের সংকেত? ইহা তো শুধুমাত্র তাহার সংকেত নয়, ইহা যে তাহার অচেতন সহযাত্রীদেরও জীবনগাথা, তাহাদেরও জীবনের সংকেত—সংকেত তাহাদের জীবনের, আর তাহাদেরই সতীর্থ সোমেনের জীবন-বোধের এমন একটা বিস্ময়ের জন্য সচরাচর আমরা প্রস্তুত থাকি না।

'বনস্পতির' এই গল্পগুলিতেও সেইরূপ প্রতিভারই স্বাক্ষর রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য যাহা তাহা এই যে, ইহাতেও বাহুল্য নাই। সোমেন বোধহয় তখন আরও অল্পবয়স্ক ছিলেন, কিন্তু তখনই তাহার দৃষ্টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—'বনস্পতি'-তেই তাহা

www.amarboi.com ~

দেখিতে পাই। কিন্তু ইহারও অপেক্ষা সহজ দেখি তাহার জীবন-রসের অনুভূতি শক্তি—"মরূদ্যানে" তাহাই স্পষ্ট। স্বচ্ছন্দ এই বোধ, উচ্ছ্বাস নাই, কিন্তু আনন্দে টলমল। স্বচ্ছ, উজ্জ্বল প্রাণ যাত্রায় এমন আকুলিত না হইলে সোমেন রূপমুগ্ধই থাকিয়া যাইত, জীবনের প্রেমরসের সন্ধান এই বয়সে পাইত না! কারণ, সোমেন শুধু-fine writing'-এর নেশায় মাতাল হইয়া যায় নাই, fine doing'-এর প্রেরণায়ও সে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

কিন্তু কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝা দরকার। এই গল্পগুলিতে দেখি সোমেনের কল্পনায় পরিণতি আসিতেছে, তাহা আসিবে; কিন্তু তাহা আসিয়া যায় নাই, এই কথাও বারে বারে মনে হইবে। তাহার প্রতিভা ফুটিতেছে। যাহা সম্ভাব্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহা বুঝিতে পারি কোথাও একটু সামান্য লেখার ভঙ্গিতে, সামান্য দুই-একটি ভাষার ত্রুটিতে। কোথাওবা গল্পের সামান্য একটু ঢিলেঢালা গড়নে; কোথাওবা লেখকের বয়ঃস্বন্ধিসুলভ প্রেম প্রণয়ের কথা বলিবার লোভে। হয়ত তাহা রহিয়াছে সোমেনের সময়াভাবের জন্য, হয়তবা রহিয়াছে সোমেনের বয়সের জন্য। কিন্তু সোমেন সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই বিদায় লইয়াছে, তবু ইহা না ভাবিয়া পারা যায় না—তাহারও রহিল "an inheritance of unfulfilled renown."

এই গল্পসংগ্রহে আমরা যে সোমেনকে দেখিলাম, বনস্পতির সম্ভাবনা তাহারও মধ্যে ছিল—এই কথা সংগ্রহ মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু 'সম্ভাবনা' আর বাস্তবে 'রূপলাভ' এক কথা নয়। 'হইতে পারে' আর 'হইয়া উঠার' মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অজানা ব্যবধান থাকে, কোন এক উৎক্রান্তিতে তাহা উত্তীর্ণ হইতে হয়। সেই উৎক্রান্তিই বয়সের ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সোমেন চন্দ সবে আয়ত্ত করিতেছিল। এমন সময় গুপ্তঘাতে তাহার জীবন শেষ হয়—বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্য এক সমাগত প্রতিভাবে হারাইল। এই গল্পগুলিতে আমরা দেখি সেই বিকাশোন্মুখ প্রতিভা প্রথম বসন্তের বার্তা লাভ করিয়া নূতন কিশলয় দল খুলিয়া দিতেছে। জানি ফুল ফুটিবে—আর ভাবি কোথায় সেই ফুল।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এর ওপর একটি আলোচনা লিখেছিলেন—আলোচনাটি এখানে তুলে ধরছি—

'বনস্পতি' গল্প-সংগ্রহটি সোমেন চন্দের ছোটগল্প রচনার প্রস্তুতিপর্ব। গল্পগুলোর অধিকাংশেরই রচনাকাল ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে। বইয়ের সর্বশেষ গল্প 'বনস্পতি' অন্য গল্পগুলোর তুলনায় বেশ দীর্ঘ, ১৯৪০-এর গোড়ার দিকে লেখা। গল্প রচনার প্রস্তুতিপর্ব এই গল্পে এসে অনেকটাই পরিণতরূপ লাভ করেছে; তরুণ লেখককের বিষয়বস্তুর ও দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব পাঠকের চোখে ধরা পড়ে।

'বনস্পতি'-র গল্পগুলো পড়লেই বোঝা যায় তরুণ লেখক জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন, সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে একটি সঠিক মূল্যায়নের চেষ্টা করছেন। জীবনের রস ও সৌন্দর্য যেমন লেখককে আকৃষ্ট করেছে তেমনই সমসাময়িক সমাজ জীবনের কতকগুলো মূল সমস্যা সম্পর্কেও তাঁকে চিন্তিত হতে দেখা যায়। কিন্তু লেখক বয়সে অতি-তরুণ বলেই জীবনরসের অনুভূতির দিকটাই গল্পগুলোতে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। খুব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অতি-তরুণ বয়সের লেখা হলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

গল্পগুলোতে কোনো উচ্ছ্বাস নেই; ধার করা কৃত্রিমতা নেই, শুরু থেকেই সোমেনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং বর্ণনার ভঙ্গি একটি সামঞ্জস্যসূত্রে গ্রথিত। সোমেন যখন এই গল্পগুলো লিখেছিলেন তখনও পুরোপুরি মার্কসীয় ভাবধারায় দীক্ষিত হন নি; কিন্তু তখন থেকেই জীবনধারার মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। মানুষের সামাজিক পরিবেশ যে তার জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং মানুষ মাত্রেরই একটা শ্রেণী-চরিত্র আছে, এটা তরুণ লেখকের চিন্তায় তখনই এসে গিয়েছিল।

'বনস্পতি'—তে লেখক নতুন দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন পৃথিবীর দিকে, মানুষের দিকে। একদিকে যেমন একালের নর-নারীর মধ্যকার সম্পর্কটিকে তিনি কৌতূহলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন (যেমন, 'ভালো-না-লাগার শেষ' কিংবা 'গান' গল্পটিতে দেখা যায়) তেমনই অতি-পরিচিত পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের মেয়ে-পুরুষ কতো বিচিত্র আচরণ করতে পারে তার বাস্তবানুগ বর্ণনাও তাঁর রচনায় শিল্পরূপ লাভ করেছে। 'সত্যবতীর বিদায়' গল্পটিতে একটি বৃদ্ধার বেদনাময় জীবনের চিত্ররূপ লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'প্রান্তর' গল্পের বৃদ্ধা লাবণ্যলতাও এইরূপ একটি চরিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার বাঙালি যৌথ পরিবারের চেহারা পাওয়া যায় 'সত্যবতীর বিদায়' এবং 'প্রান্তর' গল্প দুটিতে। 'অকল্পিত' গল্পটিতে শিল্পী জীবনানন্দ সেনের চিত্র প্রদর্শনীতে আগত ফ্যাশনদুরন্ত একদল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক-যুবতীর আচরণের বর্ণনার মধ্য দিয়েই গল্পের রস জমে উঠেছে। লেখকের অন্তর্দৃষ্টি যেন চরিত্রগুলোকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছে।

'বনস্পতি' গল্পটি আয়তনে দীর্ঘ; বড়ো গল্প না হয়ে একটি উপন্যাসও হয়ে উঠতে পারত। কারণ, লেখক এখানে ইতিহাসের বিশাল পটভূমিকায় গল্পকে দাঁড় করিয়েছেন। ইংরেজ শাসনের পূর্বকাল থেকে (১৭৫০ সাল) একেবারে ১৯৩৯ সনের বিশাল সময়সীমার মধ্যে গল্পের প্রসার। গল্পটির কেন্দ্রতে রয়েছে একটি অতি প্রাচীন বটগাছ এবং এই গাছই পীরপুর গ্রামের সুদীর্ঘ কালের বহু ঘটনাবলীর সাক্ষ্য। বাংলাদেশের ছোট অথচ প্রাচীন একটি গ্রামের সামাজিক ইতিহাস লেখককে গভীরভাবে চিন্তিত করে তুলেছিল! যে-সব ঘটনাবলীর উল্লেখ এই গল্পে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো কোনো বিশেষ এক সময়ে ঘটেনি; বলা যেতে পারে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন কাহিনীতে একটি গল্পসূত্রে গ্রথিত করে তরুণ লেখক তার সমসাময়িক কালের চেতনার সঙ্গে ইতিহাস চেতনাকে শিল্পীসুলভ সততার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন। একদিক থেকে বলা যায় 'বনস্পতি' ইতিহাস-আশ্রিত বিশাল একটি উপন্যাসেরই খসড়া মাত্র; সময় পেলে সোমেন এই গল্পকে ভিত্তি করে একটি মহৎ উপন্যাস রচনা করতে পারতেন হয়তো; কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁকে সে সময় দেয় নি। গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে বহু শক্তিমান বাঙালি লেখক ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস লিখেছেন। নিষিদ্ধ প্রেম, যৌনক্ষুধা, ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘর্ষ এই সব উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। এই ধরণের উপন্যাসের পটভূমির থেকে সোমেনের 'বনস্পতি'-র পটভূমির স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। সোমেনের লক্ষ্য ইতিহাসের কোনো বিশেষ অবস্থায় সামাজিক বা রাজনৈতিক সংঘাতের পটভূমিকায় সমাজের সাধারণ মানুষের আচরণ। এই মানুষ যেমন মন্বন্তরে মরেছে তেমনি জীবনের জন্য লড়াইও করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

'বনস্পতি' গল্পটির শিল্পগত রূপটি পরিপূর্ণতা পায়নি, কিন্তু লেখকের সুস্থ জীবনবোধ গল্পটিকে পাঠকমনে পৌঁছে দেয়। 'বনস্পতি'-তে সমাজ সচেতন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় পাওয়া যায় অল্পকাল পরেই তার গভীর ও সমৃদ্ধতর রূপ প্রকাশ পেয়েছিল 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে।

'বনস্পতি'-র গল্পগুলোতে অবক্ষয়ের চেহারা নেই; সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিণত ভাবনাও নেই। যা আছে তা জীবনকে দেখার, জীবনের গভীরতাকে জানার কৌতূহল। অতি-তরুণ এই লেখকের সজীব মন এবং উজ্জ্বল চোখ খুব সাধারণত পারিবারিক ঘটনায়, বিভিন্ন চরিত্রের আচরণে এবং উক্তিতে নতুন কিছু সন্ধান করে বেড়িয়েছে। জীবনের সংঘাতের চেয়ে জীবনের রস ও সৌন্দর্যই গল্পগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে বেশি। গল্পগুলো পড়লেই একটু নড়েচড়ে বসতে হয়, মাঝে মাঝে দারুণ পাকা হাতের ছাপ দেখে চমকে উঠতে হয়। পাঠক বুঝতে পারেন এই তরুণ লেখক প্রচুর শিল্পসম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বনস্পতি গল্পটির বিস্তার বহুমুখী। বনস্পতির শাখা-প্রশাখা ও শিকড় যেমন বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত এ গল্পের কাহিনী এবং চরিত্রগুলোর বিস্তারও তেমনি। অচ্যুত গোস্বামী গল্পটি সম্পর্কে বলেছেন—

"একবার আমরা লেখক সঙ্ঘ থেকে একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ বার করবো ব'লে ঠিক করলাম। নিজেদের মধ্যে থেকে চাঁদা তোলা হল। কে গল্প লিখবেন, কে প্রবন্ধ লিখবেন, কে কবিতা লিখবেন— তার তালিকা ঠিক করা হোলো। সোমেনের ওপর একটি গল্প লেখার দায়িত্ব চাপলো। ঠিক হল সংকলন গ্রন্থটির নাম দেওয়া হবে 'ক্রান্তি'। কিন্তু ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার আগে প্রত্যেকটি রচনাকে আমাদের বৈঠকের অনুমোদন লাভ করতে হবে।

সুতরাং চাপে প'ড়ে সোমেন একদিন সঙ্ঘের বৈঠকে একটি গল্প এনে হাজির করলো। গল্পটির নাম 'বনস্পতি'। গল্পটি আয়তনে বেশ বড়। এক জটাজুধকারী বনস্পতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে পথের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার নীরব দৃষ্টির সামনে যুগে যুগে সমাজের দৃশ্য-পরিবর্তন ঘটছে। সে যেন ইতিহাসের দেবতা। তারই তৈরি অমোঘ বিধানে মানব-সমাজ ক্রমাগত এক পরিবর্তন থেকে অন্য পরিবর্তনের দিকে ভেসে চলেছে—আজ যে ঘটনা জীবন্ত, সত্য, কত আনন্দ-বেদনার উৎস—কাল তা মৃত ইতিহাসের পাতার নির্জীব কালির আঁচড় মাত্র। কত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা-গড়ার ভেতর দিয়ে কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য অগ্রগতির সুউচ্চ চূড়ায় আরোহণের জন্য মানবজাতি অভিসার-যাত্রায় বেরিয়েছে কে জানে! ইতিহাসের দেবতা নির্মম, মানব-নাট্যের নির্বাক দর্শক। কিন্তু মানব-নাট্যের যেমন একদিন শেষ আছে, তার কোনোদিন তেমনিভাবে কি অবসান ঘটবে? এই প্রতীকী কাহিনীটি কতকগুলো পারম্পর্যহীন বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্যকে সংগ্রথিত এবং চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলেছে। বলা বাহুল্য, এই চমৎকার অভিনব আঙ্গিকে লেখা গল্পটি সকলের সাগ্রহ অনুমোদন লাভ করেছিল এবং 'ক্রান্তি'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত ব'লে রাখি, 'ক্রান্তি' বইখানা প্রকাশিত হওয়ার পর তা তখনকার কোলকাতার বিদ্বজ্জন-সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। একটি মফঃস্বল শহর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৫৭ www.amarboi.com ~

কয়েকজন অখ্যাত তরুণ লেখকের সমবায়ে যে এমন একটি আশ্চর্য মৌলিকধর্মী উচ্চাঙ্গের সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হ'তে পারে তা ছিল অভাবিত এবং বিস্ময়কর।"

'বনস্পতি' সোমেনের বিখ্যাত গল্প। কাঠামোগত অর্থে 'বনস্পতিকে' ছোট গল্প বা বড়ো গল্প অথবা উপন্যাস বলা যায় না। তবে এর ভেতরে লুক্কায়িত আছে গল্প, উপন্যাস ও ইতিহাস। কল্যাণ চন্দ বলেছেন—

'দাদার বড়ো গল্প 'বনস্পতি' অনেকের নজর কাড়লো। অমৃত দত্তের কাছে শুনেছি, ঐ সময় প্রেমেন্দ্র মিত্র পত্রে 'বনস্পতি' গল্পের প্রশংসা করে বিস্ময় প্রকাশ করেন —এ অল্প বয়সের একজন তরুণ কী করে এমন গল্প লিখতে পারেন'।

এই গল্পে সোমেন অতীব আকর্ষণীয় করে পলাশীর যুদ্ধ, ইংরেজের আগমন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্যের অস্ত, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহি যুদ্ধ, এরপর ভারত বিভাগ দুশো বছরের ইতিহাস তুলেছেন। অনেক ছবি, অনেক ঘটনা, অনেক কাহিনী, অনেক চরিত্র এসেছে অনিবার্যভাবে যেনো এক দুর্বার স্রোতে। এখানে রয়েছে যুদ্ধ, প্রেম, দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং অনেক চোখের জল।

এই 'বনস্পতি' শুধু গল্প নয়, উপন্যাস নয়, ইতিহাস নয়, ঘটনা নয় কালের স্বাক্ষী- দু'শো বছর ধরে দেশের ইতিহাস, এবং রায়পুরা, বেলাব, মনোহরদী, শিবপুর, নরসিংদী, মাধবদী, পলাশের মানুষের এবং মেঘনা, আড়িয়ালখা, ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষার তরঙ্গ ধ্বনি ও জনপদের জীবন স্পন্দন।

বনস্পতির কাহিনী সোমেন কল্পনা থেকে নেন নি, ইতিহাস জনশ্রুতি থেকে নিয়েছেন। 'মাধবী' নামটি সোমেন পর পর ব্যবহার করেছেন। পীরপুর থেকে যে সমস্ত বাজার ও গ্রামের নাম বলেছেন এগুলোর অস্তিত্ব এখনও আছে। জমিদার নব কিশোর চৌধুরী ও তার সুন্দরী যুবতী দেহলি স্ত্রীর ঘটনা এখনও লোকমুখে ছড়িয়ে আছে। আমার দাদী এই গল্প খুবই রসিয়ে রসিয়ে বলতেন। কাজেই 'বনস্পতি' সোমেনের উদ্ভট কল্পনা নয়।

গল্পের কাহিনীটা শুরু হয়েছে এভাবে—

এতো বড় বটগাছ সচরাচর দেখা যায় না। পীরপুরের হাটকে যদি চিনিতে হয়, তবে যে-কোন অশীতিপর ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেও ইহার উত্তর মিলিবে—দূরে, সে যত দূরেই হোক না কেন, যেন আকাশেরও প্রায় অর্ধেক ছাইয়া আছে, এমন একটা দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড গোলাকার গাছের দিকে দারুণ তৎপরতায় শীর্ণ হাতটি উঠাইয়া সে বলিবে, 'আরে, তুমি কি কানা? ওই দৈত্যিটার বরাবর চলে যেতে পারে না?' যাহাকে বলা হইবে, সে যেন কোন ব্যবসায়ী, ওই হাটের দিকেই যাইতেছে, আর কোন উদ্দেশ্য তাহার নাই। পীরপুর গ্রামটি অন্যান্য গ্রামের মতো নয়, সেখানে কেউ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে পারে, একথা কেউ ভুলেও কল্পনা করিতে পারে না। কেবল একটি হাট লইয়াই যেন সারাটি গ্রাম। কেবল সারি-সারি টিনে-ছাওয়া ছোট ছোট ঘর, মাঝখানে সরু ক্ষত-বিক্ষত পথ, বটগাছের আশ্রয়ে চারিদিক চমৎকার ছায়াচ্ছন্ন, হাটবার আসিলে রাত থাকিতেই নৌকার পরে নৌকার ভিড়, তারপর সারাদিন আর সারারাত কেবল জনসমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস। সেই কলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয় যাহাদের নাই, অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-কোন উপায়ে হোক সেই জনসমুদ্রের কিছুমাত্র আভাস যাহারা পায় নাই, তাহাদের পক্ষে তেমন দৃশ্যের কল্পনা করা সুকঠিন।

আশেপাশে দশ-বারোটা গ্রাম হইতে পীরপুরের এই হাট চোখে পড়ে। সেই গ্রামগুলি আর এই হাটের মাঝখানে প্রায় দুই মাইলব্যাপী একখানা নদী আর সারি সারি অনেকগুলি বিল। বর্ষাকালে এই বিলগুলি আর নদীতে মিলিয়া যে অবস্থা হয়, সেকথা মনে করিতে হইলে, কেবল কোন সমুদ্রের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। ওপারকে মনে হয় কোন রহস্যময়, কুয়াশাচ্ছন্ন পৃথিবী, বিপুল রহস্যের ফেনা সারা গায়ে মাখিয়া এপারের পৃথিবীর সন্তানদের চোখে ধাঁধা লাগাইতেছে। ইহাও মনে হয়, আকাশের সীমারেখায় তাহা কোন ধূসর বর্ণের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের রাশি—অন্যান্য মেঘের মতো যাযাবর নয়। সেই দুই পারের মাঝখানে বিস্তীর্ণ জলরাশি আরও দুর্বোধ্য। সারাক্ষণ কেবল দুই পারের মানুষকে ভীষণ শাসাইতেছে। তারপর বাতাস বহিতে থাকে, বিশাল জলরাশিতে এখানে—সেখানে বিক্ষিপ্ত নৌকাগুলি শাদা এবং আরও নানারকমের রঙিন পাল মেলিয়া যেন পাখায় ভর দিয়া উড়িয়া আসিতে থাকে, বটগাছের শত শত ডালের ভিতর রক্তের জোয়ার আসে, কোটি কোটি পাতা মৃদু কাঁপিতে থাকে। তারপর কোন এক সময় হয়তো শীতের অবির্ভাব, মাথার উপরে কাঠফাটা রৌদ্র, সমুদ্রের বুক দেখা যায়—কঠিন, ক্ষত-বিক্ষত কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, সেখানে আগুন জ্বলিতে থাকে, বাতাস ক্ষেপিয়া যায়, আর বটগাছের নীচে অজস্র শুকনো পাতার রাশি। একটা মুসলমান বুড়ী মাঝে মাঝে সেই পাতাগুলি ঝাঁট দিয়া নেয়।

আমরা সোমেনের যে কোন গল্প আলোচনা করলেই দেখবো— সোমেন কাহিনী বলে যাচ্ছেন, চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলছেন, ঘটনা সংস্থাপন করছেন আর সাথে সাথে যেনো প্রকৃতি ও বিভিন্ন দৃশ্যাবলির ছবি এঁকে যাচ্ছেন।

এবার সোমেন ফিরে এলেন ঐতিহাসিক ঘটনায়। ঘটনাকাল ১৭৫০। সোমেন যে গল্পজুড়ে দিলেন। আমাদের এলাকার প্রাচীনদের মুখে শুনেছি এ ঘটনা সত্য। এবং গল্প জমে ওঠেছে বৃদ্ধ জমিদার নবকিশোর চৌধুরী ও তার ৩য় পক্ষের যুবতী সুন্দরী স্ত্রী অরুন্ধতী এবং একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্র কিশোরকে নিয়ে।

তখনো সমগ্র ভারতবর্ষের কেন, কেবলমাত্র বাংলাদেশের শাসনভারও জনকতক হিন্দু শ্রেষ্ঠীর চেষ্টায় ইংরেজ বণিকের হাতে চলিয়া আসে নাই, তাহাদের ব্যবস্যয়-প্রতিষ্ঠান ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখনও প্রকৃত শাসন-প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতে পারে নাই। এমন দিনে এক রাত্রে পীরপুরের বৃদ্ধ জমিদার নবকিশোর চৌধুরী তাঁহার শয্যা-সঙ্গিনী তৃতীয়-পক্ষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে লইয়া বড় বিব্রত বোধ করিলেন। একটা ভয়ানক উত্তাপে এক মুহূর্তে কী জানি কেন সমস্ত শরীরটা তাঁহার দারুণ অবশ হইয়া আসিল, কেমন একটা অবসাদে ভরিয়া গেল, তিনি বড় অসহায় বোধ করিলেন, ইচ্ছা হইল দুই হাত দিয়া নিজের চুল ছিঁড়িতে থাকেন, অবশেষে গুটি-শুটি মারিয়া তিনি পড়িয়া রহিলেন'।

গল্পের মটিফ নতুন না হলেও কাহিনী নিয়ে সোমেন এক দুঃসাহসিক জগতে প্রবেশ করলেন। আমি আগেই উল্লেখ করেছি সোমেন যখন কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

করেন, তখন একে প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত করে দেন। তখন প্রেম, প্রকৃতি ও ঘটনা এবং চরিত্র এমনভাবে একাত্ম হয়ে যায় যে, মনে হয় এমন সংযোজন না হলে হতো না। এখানে গল্পের একটু অংশ তুলে ধরছি।

রাত তখন দুইটা। চারিদিক গভীরে নিস্তব্ধ, কোথাও টুঁ শব্দটি শোনা যায় না। সামনের জানালা দিয়া বাগান হইতে তীব্র ফুলের গন্ধ আসিতেছে। বিছানায় বালিশের পাশেও নানারকম ফুল, কিন্তু নবকিশোরের কাছে তাহা এখন বিষের মতো মনে হইল, তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো, অথবা সুচের মতো তাঁহাকে বিঁধিতেছে। পাশেই অরুন্ধতী তাহার প্রখর যৌবন আর চেহারার দীপ্তি লইয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া আছে। নবকিশোরের ইচ্ছা হইল ডাক ছাড়িয়া কাঁদেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি ঘামিতে লাগিলেন। আস্তে-আস্তে তিনটা বাজিয়া গেল, হয়তো রাতকে দিন ভাবিয়া কয়েকটা কাক বাহিরে কা-কা করিতেছে, কাঁটার বিছনায় শুইয়াও নবকিশোর এক সময় ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার আশেপাশে একদল নগ্ন নর-নারী চমৎকার তাহাদের চেহারা, যেন শ্বেত পাথরে খোদা মূর্তি, চমৎকার চোখ-মুখের ভঙ্গি, যেন অজস্র মানিক ঝরিতেছে, নবকিশোর দেখিলেন, খিল-খিল করিয়া হাসিয়া তাহারা একজন আর একজনের সঙ্গে কথা বলিতেছে, অজস্র চুমা খাইতেছে, কেহ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কোন মেয়ের হাঁটুতে মুখ রাখিয়া কী সব বলিতেছে, কেউ বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—আর সেই একদল হাস্যমুখর, সৌন্দর্যদীপ্ত মানুষের মধ্যে তিনি যেন একটি ভেড়া। এমন সময় নবকিশোর হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন, অসহায়তার তুলনা তো নাই, শরীরটাকে আরও অবসাদগ্রস্ত বোধ করিলেন। ঘরের কোণে বাতি জ্বলিতেছে, মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া তিনি দেখিলেন, আশ্চর্য, বিছানা খালি, পাশে তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী অরুন্ধতী নাই, ঘরের দরজা শা—শা খোলা, হু হু করিয়া শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার চোখের পাতা আর ভ্রু কুঁচ্‌কাইয়া আসিল, তিনি খাট হইতে নামিয়া দরজার কাছে আসিলেন, আস্তে ডাকিলেন—'বৌ'?

এরপরের ঘটনা আরো নাটকীয়। স্ত্রীকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে শেষ পর্যন্ত যা দেখলেন ছেলে সুরেন্দ্র কিশোরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে।

'একবার উঁকি মারিয়া যা দেখিলেন, তাতে রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, হাত-পা কাঁপিতে লাগিল,—পীরপুরের চৌধুরী-পরিবারের ভাগ্যে আজ এ কী অভিশাপ, হায়, আজ এ কী দুরপনেয় কলঙ্কের ইতিহাস তাহাকেই বিশেষ করিয়া দেখিতে হইল। তাহার তৃতীয়-পক্ষের স্ত্রী সুন্দরী অরুন্ধতীর সঙ্গে এক বিছানায় শুইয়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া প্রেমালাপ করিতেছে তাঁহারই একমাত্র ছেলে সুরেন্দ্রকিশোর।

ঐ রাতের পর থেকেই সুরেন্দ্র-অরুন্ধতীর অস্তিত্বের আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেলো না। এবং এরপর থেকেই বটগাছের ইতিহাস।

এবং ইহার কয়েকদিন পরেই দেখা গেল নদীর পারে একটা চমৎকার খোলা জায়গা বাছিয়া সেখানে নবকিশোর দুটি বট—অশ্বত্থের চারা একসঙ্গে পুঁতিয়া দিলেন, তারপর সেই গাছে অনেক সিঁদুর মাখাইয়া নতুন কাপড় পরাইয়া বিরাট সমারোহে পূজা করিলেন, আশেপাশের বিভিন্ন গাঁ হইতে হাজার হাজার প্রজা আসিয়া তাঁহার সেই পূজা দেখিল, অজ্ঞাত নিরুদ্দেশ দেবতার উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। ধূপের ধোঁয়ায় আর মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৬৭ www.amarboi.com ~

কোলাহলে কত ছাগশিশুর চিৎকার আর কান্না শুনিয়াও শোনা গেল না, ধূসর মাটি রক্তে ভাসিয়া গেল, নবকিশোর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া 'মা' 'মা' করিয়া অনেক ডাকিলেন।

বটগাছের জন্মের ইতিবৃত্ত মোটামুটিভবে এই।

এরপর সোমেন চলে এলেন ১৭৫৭ খ্রি: পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত। আর এই যুদ্ধে পীরপুরের ছেলে অর্জুন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলো—। এর পরের ঘটনা—বাঘ হত্যাকে কেন্দ্র করে জমিদার তনয়া চম্পকের সাথে অর্জুনের প্রেম। শেষ পর্যন্ত অর্জুনের আবার যুদ্ধে যাত্রা।

নদীর মাঠ হইতে কিছুদূরেই সেই বটগাছ। এখন কিছুটা বড় হইয়াছে। পাতাগুলি কচি, চমৎকার, চক্‌চক্ করে। রোদ খুব তীব্র হইয়া উঠিলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছায়া মাটিতে পড়ে। দুই-একটি ডালের ভিতর দিয়া সুতার মতো সরু শিকড় বাহির হইয়াছে। গাছের গোড়ার দিকটা সিঁদুরে—লাল, আর সেই গোড়ার মাটিও প্রচুর দুধ আর তেল খাইয়া কালো রং ধরিয়াছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, এই গাছের নীচে একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়ায়,—তাহার চুল এলোমেলো—চোখ দুটি কাহার প্রতীক্ষায় আকুল। সে চম্পক। চম্পক মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া সেই দেবাংশী গাছের উদ্দেশ্যে অনেক প্রার্থনা জানায়, বিড় বিড় করিয়া বলে, জয়ের মালা পরিয়া তাহার অর্জুন যেন শীগ্‌গিরই ফিরিয়া আসে, সে আবার তাহাকে বরণ করিয়া লইবে, তাহার বুকের ছায়ায় সেই বীরকে আশ্রয় দিবে। চম্পকের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল, স্তনের ভিতরও কেমন একটা যন্ত্রণা, দুই হাতে সে তাহার স্তন চাপিয়া ধরিল।

চম্পক নদীর পারে আসিয়া দাঁড়ায়, চোখ ছোট করিয়া বহুদূর পর্যন্ত চাহিয়া থাকে, চোখের দৃষ্টি কখনো ভাঙ্গিয়া আসিলেও সে নিজে কখনও ভাঙ্গে না, বর্ষায় ক্ষিপ্ত নদীর ঢেউ পায়ের উপর আসিয়া আছাড় খায়, বর্ষা যায় শীত আসে, শীত যায় আবার বর্ষা আসে,—তবু অর্জুন আসে না; বছরের পর বছর ঘুরিয়া গেল, বটগাছ আরও বাড়িয়া ডাল-পালা মেলিয়া মাটিতে দীর্ঘতর ছায়া বিস্তার করিল, গ্রামের কোথাও দারুণ জঙ্গলে ভরিয়া গেল, কোথাও মানুষের পদক্ষেপে পরিষ্কার হইল, গ্রামে আবার বাঘ দেখা দিল, অনেক ছাগল-বাছুর খাইল—তবুও অর্জুন আসে না। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনতার লড়াই করিয়া সে প্রাণ দিয়াছে।

নদীর পারে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে চম্পকের শরীরও একদিন ভাঙ্গিয়া আসে, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। একদিন দেখা গেল, রাজকুমার মুণ্ডলের মেয়ে চম্পক নদীর বিক্ষুব্ধ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, প্রাণপণে সে সাঁতরাইতেছে। নদীর ঢেউ-এর আঘাতে খোঁপা তাহার খুলিয়া গেল, জলের তালে তালে নাচিতে লাগিল, চম্পক সেই যে জলে নামিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই'।

শিশু-বিধবা চম্পকের জীবনে ঢেউ তুলেছিলো অর্জুন। জীবনের ছন্দে নন্দিত হয়েছিলো চম্পক। সে অর্জুন চলে গেছে। কিন্তু চম্পকের আকাঙ্ক্ষা—জয়ের মালা নিয়েই অর্জুন ফিরবে। দেবাংশী বটগাছের উদ্দেশ্যে সে প্রার্থনা জানায়। বটগাছের নিচে এসে সে দাঁড়ায়। অর্জুনের প্রতীক্ষায় সে। অর্জুন ফিরলেই "তাহার বুকের ছায়ায় সেই বীরকে আশ্রয় দিবে। চম্পকের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিলো। স্তনের ভিতরও কেমন একটা যন্ত্রণা, দুই হাতে, সে তাহার স্তন চাপিয়া ধরে।"

পুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

এবার সোমেন বর্ণনা দিয়েছেন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের। বর্ণনা দিয়েছেন মানুষের দুঃখ দুর্দশা এবং অনেক মৃত্যুর।

তারপর আরও অনেকগুলি বছর কাটিয়া গিয়াছে, প্রায় একশ' বছরের কাছাকাছি। এতদিনে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, পীরপুরেরও। আগে যাহারা ছিল, এখন তাহারা নাই। এখন যাহারা আছে, তাহারা আর একদল লোক, কিন্তু তাহাদের রক্তে একই মানুষের রক্তের প্রবাহ বহিতেছে। সেই বটগাছকেও আর চিনিবার জো নাই। একদিন যা ছিল নিতান্ত শিশু, সে এখন বড় হইয়া প্রাকাণ্ড ছায়া বিস্তার করিতেছে। পাতাগুলি এত ঘন যে আকাশও অনেক সময় দেখা যায় না। এখানে-সেখানে মোটা-মোটা শিকড়, মাটির রস পান করিতে অতৃপ্তি নাই। গাছের ছায়া এত নিবিড় যে গ্রামের ছেলেরা ইহার নীচে বসিয়া আড্ডা মারে, শীতকালে এখানে বসিয়াই আগুন পোহায়, ধোঁয়ায় তাদের মুখ ধূসর হইয়া আসে। এছাড়া গাছের নীচে দুই-একটি ঘরও উঠিয়াছে। তার মধ্যে একটি মুদি-দোকান।

এতদিন পীরপুরর এই বটগাছকে ঘিরিয়া কতো ঘটনা ঘটিয়া গেল, আরও কতো ঘটিবে কে জানে। এতকাল এই গাছ গ্রামের দুই পুরুষ দেখিয়াছে, আরও দেখিবে'।

এরপর সোমেন আমাদের সামাজিক পরিবর্তন, শিল্পসভ্যতা, রেল যাতায়াত—আর সাথে সাথে তুলে ধরেছেন শঙ্কর-সুকুমারীর গল্প। বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কলেরা ও নানা রোগের বর্ণনা। সবকিছুরই পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পীরপুরের অবস্থা সেই প্রাচীনকালই। এরপরও কতো কিছু। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, গান্ধীর আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির নেতাকর্মীরা গ্রামে ছড়িয়ে দেশ ও মানুষের মুক্তির কথা প্রচার করছে।

এরপর একদিন বিকালে বটগাছের নীচে বসিল এক সভা। অনেক লোক আসিল। দেখা গেল, কয়েকটি স্ত্রীলোকও সন্তান-সন্ততিসহ বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছে। তাহারা এক হাত ঘোমটা টানিয়া স্বদেশী বক্তৃতা শুনিল। সভায় সভাপতিত্ব করিলেন শ্রেষ্ঠ পত্রিকা-পাঠক মনোহর চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি গান্ধীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যেসব অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছেন তাহা সমবেত সকল লোককে শুনাইলেন। একজন শুধু 'বন্দেমাতরম্' শব্দেরই ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের এই অপূর্ব মন্ত্র আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর মুখে-মুখে ফিরিতেছে বটে কিন্তু ইহার অর্থ অনেকেই জানে না। ইহার অর্থ হইল 'হে মাতা, তোমাকে বন্দনা করি।' এছাড়া সেই যুবকদের মধ্যেও দুই-একজন বক্তৃতা দিল।

তারপরে একেবারে ১৯৩৯ সাল। বটগাছের মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে, এতদিন চোখে পড়ে নাই, কিন্তু আজ দেখিতে বড় ভয়ানক। কতকগুলি ডাল এখন একেবারে জীর্ণ, পত্রহীন।

অবশেষে সতীন মিত্রের বক্তৃতার মাধ্যমে গল্পের শেষ।

সতীন বলিতেছিল : 'আমার চাষী ভাইরা, চেয়ে দেখুন, সব জিনিসেরই দর বেড়েছে কিন্তু যা বিক্রি করে আমরা দুটি খেয়ে বাঁচবো, সে জিনিসের দর বাড়েনি। কেন এমন হলো?'

সকলে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। হায়দরের ছেলে বসির সতীনের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!১৬২www.amarboi.com ~

সতীন আবার বলিতেছে : 'ভাইসব, সমাজের যারা পরগাছা—যারা আমাদের গায়ের রক্ত শুষে শুধু বসে খায়, তাদের উপড়ে ফেলবার দিন এসেছে আজ। ভাইসব, আমাদের জিনিস দিয়েই ওরা মোটর হাঁকায়, ব্যাঙ্কে লাখ লাখ টাকা জমা রাখে, কিন্তু আমরা না খেয়ে মরি। এ অত্যাচার কেন আমরা সহ্য করবো? কেন সহ্য করবো?'

এমন সময় আর এক কাণ্ড ঘটিল। হঠাৎ একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। লাঠি-হাতে মস্ত জোয়ান একদল লোক বাঁধানো জায়গাটিতে উঠিয়া অনবরত লাঠি চালাইতে লাগিল।

দুই-এক ঘা খাইয়াও সতীন চিৎকার করিয়া বলিল, 'ভাইসব, এদের চিনে রাখুন, এরা সেই জমিদারদেরই ভাড়াটে গুণ্ডা, লাঠি চালিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করতে এসেছে!'

সতীন আর বলিতে পারিল না, আরও কয়েকটা লাঠির ঘা খাইয়া বসিয়া পড়িল। রক্তে তাহার শরীর ভাসিয়া গেল, যে মাটি একদিন সিঁদুর আর শত শত পাঠার রক্তে লাল হইয়াছে, তাহা আজ মানুষের রক্তে লাল হইয়া গেল'।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি—বটগাছের শাখা-প্রশাখা এবং শিকড় যেমন বহুধায় প্রসারিত ও বিস্তৃত সোমেন চন্দের বনস্পতিও তেমনি অনেক ঘটনা অনেক কাহিনী ও অনেক চরিত্রের সমাবেশে বিস্তৃত। এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো—

'ইহার কয়েকদিন পরেই এক ভীষণ ঝড় আসিল, এমন ঝড় এ-অঞ্চলে ইদানীং আর হয় নাই। ঝড়ের ঝাপটা মৃতপ্রায় বটগাছের উপরেই লাগিয়াছিল বেশী। বটগাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল, যেন প্রকাণ্ড এক দৈত্য ধরাশায়ী হইল। আর যেটুকু বাকী ছিল, তাহাও কাটিয়া লওয়া হইল। দেবাংশী গাছের কাঠ ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা ব্যবহার করে না বটে কিন্তু স্থানীয় জমিদার উহা বেচিয়া বেশ দু-পয়সা লাভ করিলেন।

দীর্ঘ দুইশ' বছর পরে বটগাছ অবশেষে মারা গেল। ইহার নীচে অনেক ইতিহাস রচিত হইয়াছে, কতো দীর্ঘশ্বাস চাপা কান্নার শব্দ ইহার প্রতিটি পাতার নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িত; ইহার নীচে কতো লোক চাপা পড়িয়াছে, এক রক্তের গঙ্গা বহিয়া গেল, কত রক্তের বীজ ছড়াইয়া আছে, সেই বীজ হইতে একদিন অঙ্কুর দেখা দিবে, তারপর অনেক নূতন বৃক্ষ জন্ম নিবে, ইহাও আশা করা যায়।

গল্পের শেষ অংশটুকু খুব বেশি ইঙ্গিতময়, ভীষণ ঝড় আসিল, ঝড়ের ঝাপটা বটগাছের উপরেইলাগিয়াছিল, বটগাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল প্রকাণ্ড এক দৈত্য ধরাশায়ী হইল, দুইশ বছরের গাছ মারা গেল রক্তের বীজ ছড়াইয়া আছে, অনেক নতুন বৃক্ষ জন্ম নিবে।

আমাদের বোধহয় একটা বাতিক আছে যে, কারো কোন সাহিত্যকর্ম আলোচনা করতে গিয়ে একলাফে পাশ্চাত্যের কোন লেখকের সাথে তুলনা করি তার মতো হলো কিনে অথবা অন্য কোন বড় লেখকের মতো না হলে একবারে বাতিলের খাতায় জমা দিয়ে রাখি। এবং যা ভালো একেও নাকচ করে দিই।

প্রথমেই বলবো যে, সোমেন তার গল্প ও উপন্যাসে যুগের দাবিও উত্তেজনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

দ্বিতীয়ত তিনি তার লেখায় দায়বদ্ধতার অভিধাকে বড়ো করে দেখেছেন।

তৃতীয়ত বাইশ বছর বয়সেই সোমেন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

www.amarboi.com ~

যে বয়সে জীবনে অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞার ফসল পেকে ওঠে সে বয়সের প্রান্তে তিনি পৌঁছতে পারেননি।

চতুর্থ : কবিতার জগতে অল্পবয়সে পরিণতিবোধ আসলেও গদ্যে তা সহজে হয়ে ওঠে না—বিশেষ করে ছোট গল্প উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ ও চরিত্র সৃষ্টিতে।

সোমেন চন্দের উপন্যাসও ছোটগল্পের আলোচনায় এ অভিধাগুলো একটা নিয়ামক হিসেবে আমাদের সামনে রাখতে হবে।

সোমেন চন্দের 'সংকেত', 'দাঙ্গা', 'বনস্পতি', ও 'ইঁদুর' সবচেয়ে আলোচিত গল্প। আমার ধারণা এই গল্পগুলো বিশেষ করে ইঁদুর বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠগল্পগুলোর মধ্যে একটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবে মানুষের জীবন যেখানে বিপর্যস্ত সেখানে ঠিক এমনি সময় একটি দরিদ্র ক্ষতবিক্ষত পরিবারের পারিবারিক বিধ্বস্তির চিত্র নিয়ে এই গল্প। গল্পটি সম্বন্ধে অচ্যুত গোস্বামী বলেছেন—

"এই সময়ে সোমেন তার বিখ্যাত 'ইঁদুর' গল্পটি লেখে। মনে আছে, সঙ্ঘের বৈঠকে সোমেন নিজে এই গল্পটি পাঠ করেনি। তার শরীরটা ভালো ছিল না ব'লে পড়তে আরম্ভ ক'রে বার বার হোঁচট খাচ্ছিল। সেই সময় ভাগ্যক্রমে সেদিন বৈঠকে ঢাকা রেডিওর একজন ঘোষক উপস্থিত ছিলেন (নামটি এখন আর মনে করতে পারছি না।)। এমন একজন সুকণ্ঠ সুদর্শন পড়ুয়াকে হাতের কাছে পাওয়ায় আমরা তাঁকেই গল্পটি পড়তে অনুরোধ করি। স্বাভাবিক দক্ষতার ফলে তিনি সুন্দর ক'রে প'ড়ে, কখনো কণ্ঠ উচ্চ ক'রে, কখনো খাদে নামিয়ে, তিনি গল্পটির প্রতি সুবিচার করতে পেরেছিলেন। গল্পটি শুনে উপস্থিত সকলেই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম যে কথাটি আমার মনে হয়েছিল তা এই যে—এ-রকম গল্প আমি লিখতে পারতাম না।

গল্পটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাধারণ। একটি দারিদ্রপীড়িত শ্রীহীন পরিবার। নানা আপাততুচ্ছ কারণে, এমনকি নিতান্ত যুক্তিহীনভাবে, পরিবারের সভ্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, এবং এমনিতেই যে পরিবেশ নিরানন্দকর তা আরও নিরানন্দ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে যে সামান্য আনন্দনাট্যও না-জমে এমন নয়। এই সামান্য সুখ এবং বিপুল পরিমাণ দুঃখ নিয়ে যে কী সদৃশ্য মানবনাট্য যা অনায়াসে অন্যরকম হ'তে পারতো! এই পরিবারের তরুণ সভ্য রাজনৈতিক কর্মী সুকুমার—এই জীবন যে কত সুন্দর হ'তে পারে, মানুষের সামনে যে কত বিপুল সম্ভাবনা আছে—তা জানে। জানে ব'লেই এই জীবনের ক্ষুদ্রতা ও দীনতা তার সংবেদনশীল হৃদয়কে দারুণভাবে পীড়িত করে। সোমেনের ভাষা আরও সতেজ, রূপধর্মী এবং অর্থবহ। ঘটনা-বিন্যাসে তার স্বাভাবিক দক্ষতা, সংযম এবং ইঙ্গিতময়তা এখন আরও সুপরিণতি লাভ করেছে। গল্পটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম।"

সোমেন চন্দকে বলা যেতে পারে মার্কসাবাদী চেতনা, ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ও প্রগতি সাহিত্য সংঘের এক যুগ তারকা। এবং প্রগতিশীল সাহিত্য ধারায় এক যুগ প্রবর্তক বিশেষ করে তার ছোটগল্পগুলো আমাদের বাংলা সাহিত্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণের ধারা থেকেও স্বতন্ত্র একটি আলোকোজ্জ্বল ধারায় অভিস্নাত। এজন্যই কমরেড মুজফফর আহমদ বলেছেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৬৪www.amarboi.com ~

"সোমেন চন্দ বিশের কোঠায় পা দিতে-না-দিতে ঘাতকের ছোরার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন। তখন আমি আমাদের বে-আইনী পার্টির সভ্য হিসাবে গা-ঢাকা দিয়েছিলাম। সোমেন চন্দের নাম জানা ছিল, কিন্তু তাঁকে কখনও দেখিনি, কিংবা তখন তাঁর কোনো লেখা পড়িওনি। পার্টি যখন আইনসম্মত হল তখন বাইরে এসে সোমেন চন্দের লেখা 'ইঁদুর' গল্পটি প্রথম পড়লাম। আমার মন তখন হাহাকার ক'রে উঠলো। হায় হায়, এমন ছেলেকে রাজনীতিক মন-কষাকষির জন্য রাজনৈতিক, প্রতিদ্বন্দ্বীরা মেরে ফেললো! সোমেন বেঁচে থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি বিরাট স্তম্ভ গ'ড়ে তুলতে পারতেন। তাঁর ছোটগল্প 'ইঁদুর'-এর ইংরেজি তর্জমা করছেন শ্রী অশোক মিত্র আই.সি.এস। এই গল্প পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক তা পড়েছেন। 'ইঁদুর'—জগতের একটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প।"

সোমেনের দৃষ্টি ছিলো দেশ সমাজ ও মানুষের প্রতি। বিলাসী সমাজ সেবকও দেশপ্রেমিদের মতো সোমেন নামকরার জন্য দেশপ্রেমিক বা সমান সেবক হতে চান নি বা দূর থেকে দূরবীণ দিয়ে মানুষ ও সমাজকে দেখেন নি। জনতার মধ্যে সোমেন নেমে গিয়েছেন তাদের সাথে একাত্ম হয়েছেন এবং তিনি ছিলেন জনতারই একজন।

অনেকেই বলেন দারিদ্র্য ও আর্থিক প্রতিকূলতার জন্য সোমেন ডাক্তারি পড়তে পারে নি, একথা ঠিক নয়—। আসলে সোমেন জানতে চেয়েছেন জীবনকে, সমাজকে, মানুষকে, সমাজ পরিবর্তনকে এবং তিনি পরিবর্তন করতে চেয়েছেন হাজার হাজার বছর ধরে নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত লাঞ্ছিত হেয়-অপাঙক্তেয় মানুষকে, যারা হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও কিছু পায় না। এবং এজন্যই সোমেন সম্বন্ধে বলা হয়—

ডাক্তারী পড়ার চেয়ে (সোমেনের) অধিক আগ্রহ মানুষের জীবনকে জানার, ইতিহাসের ঠিকানাকে উপলব্ধি করার। ...ইতিহাসের জটিল যুগসন্ধিক্ষণে সেই বাইশ বছরের যুবক সোমেন আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে বিভ্রান্তির সমস্ত কুয়াশা ভেদ করে আগামীর দিকে তাকিয়েছেন। ইতিহাসের সড়ক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরী হয় না। তাকে তৈরী করতে হয়। ইতিহাসের সেই সড়ক তৈরীতে সোমেন নিজের হাত লাগিয়েছেন এবং মানুষের জন্য সুন্দরতর সমাজ গড়ার কামনায় সেই ইতিহাসের সড়কে নিজের জীবন দান করেছেন'।

সোমেনের জীবনের প্রবর্তনা ছিলো মাটি আর মানুষের কাছাকাছি—। তার গল্পের ও কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন মানুষের সংগ্রাম। বার বারই বলেছেন কল্পনা নয়—সংগ্রামের মাধ্যমেই জীবনকে সমানে নিয়ে যেতে হবে। সমাজকে পরিবর্তন করতে হবে।

সোমেন যেমন আস্থা স্থাপন করেছেন কৃষক, শ্রমিক ও গরীব শ্রেণীর ওপর তেমনই আস্থা রেখেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর। কারণ বিপ্লবে-বিদ্রোহে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীও একটা বড়ো নিয়ামক। এজন্যই বলা হয়েছে—

"আমাদের বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে অনিবার্যভাবে পচন ধরেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বুদ্ধিজীবী সমাজেই—অর্থাৎ যাঁরা প্রগতি পরায়ণ লেখক তাঁরাও বাদ যায় না,—সবার ভেতরেই পচন ধরেছে। এরা বলেন অনেক, জানি না কিছুই বিশ্বাস করেন কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

না!....কিন্তু জানেন এই মধ্যবিত্ত সমাজেরই ভেতর থেকে একদল যাবে নীচে নেমে; তাদেরই ভেতর থেকে আগামী দিনের বিপ্লবের পুরোহিতরা বেরিয়ে আসবেন।"

এজন্যই ইঁদুর গল্পের নায়ক সুকুমার বলছে—

আমার প্রথম অভিজ্ঞতায় সেদিনের দৃশ্যটি চমৎকার লেগেছিল। আমার এই মধ্যাহ্নের ট্রাক্টর স্বপ্নের ভিত পাকা করতে আরম্ভ করলুম সেই দিন থেকে। একথা বলাই বাহুল্য যে, ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলুম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলুম জনতার দিকে, তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলুম। তাদেরও ধন্যবাদ, যারা আমাকে আমার এই অসহায়তার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! সেবাব্রত নয়, মানবতা নয়, স্বার্থপরতা অথচ শ্রেষ্ঠ উদারতা নিয়ে এক ক্লান্তিহীন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন।

আমি ফিরে এলুম। সাম্যবাদের গর্ব, তার ইস্পাতের মতো আশা, তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলুম। একটু এগিয়ে দেখি লাইনের ওপর অনেকগুলি এঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষ ওদের সৃষ্টিকর্তা। হাসি নেই, কান্না নেই, কেবল কর্মীর মতো রাগ। এমন বিরাট কর্মী-পুরুষ আর আছে! সত্য কথা বলতে কী, এক কলকব্জার মাঝে, এতগুলি এঞ্জিনের ভিতর দিয়ে পথ চলতে চলতে আমার শরীরে কেমন একটা রোমাঞ্চ হলো। আমি হতভম্ব হয়ে তাদের মাংসহীন শরীরের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলুম।

'ইঁদুর' সোমেনের শ্রেষ্ঠ গল্প। বাংলা সাহিত্যে এবং এমনকি বিশ্ব সাহিত্যেও শ্রেষ্ঠ গল্প। জীবনের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি, গল্পের নির্মাণ কৌশল, আমাদের ঘরোয়া ও সামাজিক চিত্র, চরিত্র সৃষ্টি, অতীব মুন্সিয়ানায় চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনা সংস্থাপন এবং নান্দনিক অভিযোজনা তাছাড়া ছেঁড়া কাঁথার মতো প্রলেপ দেয়া আমাদের শত ছিন্ন জীবনের হতাশা, ব্যর্থতাও রিক্ততা কলহ, ক্রোধ, তিক্ততা ও স্থূলতা ফুটে উঠেছে ইঁদুর গল্পে। আমি বিস্মিত যে আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও সংসারের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি এমন কিছু নেই যা সোমেনের দৃষ্টিকে এড়িয়েছে। 'ইঁদুর' গল্পের প্রথমেই আছে—

আমাদের বাসায় ইঁদুর এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেকা যাচ্ছে না। তাদের সাহস দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনেই, যুদ্ধক্ষেত্র সৈন্যদলের সুচতুর পদক্ষেপ অগ্রসর হওয়ার মতো ওরা ঘুরে বেড়ায়, দেয়াল আর মেঝের কোণ বেয়ে-বেয়ে তর্-তর্ করে ছুটোছুটি করে। যখন সেই নির্দিষ্ট পথে আকস্মিক কোন বিপদ এসে হাজির হয়, অর্থাৎ কোন বাক্স বা কোন ভারী জিনিসপত্র সেখানে পথ আগলে বসে, তখন সেটা অনায়াসে টুক্ করে বেয়ে তারা চলে যায়। কিন্তু রাত্রে আরও ভয়ঙ্কর। এই বিশেষ সময়টাতে তাদের কার্যকলাপ আমাদের চোখের সামনে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সুরু হয়ে যায়। ঘরের যে কয়েকখানা ভাঙ্গা কেরোসিন কাঠের বাক্স, কেরোসিনের অনেক পুরনো টিন, কয়েকটা ভাঙ্গা পিঁড়ি আর কিছু মাটির জিনিসপত্র আছে, সেখান থেকে অনবরতই খুট্-খুট্, টুং-টাং ইত্যাদি নানা রকমের শব্দ কানে আস্তে থাকে। তখন এটা অনুমান করে নিতে আর বাকী থাকে না যে, এক ঝাঁক ন্যুব্জদেহ অপদার্থ জীব ঐ কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপরে এখন রাতের আসর খুলে বসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৬৬www.amarboi.com ~

আমার ধারণা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আর প্রতীকি চেতনায় ইঁদুর গল্প বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্পের একটি। এখানে রয়েছে মা ও বাবার মনোজগৎ, নিম্ন মধ্যবিত্তদের মানসিক ভয়ভীতি। আমাদের দুর্বলতার কলে মানসিক উৎকণ্ঠা ও শঙ্কা এরপরও রয়েছে পলায়নপর মানসিকতা। সন্দেহপরতাতো আছেই। দারিদ্র জীর্ণ সংসার একটি ইঁদুর মারার কথা কেনার পয়সাও নেই। ইঁদুর ভীতির কি মনস্তাত্ত্বিক চিত্র।

আমার মা কিন্তু ইঁদুরকে বড়ো ভয় করেন। দেখেছি একটি ইঁদুরের বাচ্চাও তাঁর কাছে একটা ভালুকের সমান। পায়ের কাছ দিয়ে গেলে তিনি ভয়ে চার হাত দূর দিয়ে সরে যান। ইঁদুরের গন্ধ পেলে তিনি সন্ত্রাস্ত হয়ে উঠেন, ওদের যেমনি ভয় করেন, তেমনি ঘৃণাও করেন। এমন অনেকের থাকে। আমি এমন একজনকে জানি যিনি সামান্য একটা কেঁচো দেখলেই ভয়ানক শিউরে উঠেন; আবার এমন একজনকেও জানি যাঁর একটা মাকড়সা দেখলেই ভয়ের আর অন্ত থাকে না। আমি নিজেও জোঁক দেখলে দারুণ ভয় পাই। ছোটবেলায় আমি যখন গরুর মতো শান্ত এবং অবুঝ ছিলাম,

বেশ অনেক আগে এক রুশ লেখকের 'তেলেপোকা' নামক একটি গল্প পড়েছিলাম—সুন্দর গল্প। আমরা সকলেই অন্যায় করি, ভেতরে ভেতরে আমরা সকলে দুর্বল, কাজেই কোন সামান্য টুকটাক আওয়াজ হলেই আমরা আতঙ্কিত হই। ভয়শঙ্কা আর উৎকণ্ঠায় বলে উঠি এই বুঝি আমার শঠতা, প্রতারণা ও ধূর্তামী ধরা পড়লো। তাই সামান্য আওয়াজ হলেই তেলেপোকার মতো ফুরৎ এবং ইঁদুরের মতো হুড়োহুড়ি শুরু করি।

ইঁদুরের উৎপাতে মা'র অবস্থা সম্পর্কে সোমেন বর্ণনা দিয়েছেন—

এমন স্বভাব থাকে—যেমন অনেকে কেঁচো দেখলেও ভয় পায়। আমি কেঁচো দেখলে ভয় পাইনে বটে, কিন্তু জোঁক দেখলে ভয়ে শিউরে উঠি এসব ছোটখাটো ভয়ের মূলে বুর্জোয়া রীতিনীতির কোন প্রভাব আছে কিনা বলতে পারিনে।

একথা আগেই বলেছি যে আমার মা-ও ইঁদুর দেখলে দারুণ ভীত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে সামলানোই দায় হয়ে ওঠে। ইঁদুর যে কাপড় কাটবে সেদিকে নজর না দিয়ে তখন তাঁর দিকেই নজর দিতে হয় বেশী। একবার তারই একটা কাপড়ের নীচে কেমন করে জানিনে একটা ইঁদুর আটকে গিয়েছিলো। সে থেকে-থেকে কেবল পালাবার চেষ্টা করছিলো, ছড়ানো কাপড়ের ওপর দিয়ে সেই প্রয়াস স্পষ্ট চোখে পড়ে। মা পাঁচ হাত দূরে সরে গিয়ে ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করে বললেন,

—'সুকু, সুকু।'

আমাদের ধারণা 'ইঁদুর' গল্পের প্রতিটি বক্তব্য প্রতীকি চেতনা স্বর্বস্ব। সমালোচকেরাও বলেছেন যেমন—

১. "সামগ্রিকভাবে ইঁদুর এ-গল্পে পুঁজিবাদী সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে যে আত্মবিরোধ, স্বপ্রতারণা, ও ক্ষয়কারক দিকগুলি থাকে—তারই সম্মিলিত রূপকল্প ব'লে মনে হয়।"

২. "যে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির ব্যবস্থার অন্তর্গত বিত্তহীন অক্ষম মধ্যবিত্তশ্রেণীকে দ্যাখান—তারা সর্বতোভাবে আত্ম-প্রবঞ্চক। তাদের চাওয়ার অর্থ সামান্য কয়েকটা পয়সা, বিনোদন দিবাস্বপ্নে, প্রভুত্ব অসহায় স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের উপর, ভোগের উপকরণ

www.amarboi.com ~

স্ত্রীর দেহ, আর বীরত্বের আস্ফালন কয়েকটি ইঁদুর ধরা পড়ায়। এই ইঁদুর মোটিফটি গল্পে প্রথম থেকেই ব্যবহৃত। পুঁজিবাদী সমাজের এই নিচের স্তরটির শিরায় শিরায় চ'লে বেড়ায় ইঁদুরের আক্রমণ।"

৩. এ গল্পের বক্ত-চরিত্র সুকমার এই বিষবৃত্তের বাইরে যাবার পথ কাটে। রেলশ্রমিক সংগঠনে সে দেখে এসেছে নতুন কলের কর্মী মানুষের সংকল্প। গল্পটি ঘুরে এসে আবার বন্দী ইঁদুর ধরার গর্বে উল্লিসিত সুকুমারের পিতার ছবিতে শেষ হয়েছে। লেখক গল্পটির শেষবিন্দুতে সত্যের ছবি রেখেছেন, স্বপ্নের ছবি নয়।"

সোমেন 'ইঁদুর' গল্প লিখেছেন বেশ আগে। কিন্তু এই ইঁদুর প্রতীকের অভিধা আজও উজ্জ্বল। এই 'ইঁদুর' তার তীক্ষ্ণ দাঁতে কুটুস কুটুস করে কোথায় না কাটে। ইঁদুর বই কাটে, টাকা কাটে, কাপড় কাটে, সংস্কৃতি কাটে, সাহিত্য কাটে, অর্থনীত কাটে, কাপড় কাটে, লেপ-তোষক, বালিশ, জাজিম সবই কাটে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ইঁদুর দেশও কাটে। তবে এ 'ইঁদুর' মারতে হবে। সর্বশেষ 'ইঁদুর' খাবারও নষ্ট—মাঝে মাঝে দুধের পাত্রে সাঁতরায়। অতএব ইঁদুরটা মারতেই হবে। কারণ ইঁদুরের জ্বালাতন থেকে বাঁচতে হবে। তাই শেষ পর্যন্ত সুকুমার বললো—

বাবাকে একটা কল আনতে বলতে পারো না? কোনদিন দেখবে আমাদের পর্যন্ত কাটতে শুরু করে দিয়েছে!'

—'আহা, মেরে কী হবে? অবোধ প্রাণ, কথা বলতে পারে না তো! আর কল আনতে পয়সাই বা পাবেন কোথায়?' মা'র গলার স্বর কিছুমাত্র কাতর হলো না, কোন বিশেষ কথা বলতে হলেও তাঁর গলার স্বর এমনি অকাতর থাকে এবং অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ হয়ে যায়। শেষ হওয়ার পর আর এক মিনিটও তিনি সেখানে থাকে না। তিনি অমনি চলে গেলেন।

একটা ইঁদুর-মারা কল কিনতে পয়সা লাগবে, এটা আমার আগে মনে ছিল না।

ইঁদুরের দুধ খাওয়া, খাবার নষ্ট করা, সারারাতের আওয়াজে ঘুম থেকে শুরু করে সবাইকে বিরক্ত ও আতঙ্কিত করা। ইঁদুর মারতেও পারা যাচ্ছে না আবার তার হাত থেকে রক্ষাও পাচ্ছি না—

কিন্তু নিরিবিলি থাকতে চাইলেই কী আর থাকা যায়? ইঁদুররা আমায় পাগল করে তুলবে না? আমি রোজ দেখতে পাই একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স বা ভাঙ্গা টিনের ভিতর ঢুকে ওরা অনবরত টুং-টাং শব্দ করতে থাকে, ক্ষীণ হলেও অবিরত এমন আওয়াজ করতে থাকে যে অনতিকাল পরেই সেটা একটা বিশ্রী সঙ্গীতের আকার ধারণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুধু আমার কেন অনেকেরই বিষম বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটা কুকুর যখন কাঁকিয়ে কাঁকিয়ে আস্তে আস্তে কাঁদতে থাকে, তখন সেটা কেউ সহ্য করতে পারে? আমি অন্তত করিনে। অমন হয়। যখন একটা বিশ্রী শব্দ ধীরে ধীরে একটা বিশ্রী সঙ্গীতের আকার ধারণ করে তখন সেটা অসহ্য না হয়ে যায় না! ইঁদুরগুলির কার্যকলাপও আমার কাছে সেরকম একটা বিরক্তিকর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইঁদুরের দুধ খাওয়াকে কেন্দ্র করে বাড়িতে বিপাক -মা-র চোখে জল। ইঁদুরের যন্ত্রণা যে কতটুকু অতিষ্ঠ এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত এখানে তাই প্রকাশ পেয়েছে—

www.amarboi.com ~

ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে নিয়েছি ভালো করে ভাবার জন্যে—ভাবতে লাগলুম, এমন কোন উপায় নেই যাতে এই বিকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

সন্ধ্যার পর বাবা এলেন, খবরটা শুনে এমন ভাব দেখালেন না যাতে মনে হয় তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন অথবা কিছুমাত্র দুঃখিত হয়েছেন, বরং তাড়াতাড়ি বলতে আরম্ভ করলেন—যদিও তাড়াতাড়ি কথা বলাটা তাঁর অভ্যাস নয়,—'বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে! আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলুম এমন একটা কিছু হবে। আরে, মানুষের জান নিয়েই টানাটানি, দুধ খেয়ে আর কী হবে বলো!'

দেখতে পেলুম, বাবার মুখটি যদিও শুকনো তবু প্রচুর ঘামে তৈলাক্ত দেখাচ্ছে, গায়ের ভারী জামটিও ঘামে ভিজে ঘরের ভিতর গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন একটা বিপর্যয়ের পরেও তাঁর এই অবিকৃত-প্রায় ভাব দেখে আমি আশ্বস্ত হলুম এই ভেবে যে, ক্ষতি যা হয়েছে হয়েছেই, তার আলোচনায় এমন একটা অবস্থা যার কোন পরিবর্তন নেই বরং একটা মস্ত গোলযোগের সূত্রপাত হবে, তা থেকে রেহাই পাওয়া গেল, খুব শীগ্‌গির আর আমার মানসিক অবনতি ঘটবে না।

কিন্তু বাবা কিছুক্ষণ পরেই সুর বদলালেন : 'তোমরা পেলে কী? কেবল ফূর্তি আর ফূর্তি! দয়া করে আমার দিকে একটু চাও। আমার শরীরটা কী আমি পাথর দিয়ে তৈরি করেছি? আমি কী মানুষ নই? আমি এত খেটে মরি আর তোমরা ওদিকে ফূর্তিতে মেতে আছো! সংসারের দিকে একবার চোখ খুলে চাও? নইলে টিকে থাকাই দায় হবে!'

আমার কাছে বাবার এই ধরণের কথা মারাত্মক মনে হয়। তাঁর এই ধরণের কথার পেছনে অনেক রাগ ও অসহিষ্ণুতা সঞ্চিত হয়ে আছে ব'লে আমি মনে করি।

সোমেন যেমন মার্কসবাদী, বিপ্লবী ও সংগ্রামী মানুষের চিত্র এঁকেছেন তেমনি এঁকেছেন পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আদর্শও ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে ক্ষত বিক্ষত, বিপর্যস্ত, রক্তাক্ত এবং যন্ত্রণা কাতর চিত্র। সুকুমারদের পরিবারে যেমন আর্থিক যন্ত্রণা তেমনি রয়েছে গৃহ অভাবের যন্ত্রণা।

দুঃখ, যন্ত্রণা, অভাব অনটন, পারিবারিক অশান্তি, সুকুমারদের সংসারকে ইঁদুরের মতো কুটুস কুটুস করে কাটে। আর এই ইঁদুর কাটে সুকুমারের বাবা-মা ও সুকুমারের মন এবং সবার মন। তাই দেখা যায়—

"একটা ইঁদুর-মারা কল কিনতে পয়সা লাগবে, এটা আমার আগে মনে ছিল না। তাহলে আমি বলতুম না। কারণ, এই ধরনের কথায় এমন একটা বিশেষ অবস্থার ছবি মনে জাগে, যা কেবল একটা সীমাহীন মরুভূমির মতন। মরুভূমিতেও অনেক সময় জল মেলে, কিন্তু এ মরুভূমিতে জল মিলবে, এমন আশাও করিনে। এই মরুভূমির ইতিহাস আমার অজানা নয়।"

মাঝে মাঝে এ ব্যথা বেদনাও দুঃখ চিত্র ঘূর্ণিপাকে পঙ্কিলজলের মতো উগলিয়ে ওঠে যখন আমরা উচ্চারিত হতে শুনি—

"শুনতে পেলুম, এর পরে বাবার গলার স্বর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে বোমার মতো ফেটে পড়লো!—'তুমি যাবে? এখান থেকে যাবে কি-না বলো? গেলি তুই আমার চোখের সামনে থেকে? শয়তান মাগি'....। বাবা বিড় বিড় ক'রে আরও কত কী বললেন, আমি কানে আঙুল দিলুম, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে প'ড়ে রইলুম অসাড় মৃতদেহ হয়ে....।"

www.amarboi.com ~

সোমেন জীবনবাদী নৈরাশ্যবাদী নন। তিনি উজিয়ে উঠেন হতাশা ব্যর্থতা আর ক্লান্তি ও শূন্যতাকে উচিয়ে—। ঘন গভীর কালো মেঘের আস্তরণ ভেদে করে পূর্ণির চাঁদ সব কিছুকে দেয় আলোকিত করে—। এই আলো আঁধারের দুটি চিত্রই আমরা পাই সোমেনের গল্পে—

১. কিন্তু যা ভেবেছিলুম তা আর হলো না। মা ঘরের ভিতর ঢুকেই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর আঁচলখানা পেতে শুয়ে পড়লেন। পাতলা পরিচ্ছন্ন শরীরখানি বেঁকে একখানা কাস্তের আকার ধারণ করলো। কেমন অসহায় দেখালো ওঁকে। ছোটবেলায় যাঁকে পৃথিবীর মতো বিশাল ভেবেছি, তাঁকে এমনভাবে দেখে এখন কতো ক্ষীণজীবী ও অসহায় মনে হচ্ছে! যাকে বৃহত্তম ভেবেছি, সে এখন কতো ক্ষুদ্র, সে এখনো শৈশব অতিক্রম করতে পারেনি বলে মনে হচ্ছে। আর আমি কতো বৃহৎ; রক্তের চঞ্চলতায়, মাংসপেশির দৃঢ়তায়, বিশ্বস্ত পদক্ষেপে কত উজ্জ্বল ও মহৎ, ঐ হরিণের মতো ভীরু ছোট দেহের রক্ত পান করে একদিন জীবন গ্রহণ করলেও আজ অমি কতো শক্তিমান! আমাকে কেউ জানে? এমনও তো হতে পারতো, আজ লন্ডনের কোন ইতিহাস-বিখ্যাত য়ুনিভার্সিটির করিডোরের বুকে বিশ বছরের যুবক সুকুমার গভীর চিন্তায় পাঁয়চারি করছে, অথবা খেলার মাঠে প্রচুর নাম করে সকল সহপাঠিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, অথবা ত্রিশ বছরের নীলনয়না কোন খাঁটি ইংরেজ মহিলার ধীর গম্ভীর পদক্ষেপ ভীরুর মতো অনুসরণ করে একদিন তাঁর দেহের ছায়ায় বসে প্রেম যাঞ্জা করছে! এমন তো হতে পারতো, তার সোনালী চুল, দীর্ঘ পক্ষাবৃত চোখ, দেহের সৌরভ—আহা, কে সেই ইংরেজ মহিলা? সে এখন কই.... আর সেই স্বর্ণাভ রাজকুমার সুকুমারের মা ঐ ঠাণ্ডা মেঝের ওপর সামান্য কাপড় বিছিয়ে শুয়ে! এখান থেকে কতো ছোট আর কতো অসহায় মনে হয়। এক অর্থহীন গর্বে বুকটা প্রশস্ততর করে আমি একবার মা'র দিকে তাকালুম।

ডাকলুম, 'মা? ও মা?'

কোন উত্তর নেই। গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কোন ভগ্ন নারীকণ্ঠ আমার কানের দরজায় এসে আঘাত করলো না। ঘুমিয়ে পড়েন নি তো?

২. বুঝতে পারলুম। সেই পুরনো কাসুন্দি। বুঝতে পারলুম এ জিনিস সহজে এড়াতে চাইলেও সহজে এড়াবার নয়—ঘুরে-ফিরে এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়, পাশ কাটাতে চাইলে হাত চেপে ধরে, কোন রকমে এড়িয়ে গেলেও হাত তুলে ডাকতে থাকে। এই ডাকাডাকির ইতিহাসকে যদি আগাগোড়া লিপিবদ্ধ করি তবে সারাজীবন লিখেও শেষ করতে পারবো না, কেউ পারবে না, তাতে কতগুলি একই রকমের চিত্র গলাগলি করে পাশাপাশি এসে দাঁড়াবে, আর সৌখিন পাঠকের বিরক্তিভাজন হবে। আমি তো জানি পাঠকশ্রেণী কারা? তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে কান্নাকাটির ন্যাকামি চলবে না, কিংবা কিছু লিখলেও টাকার হিসাবটাকে সযত্নে এড়িয়ে যেতে হবে বা হাসিমুখে বরণ করতে হবে। যেমন আমার বাবা অনেক সময় করেন—প্রচুর অভাবের চিত্রকেও এক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে পরম আনন্দে ঘাড় বাঁকিয়ে হাসতে থাকেন। কিংবা যেমন আমাদের পাড়ার প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা রক্ষিতমশায় করেন—ঘরে অতি শুকনো স্ত্রী আর একপাল ছেলেমেয়েদের অভুক্ত রেখেও পথে-ঘাটে রাজা-উজির মেরে আসেন। বা আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১২৭www.amarboi.com ~

প্রেস-কর্মচারী মদন—শূন্যতার দিনটিকে উপবাসের তিথি বলে গণ্য করে, কখনো পদ্মাসন কেটে বসে নিমীলিত চোখে দুই শক্ত দীর্ঘ বাহু দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঈশ্বরকে সশরীরে ডেকে আনে। এমন হয়। এছাড়া আর উপায় কী? স্বর্গের পথ রুদ্ধ হলে মধ্যপথে এসে দাঁড়াই, জীবন আমাদের কুক্ষিগত করলেও জীবনকে প্রচুর অবহেলা করি, প্রকৃতির করাঘাতে ডাক্তারের বদনাম গাই, অথবা ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করি। এসব দেখে আমি একদিন সিদ্ধান্ত করেছিলুম যে, দুঃখের সমুদ্রে যদি কেউ গলা পর্যন্ত ডুবে থাকে তবে তা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্তের নাম করতে গিয়ে যাদের জিহ্বায় জল আসে সেদিন আমি তাদেরই একজন হয়েছিলুম। বন্ধুকে এক ধোঁয়াটে রহস্যময় ভাষায় চিঠি লিখলুম : 'এরা কে জানো? এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বটে, কিন্তু না খেয়ে মরে। যে ফুল অনাদরে শুকিয়ে ঝ'রে পড়ে মাটিতে এরা তাই। এরা তৈরি করেছে বাগান, অথচ ফুলের শোভা দেখেনা! পেটের ভিতর সুঁচ বিঁধছে প্রচুর, কিন্তু ভিক্ষাপাত্রও নেই। পরিহাস! পরিহাস!....'

সোমেন নৈরাশ্যবাদী নন বলেই গল্পটাকে হতাশা ও শূন্যতার হাহাকারের অধ্যায়ে নিয়ে বল্গা ছেড়ে দেননি। তাই পর গল্পে মৃতেরা জেগে উঠে—ব্যর্থরা গা জাড়া দিয়ে উঠে—আবর্জনা ও জীর্ণতার স্তূপ থেকে অভ্যুদয় হয় নতুন প্রাণের। চরিত্রগুলো মুক্তি পায় বিবমিষা থেকে। তাই আমরা দেখি মধ্যরাত্রির ইতিহাস আরও বিস্ময়কর। এক অনুচ্চ কণ্ঠের শব্দে হঠাৎ জেগে উঠলুম। শুনতে পেলুম বাবা অতি নিম্নস্বরে ডাকছেন, 'কনক, ও কনক, ঘুমুচ্ছো?

বাবা মাকে ডাকছেন নাম ধরে! ভারী চমৎকার মনে হলো, মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলুম; আর আমার প্রতি ভালোবাসা কামনা করতে লাগলুম তাঁর কাছ থেকে। যুবক সুকুমার একদিন তার বৌকেও এমনি নাম ধরে ডাকবে, চিৎকার করে ডেকে প্রত্যেকটি ঘর-এমনি সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত করে তুলবে।

—'কনক? ও কনক?'

প্রৌঢ়া কনকলতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন উত্তর দিলেন না, কোনবার কঁকিয়ে উঠলেন, কোনবার উঃ-আঃ করলেন। আমি এদিকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিম্নগামী হলুম। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে হারিয়ে যাবার কামনা করতে লাগলুম। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলুম, শরীর দিয়ে ঘামের বন্যা ছুটলো।

ওদিকে মধ্যরাত্রির চাঁদ উঠেছে আকাশে, পৃথিবীর গায়ে কে এক শাদা মসলিনের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে এনেছে ঠাণ্ডা জলের স্রোতের মতো বাতাস, আমার ঘরের সামনে ভিখিরী কুকুরদের সাময়িক নিদ্রাময়তায় এক শীতল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ও বাড়ীর ছাদে নিদ্রাহীন বানরদের অস্পষ্ট গোঙানি শোনা যায়। মধ্যরাতের প্রহরী আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেবে কখন?

অবশেষে প্রৌঢ়া কনকলতার নীরবতা ভাঙলো, তিনি আবার আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, অল্প একটু ঘোমটা টেনে কাপড়ের প্রচুর দৈর্ঘ্য দিয়ে নিজেকে ভালোভাবে আচ্ছাদিত করলেন, তারপর এক অশিক্ষিতা নববধূর মতো ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগলেন। অঙ্গভঙ্গীর সঞ্চালনে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গীতের আয়নায় আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে সমস্ত স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমি লক্ষ্য করলুম দুই জোড়া পায়ের ভীরু অথচ স্পষ্ট আওয়াজ আস্তে আস্তে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

ইঁদুর গল্পের কাহিনী, ঘটনা সংস্থাপন, যুগমানসের চেতনা সমাজের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ এবং গল্পের বুনন প্রক্রিয়া সবকিছু আলোচনা করলেই বুঝা যাবে ইঁদুর গল্প শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়—বিশ্ব সাহিত্যেও শ্রেষ্ঠ গল্প।

'ইঁদুর' অবশ্য তার সার্থকতম রচনা, শেষ গল্পে সে প্রমাণ করছে যে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থরোপিত বনস্পতির কোটরে ও ফাটলে যেসব অস্বস্তিকর ইঁদুরের উৎপাত, তার গভীর কারণ রয়েছে মাটির নীচে, মূল শিকড়ে সযত্নে চাপা দেওয়া। সোমেন চন্দের এই লেখাটি থেকে অনেক আশাপ্রদ কথা মনে হয়েছিল। কারণ এই সঙ্গে সে এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছিল যেখানে বক্তব্য শিল্পে রূপায়িত হয়ে যায়। ইতিহাসের ব্যাখ্যায়, বিশ্লেষণ বৃত্তির সাহায্যে, বিদ্রূপের উত্তাপে ও আন্তরিকতায় সে নিজের রচনাকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিল। এবং তারচেয়ে বড় কথা আমাদের দৈনানুদৈনিক কুশ্রিতা, দৈন্যবোধকে জয় করে সে সুশ্রী ও সবল ভবিষ্যতের অনিবার্য ইঙ্গিত পেয়েছিল।

বই শেষ করলে বোঝা যায় যে, সোমেন চন্দ শুধু এখানেই থামত না। এই মন নিয়ে আরো ভাবত এবং মেশাতে পারত প্রকাশের তাগিদকে কর্মের প্রেরণায়। তার ভাষায় সজীবতা, ভাবের সংযম ও উপমার নতুনত্ব আপনিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মনে হয় নতুন যুগের গণসাহিত্য রচনায় সে একটি মৌলিক অধ্যায় যোগ করতে পারত।

'ইঁদুর সম্বন্ধে আজ আর কিছু বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ অসঙ্কোচে শিল্পের উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন। সোমেনের শক্তির প্রমাণের ইহার পরে আর প্রয়োজন হয় না। 'ইঁদুর' ইংরেজিতে অনূদিত হইয়া আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রাদেশিক গল্পে পরিণত হইয়াছে। ঢাকার সোমেন আজ শুধু বাংলার সোমেন নয়—সে আজ ভারতের সোমেন। 'ইঁদুর' গল্পের প্রথম পাঠে আমার মনে যে তৃপ্তির শিহরণ জাগিয়াছিল, তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমার জন্মায় নাই। তাহার কতকগুলি জায়গা ভুলিতে পারি না—কেবল পড়িতে ভাল লাগে। গরীব মধ্যবিত্ত পরিবার। সোমেনের নায়ক গরীব মা বাপের মধ্যে সন্ধ্যার পূর্বে মান-অভিমান হইয়াছিল। গভীর রাত্রে ইঁদুরের উৎপাতের মধ্যে তাহাদের মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইয়াছে। সোমেনের নায়ক এইখানটায় বলিতেছে : "বাবা মাকে ডাকলেন নাম ধরে। ভারী চমৎকার মনে হলো—মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলাম—আর আমার প্রতি ভালবাসা কামনা করতে লাগলাম তার কাছ থেকে...।" কিন্তু এই স্থানটি! সোমেনের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সংযত নায়কের মনের অবস্থার কি অভিনব প্রকাশ : "মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলাম...।" সোমেনও ছিল গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখময় কাহিনী—সেই দুঃখের সংসারেও নব জীবনের যে স্ফুলিঙ্গ তৈরি হইতেছে, তাহার এমনি সরস মধুর সাহিত্যিক প্রকাশ আর কি কোথাও পাইয়াছি? তারপর সেইখানটা, সোমেনের নায়ক (একি সোমেন নিজে?) রেল ইউনিয়ন হইতে ফিরিয়া আসিতেছে—শশধর, ইয়াসিন, সুরেন—সোমেনের আপনার জনের মধ্য হইতে সোমেনের নায়ক সন্ধ্যায় বাড়ি

 www.amarboi.com ~

ফিরিতেছে : "আমি ফিরে এলাম। সাম্যবাদের গর্ব—তার ইস্পাতের মতো আশা, তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলাম...'

সোমেন সমাজতান্ত্রিক ছিলেন, কমিউনিস্ট ছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছিলেন এ সব পরিচয় সোমেনের জীবনের উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। কিন্তু আরো একটি বড়ো পরিচয় সোমেন জীবনবাদী ছিলেন এবং জীবনবাদী সাহিত্যিক ছিলেন। জীবনকে তিনি তন্ন তন্ন করে দেখেছেন—জীবনের অন্তর্লীন রহস্যের চিত্র উন্মোচন করতে চেয়েছেন। তাই বলা হয়—

সোমেনের লেখাগুলিতে আগাগোড়া সহিত্যের ছাপ। তাই সাহিত্যিক সহযাত্রীরা স্বভাবতই বলিবেন,—'সোমেন আমাদের, এই তাহার পরিচয়। সে কম্যুনিস্ট ছিল, না ছিল ফ্যাসিস্ট, তাহা বাজে কথা। আসল কথা সে গল্প লিখিয়াছে, আর সে গল্প লিখিতে জানিত।' কথাটা মিথ্যা নয়, তবে কথাটা অর্ধ সত্য। আর অর্ধ সত্যের মতো মিথ্যা আর কি হইতে পারে? সোমেনের জীবন এই লেখা কয়টির মধ্য দিয়াই ঘোষণা করিতেছে এই অসত্যের অসারতা—নিছক 'সাহিত্যসৃষ্টির সংকীর্ণতা ও অগভীরতা', শুধুমাত্র 'সাহিত্যিক বিচারের' অসম্পূর্ণতা। কারণ তাহার গল্পগুলোর মধ্যে শুধু সাহিত্যের সোনার ছাপের অপেক্ষা অনেক বেশী দামী জীবনের স্বাক্ষর। তারই জোরে সাহিত্য টিকে, তারই অভাবে সাহিত্য ফ্যাকাশে হইয়া যায়। হাজার কথায়ও এই সত্য উড়িয়া যাইবে না—সোমেন চন্দ ছিল জীবনের সৈনিক।...

দিলীপ মজুমদারের সম্পাদনায় নবজাতক প্রকাশনী 'সোমেন চন্দ ও তার রচনা সংগ্রহ' প্রকাশ করে। কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন—

'সোমেন চন্দ বিশের কোঠায় পা দিতে না দিতে ঘাতকের ছোরার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন। তখন আমি বে-আইনী পার্টির সভ্য হিসাবে গা-ঢাকা দিয়েছিলাম। সোমেন চন্দের নাম জানা ছিল, কিন্তু তাঁকে কখনও দেখিনি, কিংবা তখন তাঁর কোনো লেখা পড়িওনি। পার্টি যখন আইন-সম্মত হোলো তখন বাইরে এসে সোমেন চন্দের লেখা 'ইঁদুর' গল্পটি প্রথম পড়লাম। আমার মন তখন হাহাকার ক'রে উঠলো। হায়, হায়, এমন ছেলেকে রাজনীতিক মন-কষাকষির জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা মেরে ফেললো! সোমেন বেঁচে থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক বিরাট স্তম্ভ গ'ড়ে তুলতে পারতেন।"'

সম্পাদক দিলীপ মজুমদার তার সম্পাদকীয় ভূমিকায় লিখেছেন—

'বছর খানেক আগে জাতীয় গ্রন্থাগারের পুরনো 'পরিচয়'-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখে পড়ে শ্রী সতীশ পাকড়াশী মহাশয়ের 'সোমেন চন্দ' প্রবন্ধটি। চমকে উঠেছিলাম প্রবন্ধটি প'ড়ে। মাত্র একুশ বৎসর বয়েস! সুকান্ত ভট্টাচার্যের সমবয়সী! আর তেমনি সম্ভাবনাময়! কৌতূহল আরো বেড়ে গেল যখন ঐ 'পরিচয়'-এ 'ইঁদুর' গল্পটি পড়লাম। এখন, কোথায় পাওয়া যায় সোমেন চন্দের জীবন ও সাহিত্যকর্মের আরো বিস্তৃতকর পরিচয়? বন্ধু সুমন্ত হীরা নিয়ে গেল বর্ষীয়ান নেতা শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মদের কাছে। উৎসাহিত ক'রে তিনি আমাকে জানালেন : সোমেন শুধু সম্ভাবনাময় তরুণ সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা—এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদও লাভ করেছিলেন।'

www.amarboi.com ~

তখনকার বিখ্যাত পত্রিকা ছিলো 'পরিচয়'। 'পরিচয়' নতুন লেখকদের লেখা নিয়ে ভাস্বর হয়ে উঠতো। কিন্তু 'পরিচয়ে' প্রকাশিত সোমেনের 'ইঁদুর' গল্প নতুন লেখকের পরিচয় বহন করে না। এ যেনো অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞায় ঋদ্ধ এবং পরিমিত ও সংযমিত, ধীরস্থির শৈল্পিক সুষমায় এক পরিণত গল্প। সে সময়ে পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

পরিচয় মননশীল পাঠক-মহলে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করলো। 'সবুজপত্র'-র সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে যে নবযুগ শুরু হয়েছিল 'পরিচয়'কে অনেকটা তার উত্তরসূরী বলা যায়। তবু 'সবুজপত্র'র সঙ্গে 'পরিচয়'-এর পার্থক্য ছিল। 'পরিচয়' উঠ্‌তি লেখকদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল। নতুন লেখকরা—যাঁরা মননশীল জনমানসের চোখে আসতে চাইতেন—তাঁরা অনেকেই 'পরিচয়'-এর শরণার্থী হ'তে চেয়েছিলেন।'

কোন কোন সমালোচক অভিযোগ করেছেন যে, সোমেনের গল্পে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা নেই। আমার মনে হয় তার গল্প সম্বন্ধে এ ধরণের নেতিবাচক মন্তব্য মোটেই শিল্পবেত্তার নামে একটি বিরূপ অধ্যায় সৃষ্টি করে। সোমেনের গল্প সোমেন সোমেনের মতো করেই লিখেছেন। এ আমাদের একটা অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কথায় কথায় আমরা বলে থাকি গল্পটি কোনো এভগার পো, মোপাসা বা সমারসেট মতো হলো না। মনস্তত্ত্ব যেখানে থাকার দরকার সেখানে থাকবেই জোড় করে মনস্তত্ত্বের জোয়ার আনলেই তা সার্থক হবে না—।

সোমেন চন্দের আর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প সংকেত। গল্পটির আলোচনার আগে প্রথমেই আমি অচ্যুত গোস্বামীর মন্তব্য উপস্থাপন করছি—

'সোমেনের এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'সংকেত'। লক্ষণীয় এই যে—'দাঙ্গা', 'সংকেত' ও 'ইঁদুর' এই তিনটি গল্পেরই নায়ক একজন—সুকুমার। বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তরুণ স্পর্শকাতর এই রাজনৈতিক কর্মীটি সোমেন স্বয়ং। এবং সুকুমার—যে পরিবারের ছেলে, সেটি সোমেনদের পরিবার। প্রত্যেক কাহিনীর বাস্তব পরিবেশ এই তরুণের চোখ দিয়ে দেখা। সুতরাং কাহিনীগুলি আত্মজীবনীমূলক এবং সাব্‌জেক্টিভ। সেকালে প্রগতিশীল বাস্তববাদী গল্প ব'লে যেসব গল্প প্রকাশিত হতো, সেগুলোর বেশির ভাগেই থাকতো সমাজের যান্ত্রিক বিশ্লেষণ, ফর্মূলামাফিক কাহিনী-বিন্যাস এবং ঈশপীয় কাহিনীর মতো উপদেশাত্মক এবং পূর্বানুমানযোগ্য পরিসমাপ্তি। সোমেন ঐ অল্পবয়সে প্রগতিশীল ভাবনাত্মক কাহিনীকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করার জন্য নিজস্ব শিল্পসঙ্গত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে সে এই পদ্ধতির খানিকটা আভাস পেয়েছিল। কিন্তু মূলত এ পদ্ধতির জন্ম হয়েছিল তার মনে। নিজের জীবনের তীব্র বেদনাদগ্ধ অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যয়কে রূপায়িত করার তাগিদে এর জন্ম।

সোমেনের এ গল্পগুলির সঙ্গে আমাদের যখন পরিচয় হয় তখন জানতাম যে এগুলো তার সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। এর আগে ১৬, ১৭, ১৮ বছর বয়সে সে অজস্র গল্প এবং অন্তত দু'খানি উপন্যাস লিখেছিল। কোলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় তার মৃত্যুর পর বন্ধুরা 'সংকেত' এবং 'বনস্পতি' নামক দুটি সংগ্রহ-গ্রন্থে সেই সব গল্পের কিছু কিছু সংগ্রথিত করেছিলেন। কল্লোল-কালীন লেখকদের প্রভাবপুষ্ট বয়ঃসন্ধিকালের সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও!www.amarboi.com ~

রচনাগুলির বেশিরভাগই প্রণয়মূলক। গল্পগুলির মধ্যে দু'এক জায়গায় ভাষাগত ত্রুটি যে চোখে পড়ে না এমন নয়, তবু কতকগুলি গল্পের কাহিনী খুবই মিষ্টি এবং সংযত প্রকাশের ফলে ইঙ্গিতময়। চরিত্রাঙ্কণে দক্ষতার আভাসও নজরে পড়ে। রাত্রিশেষ, একটি রাত, মরুদ্যান প্রভৃতি গল্পগুলি যদি বাংলাদেশের কোনো বিখ্যাত লেখকের প্রথম বয়সের রচনা হতো তাহলে তিনিও এগুলির জন্য লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পেতেন না।

আশ্চর্য এই যে, আমি সোমেনের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি, কিন্তু তার মুখে এসব গল্পের উল্লেখ শুনতে পাইনি। বার্নাড শ'-এর মতো এগুলোকে সে তার Non age-এর রচনা ব'লে গণ্য করতো। কিন্তু তাছাড়াও উল্লেখ না-করার আরও কারণ ছিল। সব সময় সে নিজেকে এবং নিজের কৃতিত্বকে গোপন ক'রে রাখতেই ভালবাসতো।'

সোমেনের 'সংকেত' একটি শ্রেষ্ঠগল্প। এ নিয়ে কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়—তবে আমার ধারণা এ গল্পের মৌলিকত্বও অন্য সবকে উতরিয়ে গেছে। আমার ধারণা কল-কারখানা, ক্ষেত-খামার, আর কৃষক শ্রমিক মজুর ও মেহনতি মানুষ এখানে যেভাবে বাস্তব ও সজীব হয়ে ওঠেছে সোমেনের পূর্বে কারো লেখার এমন করে তা'হয়ে ওঠে নি। যদিও এ গল্পে ব্যক্তির ভাষ্য বড়ো হয়ে ওঠেছে কিন্তু একটু ভাবলেও বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যাবে ব্যক্তিক অভিব্যক্তি সবার মধ্যে বিস্তারিত হয়েছে একক কণ্ঠধ্বনি সকলের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

সোমেন চন্দের গল্প, উপন্যাস ও কবিতা এবং চিঠিপত্র পড়লেই বুঝা যাবে সেখানে পেছনে ফেরা নেই, যাত্রাভঙ্গ নেই, হতাশা ও ক্লান্তি নেই—আছে সংগ্রাম, আলোর প্রত্যাশা, মুক্তির সংগ্রাম, সামনে যাওয়া ও সমাজ পরিবর্তন, পালাবদল এবং নতুন যুগের সম্ভাবনা।

সংকেত গল্পের পটভূমি গড়ে ওঠেছে কাপড়-কল শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে। এ গল্পের অধিকাংশ চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছে সোমেনের অর্থাৎ আমাদের নরসিংদী এলাকার আঞ্চলিক ভাষা। যে সমস্ত এলাকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাও আমাদের এলাকারই দৃশ্য।

প্রথমেই আমরা সাক্ষাৎ পাই বাচ্চা মৌলভী, মিল-ম্যানেজার, রহমান ও ইয়াসিনের। ম্যানেজার ও বাচ্চা মৌলভী এসেছে ধর্মঘটী মিলে নতুন শ্রমিক সংগ্রহের জন্য। বক্তৃতায় ও প্রলোভনে তারা গ্রামের লোকদের আকৃষ্ট করেছে মিলে যেতে।

'বাচ্চা মৌলভী বলিয়া তাহাকে সবাই ডাকে, তার একমাত্র কারণ এই যে তাহার বয়স অত্যন্ত অল্প এবং এই বয়সেই সে মৌলভী হইয়াছে। সে পাশের গ্রামেই থাকে এবং মাঝে মাঝে কোন পত্রিকা হাতে করিয়া আসিয়া বেলা দুইটা-আড়াইটা অবধি এ অঞ্চলের সকলকে যুদ্ধের খবর শুনাইয়া যায়। শহরের খবর তাহার কাছে অবিদিত নাই, মাসের মধ্যে পনেরো দিনই তো সে সেখানে কাটায়। এ কথা সবাই জনে, নবাবের সঙ্গে বসিয়া সে খানা খাইয়াছে এবং নবাব সাহেব তাহার হাতে চুমা খাইয়াছেন।

বাচ্চা মৌলভীর পরনে পাঞ্জাবী আর লুঙ্গি, গোঁফ এখনও ভাল করিয়া উঠে নাই, হাতে একটা ঘড়ি। কিন্তু ঘড়িটা কখন চলিতে সুরু করে, আর কখন থামে এ খবর কেউ রাখে না। ঘড়িটা একবার চোখের সামনে ধরিয়া এই শীতের সকালেও পত্রিকা দিয়া

www.amarboi.com ~

বাতাস 'খাইতে খাইতে মৌলভী শুদ্ধ ভাষায় বলিল, 'ওনারে আমি চিনি।' এই বলিয়া ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে তাহার এক সুদীর্ঘ পরিচয়ের ইতিহাস বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিল, 'তাইন লোক নিতে আইছে ঠিকই। রহমান, তোমার ঘরে তো তাঁত আছে, তোমারে নিব আগে।'

ম্যানেজারের বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইলো। ম্যানেজার তার বক্তৃতায় বললো—

বিকালের রৌদ্রে চারিদিক ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। গাছের ছায়ার নীচে একটা চেয়ারে বসিয়া ম্যানেজার বাবু মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের গাঁ-টি বেশ ভাল লেগেছে। তোমরাই দেশের গৌরব। 'ফেমিন' হবার আগে সারা ভারতের কাপড় জোগাতে তোমরাই। এমনকি বিদেশেও ছড়িয়ে দিতে, অথচ আজ শুকিয়ে মরছো। তোমাদের কদর কজনা বোঝে?' নদীর দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া তিনি বলিলেন, 'সেখানেও এমনি নদীর হাওয়া, নদীর একেবারে পার ঘেঁষেই চমৎকার ব্যারাক সেখানে, তোমরা থাকবে। হাতের কাছে হাসপাতাল, খেলার মাঠ, সিনেমা, যখন যা খুশি!—' ম্যানেজর বাবু মৃদু হাসিলেন'।

অবশেষে মিলে যোগদানের জন্য রহমানই প্রথম নাম লিখিয়ে সম্মতি জানালো। রহমানের যাত্রার দৃশ্যটি বড়ো বেদনাবিদূর। রহমানের বাবার বুকের হাহাকার যেনো বিশ্বপ্লাবী।

একটু নির্জনতায় ছেলেকে টানিয়া বুড়া আবার বলিল, 'বাপ?'

—'কও?'

—'একটা কথা কমু। এত বুড়া হইয়া গেলাম, তুমি আমারে ছাইড়া কোনো কালে কোনোখানে যাও নাই, কিন্তু আইজ ছাইড়া গেলা, আমার মনডারে কী দিয়া বান্ধুম, তুমিই কও?' বুড়া অনেক কষ্টে তাহার সবগুলি কথা এতোক্ষণে বলিয়া ফেলিল এবং ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এমন দৃশ্যের সঙ্গে রহমানের এই প্রথম পরিচয়, সে কী যে করিবে ভাবিয়া পাইল না।

রহমান লঞ্চে উঠলো—গ্রাম ছেড়ে লঞ্চ চলে যাচ্ছে—। তার বিদায় দৃশ্যটিও বড়ো করুণ, বড়ো দুঃখময়। সোমেনের বর্ণনায়—

'রেলিং ধরিয়া রহমান একা দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক হাত নীচেই তাহাদের গ্রামের নদী, আজ ছাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া অত্যন্ত আপনার বলিয়া মনে হয়। নদীর জলে লঞ্চের আলো পড়িয়া চিক্‌মিক্‌ করিতেছে, লঞ্চের ভিতরের মানুষগুলির আবক্ষ ছায়াও সেখানে দেখা যায়, অন্ধকারের বুকে কেবল আরো কতকগুলি গভীর অন্ধকারের মতো মনে হয়। আর তাহাদের আত্মীয়স্বজনরা-তাহারাও লণ্ঠন হাতে বিদায়ের প্রার্থনায় কাতর।

রহামানের চোখের পাতা বুজিয়া আসিল। সে দেখিল, নদীর জলে কে এক নারীমূর্তি, নাকের-চোখের জলে এক হইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। তাহার নাকের ডগায় ঘাম, ঘর্মাক্ত সমস্ত শরীরটিকে রহমান ঝুঁকিয়া দেখিল। তাহার গায়ে এখনও সেই মেয়েটির ঘামের গন্ধ। আরও নিবিড় হইয়া সে সেই গন্ধ শুঁকিতে লাগিল।

ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিল।

www.amarboi.com ~

কোনরকমে একটা জায়গা করিয়া ছোট পুঁটুলিখানা মাথার নীচে রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল। একটু পরেই সে স্বপ্ন দেখিল। আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাস, এখন ভয়ানক বাতাস ছাড়িয়াছে, দীর্ঘ সুপারি আর নারিকেল গাছের মাথায় ভীষণ মাতামাতিতে নদীর জলে দুরন্ত ঢেউ, বড়ো বড়ো ধান গাছের শিষগুলি যন্ত্রণায় কাঁপিতেছে, আকাশে পাখির কলরব, রহমান যেন শুনিতে পাইল, তাহাদের আর কোনদিনও ডাকে নাই। তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া গিয়া সে দেখিল, তাহার গরু নয় তো, তাহার বৌ, আর গোয়াল ঘরটা আসলে গোয়াল ঘর নয় তো, তাহার শোবার ঘর! বৌ তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, গলা জড়াইয়া ধরিল, বুকের মাঝখানে তাহার হাতটি রাখিয়া বলিল, 'এই দ্যাখো, এহান কেমুন ব্যথা। তোমারে ছাইড়া আমি থাকতে পারুম না বন্ধু, মইরা যামু।' একটু পরে রহমান টের পাইল, তাহার দুইটি পা আরও দুইটি পায়ের সঙ্গে সুতার মতো হইয়া গিয়াছে'।

অবশেষে নদীর চরে মিলের সন্নিকটে লঞ্চ থামলো। কিন্তু সেখানে আর এক দৃশ্য। রহমান দেখলো একদল লোক প্রচণ্ড শক্তিতে দ্রুতবেগে লঞ্চটাকে ঘিরে দাঁড়ালো। তাদের চোখে মুখে প্রচণ্ড উত্তেজনা। রহমান দেখলো—

লোকগুলির কতক হুড়মুড় করিয়া জলে নামিয়া পড়িল, লঞ্চটাকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল। আর বেশীরভাগই দাঁড়াইয়া রহিল পারে। কিন্তু সকলের মধ্যে একটা ভয়ানক চঞ্চলতা, কেহ হাত নাড়িয়া কিছু বলিতেছে, কেহ কেবলই চিৎকার করিতেছে, সকলের মুখে-চোখে—কার্যকলাপে এমন একটা ভাব যেন এখনই পারিলে লঞ্চটাকে ডুবাইয়া দেয়। আর কী গোলমাল! আকাশকেও ফাটাইয়া চৌচির করিয়া দিবে মনে হয়। অমন দৃপ্ত রাগান্বিত পদক্ষেপে তাহাদের পায়ের নীচের ভূমিখণ্ড মুহূর্তে ধসিয়া যাইবে যেন, তাহাদের চিৎকার-ধ্বনিতে নদীর জলও উত্তাল হইয়া উঠিল।

কিন্তু রহমান লক্ষ্য করিয়া দেখিল, একেবারে সামনে একটা লোকের মধ্যে পেছনের সকলের শক্তি যেন একত্রিত হইয়াছে। লোকটার বয়স অল্প, চেহারায় এই হাজার হাজার লোকের মধ্যেও এটা পার্থক্য ধরা পড়ে। সে হাত নাড়িয়া ভয়ানক চিৎকার করিয়া কী যেন বলিতেছিল, প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই শোনা যায় নাই, কিন্তু শেষে গোলমাল আপনিই কমিয়া আসিল। রহমান আশ্চর্য হইয়া শুনিল, লোকটা দৃপ্তস্বরে বলিতেছে—

এখানে যে বালকটি এবার বক্তৃতা দিচ্ছে—অন্নদা শঙ্কর রায়ের তার প্রতি অভিযোগ যে এ ব্যক্তিক এবং এখানে প্রকাশ পেয়েছে একমাত্র নিজের অভিব্যক্তিক ও অভিপ্রায়। কিন্তু আমাদের ধারণা এই বক্তব্য সোমেনের একার নয় হাজারো কণ্ঠের এবং সমস্ত বিশ্বের নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত ও ভাগ্যহত শ্রমিকদের। যদিও অনেকের কাছে এ বক্তব্যে সোমেনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং তার পার্টির উত্তাপ প্রকাশ। আমি এখানে পুরো বক্তব্যটাই উপস্থাপন করছি—

: 'বন্ধুগণ, আমাদের দেখে আশ্চর্য হবেন না। আমরা এই মিলেরই শ্রমিক, আপনারা যেখানে কাজ করতে এসেছেন আমরা সেখানেই প্রথম কাজ করতে আসি। আমরা জানি আপনাদের শুধু চাকরির কথা বলেই আনা হয়েছে, আসল কথা বলা হয় নি। এই চাকরির ভেতর কী রহস্য তা আপনাদের কাছে গোপন করা হয়েছে। বন্ধুগণ, আমাদের কথা

পুনিয়ারি পাঠক www.amarboi.com ~

আপনারা একটিবার শুনুন, আমাদের বিশ্বাস করুন। যারা আপনাদের চাকরি দেবে বলে নিয়ে এসেছে তাদের আপনারা চেনেন না, কিন্তু আমরা চিনি। আমরা তাদের কাছে শুধু আমাদের অভাব অভিযোগের কথা জনাতে গিয়েছিলাম, আমাদের সামান্য কয়েকটা মাত্র দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম কিন্তু তারা গ্রাহ্যই করেনি। তারা আমাদের মুখের ওপর লাথি মেরেছে। কিন্তু আমরা কেন তা সহ্য করবো? আমরা স্ট্রাইক করেছি, মিলের কাজ বন্ধ। আমরা তার প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমাদের এই শক্তিকে পিষে ফেলবার জন্যে, আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নেওয়ার জন্যে তারা মিথ্যে কথা বলে আপনাদের এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আপনারা তাদের বিশ্বাস করবেন না। ভাই সব। আপনাদের চোখে পৃথিবী যেমন, আমাদের কাছেও তাই, আপনাদের যতখানি শোষণ দুঃখ-দুর্দশার কষ্ট সহ্য করে চলতে হয়, আমাদেরও তাই। আমাদের ঘর নেই, বাড়ী নেই, আজ এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে কাল কোথাও দাঁড়াবার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই—আমার চাষী ভাইরা, দোহাই আপনাদের, ভাই হয়ে ভাই-এর মুখের ভাত এমন করে কেড়ে নেবেন না। একথা মনে রাখবেন, আজ যারা আমাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তারা আপনাদেরও সেই লাথি থেকে রেহাই দেবে না। বন্ধুগণ, আমরা আপনাদের ভাই, ভাই-এর কথা একটিবার মন দিয়ে শুনুন, ভাই-এর কথা বিশ্বাস করুন—আপনারা এ কাজে যোগ দেবেন না, দোহাই আপনাদের, যে লোক আজ আপনাদের ভাই-এর মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে, তার উল্লাসকে আর বাড়াবেন না।—'

আসলে আমাদের গ্রামীণ সভ্যতার দিন ফুরিয়ে গেছে। শিল্প সভ্যতার উত্তপ্ত আবহের আবেশ গ্রামজীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সংঘাত লেগেছে ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর। সমাজ জীবনের এই যে পালাবদল এ পালাবদলে মানুষ বিশেষ করে মেহনতি মানুষ—শ্রমজীবী মানুষ সংগ্রামে মুখর হয়ে ওঠেছে।

হাজার বছর ধরে তারা যে স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন করে আসছে এ জীবনে জাগরণ এসেছে—এতোদিন ঘুম ভেঙেছে তাদের রুদ্ধ জীবনে। তারা দেখছে নতুন জীবন এবং নতুন আশার সূর্য। এজন্যই বলা যায়—

'ধনী-শ্রমিকের সংগ্রাম দিয়ে যে নতুন যুগ আসছে তার সংকেত সোমেন দিয়েছেন এই গল্পে। মানুষের শাশ্বত হৃদয়চিত্র দ্যাখানো এর প্রধান লক্ষ্য নয়, যে-মানুষ ভালোবাসে, স্বপ্ন দ্যাখে—ক্ষুধাপীড়িত হয়ে সে কল-কারখানার কাজ করতে যায়। কৃষিজীবনের মধ্যে যন্ত্রজীবনের ক্রমপ্রবেশ যে নতুন সমস্যার সৃষ্টি ক'রে তুলছে—তাই নিয়ে এ গল্প। কল-কারখানায় কাজ করবার জন্য গ্রামের মানুষ চ'লে আসছে, তাদের পুরনো জীবন ভাঙছে। নতুন জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কল-কারখানার মালিকের দ্বারা। নতুন সমাজ-চেতনায় নতুন রাজনীতির জন্ম, নতুন সাহিত্যের জন্ম'।

'সংকেত' গল্পে সোমেন শ্রমিক জীবন ও মেহনতি মানুষের জাগরণের যে চিত্র এঁকেছেন তা কল্পনা থেকে নয় তার বাস্তব জীবন থেকে। এজন্যই রণেশ দাশ বলেছেন—

'গ্রামবাংলার মানুষকে সোমেন চন্দ খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। ঢাকা শহরে পড়ালেখা কররেও সোমেন চন্দ ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে আসতেন

www.amarboi.com ~

গ্রামে। সেখানে তিনি দেখেছিলেন গ্রামের সমস্ত স্তরের মানুষকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। তিনি তাঁর 'স্বপ্ন' এবং 'গান' নামক দুটি গল্পে যেসব ছবি এঁকেছেন, তাতে মনে হয় বাংলার গ্রামকে তিনি বুঝিবা নখাগ্রে ধারণ করেছিলেন। ১৯৪০ সনে যখন তিনি ঢাকা শহরে রেল শ্রমিকদের সংগঠনের কাজে নামেন একজন কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে, তখনও গভীরভাবে অন্তরঙ্গ পরিচয় পেলেন শ্রমিক জীবনের। তিনি দেখলেন, শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর চেনা গ্রামীণ মানুষের মর্মরূপটিকে যা তখন কৃষি থেকে শিল্পে এসে ঢালাই হতে শুরু করেছে পরিবর্তনের ছাঁচে।...'সংকেত' গল্পটিতে রয়েছে এর পরিচয়।

গল্পে বাচ্চা মৌলভী চরিত্রটি বেশ সজীব, জীবন্ত ও উজ্জ্বল। তাই দেখা যায় ম্যানেজার যখন "রাগে অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, সিঁড়ি ফ্যালো, সিঁড়ি ফ্যালো ঠিক এমনি সময়ে—

মৌলভী হাসিমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, হাসিয়া সকলকে বুঝাইল, ও কিছু নয়, একটা চাকরি খালি হইলে পঞ্চাশটা লোক আসিয়া দাঁড়ায়, ইহারাও তেমনি, পঞ্চাশটা চাকরি খালি হইয়াছে তো পঞ্চাশ হাজার লোক আসিয়া হাজির হইয়াছে। জোর করিয়াই লইবে আর কী। যেন মগের মুল্লুক। যেন মামার বাড়ীর আব্দার।— প্রিয়নাথ, শ্রীপতি, বাদশা মিঞা এবং আরও অনেকে মৌলভীর কথায় সায় দিল, চরের উপর বিপুল জনতার দিকে আঙুল দেখাইয়া বোকার মতো তাহারা হাসিতে লাগিল।

চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি আর গোলযোগ। রহমান স্তব্ধ হয়ে সব দেখে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গেলো। এক সময় সেই বক্তৃতার ছেলেটি রহমানকে জিজ্ঞেস করলো—

—'ও!' ছেলেটি চারিদিকে চাহিয়া একটু পরে বলিল,—'কিন্তু কাজ যারা এখন করছে তাদের উপায় হবে কী? ব্যাপার কী হয়েছে জানেন? এদের কোন দোষ নেই তবু এদের তাড়িয়ে দিয়ে আপনাদের সে জায়গায় বসানো হবে। যার আর কোন উপায় নেই এমন একজনের ভাত মারতে আপনার ইচ্ছে হয়?'

রহমান কিছু বলিল না।

—'বলুন না, ইচ্ছে হয় কিনা?'

রহমান তবু কিছু বলিল না। ছেলেটি বলিল, 'মনে করবেন না, আপনিও চিরকালই ওদের সুনজরে থাকতে পারবেন, আপনাকেও এমনি একদিন তাড়িয়ে দেবে।—' এই বলিয়া একটু হাসিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল।

ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে রহমান অবসন্ন। সমস্ত ঘটনা তাকে বিস্ময় বিহ্বল করে তুলেছে।

এদিক-ওদিক দৌড়াইয়া, এ-গেট ও-গেট করিয়া তাহার ক্ষুধা পাইয়া গিয়াছিল। একটা ছোট পুঁটুলিতে বৌ কিছু মুড়ি চিড়া আর গুড় বাঁধিয়া দিয়াছিল। রহমান আর একজনকে লইয়া একটু নির্জনে গিয়া পুঁটুলি খুলিয়া বসিল। খাওয়া শেষ হইলে নদীতে গিয়া হাত ধুইয়া আসিল। এখন একটা বিড়ি না খাইলে চলে না। কিছু দূরে একটা দোকানে গিয়া এক পয়সার বিড়ি সে কিনিল। কিন্তু একটা মুখে দিতেই আর একজন সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। এক মুহূর্তে এক পয়সার বিড়ি শেষ হইয়া গেল। রহমান নতুন বিবাহ করিয়াছে, সে এমনি দিয়া-থুইয়া খাইবে না তো কে খাইবে!

হাজার হাজার লোকের এমন বিপুল সমাবেশ, মুহূর্তের পর মুহূর্ত এমন বিস্ময়কর ঘটনাবলির সঙ্গে সাক্ষাৎ, একটা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া বিড়ি খাইতে খাইতে রহমান যতই ভাবিতে লাগিল ততই আশ্চর্য হইতে লাগিল।

www.amarboi.com ~

একটির পর একটি ঘটনা রহমানের চোখের সামনে ঘটতে লাগলো—। এ সমস্ত ঘটনার সাথে রহমানের এই প্রথম পরিচয়—

ক্রমে বিকাল হইতে লাগিল। রৌদ্রে, অনাহারে, দৌড়াদৌড়িতে, চিন্তায় প্রত্যেকেই যেন এখন এক একটি ভূতের মতো দেখিতে। এমন সময় আবার মৌলভীর ডাক আসিল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া জানাইয়া গেল যে তাহাদের এখন ঢুকিতে হইবে। আর দেরি করিলে চলিবে না, অনেক সময় পার হইয়া গিয়াছে।

সকলে দৌড়াইয়া আর একটা গেটের কাছে গিয়া জড়ো হইল। গোলমাল আরও বাড়িয়া গেল। আকাশ বিদীর্ণ করিয়া নানারকম ধ্বনি উঠিল। কান ফাটাইয়া ফেলিবে আর কী। রহমান সকলের পেছনে ছিল, একেবারে সামনের দৃশ্য দেখিতে পায় নাই। পরে টের পাইল। তাহার সামনের লোকগুলি অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সে এখন একা, পাশে চাহিয়া দেখিল, আরে সেই ছেলেটি, কী একটা উত্তেজনায় লাল তাহার মুখ, চুলগুলি এলোমেলো, প্রাণপণে সে চিৎকার করিতেছে। রহমান বুঝিতে পারিল না সেই ভাষার অর্থ। সামনের দিকে চাহিয়া দেখিল, আশ্চর্য, এবার গেট জুড়িয়া শুইয়া কয়েকটি লোক। আর তাহাদের পা দিয়ে মাড়াইয়া ভিতরে চলিয়া গেল মৌলবী, আর তাহার পেছনে আরও কয়েকজন। রহমান নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, লোকগুলির দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল সে'।

নান্দনিকেরা কলাকৈল্যবাদীরা সোমেনের গল্পকে নস্যাৎ করে দেবেন গল্পের উদ্দেশ্য প্রবণতার জন্য। আবার কেউ কেউ বলবেন এ সবে বিশেষ রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে সুতরাং এগুলোকে খাঁটি গল্প ও খাঁটি সাহিত্য বলা যাবে না।

আমরা বার বারই ভুলে যাই যে, সোমেন বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন, যে ধারাটি রবীন্দ্রসাহিত্য ও শরৎ সাহিত্যের পরিমণ্ডলের বাইরে। আমাদের সাহিত্যে এ ধরণের গল্প নেই বললেই হয়—যা আছে রুশ, স্কান্ডেনোভিয়া, আমেরিকা, ফরাসি ও চীনা সাহিত্যে—। সোমেন এখানে বিস্ময়কর ও অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী।

আমাদের এ বক্তব্যের প্রমাণ মিলবে গল্পের শেষ অংশে। লোকের ছুটাছুটি ও গোলযোগের মধ্যেও একজনের বক্তব্য রহমানকে আকৃষ্ট করলো—সে আর কেহ নয়, লঞ্চ থেকে নামার সময় যে বালক বক্তৃতা করেছিলো সে-ই। এবারের বক্তৃতা আরও দৃঢ় ও বলিষ্ঠ কণ্ঠের—

'বন্ধুগণ, আমার চাষী-ভাইরা...।'

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে । এখন প্রায় সারাটা আকাশ লাল। নীচে ধ্বংসের উৎসব দেখিয়া রক্তবর্ণ আকাশ যেন রক্তনেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া বিস্তর অশুভ কামনা করিতেছে। মানুষের পায়ের চাপে মাটির পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে আর বাকী নাই। এখানকার এই কলরবের আগুনের মতো যদি কোন শিখা থাকিত তবে সারাটা পৃথিবী নিশ্চয় পুড়াইয়া ফেলিত। বক্তা মাটিতে লাথি মারিয়া, বলিষ্ঠ ডান হাতে শূন্যে ঘুসি দেখাইয়া দৃপ্ত-স্বরে বলিল, 'বন্ধুগণ, আমার চাষী ভাইরা...।'

কিন্তু এমন সময় হঠাৎ গুলির ভীষণ আওয়াজ, আশেপাশের সব লোক পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতেছে, কারুর কোন দিকে কোন খেয়াল নাই, কে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও!www.amarboi.com ~

গেল, কে পায়ের তলায় পিষিয়া গেল, কারুর কোন দিকে লক্ষ্য নাই, সকলেই যার যার প্রাণ হাতের মুঠায় লইয়া দৌড়াইতেছে। এক মুহূর্তে সারাটি মাঠ সশস্ত্র সৈন্যে ভরিয়া গেল।

রহমান অবসন্ন হলো- সম্বিত হারালো—। বার বার তার মনে পড়লো—

বন্ধুগণ, একথা আপনারা মনে রাখবেন, আজ আমাদের যারা শুধু লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তারাই আপনাকেও লাথি থেকে রেহাই দেবে না'!

'সংকেত' গল্পে সোমেন সাহিত্যের বিশেষ করে ছোটগল্পের নিজস্ব ভিত্তিতে দৃঢ়তার সাথে তার অবস্থান পাকাপোক্ত করলো এবং বাংলা ছোট গল্পে তার মৌলিক পথ নির্মাণ করে নিলো।

'সংকেত' গল্পটিতে এসেছে তার নিজস্ব অভিসংকেত, পুঁজিবাদে অনাস্থা, শোষণ ও নির্যাতনের নীতির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র তীব্র প্রতিবাদ নয়, সংঘবদ্ধ প্রয়াসের ও কামনা। গল্পের শেষটা কিন্তু ছায়াচ্ছন্ন, তাই ইঙ্গিত জোরালো হয়েও আবার ম্লান। দাঙ্গায় পেলাম বিরোধী শক্তির প্রতিক্রিয়া, সাম্প্রদায়িকতার সস্তা মোহ, অজ্ঞতার ভয়াবহ চোরাবালি, যার ওপরে শ্রেণীভেদহীন গণশক্তির ইমারৎ খাড়া করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই গল্পটিতে সোমেনের সন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় পাই।

এক শ্রেণীর গবেষক, সমালোচক আছেন যারা সাহিত্য ও শিল্পের শুধু শিল্পমূল্যই দেখে। শিল্পমূল্য অবশ্যিই বড়ো দিক ও বড়ো নিয়ামক এবং অভিধা— কিন্তু গল্প বা উপন্যাস ও নাটকের কাহিনী, চরিত্র ও মৌল উত্তাপ এবং মানবিক আবেদনকে উপেক্ষা যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে না।

'সংকেত' গল্পে যেমন সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে তেমনি রয়েছে শাশ্বত মানবিকতা বোধেরও চিরন্তন আবেদন। এ প্রেক্ষিতেই সোমেন চন্দের 'সংকেত' গল্প আলোচনা প্রসঙ্গে ভবতোষ দত্ত বলেছেন—

'সংকেত'—নামটি সার্থক ইঙ্গিতবহ। ধনী-শ্রমিকের সংগ্রাম দিয়ে যে নতুন যুগ আসছে—তার সংকেত সোমেন দিয়েছেন এই গল্পে। মানুষের শাশ্বত হৃদয় চিত্র দেখানো এর প্রধান লক্ষ্য নয়— কৃষিজীবনের মধ্যে যন্ত্রজীবনের ক্রমপ্রবেশ। নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে তুলেছে—তাই নিয়ে এই গল্প। কলকারখানার কাজ করবার জন্য গ্রামের মানুষ চলে আসছে, তাদের পুরনো জীবন ভাঙ্গছে। নতুন জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কলকারখানার মালিকে দ্বারা। নতুন সমাজচেতনায় নতুন রাজনীতির জন্ম—নতুন সাহিত্যেরও জন্ম। 'সংকেত' গল্পের মধ্যে রহমানের কারখানায় কাজ করতে যাওয়ার আগে তার নববিবাহিত বধূর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার ঘটনাটি মূল কাহিনীর পটভূমিরূপে স্থাপিত হওয়ায় ট্র্যাজেডি আরও প্রখর হয়েছে। সোমের এই গল্পে যেমন নতুন সমাজও নতুন যুগের ইঙ্গিত দেয় তেমনি সাহিত্যের নতুন ধারার ইঙ্গিত দেয়। এজন্যই বলা যায়—

'সংকেত' গল্পটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করা প্রয়োজন। 'সংকেত' সোমেনের সাহিত্যিক শক্তির কতখানি প্রকাশ হইয়াছে তাহাই একমাত্র বিচার্য নহে। কিন্তু সেদিক দিয়া বলিতে গেলেও গ্রামের অধিবাসী ও তাহাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের পরিচয় ও তাহার সাহিত্যিক প্রকাশ 'সংকেতে' আছে। কিন্তু সংকেতের অপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে দিকটা সে আমাদের দেশের সর্বহারা মজুর ও কিষাণদের জাগরণের সংকেত-ধ্বনির প্রকাশ।...কোন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করিয়াছে। মিলের মালিক তাহাদের ধর্মঘট শক্তিহীন করিয়া দিবার জন্য দূর গ্রাম হইতে লোভ দেখাইয়া কৃষকদের লইয়া আসিয়াছে। নতুন সংগৃহীত শ্রমিকগণ মিলের মধ্যে ঢুকিতে চাইলে কলের ধর্মঘটী মজুরগণের নেতা তাহাদের বুঝাইয়া বলিতেছে যে, যেন তাহারা তাহাদেরই ভাইদের মুখের ভাত কাড়িয়া না লয়—দুঃখ-দুর্দশা তাহাদের উভয়েরই সমান—উভয়ের উপরই শোষণ সমানভাবে চলিয়াছে—মিলের ম্যানেজার হতভম্ব হইয়াছে কি করিতে সে কি করিল? শ্রমিকের শক্তি সে আরো জোরালো করিয়া দিলো। সোমেনের 'সংকেত' কৃষক—মজুরের একতাবদ্ধতার যে সংকেত আমরা আমাদের দেশে পাইতেছি তাহারই প্রকাশ। উদ্ধৃত সরদার ফজলুল করিমের আলোচনা : বিশ্বজিৎ ঘোষ, সোমেন চন্দ, রচনাবলী পৃ : ৩৪৬

ধর্মীয় উন্মাদনা ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে যতো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে অন্য কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর এতো মানুষ নিহত হ য়নি। ধর্মের নামে যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মেতে ওঠে জাতিগত বিদ্বেষে যারা অন্য জাতির মানুষকে হত্যা করে তারা কখনো ধার্মিক বা দেশপ্রেমিক নয়।

আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক 'দাঙ্গা' হয়েছে। এই দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ দর্শক ছিলেন সোমেন চন্দ। দাঙ্গা গল্পটি এ পটভূমিকাতেই লেখা।

সোমেন চন্দের 'দাঙ্গা' গল্প প্রসঙ্গে 'একা' পত্রিকায় ১ম সংখ্যা ৪র্থ বর্ষ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে অচ্যুত গোস্বামী 'সোমেন চন্দ ও তার সাহিত্য' প্রবন্ধে লিখেন—

"ঢাকায় তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল। ঢাকায় এ-রকম দাঙ্গা অনেকবার হয়েছে; এবং দাঙ্গার অবস্থায় আমরা নিজেদের সবচেয়ে অসহায় এবং নিঃসহায় ব'লে বোধ করতাম। জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব আমরা বুঝতে পারতাম না, আমাদের শুভবুদ্ধিমূলক প্রচারে কান দেওয়ার মতো সুস্থ মানসিক অবস্থায় তখন জনসাধারণ থাকতো না। সেই সময় আমাদের মধ্যে একটা আলোচনা হয়েছিল যে, দাঙ্গার উপর সার্থক প্রগতিশীল গল্প লিখিত হওয়া উচিত। দু'-তিনটি গল্প লেখাও হয়েছিল; কিন্তু সেগুলো আমাদের কারোরই তেমন মনঃপুত হয়নি। কারণ সেগুলি সবই মোটামুটি প্রত্যাশিত লাইনে লেখা হয়েছিল : কায়েমী-স্বার্থসম্পন্ন লোকদের কারসাজিতে দাঙ্গা বাধে, উভয় সম্প্রদায়েরই সাধারণ লোক পরস্পরকে ভালোবাসে, কিন্তু প্ররোচনার ফলে তারা বিপথে যায়, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা দাঙ্গা নিবারণের জন্য চেষ্টা করেন এবং সফল হন। গল্পগুলির উদ্দেশ্যমূলকতা এবং উপদেশ-প্রবণতা এমন স্পষ্ট যে, রসাবেদন সৃষ্টি হয়নি।

হঠাৎ একদিন সন্ধের বৈঠকে গল্প প'ড়ে শোনালো। বোধ করি সেই প্রথম সে একটি গল্প পাঠ ক'রে আমাদের শোনালো। গল্পটির নাম 'দাঙ্গা'। আমরা হাসি হাসি মুখ নিয়ে গল্পটা শুনতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু ছোট্ট গল্পটি পড়া শেষ হয়ে গেলে আমরা সকলে 'থ' হয়ে গেলাম। আমাদের সমালোচক-চূড়ামণি রণেশবাবু পর্যন্ত চুপ ক'রে থেকে মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন : একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর গল্প; কোনো খুঁত বের করার উপায় নেই। আজও আমার ধারণা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে দাঙ্গার উপর এইটিই একমাত্র সার্থক গল্প।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!www.amarboi.com ~

গল্পটির প্রধান গুণ হচ্ছে—লেখকের অসাধারণ সংযম। ছোট ছোট কতকগুলি দৃশ্যের ভিতর দিয়ে লেখক তখনকার দাঙ্গার পরিস্থিতির একটি বাস্তব চিত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; ছোটভাই উত্তেজনাকর অশুভ চিন্তাদর্শের শিকার; বড়ো ভাই একজন রাজনৈতিক কর্মী, অর্থহীন ট্র্যাজেডির মর্মান্তিকতা এবং মানুষের অসার উত্তেজনার বিস্তার দেখে মর্মপীড়িত। একটি স্পর্শকাতর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন তরুণের মনে দাঙ্গার ঘটনাগুলি কী প্রতিবেদন সৃষ্টি করেছে তা-ই উদ্‌ঘাটিত লেখকের উদ্দেশ্য। গল্পটি মূলত সাব্‌জেক্টিভ্ ব'লে সহজেই উপদেশাত্মক বা উদ্দেশ্যমূলক হয়ে ওঠেনি; অথচ লেখকের অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গল্পটি পড়তে হ'লে সে-কালের দাঙ্গার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু ওয়াকিবহাল থাকার দরাকার। তখনকার দাঙ্গা—পরবর্তীকালের দাঙ্গার মতো অত ভয়াবহ রূপ নেয়নি। হিন্দুপাড়া ও মুসলমানপাড়ার সংযোগস্থলগুলি ছিল বিপজ্জনক এলাকা। কর্মব্যস্ত শহরের পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ বহিরাগতরা, বা অসহায় দুর্বল বৃদ্ধরা সাধারণত দাঙ্গাকারী বীরদের শিকারে পরিণত হতো। রাস্তার মধ্যে নিরাপদে অবস্থানকারী কল্পনাহীন তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে দাঙ্গা ছিল এক আমোদজনক ব্যাপার। সৈন্যবাহিনীর কাছেও ব্যাপারটা বেশ মজার ছিল এবং তারা প্রকৃতপক্ষে দাঙ্গা নিবারণের কোন চেষ্টাই করতো না। এই অর্থহীন মানবিক ট্র্যাজেডি, এই অসুস্থ বর্বর উত্তেজনার বিকার—একটি তরুণ-মনে কী মর্মযন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে—অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাষায়, কতকগুলি সুনির্বাচিত দৃশ্যের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজনের ভিতর দিয়ে লেখক তা জীবন্ত ক'রে তুলেছেন।"

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে সোমেন ভাববাদী বা আবেগতাড়িত এবং সমাজের উচ্চমত্তের ও সাম্রাজ্যবাদীর আজ্ঞাবহ লেখক নন। সোমেন রাজনীতি করেছেন, কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন, ফ্যাসিবাদ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। গণমানুষ ও সর্বহারা মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি মার্কসবাদের আদর্শে নিবেদিত ছিলেন—একটি বিশেষ আদর্শ ও তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন—কিন্তু তার লেখায় এ সবের ছাপ পড়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটাও স্বাভাবিক যে তার লেখায় শৈল্পিক আদর্শ ব্যহত হয়নি—চরিত্রগুলো যন্ত্র হয়ে যায়নি—। এরা রক্ত মাংসের মানুষ হয়েছে, হৃদয়ের রক্তক্ষরণে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হয়েছে। এজন্যই রনেশদাস গুপ্ত বলেছেন—

"সোমেনের লেখাতে রাজনৈতিকতায় অবধারিত সাধারণ নারী ও পুরুষের আত্মগত সুখদুঃখ ও অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা আর্তিগুলিও নতুন কালের চাহিদার বিতর্কে বিন্দুমাত্র প্রতিহত না-হয়ে বিস্ময়কর সজীবতা নিয়ে মুখর হয়ে ওঠে।"

ঠিক একই সুরে কথা বলেছেন কিরণশঙ্কর সেন গুপ্ত ও পবিত্র সরকার—

"তিনের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পৃথিবী ও স্বদেশের নানা ঘটনাবলির আবর্তে দিশেহারা না-হয়ে সোমেন এই উপমহাদেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক ও বাম-গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী বিপ্লববাদী সংগ্রামীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংগতি রেখেই নিজের সাহিত্য-শিল্পের কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর যেকোনো গল্প পড়লে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, বয়সের তুলনায় তাঁর ব্যক্তিগত শিল্পদর্শক ও অভিজ্ঞতার প্রসার কত ব্যাপক ছিল। সোমেন তখনকার সীমিত মালমসলা নিয়েই বিস্তৃত প্রেক্ষিত তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন। এ বিষয়ে নতুন কালের সুবিন্যস্ত চিন্তাধারা দরুন সেদিন সোমেনের লেখা এত বড় সাহিত্যের ঐতিহ্যের ধারার মধ্যেও আগ্রহের চুম্বককেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

কল্লোল গোষ্ঠির সামনে কোন রাজনৈতিক আদর্শ ছিলোনা—এবং তারা কোন রাজনৈতিক মতাদর্শকে মেনে চলতেন না কিন্তু সোমেনের পক্ষে এমন চিন্তা করা সম্ভব না। সুতরাং "রাজনীতির চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা সমাজজিজ্ঞাসা-চালিত হয়েই করেন। রাজনৈতিক কোনো বিশিষ্ট সত্যকে অনুসরণ করতে বাধ্য হন সমাজ-কল্যাণের প্রেরণাতেই। যিনি মূলত স্রষ্টা শিল্পী, তিনি সেই রাজনৈতিক বিশ্বাসেরই রূপ রচনা করবেন। সোমেন যে মূলত প্রকৃতিতে শিল্পী, তার প্রমাণ অন্য শ্রেণীর গল্পেই আছে। তিনি তাঁর রাজনীতি-নির্ভর সমাজজিজ্ঞাসাকে গল্পে রূপ দিলেন।"

তা'ছাড়া আগেই উল্লেখ করেছি- সোমেন ছোটকাল থেকেই মার্কসবাদী বিপ্লবীদের সংস্পর্শে গেছেন এবং পড়েছেন—টি. এস. এলিয়ট. অডেন, স্টিফেন স্পেন্ডার, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, হাক্সলি, ই.এম.ফর্স্টার, হেমিংওয়ে, ম্যক্সিস গোর্কি, আঁদ্রে জিদ, র‍্যাল্‌ফ্ ফক্স, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, আপটন সিনক্লেয়ার-এর রচনাসমূহ।

সোমেনের শিল্পসত্তার শিকড় কল্পনার আকাশে বা ভাববাদের বাষ্পীয়লোকে নয়—সমাজ জীবনে, বাস্তব জীবনে, হাসি, কান্না, দুঃখ-দুর্দশা এবং ঘাত-অভিঘাতে ভরা মানুষের মধ্যে। এবং এজন্যই বলা হয়— 'দাঙ্গা' গল্প প্রসঙ্গে "সম্প্রতি দাঙ্গার সময় জিনিসটির পত্তন হয়েছে। এই বিষয় শিক্ষা নিতেই সে পাগলের মতো ঘোরাফেরা করে। উচ্চস্বরে মানুষের সঙ্গে তর্ক করে, হিটলারের জয়গান করে, হানাহানিতে প্রচুর আনন্দিত হয়ে।"

সোমেনের লেখা তাঁর অভিজ্ঞতার সন্তান। বারবার আমার ঐ উক্তিতে অনেকেই বিরক্ত হবেন জানি। কিন্তু এই স্বতঃসিদ্ধ উক্তিতে ভুলে গেলে সোমেন চন্দের লেখার সঠিক মূল্যায়ন হবে না।

সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে আমাদের দেশে যখন নতুন মোটা গড়ে ওঠেছে তখন সাম্প্রদায়িক ও গোড়া জাতীয়তাবাদী এবং উগ্র ধর্মীয় দলগুলো আরো হিংস্র হয়ে ওঠেছিলো।

আন্দামান ফেরত বিপ্লবী ও অনুশীলন পার্টির কর্মী-নেতারা শেষপর্যন্ত মার্কসবাদী বলয়ে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে। এবং তারা সাম্প্রদায়িক শক্তি ও উগ্রধর্মীয় শক্তির প্ররোচনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে। সোমেনের 'দাঙ্গা' গল্প এরই আলোকে লেখা।

গল্পটি সম্বন্ধে রণেশ দাশ গুপ্ত বলেছে—

"সোমেন চন্দ তাঁর কাহিনী এবং চরিত্র নিয়েছিলেন জীবন থেকে। সুতরাং সে সময়ে তার চারপাশে ঘটনামূলক ছোট বড় সবকিছুর জন্যেই তাঁর চোখ খোলা থাকতো। সে সময়ে ঢাকায় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য যারা সংগ্রামে নিয়োজিত তাদের মধ্যে কেউ পাছে সাম্প্রদায়িক বিষ খেয়ে বসে, এ নিয়ে সোমেনের উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

'দাঙ্গা' গল্পটি এই উৎকণ্ঠার ফল। নিজেকেও তিনি তাঁর এই গল্পের বাইরে রাখেননি। তিনি যে সাইকেলে চ'ড়ে দাঙ্গাদুর্গত শহরে ঘুরে বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ নিতেন, তার মধ্য দিয়েই সরেজমিনে দাঙ্গার চেহারাটিকে দেখেছিলেন। নায়ককেও এই সূত্রে আমরা সাইকেল আরোহীর চেহারায় পাই।"

'দাঙ্গা'র নায়ক নির্ভীক, একনিষ্ঠ ও নিবেদিত প্রাণ কমিউনিস্ট কর্মী অশোক। তার ভাই অজয় হিন্দু সোস্যালিস্ট। অশোক অজয়কে বোঝাতে চায় দাঙ্গা কিভাবে মানুষের প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শান্তিকে হনন করে। মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট করে। এই দাঙ্গার ফলে শহরে সান্ধ্য আইন চলছে—চলছে সৈন্যদের টহল এবং ঘরে ঘরে শঙ্কা, আতঙ্ক ও মৃত্যুভয়—।

অশোক দাঙ্গাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ইস্তেহার ও পোস্টার বিলি করে। অজয় এগুলো পুড়িয়ে ফেলে—।

'দাঙ্গা' কবলিত শহর। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। অশোকের বাবা বাসায় ফিরেনি। মা চরম উৎকণ্ঠায়। সোমেন এ সময়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন, এই বর্ণনা এতোই বেদনাবহ ও করুণ যে, আমি উদ্ধৃতির লোভ সামলাতে পারছিনে—

অশোক বাসার কাছে গিয়ে দেখে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে যেতেই বললেন, 'বাবা আশু, তোর বাবা তো এখনও এলো না।' তারপর ফিস্‌ফিস্ করে—'তাছাড়া আজ আবার মাইনে পাবার দিন।'

কিছুমাত্র চিন্তার চিহ্ন না দেখিয়ে অশোক তৎক্ষণাৎ বললে,

—'আহা, অত ভাবনা কিসের—? এখনো তো অনেক সময় আছে।"

—'অনেক নয় আশু, সাতটা বাজতে আর আধঘণ্টাও বাকী নেই।'

অশোক আবার রাস্তায় নেমে এলো, পেছনে ছোট ভাই নীলু মা'র আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে রইলো, বেলাও মা'র পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েক মিনিট পরেই ছোট ছোট সৈন্যদল মার্চ করে গেল। আকাশের রং ক্রমেই ধূসর হয়ে আসছে। রাস্তা আর দালানের গায়ে ছায়া নেমেছে। বাদুড় উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

এই সাতটা বাজলো। অশোক ফিরে এলো।

মা এখনো বাইরের দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে। চোখ দুটি ভোরের তারার মতো করুণ। 'আশু, এখন উপায়?'—মা ভাঙা গলায় বললেন। তাঁর চোখ জলে ভরে এসেছে।

অশোক কিছু বললে না। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে খালি তক্তপোষের ওপর শুয়ে পড়লো। তার মুখ কুঞ্চিত হয়ে এসেছে, চোখের ওপর একটা বিষম দুর্ভাবনার চিহ্ন স্পষ্ট। হয়তো এক কঠিন কর্তব্যের সম্মুখীন হতে চলেছে সে। নীলু তার হাত ধরে ডাকলো, 'বড়দা, ও বড়দা? বড়দা, বড়দা গো? বারে, কথা বলে না। ও বড়দা? বারে! বারে!'

নীলু কেঁদে ফেললো, 'বাবগো' বলে নাকিসুরে কাঁদতে লাগলো'।

ওদিকে মা-ও কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। বেলাও তাঁর পাশে বসে দুই হাঁটুর ভিতর মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এছাড়া সমস্ত বাড়ির মধ্যে একটা ভয়াবহ গাম্ভীর্য বিরাজ করছে। অন্ধকার নেমেছে রাস্তায়। ঘরের অন্ধকার আরও সাংঘাতিক। আলো জ্বালাবে কে? ঘরের আবহাওয়া ভুতুড়ে হয়ে উঠেছে। বাইরে ঘন ঘন বাসের হর্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৮৫ www.amarboi.com ~

শোনা যায়। সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। যেন কোন যুদ্ধের দেশ। অথবা কোন সাম্রাজ্যবাদের শেষ শঙ্খধ্বনি, বার্ধক্যের বিলাপ।

এ সময় অশোকের মানসিক অস্থিরতাও তুঙ্গে। দাঙ্গা যে মানুষকে কতো বড়ো কলঙ্ক ডেকে আনতে পারে তা' অশোক ভালো করেই জানে। তার মানসিক অস্থিরতার প্রগাঢ়তা এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

'অশোক ফিরে এলো। দরজার কাছে মার জলভরা চোখ ছল্ ছল্ করছে। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন। অশোক বললে, 'পরে যেতে বলেছে।' এই শুনে মা আবার ভেঙে পড়লেন, ভগ্নস্বরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। মাটির দিকে চেয়ে অশোক মনে মনে বললে, আগামী নতুন সভ্যতার যারা বীজ তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমি যোগ দিয়েছি, তাদের সুখ-দুঃখ আমারও সুখ-দুঃখ। আমি যেমন বর্তমানের সৈনিক, আগামী দিনেরও সৈনিক বটে। সেজন্য আমার গর্বের আর সীমা নেই। আমি জানি, আজকের চক্রান্ত সেদিন ব্যর্থ হবে, প্রতিক্রিয়ার ধোঁয়া শূন্যে মেলাবে। আমি আজ থেকে দ্বিগুণ কর্তব্যপরায়ণ হলাম, আমার কোন ভয় নেই।'

'দাঙ্গার' সমস্ত দুর্ঘটনা এবং মায়ের উৎকণ্ঠা সোমেনের কোন কল্পনা নয়—তিনি নিজে সাইকেল চড়ে দাঙ্গা এলাকা ঘুরেছেন এবং মা-র মানসিক যন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতার সাথে একাত্ম হয়েছেন।

'অশোকের মা খালি মাটিতে ভয়ানক ঘুমুচ্ছিলেন, ছেলের ডাকে ঘুম থেকে উঠে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'যা শীগ্‌গির, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি। একশো বার বলেছি যে, যা বাপু মামাবাড়ী কিছুদিন ঘুরে আয়, মারামারিটা কিছু থামলে পরে আসিস, না তবু এখানে পড়ে থাকা চাই, একটা ছেলেও যদি কথা শোনে! মাটি কামড়ে পড়ে থাকা চাই, শহরের মাটি এমন মিষ্টি, না?' অশোক হেসে বললে,'এত কাজ ফেরে কোথায় যাই বলো?'

—'হুঁ, কাজ না ছাই! কাজের আর অন্ত নেই কী না! তোদের কথা শুনবে কে রে? কেউ না। বুঝতে পেরেছি তোদের কতখানি জোর, কেবল মুখেই পট্‌পটি, হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা!'

—'জানো কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় কানুপুরে কী হয়েছিল? আমরা দাঙ্গা থামিয়ে দিয়েছিলুম।'

মা দুই হাত তুলে বললেন, 'হয়েছে। অমন ঢের বড় বড় কথা শুনেছি। তোদের রাশিয়ার কী হলো শুনি? পারবে জার্মানীর সঙ্গে? পারবে?'

অশোক বাইরের দিকে চেয়ে বললে, 'পারবে না কেন মা? বিপ্লবের কখনো মরণ হয়?

—'অজু, চুপ করলি?'

অজয় নিজের মনে গুম্ গুম্ করতে লাগলো।

অশোক উত্তপ্ত স্বরে বললে, 'ফ্যাসিস্ট এজেন্ট। বড়োলোকের দালাল। আজ বাদে কালের কথা মনে পড়ে যখন 'হিন্দু-মুসলমান ভাই-বোনরা' বলে গাধার মতো ডাক ছাড়বি? তখন তোর গাধার ডাক শুনবে কে? পেট মোটা হবে কার? স্টুপিড, জানিস দাঙ্গা

দুনিয়ার পাঠক এক হও!১৮৬www.amarboi.com ~

কেন হয়? জানিস প্যালেস্টাইনের কথা? জানিস আয়ারল্যান্ডের কথা, মূর্খ!—' কিন্তু একটা তীব্র আর্তনাদ শুনে হঠাৎ অশোক থেমে গেল, পাশের ঘরে গিয়ে দেখলো, মা আরও অস্থির হয়ে পড়েছেন'।

সংকেত বাংলা সাহিত্যে একটি মৌলিক গল্প। কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্র নির্মাণে এবং ঘটনা সংস্থাপন ও মনন বিশ্লেষণে দাঙ্গার ওপর এমন গল্প বাংলা সাহিত্যে নেই। শুধু বিষয়বস্তুর জন্য নয়—একটি নিটোল, শৈল্পিক ও পরিপূর্ণ ছোট গল্প হিসেবে 'সংকেত' এর তুলনা নেই।

শেষ পর্যন্ত গল্পের শেষে আমরা দেখি অশোকের চোখে জল। রক্ত দেখে অশোকের যে ভাবন্তর তা' হিন্দু মুসলমানের বা কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য নয়— চোখের জল ও কান্না সমগ্র বিশ্বমানবতার।

অশোক-চরিত্রের দৃঢ়তা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশ ও মানুষের জন্য তার আন্তরিক উৎকণ্ঠায় প্রগাঢ়তা এবং মানবিক ঔদার্য আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে তুলে তার প্রতি।

অশোকের ভাবান্তরের মাঝে পাশের ঘরে তার ভাই হিন্দু সোস্যালিস্ট অজয়ের কাণ্ড আরো বিস্ময়কর—

'এমন সময় পাশের ঘরে আলো দেখা গেল—আলো নয় তো আগুন। কাগজ পোড়ার গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। অশোক গিয়ে দেখলো হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আবেদনের ইস্তাহারগুলি স্তূপীকৃত করে অজয় তাতে আগুন দিয়েছে। অশোক তৎক্ষণাৎ আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে করতে বললে, 'এসব কী করছিস?'

—'কী করবো আবার? মড়া পোড়াচ্ছি।'

—'অজু তুই ভুল বুঝেছিস। চোখ যখন অন্ধ হয়ে যায়নি, তখন একটু পড়াশুনা কর। তারপর পলিটিক্স করিস্।'

—'দাদা, তোমার কম্যুনিজম রাখো! আমরা ও সব জানি।'

—'কী জানিস, বল্?' অশোকের স্বরের উত্তাপ বাড়লো।

—'সব জানি। আর এও জানি তোমারা দেশের শত্রু—'

'দাঙ্গা' গল্পটি সোমেন নিজের আদর্শবোধ ও সমস্ত সত্তাকে নীংড়িয়ে দিয়ে রচনা করেছেন। মনে হচ্ছে সোমেনের প্রকৃত আদল ও আদর্শ নিয়ে অশোক চরিত্র পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। রণেশ দাশ গুপ্তের ভাষায়—

'স্বাধীনতার জন্য যারা সংগ্রামে নিয়োজিত তাদের মধ্যে কেউ পাছে সাম্প্রদায়িক বিষ খেয়ে বসে, এনিয়ে সোমেনের উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। 'দাঙ্গা' গল্পটি এই উৎকণ্ঠার ফল। নিজেকেও তিনি তাঁর গল্পের বাইরে রাখেন নি। তিনি যে সাইকেলে চড়ে দাঙ্গাদুর্গত শহরে ঘুরে বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ নিতেন, তার মধ্য দিয়েই সরেজমিনে দাঙ্গার চেহারাটাকে দেখেছিলেন। নায়ককেও এই সূত্রে আমরা সাইকেল আরোহীর চেহারায় পাই।"

এই গল্পে অশোক চরিত্রে একটি বৈশ্বিক চেতনা ও বৈশ্বিক মানবতাবোধের উৎসারণ ঘটেছে গল্পের শেষে যেভাবে সোমেন ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধসংস্কার আর মানবতা হননের চিত্র তুলে ধরেছেন তা সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে এক বিস্ময়ের বিষয়। হিন্দু নয়—মুসলমান নয় মানুষের পরিচয়ই বড় পরিচয়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকদিন পরে। অশোক বাইকে চড়ে একটা সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মিটিং-এ যোগদান করতে যাচ্ছিলো। এক জায়গায় নির্জন পথের মাঝখানে খানিকটা রক্ত দেখে সে সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। সারাদিন আকাশ মেঘাবৃত ছিল বলে রক্তটা অত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়নি, এখনো খানিকটা লেগে রয়েছে। কার দেহ থেকে এই রক্তপাত হয়েছে কে জানে? অশোকের চোখে জল এলো, সবকিছু মনে পড়ে গেল। সে চারদিক ঝাপসা দেখতে লাগলো, ভাবলো, এই চক্রান্ত ব্যর্থ হবে কবে'?

বাংলা সাহিত্যে সোমেন চন্দ যে ধারা সৃষ্টি করেছেন তা'এক গৌরবময় অধ্যায়। পরবর্তীকালে অনেকেই এ ধারাকে অনুসরণ করেছেন কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে একাত্ম হয়ে আর কেউ এ ধারাকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করতে পারে নি—। তবে গল্পের শেষে তিনি একটি বিশাল-ব্যাপক বিস্তৃত ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন—

"মাটির দিকে চেয়ে অশোক মনে মনে বললে, 'আগামী নুতন সভ্যতার যারা বীজ, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমি যোগ দিয়েছি, তাদের সুখ-দুঃখ আমারও সুখ-দুঃখ। আমি যেমন বর্তমানের সৈনিক, আগামী দিনেরও সৈনিক বটে। সেজন্য আমার গর্বের সীমা নেই। আমি জানি, আজকের চক্রান্ত সেদিন ব্যর্থ হবে, প্রতিক্রিয়ার ধোঁয়া শূন্যে মেলাবে। আমি আজ থেকে দ্বিগুণ কর্তব্যপরায়ণ হলাম। আমার কোন ভয় নেই'।

মানবসভ্যতার সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্যতম প্রবৃত্তি হচ্ছে দাঙ্গার মানসিকতা। ১৯৪০-৪১ সনের দাঙ্গার সময় আমার জন্ম। আমাদের রায়পুরায় হিন্দুদের সমস্ত ঘরবাড়ি পুড়ে ফেলেছিলো দাঙ্গাবাজরা। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সরকার রায়পুরায় গোরখা সৈন্য মোতায়েন করে। রায়পুরায় হিন্দুদের বাড়িতে পোড়া টিনের ঘর এখনো এ দাঙ্গার ক্ষতবিক্ষতের সাক্ষ্য বহন করে। আমার বাবা কংগ্রেস পার্টি করতেন। দাঙ্গা থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হন এবং তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলো দাঙ্গাবাজরা।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে একটা দাঙ্গা হয়েছিলো। ভৈরবের সেতুতে রেল গাড়ি থামিয়ে হিন্দুদের পেটে ছুরিকাঘাত করে মেঘনা নদীতে ফেলে দিতো। আমার নিজের চোখে দাঙ্গা দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষপর্ব এম. এ পড়ার সময়। এফ. এইচ হল সংলগ্ন রেল কলোনীতে দেখেছি রক্তাক্ত মৃত মা, শাঁখা-সিঁদুর পরিহিতা, হাতে দুধভাত, এবং অতীব কচি শিশুটির মুখেও দুধভাত— মৃত শিশুটির পেটে জখম, আমার ধারণা দাঙ্গা নিয়ে সোমেনের গল্পই প্রথম গল্প। দেশপ্রেমের গভীরতায় গল্পের নায়ক অশোক দাঙ্গার বিরোধিতা করে, এতে তাহার ছোট ভাই অজয় ক্ষেপা : অজু কর্কশ স্বরে বললে, "তোমরা তো বলবেই"—আবার মৃদু স্বরে—"তোমরা হিন্দুও নয়—মুসলমানও নয়।" নায়ক অশোক জবাব দিল: "আমরা ইহুদির বাচ্চা না রে?" তাহার পর আর একস্থানে...মাটির দিকে চেয়ে অশোক মনে মনে বললে, 'আগামী নতুন সভ্যতার যারা বীজ, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমি যোগ দিয়েছি—তাদের সুখ-দুঃখ আমারও সুখ-দুঃখ। আমি যেন বর্তমানে সৈনিক, আগামী দিনেরও সৈনিক বটে। সেজন্য আমার গর্বের সীমা নেই। আমি জানি আজকের চক্রান্ত সেদিন ব্যর্থ হবে—প্রতিক্রিয়ার ধোঁয়া শূন্যে মেলাবে। আমি আজ থেকে দ্বিগুণ কর্তব্যপরায়ণ হলাম—আমার কোন ভয় নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৮৮www.amarboi.com ~

সোমেন চন্দের 'দাঙ্গা' 'সংকেত, 'বনস্পতি' 'ইঁদুর' ও অন্যান্য গল্প পড়লেই বোঝা যাবে যে, সোমেন 'কেবলই স্বপন করিছে বপন পবনে' সাহিত্যের এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং তিনি সাহিত্যের তাত্ত্বিকও ছিলেন না। তার সামনে ছিলো কৃষক শ্রমিক, মজুর ও সর্বহারা এবং মেহনতি মানুষ। এজন্যই মাঝে মাঝে চলে যেতেন ঢাকা শহরের বাইরে কৃষক শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের কাছে। সোমেন মনে করতেন সাহিত্যকে, কৃষক, শ্রমিক মজুর ও মেহনতি মানুষের বিপ্লবের শাণিত হাতিয়ার হতে হবে। ফ্যাসিজম, পুঁজিবাদ আর ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে সাহিত্যের মাধ্যমেও।

প্রথম থেকেই সোমেনের লেখার দিকে ঝোঁক ছিল বলে কমিউনিস্ট-পরিচালিত প্রগতি লেখক সঙ্ঘে তার ডাক পড়ে সবার আগে, সেও তার সাহিত্য-সাধনার স্বাভাবিক কর্মপথে আগ্রহশীল প্রাণে যোগ দিয়ে নিজের লেখক-প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে নেয়। রাজনৈতিক কর্মপ্রেরণা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো—বিপ্লবী গণআন্দোলনকে বাদ দিয়ে শুধু সাহিত্য-সাধনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে সে পারে নি। ফ্যাসিস্ট দানবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টায় সকল শক্তি নিয়েই অগ্রসর হওয়া তার কাম্য ছিলো।—তার জন্যই সে সাহিত্য ছেড়ে শ্রমিক-সংগঠনে লেগে যায়। তার লেখক-বন্ধুদেরও সোমেন প্রথমে টেনে আনে নতুন লেখক সঙ্ঘে। পরে তাদের কমিউনিজমের বিপ্লবী রাজনীতিতেও আকৃষ্ট করে তোলে। এইখানেই বাইশ বছরের যুবকের প্রতিভা ও কর্মকুশলতার পরিচয়। লেখা দিয়ে ভাববিপ্লব আর কাজ নিয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়—সোমেন তা শিখেছিল।

সে সময়ে প্রগতিশীল সাহিত্যের উত্তাপ বুকে ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করতো 'সবুজ বাংলার কথা' পত্রিকা। পত্রিকার সম্পাদক শ্রী নির্মল ঘোষ। সোমেন নির্মল বাবুকে যে চিঠি লিখেন এতেই তার সাহিত্য চিন্তার মানসিকতা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছে। আমরা এখানে তার চিঠিটি উপস্থাপন করছি—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু, ...'সবুজ বাংলার কথা' পেয়েছি। ভালো লাগলো। ...আপনি এবং পত্রিকার নীতি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে, বিশেষত—'অর্থনৈতিক পীড়নের দুঃসহ ক্লেশ যাদের মনে সৃষ্টি করেছে কোনো প্রচণ্ড ক্ষোভ—যে ক্ষোভ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির লাভা-প্রবাহে এক একদিন আত্মপ্রকাশ করে, নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অসাম্য ও বঞ্চনার অহমিকা, যৌবনের পথনির্দেশ তো তারাই দেবে।....আজ বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে, যে বিপ্লব দেবে আমূল সংস্কার।—খুবই ভালো লাগলো, আমি নিজেই অনুভব করছি যেন। ....এই বিপ্লবের অনুভূতি আমার সাহিত্য-সেবকের মনেই জেগেছে মনে হয়, তার মধ্যে অনেকেই প্রকাশ করতে পারছে না, বা অনেকের কণ্ঠই ক্ষীণ হয়ে গেছে তথাকথিত সাহিত্য-ডিরেক্টরদের গোলমালে। কিন্তু সেই অনুভূতির অস্তিত্ব আছে অনেকের মনেই। এইসব দেখে মনে হয়, আগামী দশ বছরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হবে একটা উজ্জ্বল অধ্যায়, একটা বৈপ্লবিক অপূর্ব সৃষ্টি। আমার উপলব্ধি অনুভূতি আর আমি নিজে....এই ঢাকা শহরে একা। ইতি—আপনাদের সোমেন।"

"পুনঃ আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমার দিনগুলি এখন মনোরম আরো অনেক, আপনাকে বলতে বাধা নেই, অনেক মানসিক (সাংসারিক) বিপর্যয়,

www.amarboi.com ~

বাধা-বিপত্তি এড়িয়েও এখনকার দিনগুলি কী ভালো লাগে। তার প্রধান কারণ, উপন্যাস লেখার উত্তেজনা। করে শেষ হবে সেই চিন্তাই করি।

এখনকার রাতগুলো আমার জীবনে স্মরণীয় থাকলো। (আর আপনি তার প্রথম শ্রোতা)। উপন্যাস লেখা ব্যর্থই হোক আর অব্যর্থই হোক, মাঝে মাঝে এক একটি রাত কখন যে শেষ হয়ে যায়, টেরও তো পাইনে!"

যেমন সামাজিক বিপ্লব তেমনি সাহিত্যে ও বিপ্লব আনতে চেয়েছেন সোমেন। এজন্যই অন্য একটি চিঠিতে সোমেন লিখেছেন—

"....সেদিন একখানা বই এনেছি, বইটি পুরনো—লেখকের নামই শুধু আগে জানতাম। জোসেফ ম্যাজিনির Duties of man; এই বই পড়ে একটা ভয় হয়, সেটা আপনাকে বলি। ম্যাজিনি যখন বেঁচেছিলেন, সে আজকের কথা নয়। সমাজব্যবস্থায় অনুরূপ হয়েও এবং এত আগেও এ-রকম অনেক চিন্তাশীল লোকদের লেখায়, বক্তৃতায় সোস্যালিজমের আভাস পেয়েও সেখানে আজ ফ্যাসিজম। এই দেখে মনে হয়, ভারতেও তা-ই হবে। ...কাল নয় ব্রিটিশের হাত থেকে ছাড়া পেলো, কিন্তু পরশু গিয়ে পড়বে ধনীদের হাতে...ইতি—আপনাদের সোমেন।"

সোমেন খুব বেশি লিখেছেন এমন নয়—কিন্তু যা লিখেছেন তাই স্বর্ণমুষ্টি। তার কোন কোন গল্প যেন বিপ্লবের আগুনে লাল ইস্তেহার। আবার তার কোন কোন গল্প আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্য ও বেদনাক্লিষ্ট ঘরোয়া জীবনের ক্ষতাক্ত ও রক্তক্ষরিত চিত্র। তবে বিপ্লবের বিষয় নিয়ে তার কোন গল্প এবং চরিত্রই টাইপ নয়।

তার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প'। 'বাবা ও মাকে উৎসর্গিত' এই গ্রন্থটির প্রকাশক প্রতিরোধ পাবলিশার্স। মোট ছয়টি গল্প নিয়ে এই গ্রন্থটি—রাত্রি শেষ, স্বপ্ন, একটি রাত, সংকেত, দাঙ্গা, ইঁদুর। মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পর ১৯৪২ সনের ডিসেম্বরে বইটি প্রকাশ পায়। মূল্য দেড় টাকা। সোমেনের মৃত্যুর এক বছর পর ১৩৫১ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে কোলকাতার মডার্ন পাবলিশার্স-এর প্রকাশক শরৎচন্দ্র দাস প্রকাশ করেন 'বনস্পতি' গ্রন্থ। মোট এগারোটি গল্প নিয়ে এই গ্রন্থের গল্পগুলো—

মরূদ্যান, ভালো না-লাগার শেষ, অমিল, সত্যবতীর বিদায়, সিগারেট, গান, প্রত্যাবর্তন, অকল্পিত, মহাপ্রায়ান, প্রান্তর, বনস্পতি। বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন, প্রখ্যাত মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল গবেষক পণ্ডিত গোপাল হালদার।

নবজাত প্রকাশনা সংঘ থেকে দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত সোমেন চন্দ ও তার রচনা সংগ্রহ। প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এ গ্রন্থে আছে কুড়িটি গল্প। গল্পগুলো হলো—শিশুতপণ, মরূদ্যান, ভালো না-লাগার শেষ, অমিল, সত্যবতীর বিদায়, সিগারেট, গান, প্রত্যাবর্তন, সমন্বিত, মহাপ্রায়ান, প্রান্তর, বনস্পতি, পথবর্তী, রাত্রিশেষ, স্বপ্ন, একটি রাত, সংকেত, দাঙ্গা, ইঁদুর, মুহূর্ত।

সোমেনের গল্প প্রতীকধর্মী। রয়েছে শোষণ-নির্যাতন আর শ্রমজীবী মানুষের বাস্তবচিত্র। তার প্রায় সব গল্পেই সমাজের প্রগতির চাকাকে সামনে ধাক্কা দেবার একটা ইঙ্গিত আছে। এজন্যই কোন কোন নান্দনিক তার গল্পকে উদ্দেশ্য প্রধানও বলেছেন। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!www.amarboi.com ~

আমাদের অবশ্যিই স্বীকার করতে হবে যে, প্রগতি সাহিত্য সংঘ এবং সোমেন চন্দ আমাদের সাহিত্যে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। সে ধারা জীবনবাদী, মানবমুখীন, এবং মেহনতি মানুষের মুক্তিও বৈপ্লবিক চেতনার উৎসারণ।

এখানে আমি সোমেন চন্দের দাঙ্গা গল্পটি সম্বন্ধে 'সোমেন চন্দ্র ও তার সাহিত্য' প্রবন্ধে অচ্যুত গোস্বামীর বক্তব্য উপস্থাপন করবো—

"ঢাকায় তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল। ঢাকায় এ-রকম দাঙ্গা অনেকবার হয়েছে; এবং দাঙ্গার অবস্থায় আমরা নিজেদের সবচেয়ে অসহায় এবং নিঃসহায় বলে বোধ করতাম। জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব আমরা বুঝতে পারতাম না, আমাদের শুভবুদ্ধিমূলক প্রচারে কান দেওয়ার মতো সুস্থ মানসিক অবস্থায় তখন জনসাধারণ থাকতো না। সেই সময় আমাদের মধ্যে একটা আলোচনা হয়েছিল যে, দাঙ্গার উপর সার্থক প্রগতিশীল গল্প লিখিত হওয়া উচিত। দু'-তিনটি গল্প লেখাও হয়েছিল; কিন্তু সেগুলো আমাদের কারোরই তেমন মনঃপুত হয়নি। কারণ সেগুলো সবই মোটামুটি প্রত্যাশিত লাইনে লেখা হয়েছিল: কায়েমী-স্বার্থসম্পন্ন লোকদের কারসাজিতে দাঙ্গা বাধে, উভয় সম্প্রদায়েরই সাধারণ লোক পরস্পরকে ভালোবাসে, কিন্তু প্ররোচনার ফলে তারা বিপথে যায়, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা দাঙ্গা নিবারণের জন্য চেষ্টা করেন এবং সফল হন। গল্পগুলোর উদ্দেশ্যমূলকতা এবং উপদেশ-প্রবণতা এমন স্পষ্ট যে, রসাবেদন সৃষ্টি হয়নি।

হঠাৎ একদিন সোমেন সঙ্ঘের বৈঠকে গল্প পড়ে শোনালো। বোধকরি সেই প্রথম সে একটি গল্প পাঠ করে আমাদের শোনালো। গল্পটির নাম 'দাঙ্গা'। আমরা হাসি হাসি মুখ নিয়ে গল্পটা শুনতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু ছোট্ট গল্পটি পড়া শেষ হয়ে গেলে আমরা সকলে 'থ' হয়ে গেলাম। আমাদের সমালোচক চূড়ামণি রণেশবাবু পর্যন্ত চুপ করে থেকে মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন : একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর গল্প। কোন খুঁত বের করার উপায় নেই। আজও আমার ধারণা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে দাঙ্গার উপর এইটিই একমাত্র সার্থক গল্প।

গল্পটির প্রধান গুণ হচ্ছে—লেখকের অসাধারণ সংযম। ছোট ছোট কতকগুলো দৃশ্যের ভিতর দিয়ে লেখক তখনকার দাঙ্গার পরিস্থিতির একটি বাস্তব চিত্র দিয়েছেন। দৃশ্যগুলোর পটভূমিকায় একটি পরিবারকে দেখানো হয়েছ : বাবা-মা বিভ্রান্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; ছোটভাই উত্তেজনাকর অশুভ চিন্তাদর্শের শিকার; বড়ো ভাই একজন রাজনৈতিক কর্মী, অর্থহীন ট্র্যাজেডির মর্মান্তিকতা এবং মানুষের অসার উত্তেজনার বিস্তার দেখে মর্মপীড়িত। একটি স্পর্শকতার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন তরুণের মনে দাঙ্গার ঘটনাগুলো কী প্রতিবেদন সৃষ্টি করেছে তা-ই উদ্‌ঘাটিত করা লেখকের উদ্দেশ্য। গল্পটি মূলত সাব্‌জেক্টিভ্ বলে সহজেই উপদেশাত্মক বা উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠেনি; অথচ লেখকের অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গল্পটি পড়তে হলে সে-কালের দাঙ্গার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু ওয়াকিবহাল থাকার দরকার। তখনকার দাঙ্গা-পরবর্তীকালের দাঙ্গার মতো অত ভয়াবহ রূপ নেয়নি। হিন্দুপাড়া ও মুসলমানপাড়ার সংযোগস্থলগুলো ছিল বিপজ্জনক এলাকা। কর্মব্যস্ত শহরের পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ বহিরাগতরা, বা অসহায় দুর্বল বৃদ্ধরা সাধারণত দাঙ্গাকারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীরদের শিকারে পরিণত হতো। রাস্তার মধ্যে নিরাপদে অবস্থানকারী কল্পনাহীন তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে দাঙ্গা ছিল এক আমোদজনক ব্যাপার। সৈন্যবাহিনীর কাছেও ব্যাপারটা বেশ মজার ছিল, এবং তারা প্রকৃতপক্ষে দাঙ্গা নিবারণের কোন চেষ্টাই করতো না। এই অর্থহীন মানবিক ট্র্যাজেডি, এই অসুস্থ বর্বর উত্তেজনার বিকার—একটি তরুণ-মনে কী মর্মযন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে—অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাষায়, কতকগুলো সুনির্বাচিত দৃশ্যের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজনের ভিতর দিয়ে লেখক তা জীবন্ত করে তুলেছেন'।

'দাঙ্গা', 'সংকেত' ও 'ইঁদুর' এই তিন গল্পের নায়কের নামই এক—সুকুমার। তিনটি গল্পেই সোমেনের ব্যক্তি জীবনের ছাপ একেবারে স্পষ্ট। সোমেনের বয়স এখন ১৬-২০ বছর মাত্র। কিন্তু এ বয়সেই সোমেন প্রগতিশীল আন্দোলনে ও মার্কসীয় বৈপ্লবিক চেতনায় এবং সমাজ পরিবর্তনের পালায়ই শুধু নয়—একজন সার্থক সাহিত্যিক হিসেবেও চমক সৃষ্টি করেছিলেন।

'বনস্পতি' সোমেনের একটি শিল্পসুন্দর গল্প। এ গল্পটি ও প্রতীকি চেতনা সবস্ব। গল্পটিতে যেনো সোমেন আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সমাজ ও নৃ-তত্ত্ব এবং মানবজীবনের সারবত্তাকে উন্মোচন করেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ চলে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের কালো থাবা আবার বিস্তার করছে। পৃথিবীব্যাপী মানুষ আবার আতঙ্কিত এখনো আকাশে-বাতাসে ধ্বনি প্রতিধ্বনি হচ্ছে হতাহত মানুষের আর্ত চিৎকার। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন বলাকার ঝড়ের খেয়া। চিঠি লিখলেন রঁমা-রঁলা আর এন্ডারসনকে। আমাদের সোমেন লিখলেন 'ইঁদুর' গল্প। আমি মনে করি এই গল্পটি শুধু সোমেনের বা বাংলা সাহিত্যের নয় সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যেরও একটি অনন্য গল্প। এ গল্পের আবেদন বৈশ্বিক। গল্পটির উৎস ও পটভূমি সম্বন্ধে অচ্যুত গোস্বামী বলেছেন—

"এই সময়ে সোমেন তার বিখ্যাত 'ইঁদুর' গল্পটি লেখে। মনে আছে, সজ্ঘের বৈঠকে সোমেন নিজে এই গল্পটি পাঠ করে নি। তার শরীরটা ভালো ছিল না বলে পড়তে আরম্ভ করে বার বার হোঁচট খাচ্ছিল। সেই সময় ভাগ্যক্রমে সেদিন বৈঠকে ঢাকা রেডিওর একজন ঘোষক উপস্থিত ছিলেন (নামটি এখন আর মনে করতে পারছি না)। এমন একজন সুকণ্ঠ সুদর্শন পড়ুয়াকে হাতের কাছে পাওয়ায় আমরা তাঁকেই গল্পটি পড়তে অনুরোধ করি। স্বাভাবিক দক্ষতার ফলে তিনি সুন্দর করে পড়ে, কখনো কণ্ঠ উচ্চ করে, কখনো খাদে নামিয়ে, তিনি গল্পটির প্রতি সুবিচার করতে পেরেছিলেন। গল্পটি শুনে উপস্থিত সকলেই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম যে কথাটি আমার মনে হয়েছিল তা এই যে—এ-রকম গল্প, আমি লিখতে পারতাম না।

গল্পটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাধারণ। একটি দারিদ্র্যপীড়িত শ্রীহীন পরিবার। নানা আপাততুচ্ছ কারণে, এমন-কি নিতান্ত যুক্তিহীনভাবে, পরিবারের সভ্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, এবং এমনিতেই যে পরিবেশ নিরানন্দকর তা আরও নিরানন্দ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে যে সামান্য আনন্দনাট্যও না-জমে এমন নয়। এই সামান্য সুখ এবং বিপুল পরিমাণ দুঃখ নিয়ে যে কী সদৃশ মানবনাট্য না অনায়াসে হতে পারতো! এই পরিবারের তরুণ সভ্য রাজনৈতিক কর্মী সুকুমার—এই জীবন যে কত সুন্দর হতে পারে, মানুষের সামনে যে কত বিপুল সম্ভাবনা আছে—তা জানে। জানে বলেই এই জীবনের ক্ষুদ্রতা ও দীনতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৯২www.amarboi.com ~

তার সংবেদনশীল হৃদয়কে দারুণভাবে পীড়িত করে। সোমেনের ভাষা আরও সতেজ, রূপধর্মী এবং অর্থবহ। ঘটনা-বিন্যাসে তার স্বাভাবিক দক্ষতা, সংযম এবং ইঙ্গিতময়তা এখন আরও সুপরিণতি লাভ করেছে। গল্পটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম।"

সোমেন জীবনবাদী, বাস্তববাদী, মেহনতি মানুষের সংগ্রাম ও জয়ে বিশ্বাসী এবং শোষণ নির্যাতন ও মানুষের অসহায়ত্ব ও দুঃখ বেদনাকে তুলে ধরেছেন কিন্তু তিনি তাদের ধনিক, বণিক ও শোষকের ফাঁদে আটকিয়ে রাখেন নি—বিপ্লবে ও আন্দোলনে জয়ী হবার জন্য সামনে যেতে প্রত্যয়ী করে তুলেছেন।

পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ধনিক, বণিক ও শোষকদের নির্যাতনে নিষ্পেষিত মানুষের আর্ত-যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে সোমেনের গল্পে। বহুমাত্রিক শোষণের প্রাকারে বন্দি কৃষক, শ্রমিক, মজুর ও মেহনতি এবং সর্বহারা মানুষগুলো। কিন্তু সোমেন এখানেই থেমে যায় নি। প্রাকার থেকে মুক্তি ও বিপ্লব আন্দোলনে তাদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন সোমেন। এবং সোমেন আরো দেখিয়েছেন যে, একজন মার্কসবাদী তার আদর্শ ও চেতনা কখনো অন্যায়, লাভ ও লোভ মোহের কাছে আত্মসমর্পণ করে না।

সোমেনের গল্পের বাস্তবতা এখানেই যে, তার চরিত্রগুলো কখনো অলৌকিক অন্ধ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। সমাজ পরিবর্তন করে বিপ্লবে জয়ী হবার প্রত্যয়ে তারা উজ্জীবিত।

তার লেখায় যে উদ্দেশ্যপ্রবণতার অভিযোগ তুলেছেন অনেকে তা সার্বিক ঠিক নয়। শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকারকে অস্বীকার করে সোমেনের সাহিত্য সাধনা নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নান্দনিকতাকে অস্বীকার করে নি সোমেন। তাই তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো যন্ত্র হয়ে ওঠেনি। এরা রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষ হয়েছে। হৃদয়ের রক্ত ক্ষরণ যেমন আছে তেমনি আছে সংগ্রামী চেতনা।

সোমেনের কোন কোন গল্প প্রতীকধর্মিতায় বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ গল্পের অভিধা পেতে পারে। আমার মনে হয় যারা তার 'ইঁদুর' ও 'সিগারেট' পড়েছেন তারা আমার সাথে একমত হবেন।

গল্পের আকস্মিকতা আর চমৎকারিত্ব দিয়ে সোমেন পাঠককে ভোলাতে চান নি এবং এ ধরণের মেকিত্ব দিয়ে কৃতিত্ব ও অর্জন করতে চান নি। তার গল্পের মানুষ, সংগ্রামে, বিপ্লবে, জীবনবোধে এবং আমাদের গৃহসংসারের সুখ-দুঃখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে। মানুষ ও মানুষের সংগ্রামকে বাদ দিয়ে আকস্মিকতা ও চমৎকারিত্ব দিয়ে তিনি পাঠকের মন ভোলাতে চান নি। আমার ধারণা তিনি গল্পের প্রচলিত মডেলকে ভেঙে দিয়েছেন। এ বিষয়ে পবিত্র সরকারের মন্তব্যের আশ্রয় নিচ্ছি—

"সোমেন কখনোই ও হেন্‌রি বা মপাসাঁর মতো whip-crack ending-এর পক্ষপাতী নন, হঠাৎ তিনি কোনো অভাবিত অপ্রত্যাশিত ঝল্‌কানিতে আমাদের বিমূঢ় করে দেন না, বরং গল্পের শেষে আমাদের পৌঁছে দেন। ফলে তাঁর গল্পের উপসংহার আমাদের—আরোপিত কৃত্রিম বলে মনে হয় না।"

[পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত সোমেন চন্দ গল্পসংগ্রহ গ্রন্থের 'সোমেন চন্দ: জীবন, গল্পাবলি' শীর্ষক ভূমিকা]।

পুনিয়ারি পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

পাঠককে গভীরতার সন্ধান ও একটা পরিপূর্ণতার পরিতৃপ্তি না দিয়ে একটা মোহ ও আকস্মিক চমৎকারিত্ব দেখিয়ে পাঠককে ভোলানোর চেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ
সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে সৌখিন মজদুরি।

সোমেন চন্দ বিলাসী আর্টের চর্চা করেননি। শিল্পীর একটি সামাজিক অঙ্গীকারও দায়বদ্ধতা আছে। এক ধরনের কলাকৈবল্যবাদী শিল্পকলায় উদ্দেশ্যহীনতায় বিশ্বাসী কিন্তু তারা জানে না উদ্দেশ্য প্রধান হয়েও গোর্কির শিল্পকর্ম মহৎ শিল্পকর্ম। সমারসেট মন বোধহয় এজন্যই বলেছেন The value of art is not only for beauty but for right action.

সোমেন প্রায়ই বলতেন 'সাহিত্যকে শ্রমিক-বিপ্লবের সহায় হতে হবে। ফ্যাসিজম ও ধন তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে।

গোর্কির কথা সোমেন অমোঘ বাণী হিসেবে গ্রহণ করতেন—

'লেখক হচ্ছেন তাঁর স্বদেশ ও স্ব-সমাজের যেন চক্ষু, কর্ণ আর হৃদয়। এক কথায় যুগের তিনি বাণী বা প্রতিধ্বনি। তিনি যথাসাধ্য সব কিছু জানবেন। অতীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকবে যত বেশি, ততই তিনি নিজের যুগকে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন—ততই তিনি তাঁর কালের সর্বজনীন বিপ্লবী রূপ ও তাঁর কর্তব্যের পরিধি—তীব্রভাবে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। জনগণের ইতিহাস তাঁর জানা উচিত, শুধু উচিত বললেই হবে না, তাঁকে তা জানতেই হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে জনগণের মনোভাব কী—তাও তাঁকে বুঝতে হবে। নৃতত্ত্ববিদ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের পণ্ডিতরা আমাদের জানিয়েছেন, জনগণের চিন্তাধারাই প্রকাশ পায়—গল্প, কাহিনী, উপাখ্যান প্রবচন, প্রবাদবাক্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। বস্তুত প্রবাদবাক্য ও প্রবচন জনসাধারণের চিন্তন-ভাবনের নিখুঁত ও সুন্দর প্রকাশ।'

সোমেন খুব বেশি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্লব ও বিপ্লবীদের বই পড়তেন। এবং বিপ্লবী সাহিত্যিকদের তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন তাদের প্রতি আগ্রহও ছিলো খুব বেশি। তরুণ কবি ও সাহিত্যিক এবং মার্কসিজমে নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবী সাহিত্যিক র‍্যালফ ফক্সের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে আত্মোৎসর্গের কাহিনী পড়ে সোমেন খুবই আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছিলেন এবং সতীশ পাকড়াশীকে গর্বের সাথে বলেছিলেন, যে সাহিত্যিক ফ্যাসিজিমের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী বিপ্লবে আত্মোৎসর্গ করে আমি তাকেই প্রকৃত সাহিত্যিক বলি। উত্তরে সতীশ পাকড়াশী সোমেনকে বলেছিলেন—

অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন কলম ছেড়ে তরবারি ধরতে হয়—বুকের রক্তে তখন নতুন সাহিত্য তৈরি হয়। ধন-শোষণ মদমত্ত ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে কবি ও সাহিত্যিকগণ তাই স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছুটে গিয়েছিলেন। সাহিত্য সাধনায় গণমানবের মর্মকথা ফুটিয়ে তোলবার যে প্রেরণা, সেই প্রেরণাই লেখককে গণমানবের-মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে। [পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৯৪www.amarboi.com ~

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সোমেন যেমন জীবনিষ্ঠ ও মার্কসবাদী বিপ্লবী হিসেবে নিবেদিত ছিলেন তেমনি একজন মার্কসবাদী লেখক হিসেবে আত্মোৎসর্গ করেছেন। তার নিজের এক কবিতায় তিনি বলেছেন—

আকাশের দিকে লক্ষ্য রেখো :
কবে আবার ঝড় আসবে?
এখানে স্বর্ণলঙ্কা,
(ভয় নেই, এ যুগে রাজায় রাজায় যুদ্ধ আর বাধে না)
প্রতি দ্বারপথে নরম সোনার আলো,
পথে-বিপথে কাউন্টার পাশে
ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে স্বর্ণকান্তি মানুষের ভিড়
এরা এঞ্জেল!
সুপ্রশস্ত পথের ধুলোয় স্বর্ণরেণু।
উর্বর জমির সোনার ফসলের
আবার বৈজ্ঞানিক চাষ এখানে।

বিপ্লবী সাহিত্যের কথা সোমেন শুধু নিজেই ভাবতেন না। বন্ধুদেরও এ বিষয়ে সচেতন করে দিতেন। একই সাথে সে কার্ল মার্কসের ক্যাপিটেল যেমন পড়েছেন তেমনি পড়ছেন যোসেফ ম্যাটসিনির ডিউটিস অব ম্যান, রঁমা রঁলার 'আই. উইল নট রেস্ট'। অন্যদিকে পড়েছেন র‍্যালফের দ্যা নভেল এ্যান্ড দ্যা পিপল আবার কডওয়ালের ইলিউসিন এ্যান্ড রিয়্যালিটি। অমৃতকুমার দত্তকে লেখা এক চিঠিতে আমরা জানতে পারি—

"...লিখতে হবে—মেহনতী মানুষের জন্য সর্বহারা মানুষের জন্য আমাদের লিখতে হবে। র‍্যালফ ফক্সের বই পড়ে আমি অন্তরে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। কডওয়েলের বইটিও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই না-হলে কি মহৎ সাহিত্যিক হওয়া যায়? স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে তাঁদের আত্মবিসর্জন ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আশার কথা—সাহিত্যে তরুণ লেখকরা এদিকে সচেতন হচ্ছেন। ...বিপ্লবের জন্য একজন তরুণ লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। গোর্কির কথাই চিন্তা করো। সৌখিন সাহিত্য করার আর সময় নেই।...."

সোমেন চন্দ ছিলেন জীবন শিল্পী। শুধু কল্পনা করে বা দূর থেকে দুরবীন দিয়ে যে লেখা তা পরীর গল্প হয়—প্রকৃত সাহিত্য হয় না। সোমেনের গল্প তার জীবন থেকে নেয়া। কমিউনিস্ট পার্টিও রেল-শ্রমিক ইউনিয়ন করে এবং কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ ও বস্তিবাসীর সাথে একাত্ম হয়েছেন। তাদের সাথে মিশেছেন আত্মীয় হয়ে। এই বাস্তবতা থেকেই নিয়েছেন গল্পের প্লট ও চরিত্র।

এই সোমেন চন্দকে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হলো ফ্যাসিবাদী গুণ্ডাদের হাতে। আসলে কি সোমেনের মৃত্যু হয়েছে; সোমেন বিশ্বাস করতো 'বিপ্লবীর জীবন সেতো বিষের পেয়ালা। পান করতেই হবে, গত্যন্তর নেই। সোমেন আরো বিশ্বাস করতো—

www.amarboi.com ~

জনগণের মুক্তির জন্য জীবন অথবা মৃত্যু, রক্তাক্ত সংগ্রাম অথবা অবলুপ্তির পথছাড়া পথ নেই। সোমেনের মৃত্যু নেই। সেদিনের জীবিত সোমেনের চেয়ে আজকের শহীদ সোমেন বেশি জীবন্ত ও বিস্ফোরক। আমরা আজ তাকে স্মরণ করে বলবো—

প্রভাত সূর্য এসেছে রুদ্ধ সমাজে, দুঃখের পথে তোমার তূর্যবাজে
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে মৃত্যুর হোক লয়।

সোমেন চন্দের ছিলো তীক্ষ্ণ ও সতর্ক যুগ চেতনা। তবে তার সাহিত্যে সাময়িক ও কালিক চেতনার মধ্যেও ছিলো যুগাতীত ও কালাতীত এবং উত্তরণের অভিবাস। সিগারেট গল্পে আমরা এরই আভাস্ পাই।

এককালে আমাদের সমাজে ঘড়ি হাতে দেয়া, চশমা পরা এবং সিগারেট খাওয়া ছিলো সৌখিনতা ও অভিজাত্যের প্রতীক—ভদ্রতা এবং বাবু ও বিলাসিতার প্রতীক।

কেউ সিগারেট খেলেই লোকে তার প্রতি বিস্ময়ে তাকাতো এবং তাকে ঘিরে ধরতো। বিবাহে, পার্বণে, উৎসবে ও অনুষ্ঠানে লোককে দেখিয়ে সিগারেট খাওয়া ছিলো একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। এজন্যই—

যাদব ঠিক করিল, সে আজ একটা সিগারেট খাইবে। বিবাহের আগে মাঝে-মাঝে দু-একটা সিগারেট সে খাইত বটে, কিন্তু তারপর এতগুলি বছর আর ছুঁইয়াও দেখে নাই, আজ ঠিক করিয়া ফেলিল, যত দামই হোক, সিগারেট আজ একটা সে খাইবেই।

বড় রাস্তার রেলওয়ে ক্রসিং-এর গেটের সঙ্গে লাগিয়া যে ছোট দোকানটা বসে, সেখানে সব রকম সিগারেটই থাকে। যাদব ধীরে ধীরে সেদিকেই চলিল। গিয়া দেখিল, দোকানের মালিক গোকুল সেখানে নাই, হয়তো খাইতে গিয়াছে, একটা ছোঁড়া বসিয়া আসে সেখানে। পান সাজানোর চক্‌চকে থালাটার উপর দুটি পয়সা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া যাদব বলিল, 'একটা সিগারেট দে তো?'

'যুদ্ধের ফলে সব সিগারেটের দামই চড়ে গিয়েছে, ছোঁড়াটা বলিল।

তা হোক, যাদব একটা সিগারেট কিনিয়া ফেলিল, অত্যন্ত সাবধানে সেটা দুই ঠোঁটের মাঝখানে চাপিয়া সে তা' ধীরে ধীরে ধরাইয়া জোরে একটা টান দিল, তারপর কিছু দূর হাঁটিয়া দেখিল, রেলওয়ে ক্রসিং-এর ওই দিকে লাইনের পাশেই শীতের রৌদ্রের নীচে খোলা জায়গাটিতে গোল হইয়া বসিয়া মাধু সর্দার, ইয়াসিন, শঙ্কর আর সুকুমার গল্প করিতেছে, তাহাদের আজ দুপুর বেলা কারুরই ডিউটি নাই।

সিগারেট মুখে যাদবকে দেখিয়া তাহারা সকলেই এক সঙ্গে হৈ হৈ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

ইয়াসিন বলিল, 'আরে মস্ত বাবু হয়ে গেলে যে যাদব বাবু!' শঙ্কর বলিল, 'এসব কী? বুড়ো—বয়সে আবার ফুর্তি জাগলো কেন?'

এরপরই সোমেন গল্পে টেনে আমাদের স্বাদেশিক আন্দোলন, বিলেতি দ্রব্যসামগ্রী ও মাল বর্জন। কালের চাকা ঘুরে গেলো—। সমস্ত দেশ স্বাদেশিকতার ঢেউয়ে তাল মাতাল। মানুষ বিলেতি বস্ত্র আর সিগারেটকে ঘৃণা শুরু করলো— সোমেন তার গল্পে বর্ণনা করেছেন—

তখন কাউকে সিগারেট খেতে দেখলে, তার ওপর এমন ঘেন্না হত যে তা' বলবার নয়। ইচ্ছে হতো, বিলিতি-বর্জনের মতো তাকেও বয়কট করি, বা, জ্বালাময়ী ভাষায় খুব

www.amarboi.com ~

কয়েকটি কথা শুনিয়ে দিই!'—সুকুমার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, প্রাণ ভরিয়া কিছুটা হাসিয়া নিয়া আবার সে বলিল, 'তখন আমি একটা লোককে জানতাম যার স্বভাবই ছিল, সকলে যা করত তার ঠিক উল্টো করা। সকলে যদি ঠিক করলো, হরতাল করবে, সে অমনি বাজার করে আসতো। সবাই যদি ঠিক করলো, এবার বিলিতি আর পরবে না, অমনি দেখা গেল খাঁটি বিলিতি কাপড়ের জামা পরে দিব্যি সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তেমনি সবাই যদি ঠিক করলো, সিগারেট আর খাবে না, চেয়ে দ্যাখো, সে দারুণ সিগারেট খেয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এবার আর কিছুতেই রেহাই পাবার জো-টি নেই। সিগারেট খেতে দেখে সবাই তাকে বয়কট করলো, এমনকি, কথা পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হলো। সত্যি এমন শাস্তি আর দেখিনি।'

আলোচনার প্রথমেই যুগচেতনার বিষয়টি ওঠেছিলো—। বর্তমানে আমাদের দেশে ধূমপানের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন হচ্ছে। সরকারি, বেসরকারি প্রচার বিভাগ মুখর হচ্ছে—। সর্বত্র, সভাসমিতি ও বিজ্ঞাপনে এবং মানববন্ধনে ধূমপানের ক্ষতিকারক দিকটা তুলে ধরা হচ্ছে—।

সোমেন তার গল্পের মাধ্যমে অনেক আগেই এ বিষয়ে সচেতন ভাবে সক্রিয় ছিলেন—তাই যাদবের সিগারেট খাওয়া দেখে শঙ্কর হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'যাদবদা, সিগারেটটা ফেলে দাও, ফেলে দাও বলছি!'

সকলে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে যাদবের দিকে তাকাইল।

শঙ্কর আবার বলিল, 'ওটা আর খেয়ো না, খেয়ো না, ফেলে দাও বলছি?' শঙ্করের চোখে-মুখে আতঙ্ক, স্বর উত্তেজিত।

যাদব হতভম্বের মতো সিগারেটটা নীচে নামাইয়া বলিল, 'কেন?'

শঙ্কর বলিল, 'দেখছো না, ওটা কেমন হয়ে গেছে, কী যেন বেয়ে পড়ছে।'

সকলে দারুণ আতঙ্কে জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে চাহিয়া দেখিল—হ্যাঁ, ঠিকই, কেমন একটা বিশ্রী কালো পদার্থ সিগারেটটার বাকী অংশটুকু গা বাহিয়া পড়িয়াছে। যাদবও দেখিল। হাতের আঙুলগুলি তাহার ভয়ে আর উত্তেজনায় কাঁপিতেছে।

শঙ্কর বলিল, 'ওটা বিষ।'

—'বিষ!'

—'হ্যাঁ, বিষ। মুখে গেলে আর বাঁচতে হবে না। আমি এক সাহেবকে দেখেছি, তারও এমনি হয়েছিলো, কী যেন পড়ছিলো সিগারেটের গা বেয়ে, সে অমনি ওটা ছুড়ে ফেরে দিয়েছিলো। যাদবদা, ওটা খেয়ো না, ফেলে দাও বলছি, ছুড়ে ফেলে দাও!'

যাদব আর দ্বিরুক্তি করিল না, সিগারেটটা দূরে ছুড়িয়া মারিল। হাতটা তাহার এখনও কাঁপিতেছে। কিন্তু সিগারেটটা?

অর্ধেক খাওয়া হয় নাই যে! যাদবের মনটা খারাপ হইয়া গেল, সে চুপ করিয়া রহিল।

লাইনের কিছু দূরে দীর্ঘ ঘাসে-ভরা মাটিতে সিগারেটটা জ্বলিতেছে, আর সেই দীর্ঘ ঘাসের ভিতর হইতে একটা শাদা মসৃণ ধোঁয়ার রেখা পাকাইয়া-পাকাইয়া উপরের দিকে উঠিতেছে। মনে হয়, লক্‌লকে ঘাসে ওই তীক্ষ্ণ ডগাগুলিও সিগারেটের ধোঁয়ার বিষে জর্জরিত; তাই কম্পমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

সোমেন চন্দের গল্পে শারীরিক ঘ্রাণ

সোমেন চন্দের গল্পে শারীরিক ঘ্রাণ ও শারীরিক স্পর্শ যা আছে তা আকারে ও ইঙ্গিতে এবং পরিমার্জিত ও পরিশীলিতভাবে। সোমেন ফ্রয়েড পড়েছে। নিজেও যুবক, অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সে ভালো করেই উপলব্ধি করেছে।

জৈবিক অনুসন্ধিৎসা জৈবিক চাহিদা ও যৌন জিজ্ঞাসা ও জৈবিক বাসনা মানুষের এক স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক প্রবণতা। মানুষের মনের এই অনুভূতি প্রকাশ্যে না হলেও আকারে ইঙ্গিতে স্ফুট-অস্ফুট সংলাপে মানুষ এই অনুভূতি প্রকাশ করে।

মানুষের এই যৌন অনুভূতি কবিতার মতো, মহৎ শিল্পকর্মের মতো রহস্যময়। এ রহস্য আরো রহস্যকে জাগিয়ে তুলে। রহস্যের শেষ নেই—অনুসন্ধিৎসার কোন উত্তর নেই যা বা যেটুকু ধরা দেয়—এতেও তৃপ্তি নেই, নিবৃত্তি নেই। চাই দৈহিক সান্নিধ্য ও দৈহিক রহস্যের সন্ধান।

সোমেন চন্দ মানুষের মনের ও দেহের এই রহস্যের স্বরূপ অতীব সূক্ষ্মভাবে এবং আকারে ও ইঙ্গিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। খুব গভীরভাবে ভাবলে এবং সংলাপের ফুলেল অনুভূতির ঘ্রাণকে বিশ্লেষণ করলে 'রাত্রিশেষ' গল্পে ইঙ্গিতময়তার এই রহস্যের কিছু কিছু চিত্র পাওয়া যাবে।

আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি করবো না। শুধু দুটি গল্প থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে সমাপ্তি টানবো। এবং প্রথমেই 'বনস্পতি' গল্প থেকে—

'একরাত্রে পীরপুরের বৃদ্ধ জমিদার নবকিশোর চৌধুরী তাহার শয্যা সঙ্গিনী তৃতীয় পক্ষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে লইয়া বড় বিব্রতবোধ করিলেন। একটা ভয়ানক উত্তাপে এক মুহূর্তে কী জানি কেন সমস্ত শরীরটা তাঁহার দারুণ অবশ হইয়া আসিল। কেমন একা অবসাদে ভরিয়া গেল, তিনি বড় অসহায় বোধ করিলেন, ইচ্ছে হইল, দুই হাত দিয়া নিজের চুল ছিঁড়িতে থাকেন, অবশেষে গুটিসুটি মারিয়া তিনি পড়িয়া রহিলেন'।

নবকিশোর চৌধুরী বৃদ্ধ। কিন্তু স্ত্রী সুন্দরী ও যুবতী। নবকিশোর জমিদার তার বিলাস-প্রাচুর্য ও ধনসম্পদ আছে। সুন্দরী যুবতীকে জোড় করে প্রলোভনের টোপ ফেলে বিলাস ও ঐশ্বর্যের মোহে আবিষ্ট করে বিয়ে করা যায়—। কিন্তু যৌন শক্তিতে অক্ষম নবকিশোরের যুবতী সুন্দরী স্ত্রীর যৌন চাহিদা মিটিয়ে তাকে আয়ত্তে রাখার শক্তি তার নেই। নবকিশোর সত্যিই বুঝত পারে যে, তার মতো এমন অসহায় ও নিষ্ফল জীবন পৃথিবীতে আর কারো নেই। জৈবিক অতৃপ্তির যন্ত্রণার এই চিত্র সোমেন খুব নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছেন।

এরপরের দৃশ্য আরো উৎকট ও ভয়ঙ্কর—

রাত তখন দুইটা। চারিদিক গভীর নিস্তব্ধ, কোথাও টুঁ শব্দটি শোনা যায় না। সামনের জানালা দিয়া বাগান হইতে তীব্র ফুলের গন্ধ আসিতেছে। বিছানায় বালিশের পাশেও নানারকম ফুল, কিন্তু নবকিশোরের কাছে তাহা এখন বিষের মতো মনে হইল, তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো, অথবা সুচের মতো তাঁহাকে বিঁধিতেছে। পাশেই অরুন্ধতী তাহার প্রখর যৌবন আর চেহারার দীপ্তি লইয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া আছে। নবকিশোরের ইচ্ছা

www.amarboi.com ~

হইল ডাক ছাড়িয়া কাঁদেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে তিনটা বাজিয়া গেল, হয়তো রাতকে দিন ভাবিয়া কয়েকটা কাক বাহিরে কা-কা করিতেছে, কাঁটার বিছানায় শুইয়াও নবকিশোর এক সময় ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার আশে পাশে একদল নগ্ন নর-নারী, চমৎকার তাহাদের চেহারা, যেন শ্বেত পাথরের খোদা মূর্তি, চমৎকার চোখ-মুখের ভঙ্গি, যেন অজস্র মানিক ঝরিতেছে, নবকিশোর দেখিলেন, খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া তাহারা একজন আর একজনের সঙ্গে কথা বলিতেছে, অজস্র চুমা খাইতেছে, কেহ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কোন মেয়ের হাঁটুতে মুখ রাখিয়া কী সব বলিতেছে, কেউ বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—আব সেই একদল হাস্যমুখর, সৌন্দর্যদীপ্ত মানুষের মধ্যে তিনি যেন একটি ভেড়া।

এই উৎকট দৃশ্যের পর নবকিশোর দেখলেন—

ঘরের এক কোণে বাতি জ্বলিতেছে, মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া তিনি দেখিলেন, আশ্চর্য, বিছানা খালি, পাশে তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী অরুন্ধতী নাই, ঘরের দরজা শা-শা খোলা, হু হু করিয়া শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার চোখের পাতা আর ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া আসিল, তিনি খাট হইতে নামিয়া দরজার কাছে আসিলেন, আস্তে ডাকিলেন—'বৌ'?

এই গভীর রাতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎ নবকিশোরের চোখে পড়লো—

'ছেলে সুরেন্দ্রকিশোরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, আর সেখানে কোন মেয়েলী-স্বরে কথাবার্তায় আওয়াজ শোনা যায়। ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হইলেন, বুক তাঁহার দুরুদুরু কাঁপিতেছে। ঘরের ভিতর কথাবার্তার শব্দ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল, আর কোন সন্দেহ রহিল না, তবু একবার উঁকি মারিয়া যা দেখিলেন, তাতে রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, হাত-পা কাঁপিতে লাগিল,—পীরপুরের চৌধুরী-পরিবারের ভাগ্যে আজ এ কী অভিশাপ, হায়, আজ এ কী দুরপনেয় কলঙ্কের ইতিহাস তাহাকেই বিশেষ করিয়া দেখিতে হইল। তাহার তৃতীয়-পক্ষের স্ত্রী সুন্দরী অরুন্ধতীর সঙ্গে এক বিছানায় শুইয়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া প্রেমালাপ করিতেছে তাঁহারই একমাত্র ছেলে সুরেন্দ্রকিশোর'!

এই গল্পে আর একটি দৃশ্য আছে শঙ্কর ভুঁইমালী ও তার স্ত্রী সুকুমারীকে নিয়ে—।

সুকুমারী বটগাছের গোড়ায় মাথা কুটছে আর চিৎকার করছে। তার এ কান্না অন্নবস্ত্রের অভাব ও ক্ষুধায় নয়। এখানে রয়েছে স্বামীর যৌনতৃষ্ণা পূরণ করতে পারেনি বলে তার চরম অনুশোচনা। শঙ্কর ভুঁই মৃত্যুবরণ করছে। মৃত্যুর পূর্বে সে চেয়েছিলো সুকুমারীর দেহ। সুকুমারী রাজি হয়নি কারণ শঙ্করের তখন প্রচণ্ড জ্বর ছিলো। মৃত্যুপথ যাত্রী শঙ্করকে দেহ দিয়ে তার শেষ কামনা পূরণ করতে পারেনি বলে এখন তার অনুশোচনাও কান্নার শেষ নেই—

সেদিন সে গিয়াছিল মাধবদির হাটে। সন্ধ্যার কিছু পরে হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল, বলিল, 'বৌ, একটা কাঁথা দে, জ্বর আইল বুঝি?

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'আবার কী সর্বনাশ অইছে কে জানে।' তোলা একখানা কাঁথা বাহির করিয়া সে শঙ্করের উত্তপ্ত শরীরে তাড়াতাড়ি বিছাইয়া দিল। হাত দিয়া কপাল পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'ওগো মাগো, গাও যে পুইড়া গেল!।'

www.amarboi.com ~

জ্বরের ঘোরেও শঙ্করের দুষ্টুমি বুদ্ধি যায় না। তাহার হাতখানা সরাইয়া সে বলিল, 'এমনে জ্বর দেখে না।'

'কেমনে?' সুকুমারী তাহার কপালে নিজের গাল রাখিয়া বলিল, 'এমনে?'

শঙ্কর তাহার গরম ঠোঁট দুটি সুকুমারীর ঠাণ্ডা গালে জড়িত-স্বরে বলিল 'হু।'

সুকুমারী হাসিয়া ফেলিল, তাহার গালে মৃদু একটা চড় মারিয়া বলিল, 'এই বঝি জ্বরের রুগীর মতন কথা?'

তারপর জ্বর আরও বাড়িয়া চলিল। সেদিনের রাত্রিটা মোটমুটি ভালোই গিয়েছিল। সুকুমারীকে বেশী জাগিতে হয় নাই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও ভালোই গেল। চারদিনের দিন বিছানা হইতে উঠিয়া শঙ্কর বলিল, 'বৌ, তাড়াতাড়ি ভাত বসাইয়া দে, আমি আজই ভাত খামু। শঙ্কর সত্যই স্নান করিতে চলিল। ব্যাপার দেখিয়া সুকুমারীর দুই চক্ষু স্থির। সে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'এমুন করলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরুম। তাড়াতাড়ি যাও, শুইয়া থাক গিয়া, জ্বর অহনও ছাড়ে নাই।'

শঙ্করের স্বভাবটা চিরকালই এমনি। কেবল সুকুমারীর আশ্রয়েই সে যেন মানুষের মতো চলিতে ফিরিতে পারে, নইলে কোথায় ভাসিয়া যাইত কে জানে।

মারা যাওয়ার আগের দিন এক কাণ্ড ঘটিল। রাত্রি তখন অনেক। শঙ্কর হঠাৎ চোখ মেলিয়া ডাকিল,

'বৌ?'

সুকুমারী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলিল, 'কও?'

শঙ্কর আবার ডাকিল, 'বৌ?'

সুকুমারী বলিল, 'কী? কও না গো?'

শঙ্কর তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া বলিল, 'উ।'

সুকুমারী তবু বুঝিতে পারে না, সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, 'কী অইছে গো?'

তবু তাহার কোলের ভিতর মুখ গুঁজিয়া শঙ্কর গোঙাইতে থাকে, বিড় বিড় করিয়া এক মনে কী বলে।

কী একটা কথা মনে হওয়ায় সুকুমারী হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তাহার মুখটি বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল,—'ছিঃ, এমুন পোলাপানের মতন করে না। তোমার যে জ্বর গো!'

শঙ্কর বলিল, 'না, জ্বর না, আমার জ্বর না।'

—'তুমি একটা পাগল। গাও পুইড়া যায় জ্বরে, তবু—',

সুকুমারী কী করিবে ভাবিয়া পায় না, তাহাকে আরও জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের কাছে নিজের মুখটি লইয়া সে বলিল, 'খালি চুমা দেও।'

কিন্তু শঙ্কর তাহার মুখ ফিরাইয়া লইল, একেবারে পাশ ফিরিয়া শুইল।

এবং পরদিনই সে মারা গেল।

সুকুমারী ইহার পর আর কী করিতে পারে? ঘরের এককোণে মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া রহিল, কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ-মুখ তাহার ফুলিয়া গেল, কেবলই মনে হইতে লাগিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও!২০০www.amarboi.com ~

মৃত্যুর আগে শঙ্কর কী একটা জিনিস তাহার কাছে চাহিয়াছিল। অথচ সে দেয় নাই, হায়, সে কেন রাজী হয় নাই? এমন কঠিন কিছু নয়তো যে কিছুতেই দেওয়া চলে না, হায়, কেন রাজী হয় নাই সে! কাঁদিতে কাঁদিতে সুকুমারীর যে দমবন্ধ হইয়া আসে আর ভাবিতে পারে না সে।

ইহার পর হইতেই তাহাকে অনেক নির্জন সন্ধ্যায় অথবা গভীর রাত্রে সেই দেবাংশী বটগাছের নীচে মাথা কুটিয়া কাঁদিতে দেখা যায়। এমন শাদা কাপড় পরা একটা মূর্তিকে হঠাৎ দেখিলে মনে প্রথমে ভয়ই জাগে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেই ভুল ভাঙ্গে। একটা চাপা কান্নার শব্দ কানে আসিতে থাকে এবং তখন মনে হয় ঐ শাদা কাপড়-পরা মেয়েটি শঙ্করের সদ্য-বিধবা স্ত্রী সুকুমারী ছাড়া আর কেহ নয়'।

অন্য একটি দৃশ্য আমরা পাই অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন গল্পে। অন্ধ শ্রীবিলাসের স্ত্রী বিন্দু। অভাব, দুঃখ, যন্ত্রণা আর ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষতবিক্ষত এই পরিবার। বিন্দু পার্শ্ববর্তী ধনীদের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে। পরিবারটি একমাত্র তার উপার্জনেই চলে।

সেদিন বিন্দু একটু আগেই বাড়ি চলে এলো। শ্রীবিলাস অন্ধ হলেও স্ত্রীর ওপর প্রভুত্বের প্রভাব খাটাতে চায়। বার বার পেটের ক্ষুধার সাথে প্রতিযোগিতা করে যৌনক্ষুধা প্রাবল্যই জয়ী হয়। যৌন যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে ওঠে। সে রাতে শ্রীবিলাস ও বিন্দুর মধ্যে উচ্চারিত সংলাপ—

কিন্তু, বৌ, আজ তুমি সকালে এসেছ বলে মনে হয়। বিন্দু বললে, হুঁ। ছুটি দিয়ে দিলে। ওদের বাড়ীতে আজ মেয়েরা নাচবে গাইবে। তারপর মেয়ে-পুরুষে মিলে থিয়েটার করবে গো—কিন্তু আমি তাতে কি কাজে লাগবো বলো? তাই চলে এলাম।

—তা নাচ-গান দেখে এলে না কেন?

বিন্দু মুচ্‌কি হেসে বললে, যাবে?

—কি বলো? এখন? এত রাতে?

—এত রাতেই তো এলাম। তাছাড়া আমার ওসব লোকের ভয় নেই।

খেয়ে-দেয়ে শ্রীবিলাস বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বললে, নেই কেন?

বিন্দুর গরমটা সত্যি একটু বেশী, সে বাইরে গিয়ে বসলো।

একটু ঝিরঝিরে বাতাস বাইরে পাওয়া যায় বটে। কিছু দূরেই একটি মাধবীলতার গাছ আছে, তাতে অজস্র ফুল, তা থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছে মাঝে মাঝে বাতাসের সঙ্গে ভেসে।

বিন্দু বললে, কারণ আমি জানি, আমি সত্যি, ওরা মিথ্যে। ওরা ভীতু।

—তবে কাকে ভয় করো শুনি?

বিন্দু বললে, তোমাকে।

শ্রীবিলাস শুয়েছিল, উঠে পড়লো, ধীরে ধীরে বাইরে এসে বললে, আমাকে কেন?

বিন্দু ফিক্ করে হেসে বললে, ভয় করবো না তো কি? এই দ্যাখো, ছেঁড়া কাপড়, তালি দিয়ে সেলাই করে কোনরকমে পরি। কিছুতেই আর সংসার চালাতে পারি না। এইতো আজ অর্ধেক মাস মাত্র গেছে, আমার কাছে মোটে একটি টাকা। ঘরে শুয়ে আছে

www.amarboi.com ~

তিন ছেলে-মেয়ে। ওরা বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু ওগো, তোমার চোখে কি ঘুম নেই? তোমার চোখের আগুন নেবাও, আমি তো আর পারিনে।

—আমি এখন শোবো না।

—শোবে না?

—না, আমার শুতে ইচ্ছে করছে না।

শ্রীবিলাস কাতরস্বরে বললে, দ্যাখো, আমি অন্ধ মানুষ, কত দুঃখ। তার ওপর আমাকে আরও কষ্ট দিয়ে লাভ কি? বিন্দু, ও বিন্দু—

—না, না, আমাকে আর ডেকো না। এই বয়সে আর অত সোহাগের ডাক ভালো লাগে না। একটা রাতও...

—অত অহঙ্কার ভালো নয়।

—আরে, এতে অহঙ্কারের কি হলো?

শ্রীবিলাস শক্ত গলায় বললে, তুই কি সারারাত ওখানেই দাঁড়িয়ে কাটাবি?

বিন্দু চুপ করে রইলো।

—আমি চোখে দেখতে পাই না ব'লে মজা পেয়েছিস্ বুঝি? খুব মজা না, খুব মজা?

কাছেই ছিল লাঠি, শ্রীবিলাস ভয়ানক রেগে সেটা ছুঁড়ে মারলো আন্দাজে।

বিন্দু এবার হেসে উঠলো। লাঠিটা গায়ে লাগেনি। সে তা উঠিয়ে রেখে দিলে ঘরের এককোণে।

শ্রীবিলাস উঠে দাঁড়ালো, কাঁপতে কাঁপতে বিন্দুকে ধরবার জন্য রুখে এলো, কিন্তু বিন্দু নিঃশব্দে সরে এসেছে আর এক দিকে।

একটা পুরনো বাক্সের সাথে শ্রীবিলাস খেলো ধাক্কা, আছাড় খেয়ে পড়লো, তারপর, আশ্চর্য—কেঁদে উঠলো ডাক ছেড়ে, আমাকে মেরে ফেল্‌লে রে, ওই রাক্ষুসি আমাকে মেরে ফেল্‌লে রে।

আশপাশে অনেক লোকজন, তারা শুনতে পেলে কি মনে করবে, হয়তো ভিড় জমবে এসে এই রাতে, বিন্দু ভয় পেয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি শ্রীবিলাসের কাছে এলো, হাঁটু গেড়ে বসলো, তার হাত ধরে বললে, চুপ চুপ; কেন এমন করছো? এই দ্যাখো, আমি একটুও ভয় পাই না তোমাকে।

শ্রীবিলাসের চেঁচামেচি এক মুহূর্তে গেল থেমে, ব্যথা গেল উড়ে।

বিন্দু দরজা বন্ধ করলো।

আবার ভোরও হলো, কেউ না উঠতেই শ্রীবিলাসও উঠলো, আকাশে না-দেখা সূর্যকে প্রণামও করলো, পরলোক-বিষয়ক একটি গানও ধরলো'।

বনস্পতি গল্পে সোমেন অর্জুন ও চম্পকের প্রেমের চিত্র তুলে ধরেছেন—। অর্জুন দেশকে স্বাধীন করার জন্য নবাব সিরাজদৌল্লার পক্ষে ইংরেজকে বিতাড়িত করতে পলাশীর যুদ্ধে যোগদান করছে। প্রিয় সান্নিধ্য কামনায় অস্থির হয়ে ওঠে চম্পক। সোমেন এখানে কাম-কাতর চম্পকের অবদমিত কামনা-বাসনার চিত্র নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন—। চম্পকের প্রার্থনায় ফুটে ওঠে তার দৈহিক চাহিদা পূরণের দুরন্ত ইচ্ছে—

'এই গাছের নীচে একটি মেয়ে এসে দাঁড়ায়—তাহার চুল এলোমেলো—চোখ দুটি কাহার প্রতীক্ষায় আকুল। সে চম্পক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২০২www.amarboi.com ~

চম্পক মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া সেই দেবাংশী গাছের উদ্দেশ্যে অনেক প্রার্থনা জানায়। বিড় বিড় করিয়া করিয়া বলে জয়ের মালা পরিয়া তাহার অর্জুন যেন শীগগীরই ফিরিয়া আসে। সে আবার ফিরিয়া আসে, সে আবার তাহাকে বরণ করিয়া লইবে। তাহার বুকের ছায়ায় সেই বীরকে আশ্রয় দিবে। চম্পকের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। স্তনের ভিতরও কেমন একটা যন্ত্রণা, দুই হাতে তাহার স্তন চাপিয়া ধরিল'।

'পথবতী' গল্পে সুব্রত ও মালতীর হৃদয়ঘটিত উষ্ণ আবহ পাঠককে বিমুগ্ধ করে।—

বই পড়তে পড়তে সুব্রত এর ঘুমোবার অভ্যাস। বই নেই তাই সুব্রত-এর প্রস্তাব।

'বই যখন নেই তখন তুমি একটু গল্প করবে।

মালতী বললে, 'আচ্ছা'।

সুব্রত তার হাত ধরলো—এবং দু'জনে এক সাথে ঘরে ঢুকলো।

সুব্রত তার হাতের দিকে চেয়ে রইলো। সুন্দর, নিটোল, ফর্সা, অনেকগুলো চুড়িতে ভর্তি; আঙুলগুলো সরু, শীর্ণ—কথার সঙ্গে সঙ্গে এঁকে-বেঁকে নড়ছে।

সে বললো 'ভাবী সুন্দরতো! দেখি তোমার হাতখানা।

মালতীর চোখে বিস্ময় নেমে এলো। ধীরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষণেক পরে সে অনুভব করলো :

একটি আলোর রেখা যেন তার হাতের লোমকূপ দিয়ে প্রবেশ করে শরীরের অণু-পরমাণুতে উচ্ছ্বসিত হয়ে জড়িয়ে পড়েছে।

এখন বোধ হয় শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রীকে আক্রমণ করেছে, নইলে শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয় কেন? সে স্তব্ধ হয়ে তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো'।

'রাত্রিশেষ' গল্পে ললিতা ও চিত্তের হৃদয় উন্মোচনের খুবই নরম, স্নিগ্ধ চাঁদের আলো পরশের মতো দৃশ্য আছে—

'ললিতা তাহার দিকে কতোক্ষণ চাহিয়া কী মনে করিয়া আঙ্গিনায় গেল, কাহাকে যেন খুঁজিল, তারপর বাঁশের খুঁটি চাপিয়া নিঃশব্দে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। এখন মাথার উপরে চাঁদ, জ্যোৎস্নায় ফুট ফুট করে উঠানটি, গাছের নীচে সেই ভাঙ্গা নরম আলো। পৃথিবী ভরিয়া রূপের প্রবাহ বহিয়া গেছে, সেদিকে চাহিয়া চক্ষু বুজিয়া আসে, বুকে নিঃশ্বাস ভরিয়া উঠে

কিন্তু বাহিরের পৃথিবীর তুলনায় মনের কোনো শূন্য, কেবল শূন্য। সেই মরুভূমিতে কাহার হাতের স্পর্শ, ঐ জ্যোৎস্নার মত নরম, বুলাইয়া গেছে। কিন্তু কি জানি কেন বিশ্বাস করতি ইচ্ছা হয়। যেন চিত্তর সেই আগ্রহের মূলে শ্মশানবাসী খেয়ালই বেশী।

পেছনের দরজার চৌকাট ধরিয়া রতন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ললিতা দেখে নাই। টের পাইলে সে হয়তো ভীষণ চমকিয়া উঠিত।

.....কেন গো অসময়ে খুঁটি ধরিয়া চিত্ত বলিল 'তেষ্টা পেয়েছে'।

বিস্ময়ে ললিতার চোখ বড় হইল। বাড়ীতে জল নাই? আচ্ছা এ কী রকম তেষ্টা?

www.amarboi.com ~

সোমেনের গল্পে নিসর্গ

মার্কসবাদীরা বিপ্লব ও সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্যকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তা'ছাড়া আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, মার্কসীয় সাহিত্য মানেই নির্মম বাস্তবতা ও যান্ত্রিকতা নয়— তবে এ বিষয়টি প্রসঙ্গে অনেকেই অপব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, এখানে প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই, হৃদয়ানুভূতি নেই—এবং এমন কি নিসর্গও নেই।

আমরা বার বারই স্মরণে রাখবো 'সাহিত্য রচনার পথেও বিপ্লবের কাজ হয়'। তবে এ সাহিত্য ভাববাদী সাহিত্য নয়। ভাববাদী সাহিত্য মাদকাসক্তির চেয়েও মারাত্মক নেশা জাগিয়ে দেয়—মানুষকে বাস্তবতা হতে, মাটি হতে এবং জীবন থেকে বিচ্যুত করে কল্পনার আকাশে বেলুনের মতো উড়িয়ে দেয়। মানুষ এখন কল্পনার রঙিন জগতে উড়তে উড়তে পৃথিবীর কথা, বেঁচে থাকার কথা ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামের কথা ভুলে যায়, জীবন বিমুখ হয়ে পড়ে আর শেষ পর্যন্ত এ সুযোগটাই গ্রহণ করে শাসক, শোষক ও পুঁজিবাদীরা।

আমরা অবশ্যি ফুল ফল পাখি, প্রকৃতি, নদী, মেঘ ও আকাশ এবং চাদনী রাত, প্রেম ও ভালোবাসা নিয়ে লিখবো--কিন্তু ক্ষুধার রাজ্যে পূর্ণিমার চাঁদ যখন ঝলসানো রুটি', জননী মাগিছে ভিক্ষা ঘরে ঢেকে রেখে ছেলের লাশ, ডাস্টবিনে মানুষে কুকুরে উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে কড়াকড়ি করে তখন শুধু ফুল, চাঁদ ও প্রেমের বন্ধনায় মানুষের মুক্তি আসবে না এবং সমাজ পরিবর্তনও হবে না। সেখানে চাই অধিকার আদায়ের সংগ্রামী চেতনা ও আন্দোলন।

সোমেন চন্দ প্রসঙ্গে আলোচনায় সতীশ পাকড়াশী লিখেছেন—

'সোমেনের বন্ধুরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নারী জীবনের মাধুর্য এবং অজানার সুন্দর পরিকল্পনা দিয়ে কবিতা ও সাহিত্য রচনা করতো—পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখত'।

একদল লেখকের ধারণা ছিলো যে, সাহিত্যে রাজনীতি থাকবে না এবং সাহিত্যের কোন উদ্দেশ্যও থাকবে না। কিন্তু রাজনীতিকে বাদ না দিয়েও যে সাহিত্য হতে পারে সোমেন চন্দ এবং প্রগতির লেখকেরা তাই প্রমাণ করলো।

সোমেন চন্দের গল্প ও উপন্যাস আলোচনা করলেই দেখা যাবে এখানে প্রেম ও প্রকৃতি আছে—আবার রাজনীতি, বিপ্লব এবং সমাজ পরিবর্তনের কথাও আছে—।

সোমেনের গল্পে ও উপন্যাসে মানুষের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার সাথে প্রেম ও প্রকৃতি এক হয়ে গেছে—। প্রকৃতি হয়ে গেছে মানব জীবনের অনুষঙ্গ।

আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, সোমেন যদিও মার্কসবাদী কিন্তু তার গল্প ও উপন্যাসে যান্ত্রিকতা নেই। সমাজ পরিবর্তনের কথা, অধিকার আদায়ের কথা এবং শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ আছে এর সাথে সাথে নিসর্গ ঐশ্বর্য এবং প্রেম ও ভালোবাসাও আছে। সোমেনের গল্প থেকে এমন কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করছি—

'রাত্রিশেষ' গল্পের প্রথমেই আছে—

'গাছপালার পাশে তির্যক ছায়া, তার ফাঁকে ভাঙ্গা মিষ্টিবোদ'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!২০৪www.amarboi.com ~

গল্পের এক প্রধান চরিত্র রতনের মানসিক ভাবান্তরের পর সোমেন বর্ণনা করেছেন— 'কতক্ষণ পরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। আকাশে ধূসরতা, ছায়ার সঙ্গে বাতাস মিলিয়া যেন ভারী হইয়া গেছে। বনপথ স্তব্ধ'।

এই গল্পের অন্য একটি প্রধান চরিত্র চিত্ত—এবং প্রধান নারীচরিত্র ললিতার সাথে চিত্তের হৃদয় বিনিময়ের কোঁড়ক বিছানো সুখ। সোমেনের বর্ণনায়—

'চিত্ত আনমনে ধীরে ধীরে হাঁটিতেছিল। পথের পাশে সরকার বাড়ির খোলা পুকুর, জলে ভরা।

হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল এক কলসী জলকাঁখে ললিতার মতোই কে যেন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেছে। চিত্ত আর একটু কাছে গিয়া ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিল, হাঁ সে-ই। বুকটা তাহার কেমন করিয়া যেন উঠিল। চিত্ত যে পথের উপর দাঁড়াইয়াছে, ললিতাকে সেখান দিয়াই যাইতে হবে। সে ধীরে ধীরে আসিয়া কাছ দিয়াই যাইতেছিল, চিত্ত বলিল এই সন্ধ্যাবেলায় জল নিচ্ছ যে?

ললিতা নীরবে একটু হাসিল। ভারী সুন্দর, চোখ দুটি ছোট ছোট হইয়া আসে। লালাভ গালে টোল পড়ে, চামড়ার টানে চিবুকটি সরল হইয়া যায়। চিত্ত বলিল, বারে বোবা নাকি।

—নাগো না, বোবা কেন হতে যাব? ললিতা হাসিয়া অগ্রসর হইল। দেখা যায়, সচকিত কতটুকু ফর্সা নগ্ন-পা, মাথা ভরা চুল, চলমান, জলভারে বাঁকা দেহলতা। ছায়ার স্নিগ্ধতা ঘিরিয়া রহিয়াছে। চিত্ত সেখানে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পথের বাঁকে অদৃশ্য হইবার আগে ললিতা আর একবার ফিরিয়া চাহিয়াছে। চিত্ত ললিতার অন্য একটি চিত্ত উন্মোচনের চিত্র এখানে উপস্থাপন করছি—

বাইরে গেলে অত বড় ঘোমটা দাও কেন?

.....খুব বঝি রূপ না? খুব সুন্দরী?

ললিতা মুচকি হাসিয়া বলিল, হাঁ খুব সুন্দরী। পুকুরে জল আনতে গিয়ে জলে যখন ছায়া পড়ে, প্রথমে ভয়ানক কাঁপতে থাকে, ছায়াগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তারপরে একটু পরে ভাঙ্গা ছায়া জোড়া লাগে, আশ্চর্য হয়ে দেখি, সে কী অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে কলসী কাঁখে করে দাঁড়িয়ে আছে, আমার দিকে চেয়ে হাসছে। জলকে নেড়ে দিতে ভয় করে। তাহলে ঢেউ হবে আর মেয়েটি হারিয়ে যাবে। আমার জলভরা আর হয় না। শেওলা ভরা সিঁড়ির উপর বসে পড়ি। আর চেয়ে থাকি—।

সোমেনের এ সমস্ত বর্ণনা কবিত্বময় এবং পরিমিত ও সংযমিত, অন্য একটি বর্ণনা পাই—

রাত্রি দশটা হইবে। আজ এতক্ষণে মাত্র চাঁদ উঠিয়াছে। বননী কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। পায়ে হাঁটা শাদা পথ টুকলো জ্যোৎস্নালোকিত শুকনো বালুচরে নিঃশ্বাস না ফেলিয়া ঘুমাইতেছে। এর পরের বর্ণনায় পাই—

ললিতা....বাঁশের খুঁটি চাপিয়া নিঃশব্দে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। এখন মাথার উপরে চাঁদ, জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছে করে উঠোনটি, গাছের নীচে সেই ভাঙ্গা নরম আলো। পৃথিবী ভরিয়া রূপের প্রবাহ বহিয়া গেছে সেদিকে চাহিয়া চক্ষু বুজিয়া আসে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বুকে নিঃশ্বাস ভরিয়া উঠে। কিন্তু বাহিরের পৃথিবী পৃথিবীর তুলনায় মনের কোণ শূন্য, কেবল শূন্য। সেই মরুভূমিতে কাহার হাতের স্পর্শ ঐ জ্যোৎস্নার মত নরম, বুলাইয়া গেছে। কিন্তু কি জানি কেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, যেন চিত্তর সেই আগ্রহের মূলে শ্মশানবাসী খেয়ালই বেশি।

চিত্ত পান চাইলে ললিতা পান দিলো—। ললিতা একটি গানের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে চিত্ত বললো—

অর্থটা হচ্ছে— তোমারই দেওয়া পানে রাঙিয়া ঠোঁট ছাপ একে দেবো তোমার শাদা ঠোঁটে।.....

এরপর..... পুকুরে ছায়া নেমেছে—জলের রং হয়ে গেছে কালো, বাতাস হয়েছে স্থির।

একদিন চিত্ত বড়শি কেনেছে। নিস্তব্ধ জলের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে—এমন সময়—আকাশে এক টুকরো মেঘ নাই। বাতাস ও নাই, পুকুরের চারিদিকে গাছের পাতা নড়ে না। ওদিকে তালগাছটায় বসিয়া কয়েকটা শকুন বোধ হয় ডানা নাড়িতেছে, তাহারই শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসে।

দিকচক্ররেখা, চিত্ত যে জায়গায় বসিয়া আছে সেখান হইতে দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যায় পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ, দীর্ঘ, সোজা উজ্জ্বল আলোর সমষ্টি।

এরই মানে ললিতা ও চিত্তের হৃদয় হৃদয় বিনিময় হয়ে গেছে। এখানে একটা বর্ণনায় চিত্রময়তা এসেছে—

বহিরের অন্ধকার আরও গুরুতর চাপিয়া আসিয়াছে—। একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ। কিছুদূরে কামার বাড়ীর লোহা ঠুকিবার আওয়াজ।

এবার চিত্ত ও ললিতার পালাবার পালা—তখন—বাহিরে ফুট ফুটে জ্যোৎস্না, আলোর স্পর্শে বিবশ পৃথিবী। গাছ-পালা সব যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এদিকে রাত্রি বাড়িয়া চলিয়াছে'।

সোমেন চন্দের গল্পে নিসর্গ ঐশ্বর্য এসেছে প্রাসঙ্গিকতায়। এ কোনো খেয়ালি বশে নয়। আর বর্ণনায় কোথাও পরিমিতিবোধ হারিয়ে যায় নি—। 'স্বপ্ন' গল্প থেকে দু' একটা উদাহরণ উপস্থাপন করছি—।

'কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। চারিদিকে পিটপিটে অন্ধকার। বাতাসের শন্ শন্ শব্দ। দুই পাশে ঝোপ-ঝাড়, গাছপালা, অন্ধকারের সঙ্গে উহাদের পার্থক্য ধরা যায় অল্প'।

ঠিক সাথে সাথেই অন্য একটি বর্ণনায় আছে—

চৈত্রের বাতাস হাহা করে। নারকেল গাছে শিরশির শব্দ। মুঠা মুঠা অন্ধকারের রাশি শঙ্করকে ঘিরিয়া ধরিল।

'একটি রাত' গল্পের একটি ছবি আমরা পাই—

বাইরে কিছু কিছু কুয়াশা পড়েছে। কোন গাছের চারিদিকে একটা মোটা আংটির মতো মনে হয়, বাড়ির সামনের অঙিনায় যে শেফালী গাছটি একটা ছোলা মুরগির মতে আজও বেঁচে আছে। তার অবশিষ্ঠ কয়েকটি ডাল থেকে কিছু ফুল একটি দুটি করে আঙিনায় কর্কশ শরীরে ঝড়ে পড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২০৬ www.amarboi.com ~

সোমেন চন্দের এমন যে 'সংকেত' গল্প, যেখানে কলকারখানা, শ্রমিক, সংগ্রাম, আন্দোলন, মালিক শ্রমিক সংঘাত, সেখানেও আছে প্রেম, আছে প্রকৃতি। আর সোমেনের বর্ণনায় যন্ত্রও যেনো প্রাণ স্পন্দনে সজীব হয়ে ওঠে—। শোষণ নির্যাতন ও শ্রমিকের শ্রমে ঘামে সিক্ত উষ্ণ নিঃশ্বাসের মধ্যেও প্রাণবন্ত হয়ে দেখা দেয় প্রকৃতি। যেমন—

'গোলাম আলীর বাড়ী পার হলেই একটা মস্ত বকুল গাছের নীচ দিয়া হাঁটিতে হয়। সেখানে বকুল ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরিয়া থাকে।

সেই গাছের নীচ দিয়া চলিতে চলিতে রহমানের শরীর অবশ হইয়া আসিল। ঘুমে ভরা চোখ বুঝিয়া আসিল। সে অনুভব করিল এখনও যেন সে কারও ফুলের মতো বুকে মুখ রাখিয়া গভীর নিঃশ্বাস ফেলিতেছে'।

এবার সোমেন রহমানের স্বপ্নেও প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন—

আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাষ, এখন ভয়ানক বাতাস ছাড়িয়াছে। দীর্ঘ সুপারি আর নারিকেল গাছের মাথায় ভীষণ মাতামাতি নদীর জলে দুরন্ত ঢেউ, বড়ো বড়ো ধান গাছের শিষগুলি যন্ত্রণায় কাঁপিতেছে, আকাশে পাখির কলরব।

এরপরের বর্ণনা আরো সুন্দর—

'সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। এখন প্রায় সারাটা আকাশ লাল। নীচে ধ্বংসের উৎসব দেখিয়া রক্তবর্ণ আকাশ যেন রক্ত নেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া বিস্তর অশুভ কামনা করিতেছে'।

'বনস্পতি' গল্পেও মাঝে মাঝে বাংলার প্রকৃতি তার চিরন্তন রূপ নিয়ে মাথা উঁচু করে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা এখানে এমন একটি ছবি তুলে ধরছি—

সেই গ্রামগুলি আর এই হাটের মাঝখানে প্রায় দুই মাইল ব্যাপী একখানা নদী আর সারি সারি অনেকগুলি বিল। বর্ষাকালে এই বিলগুলি আর নদীতে মিলিয়া যে অবস্থা হয়, সেকথা মনে করিতে হইলে, কেবল কোন সমুদ্রের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। ওপারকে মনে হয় কোন রহস্যময়, কুয়াশাচ্ছন্ন পৃথিবী, বিপুল রহস্যের ফেনা সারা গায়ে মাখিয়া এপারের পৃথিবীর সন্তানদের চোখে ধাঁধা লাগাইতেছে। ইহাও মনে হয়, আকাশের সীমারেখায় তাহা কোন ধূসর বর্ণের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের রাশি—অন্যান্য মেঘের মতো যাযাবর নয়। সেই দুই পারের মাঝখানে বিস্তীর্ণ জলরাশি আরও দুর্বোধ্য। সারাক্ষণ কেবল দুই পারের মানুষকে ভীষণ শাসাইতেছে। তারপর বাতাস বহিতে থাকে, বিশাল জলরাশিতে এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত নৌকাগুলি শাদা এবং আরও নানারকমের রঙিন পাল মেলিয়া যেন পাখায় ভর দিয়া উড়িয়া আসিতে থাকে, বটগাছের শত শত ডালের ভিতর রক্তের জোয়ার আসে, কোটি কোটি পাতা মৃদু কাঁপিতে থাকে। তারপর কোন এক সময় হয়তো শীতের আর্বিভাব, মাথার উপরে কাঠফাটা রৌদ্র, সমুদ্রের বুক দেখা যায়—কঠিন, ক্ষত-বিক্ষত কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, সেখানে আগুন জ্বলিতে থাকে, বাতাস ক্ষেপিয়া যায়, আর বটগাছের নীচে অজস্র শুকনো পাতার রাশি।

এ গল্পেই অন্য আর একটি চিত্রময় ছবি পাওয়া যায়—

নদীর মাঠ হইতে কিছু দূরেই সেই বটগাছ। এখন কিছুটা বড় হইয়াছে। পাতাগুলি কঠিন চমৎকার চক্‌চক্ করে। রোদ খুব তীব্র হইয়া উঠিলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছায়া মাটিতে পড়ে।

www.amarboi.com ~

দুই-একটি ডালের ভিতর দিয়া সুতার মতো সরু শিকড় বাহির হইয়াছে।.... চম্পক নদীর পারে আসিয়া দাঁড়ায়, চোখ ছোট করিয়া বহুদূর পর্যন্ত চাহিয়া থাকে। চোখের দৃষ্টি কখনো ভাঙ্গিয়া আসিলেও সে নিজে কখনো ভাঙ্গে না। বর্ষায় ক্ষিপ্ত ঢেউ পায়ের উপর আসিয়া আছাড় খায়—বর্ষা যায় শীত আসে, শীত যায় আবার বর্ষা আসে.....।

সোমেন চন্দের প্রথম গল্প 'শিশুতপন'। গল্পটি প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায়। এ গল্প থেকে দু'একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি—

১. বর্ষাকাল। বিদ্যুৎ চমকাইয়া মেঘ ডাকে। ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি আসে। বিশ্ব প্রকৃতি মুখর হয়। ঘন কালো আকাশের অবিশ্রান্ত বারি পতনের অপরূপ শব্দে।

২. উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে প্রলয় নৃত্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নীচে মাটির বুকে বিয়োগবিধুর এক শিশু চিত্তের বেদনা, মনে করিতেও কষ্ট হয়।

ভালো না লাগার শেষ গল্পটি সার্থক ছোট গল্প কিনে তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু স্নিগ্ধ, নম্র মধুর প্রেমের গল্প। প্রেমও প্রকৃতি এখানে এক হয়ে গেছে— একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

'এখানে এই খোলা মাঠে নরম ঘাসে, গাছের ছায়ায়, আকাশের নিচে বসলে তার চোখে যেমন যেন নেশা লাগে। হাতে দুটি কাকে যেন হাতড়িয়ে। অদিতি সবুজ ঘাসের ওপর পা ফেলতে ফেলতে.....'

এবার বন্যা উপন্যাস হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো। প্রবল বন্যায় সব ডুবে গেছে পা রাখার জায়গা নেই। এ অবস্থায় সোমেন নিসর্গ সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য ভুলে যায় নি—

'জলের আয়নায় সূর্যের ছায়া প্রকাণ্ড বড়ো হইয়া পড়ে। দীর্ঘ সারি সারি তালগাছের ডগায় বাতাসে শো শো শব্দ করে, আকাশে কোন পাখির আর্তনাদ শোনা যায়। রাতের আকাশ আর কথা বলে না। গাছ পালা সব নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে'।

মালতীর মানসিক অবস্থা বর্ণনায় সোমেন খুবই শৈল্পিক সৌকর্যের পরিচয় দিয়েছেন—

এ শুধু বর্ণনা নয় চিত্রময়তা এবং কাব্যসৌন্দর্য ও মনন বিশ্লেষণে নন্দিত হয়ে ওঠেছে—

ওদিকে দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছে মালতী। এমন দৃশ্যের সাথে পরিচয় তার এই প্রথম। সোনার বরণ দেবতা সত্যি দিয়েছে দেখাব জলে বুকে তার ছায়া কাঁপে। ইস্ আজ বাতাস কি দুরন্ত! জলদেবতার স্বর্ণাভ চুল কেমন সুন্দর উড়িতেছে, তাহার পাতলা উত্তরীয় বাতাসে সাথে কেমন নড়ে! কিন্তু মালতীর দুই চোখের পাতা আজ পাথরের মতো স্পন্দনহীন, স্থির চাহিয়া আছে।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে—

ভোরের পৃথিবীতে এতো আলো সে যেনো আবার নতুন করিয়া দেখিল! বন্যার জল রৌদ্রে রঙিন হইয়া উঠিয়া ঝলমল করিতেছে। সে গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিল।

.....

কিছু দূরে জলে-ভরা উঠানে ছিল এক শজনে গাছ, সেটা মরিয়া গিয়াছে। এখন বাঁচিয়া থাকিলে ঝরা ফুল ভাসিত জলে। কিন্তু নাই। সেই গন্ধমদির বাতাসও আর নাই। ফুলের গাছে নমিয়া আসিয়াছে মৃত্যুর শুষ্কতা।

www.amarboi.com ~

রজতের সাথে মালতীর হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে মানসিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া—সোমেন এসব অবস্থাকে প্রকৃতির অনষঙ্গে অভিযুক্ত করেছেন—

'মালতী আবার জলের দিকে চক্ষু ফিরাইল; আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, চাঁদ! এতক্ষণ লুকাইয়া ছিল কোথায়? কোথায় হারাইয়া ছিল পথ?

আজ চাঁদ উঠিয়াছে : বাঁকা ছুরির মত চাঁদ, শীর্ণ নিরাভরণ আলো। মালতী আবার জলের দিকে চাহিয়া দেখিল কোথায় তাহার কম্পমান ছায়া? কোথায় আরশির বুকে রামধনু? কোথায় ভাঙ্গা আলোর ঝিলমিল'?

উপন্যাসের শেষ প্রান্তিকে রয়েছে কাব্যময় একটি বর্ণনা। আতি মরিমিত ও সংযমিত এ বর্ণনা।

পরদিন ভোরে আবার দেখা গেল, নরম রোদে পৃথিবী রঙিন, অবশিষ্ট বন্যার জল ঝল্‌মল্‌ করে। বাতাসে আবার সেই আগের সৌরভ, পাখির ডাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমেন চন্দের উপন্যাস

সোমেন চন্দের ওপর আলোচনায় অনেকেই একটি অভিধায় বৃত্তানুগ যে, তিনি অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, বেঁচে থাকলে ভালো লিখতেন। ভাবটা এইযে, বেশি বয়স হলেই বেশি ভালো লেখা যায়। আমার মনে হয় শিল্পজগতে এ ধরণের মন্তব্য সঙ্গত নয়।

সোমেনের গল্প ও উপন্যাসে গভীর জীবনবোধ, মানবতাবোধ, অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনা, যুদ্ধবিরোধী চেতনা, মেহনতি মানুষের সংগ্রাম ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ পরিবর্তন ও মানব মনের অন্তর্লীন রহস্যের চিত্র উন্মোচনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। একটা বিশেষ আদর্শবোধে নিবেদিত হয়ে ও তিনি শিল্পী সত্তাকে হনন করেন নি। যেমন ইঁদুর গল্প থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

"তাদের মুখ এমন খারাপ, আর ব্যবহার এমন অশ্লীল ছিল যে, আমার ভিতর যে সুপ্ত যৌনবোধ ছিল তা অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে উঠতো, অথচ আমার স্ব-শ্রেণীর সংস্কারে তা মুখে প্রকাশ করতে পারতুম না।"

এই সোমেনকে তখনই বুঝতে আমাদের ভুল হয় না যে, সোমেন অবচেতন মন এবং মানব মনের অন্তর্লোক ও সমাজের তলদেশ সবকিছুই তার অন্তর্লোকের দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করেছেন।

বন্যা সোমেন চন্দের প্রথম এবং একমাত্র উপন্যাস। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের একটি আভাস পাওয়া যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত এর সন্ধান মেলে নি।

"বিপ্লবের জন্য একজন লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হ'তে হবে। গোর্কির কথাই চিন্তা করো। সৌখিন সাহিত্য করার আর সময় নেই।"

সোমেন চন্দের এই আদর্শবোধ তার গল্পে যেমন শিল্পরূপ লাভ করেছে তেমনি তার উপন্যাসেও।

উপন্যাসটি লেখার পূর্বে সোমেন তার বন্ধু নির্মলকুমার ঘোষকে লেখা দুটি চিঠিতেই উপন্যাস প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছেন। শুধু উপন্যাস প্রসঙ্গে নয়, উপন্যাস সাহিত্য ও শিল্প এবং অন্যদের লেখার ওপরও আলোচনা করেছেন। আমি এখানে দু'টি চিঠিই উল্লেখ করছি—

ঢাকা
৪৭ লালমোহন সাহা স্ট্রীট,
পো. উয়ারী।
১৯৩৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি দেখেছি, 'সবুজ বাংলার কথাও' পেয়েছি। ভালো লাগলো, আপনার কথাগুলি চমৎকার-তাতে আপনার এবং পত্রিকার নীতি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে, বিশেষত—'অর্থনৈতিক পীড়নের দুঃসহ ক্লেশ যাদের মনে সৃষ্টি করেছে কোনো প্রচণ্ড ক্ষোভ—যে ক্ষোভ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির লাভা প্রভাবে এক একদিন আত্মপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৩০www.amarboi.com ~

করে—নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অসাম্য ও বঞ্চনার অহমিকা,—যৌবনের পথনির্দেশ তো তারাই দেবে।' আর 'মানুষের সমাজ গড়ে ওঠবার পর থেকে আজ অবধি প্রায় একই নীতি সর্বদেশে অনুসৃত হয়ে এসেছে। এর ফলে সর্বসাধারণের কল্যাণ হয়ে থাকুক আর নাই থাকুক একথা অনস্বীকার্য যে লাভ ও সুবিধার কথা বলতে গেলে আঠারো আনারই মালিকানা জনকয়েক লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে।'—'আজ বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে,—যে বিপ্লব দেবে আমূল সংস্কার।' খুবই ভালো লাগলো, আমি নিজেই অনুভব করছি যেন। আশীর্বাদ করুন, আমার এই বিপ্লবের অনুভূতি আমার সাহিত্য সাধনার সর্বাঙ্গে যেন জড়িয়ে থাকে।

আর এই বিপ্লবের অনুভূতি কেবল আমার নয়, আরও অনেক সাহিত্যসেবকের মনেই জেগেছে মনে হয়, তার মধ্যে হয়তো অনেকেই প্রকাশ করতে পারছে না, বা অনেকের কণ্ঠই ক্ষীণ হয়ে গেছে তথাকথিত সাহিত্য-ডিক্টেটরদের গোলমালে, কিন্তু সেই অনুভূতির অস্তিত্ব আছে অনেকের মনেই—এইসব দেখে মনে হয়, আগামী দশ বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হবে একটা উজ্জ্বল অধ্যায়, একটা বৈপ্লবিক অপূর্ব সৃষ্টি।

আমি একটা উপন্যাস লিখছি এখন, এবং সেটা শেষ হতে বেশী দেরী নেই। এটা শেষ হলে আগামী ক্রীসমাসে কলকাতায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আপনি 'নবশক্তি'র গল্পটার প্রকাশের কথা লিখেছেন—ভালো কথা, ওরা আমাকে পারিশ্রমিক দেয়নি—আপনি ওদের দিয়ে সেটা ছাপিয়ে নেয়ার কথা লিখেছেন। কিন্তু আমার নিজের সেই গল্পটা পছন্দ হয় না, বিশেষত প্রথম দিকের ডায়লগগুলো কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে, অবশ্যি তা বদলানো যেতে পারে—কিন্তু আসল কথা, আমার যা নীতি, তা প্রকাশ পায়নি সেই গল্পে—কাজেই প্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় না। তবে কেটে-ছেঁটে আরও ছোট করে অন্যান্য গল্পের সাথে প্রকাশ করা যেতে পারে। 'নবশক্তি'তে এর আগে আমার আর একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে, 'মুখোস' নামে।

কিন্তু শীঘ্রই সেই উপন্যাস, যেটা এখন লিখছি, সেটা ছাড়াও ছোটগল্পের বই বের করবার ইচ্ছা আমার ভয়ানক এবং সেইজন্য বিশেষ নির্বাচিত রচনাও আছে আমার হাতে কিন্তু এই ব্যাপারে যে আর্থিক আনুকূল্যের দরকার—আপনার কাছে বলতে বাধা নেই—তা আমার সম্প্রতি মোটেই নেই। লেখককে নিজে খরচ না করে বই প্রকাশ করবার উপায় যদি থাকে—যেমন ধরুন, চুক্তি করে পাবলিশার্সরাও সে ভার নেয়—আপনার কাছে সে-বিষয়ে আমি পরামর্শ চাই। এ সম্বন্ধে আমার মোটেই অভিজ্ঞতা নেই, আপনার আছে। তবে আন্দাজ করতে পারি, আমি যে-উপায়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম, তা হয়তো আমার মতো অখ্যাতনামা লেখকের বেলায় সম্ভব হয় না। তারা তো 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' পছন্দ করে আগে। 'অগ্রগতি'তেও এমন প্রচুর লিখিনি যাতে ওরা প্রকাশ করতে পারে। তাছাড়াও আপনিও সেখানে নেই। প্রকাশিতের মধ্যে মাত্র চারটি গল্প বইয়ের জন্য নির্বাচিত হতে পারে : অন্ধ শ্রীবিলাস, অমিল, মুখোস, দুই পরিচ্ছেদ (পরিবর্তিত হয়ে)—আর কয়েকটি আমার হাতে। কিন্তু আবার, আমার যেভাবে প্রকাশের ইচ্ছা তাতে আমার নিজে না ছাপালে চলে না। গল্পগুলো অধিকাংশই বিদ্রূপাত্মক—আমার ইচ্ছা, প্রত্যেক গল্পের সঙ্গে ছবি দেয়া। এ বিষয়ে সবচেয়ে পছন্দ হয় শৈল চক্রবর্তী। Bernerd

www.amarboi.com ~

Shaw-এর Short Stories Scraps and Shavings নিশ্চয় দেখেছেন, তাতে John Farleigh-র আঁকা কী চমৎকার Wood Engravings! কাজেই এরকম সম্ভব করতে আমার দুরাশা আছে। তবে চেষ্টা করবো শেষ পর্যন্ত, তাতে যদি পুস্তক প্রকাশের দেরিও হয়, তা-ও হোক। এ সম্বন্ধে আমি সবসময় কেবল আপনার পরামর্শের কথাই ভাবি। কারণ, আমার উপলব্ধি অনুভূতি, আর আমি নিজে, এই ঢাকা শহরে একা। অমৃত খুবই সরল, আর যাকে বলে খুবই Sincere, যাকে একবার ভালো চোখে দেখলো, বা ভালোবাসলো বা শ্রদ্ধা করলো, তার জন্য এমন কি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে যেন, তার হয়ে মানুষের সঙ্গে মারামারি করতে পারে। এইতো, আপনি বলতে সে অজ্ঞান, বঙ্কিমঘটিত ব্যাপারের সময় লোকের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে যা তর্ক করেছে, তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়, একজন কাউকে চোখে পর্যন্ত না দেখে কেউ যে তার সম্বন্ধে এতো জাগ্রত হতে পারে, তা বিশ্বাস করা যায় না সহজে। আর কেবল আপনিই না, বলেছি তো যাকে একবার ভালোবাসলো বা শ্রদ্ধা করলো তো, তাইতেই। এই আমার জন্যেও মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করে আসতে পারে। এটা সরলতা; যে এটা বুঝলো, সেই তার সঙ্গে চলতে পারলো। কিন্তু বিপদ এই, মতের দৃঢ়তা নেই, যেকোনো লোকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে। তাই মাঝে মাঝে একা মনে হয়, আমার উপলব্ধির পেছনে কোন অনুপ্রেরণা না পেয়ে মাঝে মাঝে অবসাদ আসে। অবশ্য 'সবুজ বাংলার কথা'য় তা পেলাম।

আমার বইয়ের দাম হবে যথাসম্ভব কম—সর্বসাধারণের সুবিধার জন্যে, যাতে আমার মতো লোকও পড়তে পারে। এতে আপনি হাসবেন জানি—কিন্তু এ বিষয়ে আমি রোমাঁ রোলাঁর কথা মানি এবং বিশ্বাস করি : 'খাঁটি আর্টের নিবেদন এমন গভীর যে, তা নিম্নতম অধিকারীর হৃদয়েও সাড়া দেয়। প্রমা, শেক্সপীয়রে নাটক—ও জিনিসের বোঝাবার জন্যে বৈদগ্ধ্যের দরকার হতে পারে কিন্তু বোধ করবার পক্ষে প্রকৃতি যা দিয়েছে তাই যথেষ্ট। অবশ্যি, আমার লেখাতে খাঁটি আর্ট বলে যদি কিছু থাকে।—আমার বইয়ের বাইরের বিলাসী চাকচিক্যের চেয়ে নতুনত্ব বেশি হবে, এই ইচ্ছা। বিশ্বাস করবেন না, আমাদের অনেক বাংলা বইয়ের চকচকে প্রচ্ছদপটের চেয়ে Penguim Books-এর অনাড়ম্বর আর uniform প্রচ্ছদপটও আমার ভালো লাগে।

সে যাই হোক, নিজে খরচ দিয়ে প্রকাশ করলে কলকাতার চেয়ে ঢাকায় অনেক সুবিধা—এখানে ছাপিয়ে কলকাতার কোনো পাবলিশার্স দিয়ে পাবলিশ করলেই তো হয়।

ইতিমধ্যে, অর্থাৎ ক্রীসমাসের আগে, ছোটদের একটা ছোট উপন্যাসও লিখবো। আর এই তিনটি জিনিস শেষ করে তারপর কয়েকটি নাটিকা লিখবো—বাংলায় ভালো নাটকের নিতান্তই অভাব।

'সবুজ বাংলার কথা'র গল্পটি যে অবস্থায় বেরিয়েছে, তাই বরং আমার ভালো লাগলো। 'কাব্য—পরিচয়ে' আপনার কবিতা নির্বাচিত হয়েছে একথা অনেক আগেই শুনেছি। খুশি হয়েছি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি কবিতা এবার খুবই ভালো লাগলো—'কবিতা আর 'আনন্দবাজারে'র—পড়তে পড়তে একরকম মুখস্থ হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২১২www.amarboi.com ~

ঢাকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য খবর এই, এখানে এ বৎসর সাহিত্য-আলোচনার একটি Sensation টের পাওয়া যাচ্ছে। একটি দুটি পত্রিকা নয়, এমনও আছে যাদের নাম আপনিও হয়তো শোনেননি, অথচ সারা বছরই চলছে।

এত লম্বা চিঠি পড়ে আপনি বিরক্ত হবেন জানি কিন্তু উপায় নেই, আরও বাকী রইলো। অনেক দরকারি কথা এতদিন জমে ছিল বলেই চিঠি এত বড়ো হয়ে গেল। দু'দুটো চিঠি আপনি এদিকে লিখলেন, অথচ আমার কাছে একটিও নেই। এ দেখে আমাকে আপনি ভুলে যাচ্ছেন মনে হয়।

যতো শীগ্‌গির হয়, এ চিঠির উত্তর দেবেন কিন্তু। আমি ভালো, আপনার শারীরিক কুশল কামনা করি। আমার শ্রদ্ধা আর নমস্কার জানবেন। কপিলবাবুর চিঠি দেখেছি, তাঁকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি। ইতি—

আপনাদের
সোমেন

পুঃ—আপনাকে একটি কথা বলতে ভুলে গেছি, আমার দিনগুলো এখন মনোরম—আর অনেক, আপনাকে বলতে বাধা নেই, অনেক মানসিক (সাংসারিক) বিপর্যয়ের বাধা-বিপত্তি এড়িয়েও এখনকার দিনগুলো কী ভালো লাগে! তার প্রধান কারণ, উপন্যাস লেখার উত্তেজনা। কবে শেষ হবে, সেই চিন্তাই করি।

এখনকার রাতগুলো আমার জীবনের স্মরণীয় হয়ে থাকলো, (আর আপনি তার প্রথম শ্রোতা) উপন্যাস লেখা ব্যর্থই হোক আর অব্যর্থই হোক—মাঝে মাঝে একেকটি রাত কখন যে শেষ হয়ে যায়, টেরও পাইনে। অমৃতের কাছে এসব জানাই নে, কারণ সে ক্ষেপিয়ে মারবে।

দ্বিতীয় চিঠিতেও বন্যা উপন্যাসের কথা বলেছেন এবং বইটি প্রকাশের বিষয়েও অনেক বাস্তব কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

৪৭, লালমোহন সাহা স্ট্রীট,
পোঃ উয়ারী, ঢাকা।
৯ই নভেম্বর, বুধবার

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ক্রীসমাসে আমার কলকাতায় আসবার ইচ্ছা আছে, আপনাকে তা বলেছি। তখন লিখিত উপন্যাসখানা নিয়ে আসবো, সেটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উপন্যাসখানা গ্রাম এবং শহর, দু'য়ে মিশিয়ে লেখা। তবে বেশীর ভাগই গ্রাম। আপনি অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন : গ্রাম্য অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর—এমনকি, যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতোগুলো Sweet উপন্যাস রচনা করেছেন বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমি, কিন্তু এতদিন সেসব সম্বন্ধে কিছু লিখিনি এই ভেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

যে, ওসব পুরনো হয়ে গেছে, এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। কিন্তু বছরখানেক সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কোন পথই খুঁজে পেতাম না, এখন কতকটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে, সেটা আমার বর্তমান উপন্যাসে ফলবে। নিজের ওপর নির্ভরতায় এবং নিজেরই বিচারশক্তিতে আমার মনে হয়, বইটি প্রকাশিত হলে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনি 'বিত্তহীন মধ্যবিত্ত'দের নিয়ে লিখতে বলেছেন, এদের ছাড়া আমি আর কাউকে নিয়ে লিখবো না জানবেন (তবে এঁদেরই কথা বলবার সুবিধের জন্যে ধনীদের সাহায্য নিতে পারি, সেটা লিখবার পদ্ধতি), আমার বর্তমান উপন্যাস তাঁদেরই নিয়ে। তবে আমার নায়ককে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখেছি, সে কী এবং কে, এ পর্যন্ত জানতে দিইনি, সর্বশেষ কী হবে এখনও বলতে পারিনে। প্লটটি অল্পেতে বলি শুনুন : একটি বন্যাপীড়িত গ্রাম, সেখানে কোনো এক বিত্তহীন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে মালতী—ঘরে অন্নের চিন্তা কিন্তু ভয়ানক স্বপ্নবিলাসী, তার বারান্দার নীচে জল দেখে তার আনন্দ হয়, বন্যার সেই নতুন জলে পা ডুবিয়ে সেই জলেই নিজের চেহারা দেখতে তার সুখ; অথচ পেছনে ছোট ভাই-বোন, মা-বাপ, ঠাকুরমা মিলে এক মস্ত সংসার—চেঁচামেচি, দু'হাত মেলে খাবার ভিক্ষার কান্না—এর মধ্যেও আমার এই মেয়ে নিশ্চিন্তে স্বপ্ন দেখে। ইতিমধ্যে গ্রামে ফ্লাড রিলিফ কমিটি বসেছে, শুধু চাল দেয়া এদের রীতি, অর্থ নয়, সেখানকারই রজত নামে এক ছেলে এই সূত্রেই মালতীদের সাথে পরিচিত হলো, মালতীর স্বপ্ন দেখায় সে আঘাত করলো, তার স্বপ্ন সে ভেঙে দিলো। এখানে রজতের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সে আমার উপন্যাসের নায়ক—ইচ্ছা করেই আমি তাকে (শুধু তাকেই) অস্বাভাবিক করেছি, তার কারণ, যা আমি বলতে চাই নইলে তা আর বলা হয় না। একটা নতুন বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি শুধু এরই ওপর বেশি ছায়াপাত করেছে, ইংরেজিতে যাকে adventurer বলে, কতকটা সেই জাতীয় চরিত্র, প্রথম থেকে শেষ অবধি সে সকলের কাছে অজ্ঞাত অথচ সকলের সাথেই ঘনিষ্ঠতার অন্ত নেই। রজতের ideology প্রচার করতে গিয়ে অনেকখানেই আমাকে চেপে যেতে হয়েছে, পুরোপুরি খোলা হতে পারিনি; এইখানেই একটা কথা আমার বার বার মনে হয়েছে, সেটা এই, দেশে যদি চারপাশে এমনি নাগপাশের বাঁধন না থাকতো, অর্থাৎ দেশে যদি ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট থাকতো তবে আমাদের বিশেষভাবে উপন্যাস সাহিত্যের গতি এই যে রুদ্ধ হয়ে এসেছে, তার বাঁধন খুলতো। বৃহত্তর চিন্তা আমরা কি কম করি, মার্কস-হেগেল-কোল-স্ট্রাচি-শ' কি অনেকেরই কণ্ঠস্থ নয়? কিন্তু আমাদের এই দারিদ্র্যপীড়িত, দুঃখক্লিষ্ট জীবনে বৃহত্তর চিন্তাকে মিশ খাইয়ে একটু আশার বাণী শোনায় কে? ক্যাপিটালিজম আর ইম্পিরিয়ালিজম-এ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, প্রথমটির বিরুদ্ধে কোন লেখকের অভিযান করতে হলে, দ্বিতীয়টির [বিরুদ্ধেও] করতে হয়; সুতরাং বই প্রকাশিত হবার পরদিনই বন্ধ। তখন কী আশা, স্পর্ধা, সাহস আর পুঁজি নিয়ে গরিব লেখক আর একখানা উপন্যাসের সূচনা করবে? জমিদারদের তো অনেকেই গাল দিলো (শুধু গাল-ই, উপায় বের করলে না কেউ); কিন্তু মূলে কী, তা কি কেউ জানে না? জানলেও জানাবার সাহস তাদের কোথায়?— এই বয়সে আমার যতখানি intellectual অনুভূতি-অভিজ্ঞতা আছে, তার সবখানি আমি নায়ক রজতকে ঢেলে দিয়েছি, কতদূর সফল হলাম কে জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আপনি বলেন, আমিও বলি,—স্বীকার করি, শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের যা গুণ তার সবই আছে তাঁর মধ্যে— বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি, অভিনব চরিত্র সৃষ্টি, অপূর্ব অভিজ্ঞতার উপলব্ধি, সবই আছে, কিন্তু পড়াশুনা কম বলে মনে হয়। কল্পনা করা যায়, এই প্রতিভার সঙ্গে বিস্তর পড়াশুনার যোগ থাকলে আরও কতো বড়ো সাহিত্যই না আমরা পেতাম।

তারপর প্লটের কথা বলেছিলাম—রজত মালতীর স্বপ্ন ভেঙে দিলো। তার মনে সে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিলো। বেশি বেগ পেতে হলো না, কারণ উপকরণ সামনেই আছে, মালতীর হাতের কাছেই সব দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সরলভাবে বুঝিয়ে দিলো। তারপর সে চলে এলো। আর এক গ্রাম; এখানকার যিনি জমিদার, তিনি থাকেন শহরে, একজন উচ্চ এডুকেশনাল অফিসার, বছরে একবার দেশে আসেন, সেবা'রও এসেছেন, সঙ্গে দুটি শিক্ষিত মেয়ে আর স্ত্রী। রজত তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হলো। এখনও পরিচয়ের বাঁধুনি দৃঢ় হচ্ছে, বাকী আছে কেবল শেষটুকু। উপন্যাসখানা বইয়ের আকারে তিনশো পৃষ্ঠা সম্ভবত হবে।

সেদিন বার্নার্ড শ'র *Intelligent Woman's Guide to Socialism* বই খানা কিনেছি, এখন সময় মতো পড়ছি। সন্তোষ সেন নামক ভদ্রলোকের কথা বলেছিলেন, অমৃতর সাথে দুইদিন তাঁর বাসায় গিয়েছি, পাইনি। আর একদিন যাবো। আসলে, অমৃত সারাদিনে সেই সন্ধ্যেবেলা একটু সময় পায়, তখনই শুধু সেই ভদ্রলোকের কাছে যাওয়া যায় কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় কখনও কাউকে বাসায় পাওয়া যায় নাকি? আপনি বইয়ের কথা লিখেছেন কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানটুকু পেতে হলে প্রথমই যে কারুর সাহায্য ছাড়া আমি একটা সেই বই পড়ে বুঝতে পারবো, মনে হয় না। দুরূহ বিষয় শুনেছি। সে যা হোক, আমি চেষ্টা করবো।

গৌরপ্রিয় দাশগুপ্ত আপনার কাছে চিঠি লিখেছিলেন দেখতে পাচ্ছি। ওঁর সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আছে, একজন সাহিত্য-সেবক। এক 'নটরাজ' পত্রিকার সম্পাদক ছাড়া অন্যভাবেও হয়তো আপনি ওঁকে চিনতে পারবেন : ওরিয়েন্টাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ঢাকার ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার বি. ভি. দাশগুপ্ত ওঁর বাবা। আমি ভালোই আছি। আশা করি আপনি ভালো আছেন। আমার নমস্কার জানবেন।

আশা করি ক্রীসমাসে আপনার সাথে দেখা হবে। কলকাতা থাকতেই আমার একান্ত ইচ্ছা; কলকাতা সম্বন্ধে একখানা বিশদ উপন্যাস লিখবার ইচ্ছা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখেছি। এখানে মোটেই ভালো লাগছে না। কিরণশঙ্করের কবিতার বই শীগ্‌গিরই বেরুচ্ছে; এবারে ঢাকা হলের বার্ষিকী বাসন্তিকা তাঁরই সম্পাদনায় বের হবে। ইতি—

আপনাদের
সোমেন

সতেরো বছর বয়সের সময় সোমেন চন্দ 'বন্যা' উপন্যাস রচনা করেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সাথে সাথেই পাঠক ও সমালোচক মহলে দারুণ উৎসাহ, আগ্রহ ও আলোড়ন সৃষ্টি

www.amarboi.com ~

করে। প্রতিরোধ পত্রিকার (জৈষ্ঠ, ১৩৫০, সোমেন স্মৃতি সংখ্যা) অচ্যুত গোস্বামী 'বন্যা' উপন্যাসের ওপর একটি আলোচনা লেখেন। আলোচনাটি এখানে উপস্থাপিত হলো—

সতেরো বছর বয়সে শরৎচন্দ্র প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন। পাছে পাঠকেরা ঘটনাটিকে লঘু করে দেখে এই ভয়ে বিভিন্ন জীবনীকার কথাটার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তার দরকারও ছিল। এত অল্প বয়সে প্রতিভার স্ফুরণ হওয়াটা অন্তত অসাধারণ বলেও তো উল্লেখযোগ্য।

'বন্যা' উপন্যাসখানা পড়তে পড়তেও এই কারণেই না ভেবে পারছিলাম না যে, এটা সোমেনের সতেরো বছর বয়সের সময়ে লেখা। সতেরো বছর বয়সের ছেলের পক্ষে আইন অমান্য করে জেলে যাওয়াটা খুব সোজা, ছোটখাটো মোটামুটি ভাল গল্প বা কবিতা লেখার কথা ভাবা যায়। কিন্তু উপন্যাস? অবিশ্যি কোন বিখ্যাত লেখকের বিখ্যাত উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে লিখিত লেখাকে যদি স্বীকার করা যায় তো সেই অবধিও হয়তো কোন বিচক্ষণতা সতেরো বছর বয়সের ছেলের থেকে আশা করা যায়। 'বন্যা' কিন্তু ছায়া অবলম্বনে রচিত উপন্যাস নয়। শুধু তাই নয়। তাছাড়াও 'বন্যা' এমন কিছু যা পড়তে গেলে সতেরো বছরের শরৎচন্দ্র যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন, আর একবার সেই বিস্ময়ের মুখোমুখি হোতে হয়। 'বন্যা' পড়ে আমি যে বিস্মিত হয়েছি একথাটা যদি এই ছোট আলোচনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি তো তাতেই মনে করব আমার উদ্যম সার্থক।

'বন্যা' রচনার সময় হল ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৮। 'বন্যা'-র বিশেষত্বটা ভালো করে বুঝতে গেলে বন্যা রচনাকালের বিশেষত্বটা জানা থাকা দরকার। এক কথায় পরিচয় দিতে গেলে বলা চলে এটা হচ্ছে প্রশ্নবোধক চিহ্নের সময়। কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। ১৯৩০ এবং '৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার পর সারা দেশ কিছুদিনের জন্য গভীর হতাশায় এবং প্রতিক্রিয়ায় ডুবে গেল। অনেকে ভাবল, রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে আমাদের কোন লাভ হবে না, সেটা শূন্যে সৌধ নির্মাণের মতই নিরর্থক। অনেকে এমনও ভাবল, রাজনৈতিক আন্দোলন মনে ছিল কতগুলো মতিচ্ছন্ন নেতার প্ররোচনায় কতগুলো সম্ভাবনাপূর্ণ (অর্থাৎ চাকরী পাওয়ার উপযুক্ত) ছেলের বারোটা বেজে যাওয়া বা অর্থনৈতিক উপযোগিতা নষ্ট হওয়া। এই নিদারুণ হতাশা-নিরাশার স্তর কিন্তু এক সময়ে শেষ হয়ে আসে। দেশের লোক ভাবতে শুরু করে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করা সত্ত্বেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি ঠিকই, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি বলেই আমাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল যে সমস্যাগুলোর সমাধান করা, সেগুলো সমাধানের পথে না গিয়ে আরও জটিলতর হয়ে উঠছে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ধরেছে নতুন পথ, অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বিধান হয়ে উঠেছে অসম্ভব। কাজেই হতাশ হয়ে বসে না থেকে সমাধানের কথা আমাদের ভাবতে হয় এবং সেই প্রসঙ্গেই এই চিন্তাটা আসে, গত আন্দোলনে আমরা বিফল হলাম কেন? অতীতকে বিশ্লেষণ করা, তার ভিতর দিয়ে অতীতের ভুল-ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করা,—এই মানসিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয় তখন। হতাশা-নিরাশা কাটিয়ে উঠে মানুষ প্রশ্ন করতে শুরু করে, এবং উত্তর খুঁজে বেড়ায়। সেই সময়টা ১৯৩৭-৩৮ সাল, সেই সময় লেখা হয়েছিল 'বন্যা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!www.amarboi.com ~

রাজনীতি ক্ষেত্রে যদিও এই সময় এসেছে নতুন চিন্তাধারা, নতুনভাবে ভাবনা-চিন্তা শুরু করে আবার রাজনৈতিক অচল-অবস্থা দূর করার প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাওয়ার ক্রমবর্ধমান সদিচ্ছা, সাহিত্যক্ষেত্রে তখনো কিন্তু এ নবজীবনের স্ফুরণের চেষ্টা মাত্রও নেই। ৩২-এর পর কিছুদিন ধরে পূর্ণোদ্যমে রাজনীতি বিমুখ ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস চলেছে, কিন্তু সুস্থ প্রাণাবেগের অভাবে সেই আন্দোলনও অতি অল্পেই এসেছে ঝিমিয়ে। ফলে বাংলা সাহিত্যে তখন ধূসর অনুর্বরতা। অবিশ্যি সর্ব-ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠা এবং সেই সংঘে সাহিত্যের মোড় ফেরানোর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলছে। কিন্তু তার প্রকাশ ছিল না সৃজনী সাহিত্যের মধ্যে।

সাহিত্যের এই অচলাবস্থার মধ্যে সতেরো বছরের সোমেন যে উপন্যাস লিখেছেন তার আখ্যানভাগটা সংক্ষেপে আগে বলেনি। বন্যাবিধ্বস্ত এক গ্রামে বন্যা-ত্রাণ সমিতির একদলের সঙ্গে এসেছিল রজত। সেবাকার্যের ভিতর দিয়ে একসময় তার গ্রামের সুন্দরী চপল মেয়ে মালতীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আলাপ ব্যাপৃত হয়ে শেষে মালতীদের সারা পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। মালতীর বাপ, মা, দিদিমা একরকম ধরেই নিলেন তাঁদের মেয়ের বিয়ের সমস্যাটা একরকম ঘুচল। মালতীর কিশোরী মনও খুব বেশী রকমই ঝুঁকে পড়ল রজতের দিকে। এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও রজতের মন কিন্তু এদের ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে ছিল। সে মালতীর বাবা প্রিয়নাথকে বোঝাতে চাইল, গরিবের উপর ধনীদের অত্যাচার চলে কিভাবে; মালতীকে বোঝাতে চেষ্টা করল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে ভারতবর্ষের উপর আপন শোষণ যন্ত্র অব্যাহত রাখছে, আর কিভাবেই বা ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা এই কুটিল সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। মালতীকে রজতের ভালো লেগেছিল; কিন্তু মালতীর চেয়ে তার কাছে অনেক প্রিয়তর ছিল তার বিরাট দেশপ্রেমের আদর্শ। সেই আদর্শের টানে একদিন সে মালতীকে চোখের জলে ভাসিয়ে বিদায় নিল। এরপর অবিশ্যি ঘটনাস্রোত এগিয়ে গেছে 'বন্যা'-র দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড এখন কোথায় আছে কে জানে?

১৯৩৭-৩৮-এ যাঁরা খ্যাতিমান লেখক ছিলেন, এই অখ্যাতবস্তুর মত চিন্তাধারা তখন তাঁদের চেতনার বাইরে ছিল। রাজনীতিকে বাদ না দিয়েও যে সাহিত্য হতে পারে একথা দু'-একজন মাত্র অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলতে শুরু করেছেন, কিন্তু এইসব আলোচনাকারীদের অস্বীকার করেই চলছিলেন সাহিত্য-রথীরা। এর মধ্যেই 'বন্যা'-র শক্তিশালী লেখক প্রমাণ করলেন কী করে বন্যার অবস্থার অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও নিজস্ব ছন্দে চিত্রিত হয়ে ওঠে, এবং সেই ছন্দের মধ্যে স্পষ্টতম সুর হয়ে দেখা দেয় পরাধীন মানব মনের স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। '৩৮ সালে যদি 'বন্যা' ভালোভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেত, তবে এই বছরের সবচেয়ে প্রগতিশীল লেখা বলে সেটা পরিচিত হতে পারত অনায়াসে।

'বন্যা'-র দোষত্রুটি কথা গোপন করব না। সতেরো বছরের ছেলে বাংলা ভাষার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব আয়ত্ত করতে না পারার ফলে যদি ভাষার সামান্য দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে তো সেটা একরকম উল্লেখ করাই চলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আর এ-ও ঠিক, অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ, রঙিনতাপ্রিয় সোমেন তার আখ্যানবস্তুর বিভিন্ন অংশগুলোর গাঁথুনি কীভাবে পোক্ত করতে হবে তা জানত না। ঘটনার অগোছালো ভাবটা সক্ষম শিল্পীর স্বেচ্ছাকৃত সৌন্দর্য সৃষ্টির নতুন ধরন নয়, সেটা নতুন লেখকের রাশ টানার অক্ষমতা। তবু আবার এই সঙ্গেই বলতে হয় কিশোর লেখকের রোমান্স সৃষ্টির মধ্যে বস্তুর প্রাচুর্য এবং মনস্তত্ত্বের মাধুর্যের চমৎকার সমন্বয় হয়েছে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক শিল্পী মানব-মনের স্থূল বৈশিষ্ট্যগুলো ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করে তুলির কয়েকটা আঁচড়েই তা ফুটিয়ে তুলতে পারছেন। মানব-মনের সূক্ষ্মতর রাজ্যেও তাঁর খোঁজারু চোখ দুঃসাহস ভরে ঢুকে পড়ার চেষ্টার ত্রুটি করছে না। শক্তিশালী লেখকের সাহস একটু বেশীই হয়।

চিন্তাধারার মধ্যে অবিশ্যি স্পষ্টতা আসেনি। তখনকার রাজনৈতিক চিন্তাধারা যতখানি এগিয়ে গেছে, সোমেন সে তুলনায় পশ্চাৎবর্তী। সে ধনিকের শোষণের কথাও বলেছে, সাম্রাজ্যবাদের শোষণের কথাও বলেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কথাও বলতে পারে নি, স্বাধীনতার রূপ এবং পথের ইংগিতও দিতে পারেনি। কিন্তু যদি ভেবে দেখা যায়, এরও পরে অনেক পরিণত এবং অভিজ্ঞ লেখক তারাশঙ্কর তাঁর অনেক বেশী শক্তিশালী টেকনিক এবং ভাষার সাহায্যে যে 'কালিন্দী' লিখেছিলেন, তার মধ্যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদ এবং সাম্যবাদের কেমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিলো, তাহলে সোমেনের এই চিন্তাগত দুর্বলতা সাধারণ বলেই মনে হবে।

মোটের উপর, কল্পনা করুন, সতেরো বছর বয়সের সোমেন তার সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও গড়ে তুলেছে এমন এক উপন্যাস যার মধ্যে সে সমসাময়িক অচলাবস্থাকেও কাটিয়ে উঠে, সমস্ত গতানুগতিক ঐতিহ্যকে সবলে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে বলিষ্ঠ কল্পনাধর্মী প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে রূপ দিয়েছিল। আশ্চর্য বলে মনে হয় না কি? সতেরো বছর বয়সে যুগের পথ-প্রদর্শক হিসাবে এগিয়ে আসা, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রগতির দীপ শলাকা জ্বালিয়ে ধরা?

আমার কাছে কিন্তু এই ঘটনাটি খুব আশ্চর্যজনক বলে বোধ হয়েছে'।

সোমেন চন্দের সমস্ত লেখা এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা হয় নি—বিভিন্ন পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সমস্ত পত্রিকায় এখনো অনুসন্ধান করলে তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা লেখা উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

তার প্রথম গল্প 'শিশু তপন' দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও বহু পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। যেমন— মাসিক শান্তি, নবশক্তি, বলাকা, প্রভাতী, অগ্রগতি, সবুজ বাংলার কথা, বালিগঞ্জ প্রভৃতি। তার মৃত্যুর পর 'পরিচয়' পত্রিকায় ইঁদুর, অরণিতে দাঙ্গা, প্রতিরোধে 'সংকেত' প্রকাশিত হয়।

সোমেনের চিঠি এবং তার বন্ধু ও বিভিন্ন তথ্যের বরাতে আমরা জানি যে, সোমেন উপন্যাস লিখেছেন দুটি। বন্যার সন্ধান পেলেও অন্য উপন্যাসটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। অন্য উপন্যাসটি প্রসঙ্গে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন—

তার মাত্র পাঁচ বছরের সাহিত্য জীবনের (১৯৩৭-১৯৪১) সময় সীমায় তিনি লিখেছিলেন দুটি উপন্যাস এবং বেশ কিছু গল্প। প্রথম উপন্যাসটি ছাপা হয়েছিলো সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' পত্রিকায় ১৩৩৮ এর শারদীয় সংখ্যায়। সোমেন একবারেই তরুণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২১৮www.amarboi.com ~

নবশক্তি সম্পাদক অদ্বৈত মল্লবর্মন, যার 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের নাট্য রূপ একালে অনেকেই দেখেছেন। তরুণ সোমেনের সাহিত্য সম্ভাবনাকে চিনতে ভুল করেননি বলেই সাগ্রহে উপন্যাসটি ছেপেছিলেন কিন্তু উপন্যাসটি পত্রিকার পাতা থেকে উদ্ধার করা যায়নি এবং নামটাও জানা যায়নি। (আগুনের অক্ষর পৃ: ৯২)

'বন্যা' উপন্যাস প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

'উপন্যাসখানা গ্রাম এবং শহর, দু'য়ে মিশিয়ে লেখা। তবে বেশিরভাগই গ্রাম। আপনি অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন : গ্রাম্য অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর—এমনকি, যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতোগুলো Sweet উপন্যাস রচনা করেছেন বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমি, কিন্তু এতদিন সেসব সম্বন্ধে কিছু লিখিনি এই ভেবে যে, ওসব পুরনো হয়ে গেছে, এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। কিন্তু বছরখানেক সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কোন পথই খুঁজে পেতাম না, এখন কতকটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে, সেটা আমার বর্তমান উপন্যাসে ফলবে। নিজের ওপর নির্ভরতায় এবং নিজেরই বিচারশক্তিতে আমার মনে হয়, বইটি প্রকাশিত হলে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনি 'বিত্তহীন মধ্যবিত্ত'দের নিয়ে লিখতে বলেছেন, এদের ছাড়া আমি আর কাউকে নিয়ে লিখবো না জানবেন (তবে এঁদেরই কথা বলবার সুবিধের জন্যে ধনীদের সাহায্য নিতে পারি, সেটা লিখবার পদ্ধতি), আমার বর্তমান উপন্যাস তাঁদেরই নিয়ে। তবে আমার নায়ককে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখেছি, সে কী এবং কে, এ পর্যন্ত জানতে দিইনি, সর্বশেষ কী হবে এখনও বলতে পারিনে'।

বাংলাদেশে কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের বার বারই প্রতিশ্রুতিভঙ্গে পালা, বীররসের অঙ্গীকারে অশ্রুজলে ভাসিয়ে দেয়া, দানবের সাথে সংগ্রামের জন্য হুঙ্কার দিয়ে নিজেই দানব হয়ে যাওয়া, কেউটে হয়ে ফণাধরে মাথা তুলে আবার ডুরা হয়ে বিবরে প্রবেশ করে আবার হিমালয়ের মতো শির উন্নত করে প্রিয়ার পদতলে মাথা নত করার উদাহরণের অভাব নেই।

সোমেন অঙ্গীকারবদ্ধ শিল্পী। দায়বদ্ধতার ভার মাথায় নিয়েই তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন। এবং জোসেফ ম্যাটসিনির উক্তি বারবারই স্মরণ করেছেন— Whenever you see any corruption by your side and don't strive against it you must their by betray your society. সাহিত্য চর্চায়, পার্টির কর্মতৎপরতায় এবং প্রগতিশীল আন্দোলন ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে কখনো কখনো দেশ, মানুষ কয়েকটি দিন মাত্র আমাদের আয়ু এই দিনগুলো নীচ দুর্বৃত্তদের পায়ের তলায় গুড়ি মেরে কাটানোর জন্য নয়। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বুকের রক্ত দিয়ে সোমেন তার অঙ্গীকার পালন করেছেন এবং দায়বদ্ধতার ভার বহন করে গেছেন। কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি। এক্ষেত্রে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে সোমেন অনন্য ও মৌলিক শিল্পী। স্পর্ধাবান, ব্যক্তিত্ববান ও শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে কথা বলার শিল্পী।

বন্য উপন্যাসটি আলোচনা প্রসঙ্গে এর প্লট নিয়ে আমাদের যা কিছু বলা প্রয়োজন তা সোমেন নিজেই বলেছেন—

প্লটটি অল্পতে বলি শুনুন : একটি বন্যাপীড়িত গ্রাম, সেখানে কোনো এক বিত্তহীন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, মালতী—ঘরে অন্নের চিন্তা কিন্তু ভয়ানক স্বপ্নবিলাসী, তার

www.amarboi.com ~

বারান্দার নীচে জল দেখে তার আনন্দ হয়, বন্যার সেই নতুন জলে পা ডুবিয়ে সেই জলেই নিজের চেহারা দেখতে তার সুখ; অথচ পেছনে ছোট ভাই-বোন, মা-বাপ, ঠাকুরমা মিলে এক মস্ত সংসার—চেঁচামেচি, দু'হাত মেলে খাবার ভিক্ষার কান্না—এর মধ্যেও আমার এই মেয়ে নিশ্চিন্তে স্বপ্ন দেখে। ইতিমধ্যে গ্রামে ফ্লাড রিলিফ কমিটি বসেছে, শুধু চাল দেয়া এদের রীতি, অর্থ নয়, সেখানকারই রজত নামে এক ছেলে এই সূত্রেই মালতীদের সাথে পরিচিত হলো, মালতীর স্বপ্ন দেখায় সে আঘাত করলো, তার স্বপ্ন সে ভেঙে দিলো।

তারপর প্লটের কথা বলেছিলাম—রজত মালতীর স্বপ্ন ভেঙেগ দিলো। তার মনে সে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিলো। বেশি বেগ পেতে হলো না, কারণ উপকরণ সামনেই আছে, মালতীর হাতের কাছেই সব দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সরলভাবে বুঝিয়ে দিলো। তারপর সে চলে এলো। আর এক গ্রাম ; এখানকার যিনি জমিদার, তিনি থাকেন শহরে, একজন উচ্চ এডুকেশনাল অফিসার, বছরে একবার দেশে আসেন, সেবা'রও এসেছেন, সঙ্গে দুটি শিক্ষিত মেয়ে আর স্ত্রী। রজত তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হলো। এখনও পরিচয়ের বাঁধুনি দৃঢ় হচ্ছে, বাকী কেবল শেষটুকু।

এবার সোমেনের আদর্শবোধের কথা আলোচনা করা যাক—। সোমেন সচেতন লেখক—। সচেতন লেখক বলেই দেশ, সমাজ ও মানুষকে উপেক্ষা করে কিছুই বলতে পারে না। তার গল্পে, উপন্যাসে, কবিতা ও নাটকে তিনি এই আদর্শিক চেতনার উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছেন—। যেমন উপন্যাসের নায়ক রজত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সোমেন তার আদর্শ ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন—

এখানে রজতের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সে আমার উপন্যাসের নায়ক—ইচ্ছা করেই আমি তাকে (শুধু তাকেই) অস্বাভাবিক করেছি, তার কারণ, যা আমি বলতে চাই নইলে তা আর বলা হয় না। একটা নতুন বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি শুধু এরই ওপর বেশি ছায়াপত করেছে, ইংরেজিতে যাকে adventurer বলে, কতকটা সেই জাতীয় চরিত্র, প্রথম থেকে শেষ অবধি সে সকলের কাছে অজ্ঞাত অথচ সকলের সাথেই ঘনিষ্ঠতার অন্ত নেই। রজতের ideology প্রচার করতে গিয়ে অনেকখানেই আমাকে চেপে যেতে হয়েছে, পুরোপুরি খোলা হতে পারিনি; এইখানেই একটা কথা আমার বার বার মনে হয়েছে, সেটা এই, দেশে যদি চারপাশে এমনি নাগপাশের বাঁধন না থাকতো, অর্থাৎ দেশে যদি ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট থাকতো তবে আমাদের বিশেষভাবে উপন্যাস সাহিত্যের গতি এই যে রুদ্ধ হয়ে এসেছে, তার বাঁধন খুলতো। বৃহত্তর চিন্তা আমরা কি কম করি, মার্কস-হেগেল-কোল-স্ট্রাচি-শ' কি অনেকেরই কণ্ঠস্থ নয়? কিন্তু আমাদের এই দারিদ্র্যপীড়িত, দুঃখক্লিষ্ট জীবনে বৃহত্তর চিন্তাকে মিশ খাইয়ে একটু আশার বাণী শোনায় কে? ক্যাপিটালিজম আর ইম্পিরিয়ালিজম-এ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, প্রথমটির বিরুদ্ধে কোন লেখকের অভিযান করতে হলে, দ্বিতীয়টির [বিরুদ্ধেও] করতে হয়; সুতরাং বই প্রকাশিত হবার পরদিনই বন্ধ। তখন কী আশা, স্পর্ধা, সাহস আর পুঁজি নিয়ে গরিব লেখক আর একখানা উপন্যাসের সূচনা করবে? জমিদারদের তো অনেকেই গাল দিলো (শুধু গাল-ই, উপায় বের করলে না কেউ); কিন্তু মূলে কী, তা কি কেউ জানে না? জানলেও জানাবার সাহস

www.amarboi.com ~

তাদের কোথায়?— এই বয়সে আমার যতখানি intellectual অনুভূতি-অভিজ্ঞতা আছে, তার সবখানি আমি নায়ক রজতকে ঢেলে দিয়েছি, কতদূর সফল হলাম কে জানে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আপনি বলেন, আমিও বলি,—স্বীকার করি, শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের যা গুণ তার সবই আছে তাঁর মধ্যে— বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি, অভিনব চরিত্র সৃষ্টি, অপূর্ব অভিজ্ঞতার উপলব্ধি, সবই আছে, কিন্তু পড়াশুনা কম বলে মনে হয়। কল্পনা করা যায়, এই প্রতিভার সঙ্গে বিস্তর পড়াশুনার যোগ থাকলে আরও কতো বড়ো সাহিত্যই না আমরা পেতাম।

আগেই আলোচনা করেছি—সোমেন তার গল্প ও উপন্যাসের চরিত্রে মানুষের জীবনকে, মানুষের ভেতরের শক্তিকে মানবতাকে খুড়ে খুড়ে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। দেখতে চেয়েছে সংগ্রামে বিপ্লবে, আন্দোলনে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা ও প্রত্যয়কে।

একজন শ্রেষ্ঠ লেখকের বড়ো গুণ হচ্ছে মানুষের ভেতরের মানবতা ও মনুষ্যত্বকে আবিষ্কার করা। যেমন মিল্টনের স্যাটান যখন বলে—

It is better to reign in hell
Than serve in Heaven.

তখন স্যাটান আর বাইলের ঘৃণিত স্যাটান থাকে না। সফোক্লিস ইদিপাসের মনুষ্যত্বকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলেই ইদিপাসের প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে শ্রদ্ধা হয়। মধুসূদন রাবণকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন বলেই রাবণ আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, শেকসপিয়র নিষ্ঠুর শাইকের মধ্যেও আবিষ্কার করেছেন ভেতরের চাপা পড়া মানুষটিকে আর রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির ভেতরের মানুষটি উদ্ধার করতে পেরেছেন বলেই শেষপর্যন্ত দেবীকে গোমতির জলে ট্যানে-হ্যাচড়ে বিসর্জন দিয়ে বলেছে—

'গেল এবার পাপ গেল'।

সোমেন চন্দ তাই করেছেন। সোমেন রাজনীতির কথা, সংগ্রামের কথা, মার্কসিজমের কথা, বিপ্লবের কথা, আন্দোলনের কথা, সমাজ পরিবর্তনের কথা বললেও এবং রাজনীতির আদর্শ সামনে রেখেও কোনো টাইপ চরিত্র বা যন্ত্র নির্মাণ করেননি— মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই অচ্যুত গোস্বামী বলেছেন—

'চারদিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে কিশোর লেখকের রোমান্স সৃষ্টির মধ্যে বস্তুর প্রাচুর্য এবং মনস্তত্বের চমৎকার সমন্বয় হয়েছে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক শিল্পী মানবমনের স্থূল বৈশিষ্ট্যগুলো ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করে তুলির কয়েকটা আঁচড়েই তা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। মানব মনের সূক্ষ্মতার রাজ্যেও তার সন্ধানী চোখ দুঃসাহসভরে ঢুকে পড়ার চেষ্টার ত্রুটি করছে না। শক্তিশালী লেখকের সাহস একটু বেশিই হয়'।

প্রথমে সোমেনের লেখায় আবেগ, উচ্ছ্বাস ও কল্পনাপ্রবণতা লক্ষণীয়। তবে মানবিকতাবোধ ও জীবনবোধ এবং মানুষের প্রতি দরদবোধ ছিলো না একথা বলা যায় না। তবে সোমেন সতীশ পাকড়াশী, অচ্যুত গোস্বামী ও রণেশদাশ গুপ্ত প্রমুখ মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে এসে প্রগতিবাদী জীবনবাদী ও মেহনতি মানুষকে নিয়ে সাহিত্য

www.amarboi.com ~

রচনা করতে গিয়ে তার জীবন দৃষ্টি পাল্টিয়ে যায়। এবং বন্যা উপন্যাস থেকেই তার এই জীবন দৃষ্টির সন্ধান এবং বৃত্ত ভাঙ্গার পালা বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে অচ্যুত গোস্বামীর মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়—

....'বন্যা'র শক্তিশালী লেখক প্রমাণ করলেন—কী ক'রে বন্যার অবস্থায় অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও জীবন নিজস্ব ছন্দে চিত্রিত হয়ে ওঠে, এবং সেই ছন্দের মধ্যে স্পষ্টতম সুর হয়ে দ্যাখা দ্যায় পরাধীন মানব-মনের স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। '৩৮ সালে যদি 'বন্যা' ভালোভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেতো, তবে এই বছরের সবচেয়ে প্রগতিশীল লেখা ব'লে সেটা পরিচিত হ'তে পারতো অনায়াসে।

[প্রতিরোধ, সোমেন স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ]

সোমেন চন্দের বর্ণনা নিখুঁত, এ নিপুণ শিল্পীর বর্ণনা। বন্যা উপন্যাসে ক্যাম্পে অবস্থানকালীন একটি বর্ণনায় আছে—

ক্যাম্পে সেই গভীর রাতে রজতকে ফিরিতে দেখিলে যে কেউ বিস্ময়ে হতবাক না হইয়া পারিবে না।

সব জায়গায় জল নয়, এমনও জায়গা আছে যেগুলো এখনও সগৌরবে জাগিয়া আছে। কিন্তু ঘরের একদিকে জল ফেলিলে যেমন অন্য দিকে পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা কম, তেমনি এই প্লাবিত মাটির দেহেও; জলে, জঙ্গলে, শুকনো মাটিতে একটা অভিশপ্ত অপরিচ্ছন্নতার ছাপ।

রজত হাঁটুতে কাপড় উঠাইয়া নীচের দিকে চাহিয়া হাঁটিতেছিল। এখানে অন্ধকারের গাঢ়তা কম। দু'পাশে ঝোপই বেশির ভাগ, বড়ো গাছ যা আছে তার মধ্যে আম-কাঁঠালের সংখ্যাই বেশী।

কাঁচা মাটির পথে দু'দিকে গরুর গাড়ির চাকার দাগ, শহরের খোলা ড্রেনের মতো তাছাড়া তার ভিতর হাঁটু পরিমাণ কাদা, একবার অন্ধকারে ভুল করিয়া পা ফেলিলে অনেক দুষ্কৃতির ফল পোহাইতে হইবে, নিজের উপর রাগ হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

সবাধানে হাঁটিতে লাগিল রজত।

রাত্রির নিস্তব্ধতায় এখন এই বনে একটা না—শোনা সুর তাহার কানে বাজে, নিতান্ত অপরিচিত সুর। ওই গাছগুলোর মাথায় চাঁদের স্পর্শে বাতাসের আন্দোলন—নীচ হইতে তাহার কল্পনা করা যায়। মাটিতেও পড়িয়াছে টুক্‌রা অস্পষ্ট জ্যোৎস্না, পাতার ছায়া। মাঝে মাঝে বাদুড়ের পাখার আওয়াজে খাদ্যাহরণের আনন্দ, অনাত্মীয় দিনমানকে কাটাইয়া রাত্রির পাখাকে ভর করিয়াছে। সামনেই একটা বাঁশঝাড়, তাহার কিচ্ কিচ্ শব্দ বাতাসে ভাসে।

চমকিয়া রজত থামিয়া গেল। কোন কিছুর পিছলাইয়া পড়ার শব্দ। কিন্তু তেমন কিছুই নয়। দেখিতে পাইল, তাড়াতাড়ি পথ কাটিয়া গেল একটা গোসাপ। এই অঞ্চলে এই জিনিসটির অস্তিত্ব একটু বেশী।

কর্দমাক্ত কাঁচা রাস্তায় রজতের পা আর পড়ে না। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, এতক্ষণে ক্যাম্পে পৌঁছিবার কথা, পথ ভুল হয় নাই তো? হয়তো তাই, সে চারিদিকে চাহিয়াও ঠিক করিতে পারিল না, কোথায় সে আসিয়াছে। সেই গরুর গাড়ীর পথ আর অগভীর বন পিছনে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। রজত কী পথ ভুলিয়া গিয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনির্দিষ্টভাবে সে চলিতে লাগিল।

এত রাতে হঠাৎ মানুষের সাড়া পাইয়া রজত ভয়ানক চমকিয়া উঠিল, পাশে চাহিয়া দেখিল, অত্যন্ত নীচু এক মাটির ঘর, সামনে এক ভাঙা দাওয়া, সেখানে মাটিতে দু'হাতে ভর করিয়া বসিয়া আছে একটি মানুষ। কাছেই, আরও বিস্ময়কর ব্যাপার, পা হইতে মাথা পর্যন্ত ছেঁড়া ময়লা কাপড় ঢাকা একটি ছোট ছেলে কী মেয়ে, শিয়রে একটি তুলসী গাছের চারা, আর নির্যাপিত-প্রায় এক তেলের প্রদীপ।

লোকটার মুখে দাড়ি, চোখ দুটি লাল, উরু পর্যন্ত পরনে এক কাপড়। শরীরটা এমন যে, কঙ্কালকেই মনে করাইয়া দেয়। আর সামনে ওই মড়া।

রজতের সমস্ত শরীর হঠাৎ এক ভয়ে কাঁটা দিয়া উঠিল'।

সোমেন চন্দের 'বন্যা' উপন্যাসে রাজনীতি আছে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতা ও রাজনীতি থাকার জন্য সোমেনের গল্প ও উপন্যাস শিল্পের খাতা হতে খারিজ হয়ে যাবে এমন নয়। বিষয়বস্তু যা'ই হোক একে আত্মস্থ করে শিল্পকলার বড়ো নিয়ামক হলো একে শিল্পোত্তীর্ণ, মনোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ করে তোলা—। সাহিত্যের মালমসলা ও উপকরণ সমাজ থেকেই নেয়া হয়—দৈশিক ও কালিক অবস্থানেই এর অবস্থিতি। সামাজিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে কোন শিল্প সাহিত্য হতে পারে না। এ বিষয়ে কার্লমার্কস বলেছেন—My over existance is a social a activity for ilies reason, What I myself produce. I produce for society, and the conciousness of acting as a social beings. সমস্ত শিল্পকর্মই সামাজিক জীবন মানস ও পরিপার্শ্বিকতার ফসল। দেশ, মাটি ও মানুষ এবং সমাজ বিচ্যুত সাহিত্য বলতে কিছু নেই। যদি থাকে বলে ঘোষণা করে তবে তা হবে পরগাছা বা আলোকলতা।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত এজন্যই বলেছেন—

'সাহিত্যের ভাগীরথী মানুষের মৌলিক সুখ-দুঃখের খাত ছাড়া বয়না। এই জন্যে পৃথিবীর যা বড় সাহিত্য মানুষের লৌকিক মন ও জীবন তার উপকরণ।

মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য, সমাজ পরিবর্তনের জন্য, সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিপ্লবের জন্য সাহিত্য বড়ো ভূমিকা পালন করতে পারে। অন্যকথায় বলা যায়, সাহিত্য হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার, সতীশ পাকড়াশী সোমেনকে বলেছিলো—

১. 'সাহিত্য রচনার পথেও বিপ্লবের কাজ হয়। তুমি দেশের দারিদ্র্যপীড়িত দুঃখী জনগণের আশা উদ্যমহীন জীবনের কথা দিয়ে জীবন্ত গণ-সাহিত্য তৈরি কর— তাহলে তোমার ইপ্সিত স্বাভাবিক কর্মপথেই ভবিষ্যৎ গণবিপ্লবের পথ প্রস্তুতের সহায়ক হতে পারে।

২. অত্যাচার যখন চরমে উঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন কলম ছেড়ে তরবারি ধরতে হয়। বুকের রক্তে তখন নতুন সাহিত্য তৈরি হয়। ধন-শোষণ মদমত্ত ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে কবি ও সাহিত্যিকগণ তাই স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছুটে গিয়েছিলেন। সাহিত্য সাধনায় লাঞ্ছিত গণমানবের মর্মকথা ফুটিয়ে তোলার যে প্রেরণা সেই লেখককে গণ-মানবের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে।

www.amarboi.com ~

সাহিত্যের এই প্রায়োগিক বিষয়টি ভেবেই সোমেন লিখেছেন—

র‍্যাল্‌ফ ফক্সের নাম শুনেছো?
শুনেছো কডওয়েল আর কর্নকোর্ডের নাম?
ফেদরিকো গার্সিয়া লোরকার কথা জানো?
এই বীর শহিদেরা স্পেনকে রাঙিয়ে দিলো,
সবুজ জলপাই বন হলো লাল,
মার বুক হলো খালি—

তবু বলি, সামনে আসছে শুভদিন।
চলো, আমরাও যাই ওদের রক্তের পরশ নিতে,
ঐ রক্ত দিয়ে লিখে যাই

শুভদিনের সঙ্গীত।

প্রগতি রাজনীতি, সমাজতন্ত্র, সমাজ পরিবর্তন, এ সব সম্বন্ধে ছিলো সোমেনের প্রথম জীবন থেকেই আকর্ষণ ছিলো। এ প্রসঙ্গে সরলানন্দ সেন বলেছেন—

'পরিচিত হবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সোমেন পরকে খুব আপন করে নিতে পারত। আমার মনে হয় এটা ছিল তাঁর চরিত্রের চুম্বক শক্তি। এবং এটাই বোধহয় ছিল তার চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এই গুণ তার ভিতরে ছিল বলেই লেখনীমুখে যে-চরিত্রের জন্ম সে দিত, তারা কল্পলোকের কেউ হতো না, হতো তার জীবনের আশেপাশের নিতান্ত জানাশুনা মানুষ। .....আমাদের প্রগতি লেখকদের একটি সান্ধ্য আসর জমত ভিক্টোরিয়া পার্কের সবুজ ঘাসের উপর। আসর মানে সাহিত্যচর্চার সভা নয়, অমনি এক আধটুকু খোস গল্প করা। .....হাসিঠাট্টার ভিতরও একে অপরকে আমরা বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করতাম। এই বিদায় সকলে সমান দক্ষ নয়। কিন্তু দুর্বল এবং আক্রান্তকে সাহায্য করত সোমেন। নিজেকে বাঁচিয়ে প্রতিপক্ষকে বাণ ছুঁড়বার মতো বল যদি কারো না থাকত, সোমেন তার সাহায্যে ছুটে আসত। পৃথিবীর শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের জন্যে তার অন্তরে কতখানি দরদ ছিল, এর থেকেই সেই প্রমাণ পাওয়া যায়।'

বই পড়ার মধ্যেও সোমেনের আলাদা একটি দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়—। অর্থাৎ শুধু পেঙ্গুইন সিরিজের বই নয়— সবচেয়ে আগ্রহের সাথে পড়তেন মার্কসবাদী বই, সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ, ইউরোপ এবং বিশ্বে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও সংগঠনের বিকাশের ইস্তেহার প্রভৃতি এসব বিষয়ের বই তিনি বেশি সংগ্রহ করতেন ও আগ্রহের সাথে পড়তেন। বই পড়েই সোমেন তৃপ্ত হতেন না—অন্যদের সাথে বিশ্লেষণ করতেন এবং মতামত জেনে নিতেন।

জ্ঞান চক্রবর্তী সোমেন সম্বন্ধে আলোচনায় বলেছেন:

'.....আলোচনার ভেতর তাঁর ধারণা জন্মে যে, স্বল্প জ্ঞান নিয়ে সাহিত্যের মূল সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তখন তিনি গভীর মনোযোগের সাথে

www.amarboi.com ~

মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞান এবং বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখাগুলো আয়ত্ত করতে আরম্ভ করেন। এ সময় প্রায়ই দেখা যেত সারারাত জেগে তিনি গভীর অধ্যয়নে মগ্ন আর ভোর হতেই ফোলা ফোলা লাল চোখ নিয়ে পাড়ার কাজে ব্যস্ত। একজন ম্যাট্রিক পাস করা ছেলের পক্ষে মার্কস-লেনিনের দুরূহ বইগুলো থেকে তাঁদের তত্ত্বের মর্মবস্তু উদ্ধার করা সহজ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এ বাধার কাছে হার মানেন নি, নিজের উদ্যমেই সমস্ত কিছু আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছেন এবং যখন তিনি নিজে কোন প্রশ্নের সমাধান করতে পারেন নি তখন প্রবীণ মার্কসবাদীদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছেন।....'

সোমেন শুধু বই পড়ে নয়, পার্টি থেকেই আদর্শিকভাবে সমাজতন্ত্রের দীক্ষা পেয়েছিলেন এবং তার গল্পে, উপন্যাসে ও কবিতায় এবং এমনকি নাটিকাগুলোতে এই চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন।

দেশ, সমাজ ও মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে এবং প্রগতিশীল সাহিত্য ও মার্কসবাদ হতে সোমেন এ দীক্ষাই পেয়েছিলেন যে, সাহিত্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়—। পার্টির রিপোর্ট এবং ইস্তেহারগুলো সোমেন খুব মনোযোগের সাথে পড়তেন এবং এগুলোতে প্রেরণা পেতেন ও সাহিত্যের এ পসরা বাছাই করে নিতেন। এখানে উদাহরণ হিসেবে প্রগতি লেখক সংঘের রিপোর্ট এর কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করছি—

"১৯৩৯-এর দ্বিতীয়ার্ধে প্রাদেশিক প্রগতি লেখক সংঘের সংযুক্তি লাভ করে এই সংঘের জন্ম হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে সতীশ পাকড়াশী, জ্যোতির্ময় সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, সোমেন চন্দ প্রভৃতির নাম করা দরকার। প্রথম প্রথম আমাদের কাজ শুধু রবিবাসরীয় সাহিত্যিক আড্ডা জমানোতে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টাই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান ছিল। প্রগতি-সাহিত্যের মর্মকথা নামে প্রগতি সাহিত্য বিশ্লেষণ করে একটি পুস্তিকাও আমরা এই সময় প্রকাশ করি। তারপর ১৯৪০-এ আমরা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সংঘের প্রায় ২০ জন লেখকের লেখা সংগ্রহ করে 'ক্রান্তি' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করি। কিন্তু এই প্রকাশের পর অনতিবিলম্বেই বাংলায় সুধীসমাজ যে পরিমাণ সমাদরের সঙ্গে বইখানা গ্রহণ করলেন, তাতে আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং উৎসাহ দুই-ই বেড়ে গেল। বই প্রকাশ ছাড়াও আমরা কয়েকবার আব্দুল ওদুদ সাহেব, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের সভাপতিত্বে এই ধরনের বর্ধিতায়তন বৈঠকে ঢাকার সুধীসমাজকে আকর্ষণ করে আমাদের এই আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝাতে চেয়েছি। এই যাবতীয় প্রচেষ্টার ভিতরেই প্রগতি লেখক সংঘ তার একটা দৃঢ়বিশ্বাসকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছে। সেটা হল এই বিশ্বাস যে, সাহিত্য এবং শিল্পমাত্রই কেবল সমাজকে কেন্দ্র করেই ফুলে ফলে রসে সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের কাছে এতখানি আনন্দের খোরাক হিসাবে দেখা দেয়। এবং সর্বযুগের সাহিত্যের এবং শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি এই সমাজ-কেন্দ্রিকতাকে স্বীকার করে, সমাজের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে, সমাজকল্যাণ এবং অগ্রগতির জন্য নিরঙ্কুশভাবে তাদের স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই ঐতিহ্যের কথা স্মরণ রেখে আমরা, আজকের দিনের প্রগতি-লেখকরা, এই কথা বলতে চেয়েছি, যে সমাজকে

www.amarboi.com ~

অবলম্বন করে আমাদের সাহিত্য বা শিল্প গড়ে তুলতে হবে, তার মধ্যে যেন সে-সমাজের স্বাধীনতা এবং উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার শোষণ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তাকে রূপ দিতে পারি। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এবং শিল্প সৃষ্টি তা ছাড়া সম্ভব নয়।...."

সোমেনের সাহিত্যচর্চায় রাজনীতি প্রাধান্য পেয়েছে এবং সাহিত্যিক সোমেনকে রাজনীতির মাঠে নামিয়েছেন এ ধরণের অভিযোগ যারা করেন তাদের জানা দরকার যে, দেশ, সমাজ ও মানুষ এবং সমাজ পরিবর্তন, মার্কসবাদ ও মেহনতি মানুষের সংগ্রামকে উপেক্ষা করে সোমেনের সাহিত্যচর্চা নয়।

কৃষক শ্রমিক মজুর ও মেহনতি মানুষের সাথে সোমেনের ছিলো গভীর একাত্মতা। তিনি নিজেও বলেছেন সারাদিন রেল-শ্রমিকদের সাথে একাত্ম হয়ে থাকতে তার বিপুল আনন্দ তা না হলে তিনি লিখতে পারেন না। মার্কসীয় শিক্ষার ফলেই শ্রমিক শ্রেণী ও নির্যাতিত মানুষকে প্রাণের দরদ দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরে ছিলেন। শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতি মানুষের সাথে একাত্মতার ফলে তিনি যেমন সাহিত্যের উপাদান পেয়েছেন তেমনি তার সাহিত্য ও স্বাতন্ত্র্যধারার একটি উজ্জ্বল উৎকর্ষতা পেয়েছ। সোমেনের গল্প আলোচনা করতে গিয়ে এজন্যই ভবতোষ দত্ত বলেছেন—

"রাজনীতির চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা সমাজজিজ্ঞাসা চালিত হয়েই করেন। রাজনীতিকে কোন বিশিষ্ট সত্যকে অনুসরণ করতে বাধ্য হন সমাজ কল্যাণের প্রেরণাতে। যিনি মূলত স্রষ্টা শিল্পী তিনি সেই রাজনৈতিক বিশ্বাসেরই রূপ রচনা করবেন। সোমেন যে মূলত প্রকৃত শিল্পী, তার প্রমাণ অন্য শ্রেণীর গল্পেই আছে। তিনি তাঁর রাজনীতি নির্ভর সমাজজিজ্ঞাসাকে গল্পে রূপ দিলেন।"

সোমেন নিজেও বলেছেন—

আজ বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে—যে বিপ্লব দেবে আমূল সংস্কার। খুবই ভালো লাগলো—আমি নিজেই অনুভব করছি যেনো আর্শীর্বাদ করুন। আমার এই বিপ্লবের অনুভূতি আমার সাহিত্য সাধনায় যেনো সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকে।

"বিপ্লবের জন্য একজন লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। গোর্কির কথাই চিন্তা কর। শৌখিন সাহিত্য করার আর সময় নেই।"

বাংলা সাহিত্যে সোমেনের মহৎ কীর্তি অন্য মাত্রিকতায়। কারণ সোমেন মনেপ্রাণে আদর্শিক চেতনায় বিশ্বাস করতেন যে, সামাজিক উত্তাপ ও আবহ ছাড়া সাহিত্য হতে পারে না। আবার খাঁটি সাহিত্য হতে হলে সমাজ নির্ভর হতে হবে। এবং এখানে সোমেনের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বও ও সংশয় ছিলো না। পবিত্র সরকার এজন্যই বলেছেন—

'....বরং রাজনীতিকে কিভাবে উচ্চাঙ্গের শিল্প হিসাবে পরিবেশন করা যেতে পারে, সোমেনের গল্পগুলো তার অধ্যয়নযোগ্য চর্চাযোগ্য পাঠক্রম হিসেবে প্রস্তুত হয়ে যায়।"

সোমেনের ছিলো গভীর যুগ সচেতনতা। যে যুগে সোমেনের সাহিত্য ও রাজনীতি চর্চা সে যুগটা ছিলো সমগ্র বিশ্বেই রাজনীতি অর্থনীতি, দর্শন ও বিজ্ঞানে এক বৈপ্লবিক যুগ। সোমেন যুগের চেতনাকে ধারণ করেছেন। আত্মস্থ করেছেন এবং জীবনে ও আদর্শে বরণ করে নিয়েছেন। তাই তার লেখায় দেখা যায়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও!www.amarboi.com ~

"সোমেনের লেখাতে রাজনৈতিকতায় আধারিত সাধারণ নারী ও পুরুষের আত্মগত সুখদুঃখ ও অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা আর্তিগুলোও নতুন কালের চাহিদার বিতর্কে বিন্দুমাত্র প্রতিহত না হয়ে বিস্ময়কর সজীবতা নিয়ে মুখর হয়ে ওঠে"।

১৯১৭ সনে রুশ বিপ্লব হলেও এই বিপ্লবের ফলাফল সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে ও প্রভাব বিস্তার করতে তখন সময় লেগেছিলো—। আমাদের দেশে তখন রুশ বিপ্লবের প্রভাবের উৎকর্ষকাল। এ ছাড়া তখন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ উগ্র হয়ে ওঠেছিলো। ফ্যাসিবাদ ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে থাবা বিস্তার করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন আকাশে বাতাসে দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রগতি পাঠাগার, প্রগতি লেখক সংঘ এ ছাড়াও যে সমস্ত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক বন্দি আন্দামানে ছিলো তারা মার্কবাদে দীক্ষা নিয়ে আন্দামান থেকে ফিরে এসে গোপনে কর্মতৎপরতা চালায় এবং সমস্ত দেশে তারা ছড়িয়ে পড়ে—। এ সময় দেখা যায়—

"তিনের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পৃথিবী ও স্বদেশের নানা ঘটনাবলির আবর্তে দিশেহারা না হয়ে সোমেন এই উপমহাদেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক ও বাম গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী বিপ্লববাদী সংগ্রামীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংগতি রেখেই নিজের সাহিত্য শিল্পের কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর যে কোন গল্প পড়লে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, বয়সের তুলনায় তাঁর ব্যক্তিগত শিল্পদর্শন অভিজ্ঞতার প্রসার কত ব্যাপক ছিল। সোমেন তখনকার সীমিত মালমসলা নিয়েই বিস্তৃত প্রেক্ষিত তৈরী কলেছিলেন। এ বিষয়ে নতুন কালের সুবিন্যস্ত চিন্তাধারা দরুন সেদিন সোমেনের লেখা এত বড় সাহিত্যের ঐতিহ্যের ধারার মধ্যেও আগ্রহের চুম্বককেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

সোমেন তার গল্প ও উপন্যাসে যুগের উত্তাপ বিশেষ করে সাম্যবাদী তথা মার্কসীয় চেতনাকে প্রথম সার্থকভাবে রূপ দেন। কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণেও সোমেন অতীব নৈপুণ্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আবেগ নয় উল্লাস নয়, আকাশ কল্পনাও নয় সোমেন বাস্তবকে অতীব সংযমের সাথে এঁকেছেন। তার গল্পে ও উপন্যাসে সমগ্র দেশকে একটা পুরো চরিত্রকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন—

"গোটা গোটা মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে সোমেন আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয় দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কাছ থেকে আমরা যা চাই সেই নির্বাচন ক্ষমতা। এই কারণেই সোমেনের আদর্শবাদী নায়করা যখন বিপ্লবের কথা বলেছে, তখন তা যেমন সংযত, তেমনি মাধুর্যময়ী; নায়িকাদের মনে যে অনুভূতি দোলা দিয়েছে, তখন তাও সংযত।"

'বন্যা' উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ করা হয়েছে দেশপ্রেম, মানবিকতাবোধ এবং পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, নির্যাতন ও আগ্রাসনকে কেন্দ্র করে। এবং মূলে রয়েছে প্রবল বন্যাক্রান্ত মানুয়ের দুঃখ-দুর্দশা। রজন আর মালতীর মধ্যে গড়ে ওঠেছে প্রেম। কিন্তু চপল মেয়ে মালতীর প্রেমের চেয়ে রজতের কাছে দেশপ্রেম অনেক বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ মালতীর বাবা-মা এই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলো যে, অন্ততপক্ষে মালতীর বিয়ে নিয়ে আর ভাবতে হবে না।

রজত শেষ পর্যন্ত মালতীর বাবা প্রিয়নাথকে এবং মালতীকে বুঝিয়ে দিলো যে, ধনীরা পুঁজিবাদীরা বিশেষ করে ইংরেজ কীভাবে দেশকে শোষণ করছে। রজত

www.amarboi.com ~

মালতীকে ভালোবাসেনি এমন নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশপ্রেমই তার কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সোমেন নিজেও বলেছে—

"ইচ্ছে করেই আমি তাকে (শুধু তাকেই) অস্বাভাবিক করেছি; তার কারণ, আমি যা বলতে চাই, তা নইলে আর বলা হয় না।.....রজতের Ideology প্রচার করতে গিয়ে অনেকখানেই আমাকে চেপে যেতে হয়েছে।"

"এই বয়সে আমার যতখানি Intellectual অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা আছে, তার সবখানি আমি নায়ক রজতকে ঢেলে দিয়েছি, কতদূর সফল হলাম কে জানে?

কিন্তু উপন্যাস হিসেবে যে 'বন্যা' সার্থক এবং সোমেন যে, একজন শক্তিমান লেখক এ প্রসঙ্গে অচ্যুত গোস্বামী বলেছেন—

'১৯৩৭-৩৮-এ যাঁরা খ্যতিমান লেখক ছিলেন, এই আখ্যানবস্তুর মত চিন্তাধারা তখন তাঁদের চেতনার বাইরে ছিল। রাজনীতিকে বাদ না দিয়েও যে সাহিত্য হতে পারে একথা দু'একজন মাত্র অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলতে শুরু করেছেন, কিন্তু এসব আলোচনাকারীদের অস্বীকার করেই চলেছিলেন সাহিত্যরথীরা। এর মধ্যে 'বন্যা'র শক্তিশালী লেখক প্রমাণ করলেন কী করে বন্যার অবস্থায় অপরিসীম দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেও জীবন নিজস্ব ছন্দে চিত্রিত হয়ে ওঠে, এবং সেই ছন্দের মধ্যে স্পষ্টতম সুর হয়ে দেখা দেয় পরাধীন মানবমনের স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। '৩৮ সনে যদি 'বন্যা' ভালোভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেত, তবে এই বছরের সবচেয়ে প্রগতিশীল লেখা বলে সেটা পরিচিত হতে পারত অনায়াসে।'

উপন্যাস থেকে আমি রজতের কিছু কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি—

.—না ঠাকুরমা, রাজা হয়ে কাজ নেই, কেবল গরিবের টাকায় রাজভোগ খাওয়া, সোনার পালঙ্কে ঘুমানো, ঘুমের ওপর ঘুম, আর স্বপ্ন দেখা! না ঠাকুরমা, অমন সুখের দরকার নেই। রাজারা না খেটে আরাম করে। পরের রক্ত জল করা পয়সার ওপর বসে দিনকে রাত করে।—রজত তাহার মনের কথাটি কাউকে এ পর্যন্ত বলিতে পারে নাই, কেবল নীরবে ভাবিয়াছে।

এবার প্রিয়নাথ আর রজতের মধ্যে কিছু সংলাপ—

যেন প্রিয়নাথকে উদ্দেশ্য করিয়া রজত বলিল, আমি অনুভব করছি, আমাদের হাত-পায়ে সোনার শিকল, এক পা চলতে গেলে হেঁচকা টান পড়ে। আমি অনুভব করছি, আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আর একজন খেয়ে মোটা হচ্ছে, আমাদের দশ জনের পরিশ্রমের ফলকে একজন উপভোগ করছে, মোটর দৌড়াচ্ছে, বক্তৃতা দিচ্ছে। আমাদের হাতে একটু প্রসাদেরও বেলায় ভাঁড়ার ঘর শূন্য। আমি অনুভব করছি, আমরা গরিব—

প্রিয়নাথের মুখ নীচু হইয়া আসিল যেন। চোখ কেমন করিতেছে।

রজত বলিতেছে : আমি অনুভব করছি, আমরা গরিব। একটা কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট আমাদের জীবন। আমাদের খাবার—ভাত আর গাছের পাতা—না জুটলে কিছুই নয়, তাই আমাদের অসুখের সীমা নেই। ডাক্তারের দেখা নেই। আমরা ডাক্তার দেখাতে পারিনে। আমরা খেটে দাম পাইনে। অন্যে খাটলে তার চর্তুগুণ দাম দিতে হয়। আমরাই সমাজের জীবন, অথচ ওরা বলে আমাদেরই প্রাণের দাম নেই। আমরাই তৈরী করি

www.amarboi.com ~

ছায়া, কিন্তু ছায়া পাইনে। একের বিলাসে দুয়ে মরি—আমি অনুভব করছি, আমরা গরিব—

অনুভব করিয়াও নতুন কথা শুনিতেছে লীলাবতী।

রজত বলিতেছে, আমরা খাবার সাজাই, খেতে পারিনে। রক্তের দুধ দিয়ে পুকুর কাটি, চান করে রোমের রাণী। আমরাই করি বাগান, ফুল লুটে নেয় আর একজনে—

প্রিয়নাথের মুখ আরও নীচু হইয়া আসে যেন।

দু'হাতে নারুর মুখ ধরিয়া রজত বলিল, নারু, বড়ো হলে ঘুমিয়ে থেকো না। ঠিক এরকম অনুভব করবে তো? মার খেয়ে আরও মার খেতে পড়ে থেকো না, জাগিয়ো, প্রতিবাদ করো। মনে রেখো, যা পেয়েছি তাই ঠিক পাওয়া নয়, তার চেয়ে বেশি পেতে পারি—তা' না হলে একজন যে কোনভাবে হয়ত লাখ লাখ টাকা উপার্জন করলে, আর তার মরবার পর তারই ছেলে বসে-বসে সেই টাকা সারাজীবন খেলো। এটা কি ঠিক পাওয়া? ছেলে তো এতটুকু পরিশ্রম করেনি যে অত টাকা বসে-বসে খাবে? এখানে কোন্ নীতি আর রীতি?—আসলে প্রিয়নাথকেই বলিতেছিল রজত—কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমরা গরিব বলে কিছুই কামনা করতে পারিনে, কিছুই চাইতে পারিনে, এমন নয়, যা পেয়েছি এই পাওয়া ছাড়া আর কিছু পেতে পারিনে এমন নয়, আমাদের চুপ করে থাকা অন্যায়, বোকামি! আর একজনের অন্যায় চাপে পিষে মরে যাচ্ছি তবু প্রতিবাদ করিনে, এর মতো বোকামি কী আর আছে বলো'?

রজত বিদায়ের পথে—মালতী রজতকে আটকিয়ে রাখতে পারে নি—

মালতী আর পারে না, এবার উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল—আমি কী করেছি আপনার, কোন্ ভুলটা করেছি আপনি বলুন? আপনার ওপর রাগ করবো এমন দুর্মতি যদি আমার কখনও হয় তবে তার কি কখনও ক্ষমা নেই? আমি কী ভুল করেছি বলুন?

রজত তাহাকে দুহাতে ধরিয়া বলিল, কেঁদো না, কেঁদো না। তোমার মতো মেয়ে এমন ভাবে কাঁদবে, এ আমি আশা করিনে। শোন। এখুনি আমি চলে যাচ্ছি।

এ সময় মালতী চরম মানসিক বিপর্যয়ে। সোমেন বর্ণনা করেছেন—

ওদিকে মালতী বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, মাথার চুল এলোমেলো, নিরাভরণ মসৃণ, গলা পর্যন্ত কাপড়ের আঁচল ঢাকা, একটি হাত মুখের নীচে, সেটা নিশ্চয় ভিজা আর ঘন নিঃশ্বাসে তপ্ত। রজতকে সে এখনও অনুভব করিতেছে মনে ও মুখে। এখন নিশ্চয় ভিজা আর ঘন নিঃশ্বাসে তপ্ত। রজতকে সে এখনও অনুভব করিতেছে মনে ও মুখে। এখন নিশ্চয় বর্ষার কোন কর্দমাক্ত পথে সে একাকী অগ্রসর হইতেছে—চারিদিকে পচা জলের গন্ধ, পচা পৃথিবীর নিঃশ্বাস। বলিয়াছে, আবার একদিন সে আসিবে; তখন তাহাকে দেখিতে পাইবে কিনা কে জানে—অর্থাৎ বলিয়াছে, আবার একদিন সে আসিবে, তখন তাহাকে দেখিতে পাইবে কিনা কে জানে—অর্থাৎ বলিয়াছে, আবার একদিন সে আসিবে, তখন তাহাকে দেখিতে পাইবে কিনা কে জানে—অর্থাৎ বলিয়াছে তাহাকে অপেক্ষা করিতে। কিন্তু মালতী তখন কোথায়?

কোন বাহুল্য নেই— অলৌকিকতা নেই—অতীব সংযম এবং শৈল্পিক নৈপুণ্যে এবং দক্ষ শিল্পীর অভিজ্ঞ পরশে গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন সোমেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২২৯ www.amarboi.com ~

পরদিন ভোরে আবার দেখা গেল, নরম রোদে পৃথিবী রঙিন, অবশিষ্ট বন্যার জল ঝল্‌মল্‌ করে, বাতাসে আবার সেই আগের সৌরভ, পাখির ডাক।

মালতী বাহিরে আসিল। আজিকার ভোর, পরিচয়ের সেই প্রথম মুহূর্তগুলির কথা মনে করাইয়া দেয়; এই বাতাসের ছোঁয়ায় সেই দিনটাই শুধু মনে পড়ে।

তখনো কেউ পথ চলে না। মালতী হাঁটুতে কাপড় উঠাইয়া সেই বন্যাবশেষ জলে ছপ্‌ছপ্‌ করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে, সামনেই একটা টিলার মতো ছিল, সেখানে গেল। এই উঁচু জায়গায় দাঁড়াইলে অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। মালতী চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কাহাকে যাইবে দেখা? কে আসিবে ওই প্রান্তর পার হইয়া? কোন সে সোনার-বরণ রাজপুত্তুর? কেউ না, তবু সে সেদিকে চাহিয়া রহিল একদৃষ্টে—হাল্কা রেশমের মতো চুল তাহার উড়িল দুরন্ত বাতাসে, কাপড়ের আঁচল তেমনি খসিয়া খসিয়া পড়ে; রোদে চির্‌চির্‌ করে ভেজা চোখের পাতা, আসিবার কালে তার জলে-ভেজা পা এখনও শুকায় নাই।

সাহিত্যে আমরা জীবনকে চাই, মানুষকে চাই—চাই দেশ মাটি ও মানুষের হৃদস্পন্দন। উপর্যুক্ত কথাই সোমেনের 'বন্যা' উপন্যাসে শিল্পরূপ লাভ করেছে। কারণ

"জীবন হল মানুষের কাছে প্রিয়তম। মানুষ যে ধরণের জীবন নিজে যাপন করতে চায় তাকেই সে ভালোবাসে সবচেয়ে বেশি। তারপর তার ভালোবাসা প্রসারিত হয় জীবনের সমস্ত প্রকাশের দিকে, কারোর মরে যাওয়া বেঁচে থাকাটাই মানুষের কাছে প্রিয়তর। সুস্থ জীবনের প্রতি গভীর টান বা আকর্ষণ এবং জীবনের মঙ্গলময় প্রকাশ হল সাহিত্যের মূল কথা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমেন চন্দের কবিতা

আমাদের সাহিত্য গণ-চেতনায় রুশ বিপ্লবের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে। রুশবিপ্লবের সাফল্য যে সোমেন চন্দের ওপর কতো গভীর তা আগে বলা হয়েছে। কৃষক শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের বিপ্লবে সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যয়ী ছিলেন সোমেন চন্দ। তার কবিতায়ও এরই প্রতিফলন ঘটেছে।

আমরা সোমেন চন্দের মাত্র তিনটা কবিতার সন্ধান পেয়েছি। এখানে কবিতা গুলো উপস্থাপন করছি—।

রাজপথ

উর্বর জমির সোনার ফসল
অনুর্বর জমিতেই ছড়ানো রীতি—
মূর্খেরা দরও বোঝে না!
নিজ বাসভূমি ছেড়ে পরবাসী হলে—
আপশোষ কেন। পরবাসী তো ঈশ্বরেরই পৌষ্যপুত্র।—
ইংরেজকে জানো না?
হে কৃষ্ণ, বৃথা আলস্য,
বার বার বলি, নিদ্রাই সারবস্তু নয়।
আকাশের দিকে লক্ষ রেখো :
করে আবার ঝড় আসবে?
এখানে স্বর্ণলঙ্কা,
(ভয় নেই, এ যুগে রাজায় রাজায় যুদ্ধ আর বাধে না)
প্রতি দ্বারপথে নরম সোনার আলো,
পথে-বিপথে কাউন্টার পাশে
ঝক্-ঝকে-তক্-তকে স্বর্ণকান্তি মানুষের ভীড়—
এরা এঞ্জেল!
সুপ্রশস্ত পথের ধুলোয় স্বর্ণরেণু।
উর্বর জমির সোনার ফসলের
আবার বৈজ্ঞানিক চাষ এখানে।

'সুলতা, তোমার কিছু শীতের পোশাক চাই তো?'

এই কবিতার ইঙ্গিতময়তায় অনেক জিজ্ঞাসাই থেকে যায়, যেমন—

১. মূর্খেরা দরও বোঝে না
২. পরবাসী তো ঈশ্বরেরই পৌষ্যপুত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৩১www.amarboi.com ~

৩. নিদ্রাই সারবস্তু নয়
৪. আকাশের দিকে লক্ষ রেখো :
কবে আবার ঝড় আসবে?
৫. উর্বর জমির সোনার ফসলের
আবার বৈজ্ঞানিক চাষ এখানে।

কবিতার শেষ পংক্তিটি আমাদের বিশেষভাবে আলোড়িত, বিচলিত ও আন্দোলিত করে। সুলতা তোমার কিছু শীতের পোশাক চাই তো।

জনশক্তি

কারখানার শ্রমিক আর মাঠের কৃষক
সমগ্র দেশের শোষিত মানুষ
আজ দৃঢ়বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ—
কণ্ঠে তাদের এক শ্লোগান
মিছিলে মিছিলে এক উচ্চারণ
কারখানার সাইরেন এক সঙ্গীত
—শোষকের মৃত্যু হোক।

আকাশে বাতাসে সাগরে নদীতে
আজ এক কল্লোল
নগর-প্রান্তর-পল্লী জুড়ে
আজ এক ধ্বনি
পাখীদের গানে আজ একই সুর
—শোষকের মৃত্যু হোক।

জেগেছে শ্রমিক জেগেছে কৃষক
জেগেছে ভোরের পাখী—
উঠেছে পূবের রবি
শোষকের শেষ দিন এলো ঘনিয়ে
আজ জেগেছে জনশক্তি।

শুভদিনের সংবাদ শোন

র‍্যাল্‌ফ ফক্সের নাম শুনেছো?
শুনেছো কডওয়েল আর কর্নফোর্ডের নাম?
ফেদরিকো গার্সিয়া লোরকার কথা জানো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৩২www.amarboi.com ~

এই বীর শহীদেরা স্পেনকে রাঙিয়ে দিলো,
সবুজ জলপাই বন হলো লাল,
মা-র বুক হলো খালি—

তবু বলি, সামনে আসছে শুভদিন।
চলো, আমরাও যাই ওদের রক্তের পরশ নিতে,
ঐ রক্ত দিয়ে লিখে যাই
শভদিনের সঙ্গীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমেন চন্দের নাটক

সোমেন চন্দ দু'টি একাঙ্কিকা রচনা করেন।

১. বিপ্লব

২. প্রস্তাবনা

একাঙ্কিকা দু'টি প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত শান্তি পত্রিকায়। 'বিপ্লব' বৈশাখ ১৩৪৭ এবং প্রস্তাবনা শ্রাবণ ১৩৪৭

সোমেনের সব লেখাতেই সমাজ পরিবর্তনের একটা ইঙ্গিত থাকে। সোমেন চায় শ্রেণীহীন শোষণহীন একটি সমাজ। তার নাটক 'বিপ্লবে'ও তিনি এ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এই নাটকে অনল' এর বক্তব্য—

কিন্তু আজ প্রিয় কমরেডরা যেন আমাকে ভুল না বোঝে। জীবনের এক বৃহৎ অংশকে কমল এবার আগুন জ্বালো।

নাটক শুধু বিনোদন ও বিলাসের জন্য নয়। নাটক সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার আগের নাটকগুলো এই দায়বদ্ধতা পূরণ করছে না। অনল কমলকে বলছে—

এবার নতুন নাটকের আয়োজন কর। আমাদের সংগ্রামমুখর জীবন। সারা পৃথিবী জুড়ে এক স্বর্গের প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করতে সংগ্রাম আমাদের নিত্য সহচর। কিন্তু আজ প্রিয় কমরেডরা যেন আমাকে ভুল না বোঝে। জীবনের এক বৃহৎ অংশকে আর এক বৃহৎ অংশের সঙ্গে আজ যুক্ত করে দিলাম। এবার সংগ্রামের শক্তি অদম্য। প্রিয় কমরেডরা আমায় যেন ভুল না বোঝে, কমল এবার আগুন জ্বালো। জ্বেলে দাও আগুন পুরনো বীজের গায়ে, পুরনো বীজ ধ্বংস হোক, আগুন জ্বালো ক্ষণেকের বিলাস আর খেয়ালে, কোটি কোটি মানুষের বঞ্চনায় সঞ্চিত পাপে কোটি কোটি মানুষের মুখে প্রতিবাদে ধ্বনিত হয়ে উঠুক—সর্বোচ্চ ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাক। কমল, তুমি আগুন জ্বালো। আমি ঝড় বইয়ে দিই, হ্যাঁ আমরা ঝড় বইয়ে দিই।

~ www.amarboi.com ~

সোমেন চন্দের চিঠি

পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো কবি, সাহিত্যিকরা চিঠি লিখেছেন। এ সমস্ত চিঠি শুধু দৈনন্দিন জীবনের সংবাদ হয়েই থাকে নি। সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে এগুলোর সাহিত্য এবং শিল্পমূল্যও অনেক বেশি।

সোমেন চন্দ মার্কসবাদী, সোমেন চন্দ কমিউনিস্ট, সোমেন চন্দ বিপ্লবী, সোমেন চন্দ সাহিত্যিক, সোমেনের জীবনের বৈপ্লবিক সাধনা মেহনতি মানুষের মুক্তি, সে মুক্তি আসবে কৃষক শ্রমিক মজুর ও মেহনতি মানুষের বিপ্লবে ও আন্দোলনে এবং সংগ্রামে। সোমেন নিজেই বলেছেন—

'আজ বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে—
যে বিপ্লব দেবে আমূল সংস্কার'।

এই বিপ্লবের প্রেরণা, এই সমাজ পরিবর্তনের প্রেরণা উৎসারিত হয়েছে সোমেনের রক্ত-স্পন্দন ও প্রাণ প্রবাহ থেকে—আত্মার ধ্বনি থেকে।

সোমেন চন্দের চিঠিগুলোতে পাওয়া যাবে বিপ্লবের কথা, সমাজ পরিবর্তনের কথা, পার্টির কথা, সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কিত তার ধারণা এবং বন্যা উপন্যাস উৎস ও রচনার কথা।

সোমেনের গল্পে, উপন্যাসে ও চিঠিগুলোতে ধারণা বার বারই উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, সোমেন ডাক্তারি পড়তে গিয়েও ডাক্তার হন নি। আসলে এ তার জীবন দৃষ্টির একটি মৌলিক অভিধা। সোমেনের জীবন বীক্ষা আসলে জীবনকে জানা, মানুষকে জানা, বিপ্লব ও বিপ্লবরে ইতিহাস জানা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কুসংস্কারের বৃত্ত ভেঙে সোমেন প্রগতির পতাকা হাতে সামনে চলেছেন ইতিহাস গড়তে, অভেদ অসাম্য শ্রেণীহীন, শোষণহীন নতুন সমাজ গড়তে। এজন্যই তার সম্পর্কে বলা হয়—

ডাক্তারী পড়ার চেয়ে সোমেনের অধিক আগ্রহ মানুষের জীবনকে জানার, ইতিহাসের ঠিকানাকে উপলব্ধি করার।.....ইতিহাসের জটিল যুগসন্ধিক্ষণে সেই বাইশ বছরের যুবক সোমেন আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে বিভ্রান্তির সমস্ত কুয়াশা ভেদ করে আগামীর দিকে তাকিয়েছেন ইতিহাসের সেই সড়ক তৈরিতে সোমেন নিজের হাত লাগিয়েছেন এবং মানুষের জন্য সুন্দরতর সমাজ গড়ার কামনায় সেই ইতিহাসের সড়কে নিজের জীবন দান করেছেন।

মানুষের ইতিহাস আর বিপ্লবের ইতিহাস এবং সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস জানার জন্য সোমেন বিশ্বের তাবৎ বিপ্লবী ও প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীদের বই পড়েছেন এবং নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। তাই সোমেন বলেছেন—

র‍্যাল্‌ফ ফক্সের নাম শুনেছো?
শুনেছো রুডওয়েল আর কর্নফোর্ডের নাম?
ফেদরিকো গার্সিয়া লোরকার কথা জানো?
এই বীর শহীদেরা স্পেনকে রাঙিয়ে দিলো,

www.amarboi.com ~

সবুজ জলপাই বন হলো লাল,
মা-র বুক হলো খালি—
তবু বলি, সামনে আসছে শুভদিন।
চলো, আমরাও যাই ওদের রক্তের পরশ নিতে,
ঐ রক্ত দিয়ে লিখে যাই
শুভদিনের সঙ্গীত।

সোমেন আরো বলেছেন—

কারখানার শ্রমিক আর মাঠের কৃষক
সমগ্র দেশের শোষিত মানুষ
আজ দৃঢ়বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ—
কণ্ঠে তাদের এক শ্লোগান
মিছিলে মিছিলে এক উচ্চারণ
কারখানার সাইরেন এক সঙ্গীত
—শোষকের মৃত্যু হোক।

আকাশে বাতাসে সাগরে নদীতে
আজ এক কল্লোল
নগর-প্রান্তর-পল্লী জুড়ে
আজ এক ধ্বনি
পাখীদের গানে আজ একই সুর
—শোষকের মৃত্যু হোক।

জেগেছে শ্রমিক জেগেছে কৃষক
জেগেছে ভোরের পাখী—
উঠেছে পূবের রবি
শোষকের শেষ দিন এলো ঘনিয়ে
আজ জেগেছে জনশক্তি।

সাহিত্য ও শিল্পে এবং সমাজ পরিবর্তনে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের ভূমিকাকেও সোমেন তার বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন এবং এজন্যই বলা হয়েছে—

'আমাদের বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত সমাজের অনিবার্য পচন ধরেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বুদ্ধিজীবী সমাজেই—অর্থাৎ যারা প্রগতিপরায়ণ লেখক তারাও বাদ যায় না।—সবার ভেতরেই পচন ধরেছে। এরা বলেন অনেক, জানি না, কিছুই বিশ্বাস করেন কিনা। .....কিন্তু জানেন এই মধ্যবিত্ত সমাজেরই ভেতর থেকে একদল যাবে নীচে নেমে। তাদেরই ভেতর থেকে আগামী দিনের বিপ্লবের পুরোহিতরা বেরিয়ে আসবেন'।

www.amarboi.com ~

সোমেনর লেখা চিঠিগুলো বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সোমেন প্রলেটারিয়েত শ্রেণীকে দেখেছেন।

'প্রোলেটারিয়েট পার্টির শক্তির উৎস। এ যুগের রাজনৈতিক পালাবদলে প্রোলেটারিয়েটের ভূমিকাই অগ্রণী। তাদের মধ্যে যদি কাজ করতে না পারলাম, তবে শৌখিন কমিউনিস্ট বলে নাম কিনে লাভ কি?'

শুধু সাংগঠনিক কাজ নয় আমাদের গ্রাম-জীবনের অভিজ্ঞতাই যে কতো গভীর এবং গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, মজুর ও অসহায় মানুষগুলোর সাথে তার গভীর একাত্মতা। কিন্তু এই গ্রামের মানুষকে শুধু দেখা ও একাত্মতা নয়—বিপ্লবের জন্য দেখার জন্য নতুন দৃষ্টি ও দিতে হবে। চিঠিতে সোমেনের বক্তব্য—

"গ্রাম্য অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর—এমন কি, যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতগুলো Sweet উপন্যাস রচনা করেছেন বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমি, কিন্তু এতদিন সে-সব সম্বন্ধে কিছু লিখিনি এই ভেবে যে, ওসব পুরনো হয়ে গেছে, এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। কিন্তু বছরখানেক সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কোন পথই খুঁজে পেতাম না, এখন কতকটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে .....।"

ইঁদুর গল্পের নায়ক সুকুমার যে, সোমেনেরই প্রতিচ্ছবি। সোমেনের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে সুকুমারের কণ্ঠে—

আমার প্রথম অভিজ্ঞতায় সেদিনের দৃশ্যটি চমৎকার লেগেছিল। আমার এই মধ্যাহ্নের ট্রাক্টর-স্বপ্নের ভিত পাকা করতে আরম্ভ করলুম সেইদিন থেকে। একথা বলাই বাহুল্য যে, ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলুম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলুম জনতার দিকে, তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলুম। তাদেরও ধন্যবাদ, যারা আমাকে আমার এই অসহায়তার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! সেবাব্রত নয়, মানবতা নয়, স্বার্থপরতা অথচ শ্রেষ্ঠ উদারতা নিয়ে এক ক্লান্তিহীন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন।....

আমি ফিরে এলুম। সাম্যবাদের গর্ব, আর ইস্পাতের মতো আশা, আর সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলুম।

আমি সোমেন চন্দের এলাকার মানুষ। সোমেন চন্দের ওপর আমার অনুসন্ধিৎসা আমার ছাত্র জীবন থেকেই। এ বিষয়ে তখন আমার আলোচনা হতো ফয়েজ মাস্টার, বিজয় চ্যাটার্জির সাথে এখনো আলোচনা হয় কথা সাহিত্যিক হরিপদ দত্ত, অধ্যক্ষ প্রণব চক্রবর্তী, অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক শহিদুল হক সোমেন, অধ্যক্ষ ড. মশিউর রহমান মৃধা ও রাকিবুল হাসানের সাথে। প্রবীণদের কাছে শুনেছি সোমেন ঢাকা থেকে বালিয়া এসেই কৃষকদের বাড়ি বাড়ি চলে যেতেন এবং রাতে তাদের সাথে বসে আলাপ করতেন। রণেশ দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

গ্রাম বাংলার মানুষকে সোমেন চন্দ খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। ঢাকা শহরে লেখাপড়া করলেও সোমেন চন্দ ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে আসতেন গ্রামে। সেখানে তিনি দেখেছিলেন গ্রামের সমস্ত স্তরের মানুষকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। তিনি তার 'স্বপ্ন' এবং 'গল্প' নামক দুটি গল্পে যে সব ছবি এঁকেছেন তাতে মনে হয়

www.amarboi.com ~

বাংলার গ্রামকে তিনি বুঝিয়া নখাগ্রে ধারণ করেছিলেন। ১৯৪০ সনে যখন তিনি ঢাকা শহরে রেল শ্রমিকদের সংগঠনের কাজে নামেন একজন কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে, তখনও গভীরভাবে অন্তরঙ্গ পরিচয় পেলেন শ্রমিক জীবনের। তিনি দেখলেন, শ্রমিকদের মধ্যে তার চেনা গ্রামীণ মানুষের মর্মরূপটিকে যা তখন কৃষি থেকে শিল্পে এসে ঢালাই হতে শুরু করেছে পরিবর্তনের ছাঁচে। 'সংকেত' গল্পটিতে রয়েছে এর পরিচয়।'

সোমেন চন্দের গল্প, উপন্যাস ও বিশেষ করে চিঠিগুলো পড়লেই বুঝা যাবে বিলাসী সাহিত্যচর্চা সোমেন করেননি। আমার লেখায় বহুবার আমি এ বক্তব্য রেখেছি। সমাজের পরিবর্তন দ্রুত করতে হবে আর এজন্য চাই বিপ্লব এবং বিপ্লবকেও ত্বরান্বিত করতে হবে। ত্রিশোত্তর কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে সোমেনের বৈশিষ্ট্যও এখানে আরো উল্লেখ্য যে, সোমেন নাম করার জন্য বা আত্মপ্রচারের জন্য সাহিত্য সাধনা করেননি। সোমেনের সামনে ছিলো দেশ, সমাজ, মাটি ও মানুষ এবং এদের পরিবর্তনের অভিধাই ছিলো তার জীবনের ব্রত এবং এজন্যই তিনি ছিলেন নিবেদিত ও উৎসর্গিত প্রাণ—। তাই অল্পবয়সে সোমেন চলে গেলেও তার জীবন বৃথা যায়নি—

"মহৎ কর্মপ্রেরণায় আত্মদান বৃথা যায় না। বিশ্বমানবের কল্যাণে ইংলন্ডের তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক র‍্যালফ ফক্সের (Ralph Fox) আত্মদান গণমানবের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ...ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে তরুণ যুবক সোমেনের সাথে এই কথাই হচ্ছিল,....সোমেন জিজ্ঞাসুভরা প্রাণে বলে উঠল,—'সাহিত্যিকও মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল।' আমি বললাম, অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন কলম ছেড়ে তরবারি ধরতে হয়—বুকের রক্তে তখন নতুন সাহিত্য তৈরি হয়। ধন-শোষণ-মদমত্ত ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে কবি ও সাহিত্যিকগণ তাই স্পেনের আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছুটে গিয়েছিলেন।

সাহিত্যসাধনায় লাঞ্ছিত গণমানবের মর্মকথা ফুটিয়ে তোলবার যে প্রেরণা, সেই প্রেরণাই লেখককে গণমানবের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে। সোমেন চুপ করে শুনে একটু পড়ে বলল, 'এরাই সত্যিকার সাহিত্যিক।' রাত্রিতে আমরা ফিরলাম। সোমেন তার গুটি দুই-তিন লেখক বন্ধুদের নিয়ে নতুন সাহিত্যের কথা বলতে বলতে বাড়ি গেল।"

বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা প্রসঙ্গে সোমেন তার অনুভূতি প্রকাশ করে 'সবুজ বাংলার' সম্পাদক নির্মল ঘোষকে লিখেন—

আপনার চিঠি দেখেছি, 'সবুজ বাংলার কথা'-ও পেয়েছি। ভালো লাগলো, আপনার কথাগুলি চমৎকার—তাতে আপনার এবং পত্রিকার নীতি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে, বিশেষত—'অর্থনৈতিক পীড়নে দুঃসহ ক্লেশ যাদের মনে সৃষ্টি করেছে কোন প্রচণ্ড ক্ষোভ—যে ক্ষোভ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির লাভা প্রভাবে এক একদিন আত্মপ্রকাশ করে—নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অসাম্য ও বঞ্চনার অহমিকা,—যৌবনের পথনির্দেশ তো তারাই দিবে।' আর 'মানুষের সমাজ গড়ে ওঠবার পর থেকে আজ অবধি প্রায় একই নীতি সর্বদেশে অনুসৃত হয়ে এসেছে। এর ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বসাধারণের কল্যাণ হয়ে থাকুক আর নাই থাকুক, একথা অনস্বীকার্য যে লাভ ও সুবিধার কথা বলতে গেলে আঠারো আনারই মালিকানা জনকয়েক লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে।'—'আজ বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে,—যে বিপ্লব দেবে আমূল সংস্কার।' খুবই ভালো লাগলো, আমি নিজেই অনুভব করছি যেন। আশীর্বাদ করুন, আমার এই বিপ্লবের অনুভূতি আমার সাহিত্য সাধনার সর্বাঙ্গে যেন জড়িয়ে থাকে।

রেল শ্রমিক ইউনিয়ন এবং শ্রমিকও সাধারণ মানুষের সাথে একাত্মতা প্রসঙ্গে সোমেন বন্ধু অমৃত কুমার দত্তকে এক চিঠিতে লিখেন—

গত কয়েকদিন রেল-শ্রমিকদের নিয়ে বেশ ঝামেলায় ছিলাম। লেখার জন্য একটুও সময় পাই না। তবু লিখতে হবে, মেহনতী মানুষের জন্য, সর্বহারা মানুষের জন্য, আমাদের লিখতে হবে। র‍্যালফ ফক্সের বই পড়ে আমি অন্তরে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। কডওয়েলের বইটিও আমাকে অনুপ্রাণিত করছে। এই না হলে কি মহৎ সাহিত্যিক হওয়া যায়। স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে তাঁদের আত্মবিসর্জন ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আশার কথা বাংলা সাহিত্যের তরুণ লেখকরা এদিকে সচেতন হচ্ছে।...

বিপ্লবের জন্য একজন লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। গোর্কির কথাই চিন্তা কর। শৌখিন সাহিত্য করার আর সময় নেই।

সোমেন কমিউনিস্ট হয়েও সাহিত্যকে যান্ত্রিক ছাঁচে ঢেলে দেন নি। বা নিছক প্রচারের বাহন করে তুলেন নি। তার গল্পও উপন্যাস যারা পড়েছেন তারা অবশ্যি লক্ষ করবেন যে, সোমেন কোথাও শৈল্পিক সৌকর্যকে ব্যাহত করে শুধু প্রচারের বাহন করে শিল্পকর্মকে যান্ত্রিকতার আদলে গড়ে তুলেননি—

সেকালে প্রগতিশীল বাস্তববাদী গল্প বলে যেসব গল্প প্রকাশিত হতো সেগুলো বেশীর ভাগেই থাকত সমাজের যান্ত্রিক বিশ্লেষণ, ফরমূলামাফিক কাহিনী বিন্যাস এবং ঈশপীয় কাহিনীর মতো উপদেশাত্মক এবং পূর্বানুমানযোগ্য পরিসমাপ্তি। সোমেন ঐ অল্প বয়সে প্রগতিশীল ভাবনাত্মক কাহিনীকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করার জন্য নিজস্ব শিল্পসঙ্গত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। হয়ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে সে এই পদ্ধতির খানিকটা আভাস পেয়েছিল। কিন্তু মূলত এ পদ্ধতির জন্ম হয়েছিল তার মনে। নিজের জীবনের তীব্র বেদনাদগ্ধ অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যয়কে রূপায়িত করার তাগিদে এর জন্ম।

এক ধরনের উগ্র প্রগতিশীল লেখক আছেন যারা সমাজ পরিবর্তনের বাস্তব প্রক্রিয়া থেকে নিজকে আড়ালে রেখে শুধু বুর্জুয়া লেখক আক্রমণ করে দায়িত্ব পালন করছেন বলে মনে করেন। অথচ সমাজের প্রতি যে অঙ্গীকার সোমেন তা' জীবনে ও শৈল্পিক সত্তার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন—

"বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল বলে কোনো লেখককে শুধু গালাগাল দিলেই সমস্যার সমাধান হতে পারে না, একজন প্রগতিশীল লেখককে তার নিজের রচনার মধ্য দিয়েই দেখিয়ে দিতে হবে কিরকমভাবে একালের ক্ষয়িষ্ণু-সমাজের মধ্য থেকে আগামীকালের সুস্থ ও সুখী জীবনের শক্তিগুলো ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে এবং ভাবীকালের হৃদয়স্পন্দনের সংকেত জানিয়ে দিচ্ছে।"

www.amarboi.com ~

তাই বন্যা উপন্যাস লেখা প্রসঙ্গে নির্মলকুমার ঘোষকে চিঠি লেখেন—

আমি একটা উপন্যাস লিখছি এখন, এবং সেটা শেষ হতে বেশি দেরী নেই। এটা শেষ হলে আগামী ক্রীসমাসে কলকাতায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আপনি 'নবশক্তি'-র গল্পটার প্রকাশের কথা লিখেছেন—ভালো কথা, ওরা আমাকে পারিশ্রমিক দেয়নি—আপনি ওদের দিয়ে সেটা ছাপিয়ে নেয়ার কথা লিখেছেন। কিন্তু আমার নিজের সেই গল্পটা পছন্দ হয় না, বিশেষত প্রথম দিকে ডায়লগগুলি কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে, অবশ্যি তা বদলানো যেতে পারে—কিন্তু আসল কথা, আমার যা নীতি, তা প্রকাশ পায়নি সে গল্পে—কাজেই প্রকাশ করতে ইচ্ছা হয়না।

সমাজ পরিবর্তন ও সাহিত্য শিল্প প্রসঙ্গে সোমেনের যে মানসিকতার প্রকাশ পেয়ে এর একটি চিত্র তুলে ধরা হলো—এবার সোমেনের চিঠিগুলো উপস্থাপন করছি—

১-৪ চিঠি লিখেছেন নির্মলকুমার ঘোষকে। তিনি 'অগ্রগতি', সবুজ বাংলার কথা, 'বালীগাও' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বৈষয়িক জীবনে তিনি আইনজীবী হলেও তিনি কবি এবং প্রাবন্ধিক হিসেবেও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি একবার ঢাকা এসেছিলেন এবং অমৃতকুমার দত্তের মাধ্যমে সোমেন চন্দের সাথে পরিচিত হন। সোমেন চন্দ দু'বার কোলকাতা গিয়েছিলেন এবং তখন এই দু'বারই নির্মল ঘোষের বাসায় অবস্থান করেছিলেন।

নির্মলকুমার ঘোষের পত্রিকাগুলোতে সোমেন চন্দের বেশ কটি গল্পও 'বন্যা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

ঢাকা
৪৭ লালমোহন সাহা স্ট্রীট,
পো. উয়ারী।
১৯৩৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি দেখেছি, 'সবুজ বাংলার কথা'-ও পেয়েছি। ভালো লাগলো, আপনার কথাগুলি চমৎকার—তাতে আপনার এবং পত্রিকার নীতি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে, বিশেষত—'অর্থনৈতিক পীড়নে দুঃসহ ক্লেশ যাদের মনে সৃষ্টি করেছে কোন প্রচণ্ড ক্ষোভ—যে ক্ষোভ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির লাভা প্রভাবে এক একদিন আত্মপ্রকাশ করে—নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অসাম্য ও বঞ্চনার অহমিকা,—যৌবনের পথনির্দেশ তো তারাই দিবে।' আর 'মানুষের সমাজ গড়ে ওঠবার পর থেকে আজ অবধি প্রায় একই নীতি সর্বদেশে অনুসৃত হয়ে এসেছে। এর ফলে সর্বসাধারণের কল্যাণ হয়ে থাকুক আর নাই থাকুক, একথা অনস্বীকার্য যে লাভ ও সুবিধার কথা বলতে গেলে আঠারো আনারই মালিকানা জনকয়েক লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে।'—'আজ বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে,—যে বিপ্লব দেবে আমূল সংস্কার।' খুবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো লাগলো, আমি নিজেই অনুভব করছি যেন। আশীর্বাদ করুন, আমার এই বিপ্লবের অনুভূতি আমার সাহিত্য সাধনার সর্বাঙ্গে যেন জড়িয়ে থাকে।

আর এই বিপ্লবের অনুভূতি কেবল আমার নয়, আরও অনেক সাহিত্যসেবকের মনেই জেগেছে মনে হয়, তার মধ্যে হয়তো অনেকেই প্রকাশ করতে পারছে না, বা অনেকের কণ্ঠই ক্ষীণ হয়ে গেছে তথাকথিত সাহিত্য-ডিক্টেটরদের গোলমালে, কিন্তু সেই অনুভূতির অস্তিত্ব আছে অনেকের মনেই— এই সব দেখে মনে হয়, আগামী দশ বছরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হবে একটা উজ্জ্বল অধ্যায়, একটা বৈপ্লবিক অপূর্ব সৃষ্টি।

আমি একটা উপন্যাস লিখছি এখন, এবং সেটা শেষ হতে বেশী দেরী নেই। এটা শেষ হলে আগামী ক্রীসমাসে কলকাতায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আপনি 'নবশক্তি'-র গল্পটার প্রকাশের কথা লিখেছেন—ভালো কথা, ওরা আমাকে পারিশ্রমিক দেয়নি— আপনি ওদের দিয়ে সেটা ছাপিয়ে নেয়ার কথা লিখেছেন। কিন্তু আমার নিজের সেই গল্পটা পছন্দ হয় না, বিশেষত প্রথম দিকে ডায়লগগুলি কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে, অবশ্যি তা বদলানো যেতে পারে—কিন্তু আসল কথা, আমার যা নীতি, তা প্রকাশ পায়নি সে গল্পে—কাজেই প্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় না। তবে কেটে—ছেঁটে আরও ছোট করে অন্যান্য গল্পের সাথে প্রকাশ করা যেতে পারে। 'নবশক্তি'তে এর আগে আমার আর একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে, 'মুখোস' নামে।

কিন্তু শীঘ্রই সেই উপন্যাস, যেটা এখন লিখছি, সেটা ছাড়াও ছোটগল্পের বই বের করবার ইচ্ছা আমার ভয়ানক এবং সেইজন্য বিশেষ নির্বাচিত রচনাও আছে আমার হাতে কিন্তু এই ব্যাপারে যে আর্থিক আনুকূল্যের দরকার— আপনার কাছে বলতে বাধা নেই— তা আমার সম্প্রতি মোটেই নেই। লেখককে নিজে খরচ না করে বই প্রকাশ করবার উপায় যদি থাকে— যেমন ধরুন, চুক্তি করে পাবলিশার্সরাও সে ভার নেয়— আপনার কাছে সে-বিয়য়ে আমি পরামর্শ চাই। এ সম্বন্ধে আমার মোটেই অভিজ্ঞতা নেই, আপনার আছে। তবে আন্দাজ করতে পারি, আমি যে-উপায়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম, তা হয়তো আমার মতো অখ্যাতনামা লেখকের বেলায় সম্ভব হয় না। তারা তো 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' পছন্দ করে আগে। 'অগ্রগতি'তেও এমন প্রচুর লিখিনি যাতে ওরা প্রকাশ করতে পারে। তাছাড়া আপনিও সেখানে নেই। প্রকাশিতের মধ্যে মাত্র চারটি গল্প বইয়ের জন্য নির্বাচিত হতে পারে : অন্ধ শ্রীবিলাস, অমিল, মুখোস, দুই পরিচ্ছেদ (পরিবর্তিত হয়ে)— আর কয়েকটি আমার হাতে। কিন্তু আবার আমার যেভাবে প্রকাশের ইচ্ছা তাতে আমার নিজে না ছাপালে চলে না। গল্পগুলো অধিকাংশই বিদ্রূপাত্মক—আমার ইচ্ছা, প্রত্যেক গল্পের সঙ্গে ছবি দেয়া। এ বিষয়ে সবচেয়ে পছন্দ হয় শৈল চক্রবর্তী। Bernerd Shaw-এর Short Stories Scraps and Shavings নিশ্চয় দেখেছেন, তাতে John Farleigh-র আঁকা কী চমৎকার Wood Engravings! কাজেই এরকম সম্ভব করতে আমার দুরাশা আছে। তবে চেষ্টা করবো শেষ পর্যন্ত, তাতে যদি পুস্তক প্রকাশের দেরীও হয়, তা-ও হোক। এ সম্বন্ধে আমি সবসময় কেবল আপনার পরামর্শের কথাই ভাবি। কারণ, আমাদের উপলব্ধি অনুভূতি, আর আমি নিজে, এই ঢাকা শহরে একা। অমৃত খুবই সরল, আর যাকে বলে খুবই Sincere, যাকে একবার ভালো চোখে

পুনিয়ার পাঠক ~ www.amarboi.com ~

দেখলে, বা ভালোবাসলো বা শ্রদ্ধা করলো, তার জন্য এমনকি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে যে, তার হয়ে মানুষের সঙ্গে মারামারি করতে পারে। এইতো, আপনি বলতে সে অজ্ঞান, বঙ্কিমঘটিত ব্যাপারের সময় লোকের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে যা তর্ক করেছে, তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়, একজন কাউকে চোখে পর্যন্ত না দেখে কেউ যে তার সম্বন্ধে এতো জাগ্রত হতে পারে, তা বিশ্বাস করা যায় না সহজে। আর কেবল আপনিই না, বলেছি তো যাকে একবার ভালোবাসলো বা শ্রদ্ধা করলো তো, তাইতেই। এই আমার জন্যেও মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করে আসতে পারে। এটা সরলতা; যে এটা বুঝলো, সেই তার সঙ্গে চলতে পারলো। কিন্তু বিপদ এই, মতের দৃঢ়তা নেই, যেকোনো লোকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে। তাই মাঝে মাঝে একা মনে হয়, আমার উপলব্ধির পেছনে কোন অনুপ্রেরণা না পেয়ে মাঝে মাঝে অবসাদ আসে। অবশ্য 'সবুজ বাংলার কথা'য় তা পেলাম।

আমার বইয়ের দাম হবে যথাসম্ভব কম—সর্বসাধারণের সুবিধার জন্যে, যাতে আমার মতো লোকও পড়তে পারে। এতে আপনি হাসবেন জানি—কিন্তু এ বিষয়ে আমি রোঁমা রোঁলার কথা মানি এবং বিশ্বাস করি : 'খাঁটি আর্টের নিবেদন এমন গভীর যে, তা নিম্নতম অধিকারীর হৃদয়েও সাড়া দেয়। প্রমাণ, শেক্সপীয়রের নাটক—ও জিনিসের বোঝাবার জন্যে বৈদগ্ধ্যের দরকার হতে পারে কিন্তু বোধ করবার পক্ষে প্রকৃতি যা দিয়েছে তাই যথেষ্ট। অবশ্যি, আমার লেখাতে খাঁটি আর্ট বলে যদি কিছু থাকে!—আমার বইয়ের বাইরের বিলাসী চাকচিক্যের চেয়ে নতুনত্ব বেশী হবে, এই ইচ্ছা। বিশ্বাস করবেন না, আমাদের অনেক বাংলা বইয়ের চকচকে প্রচ্ছদপটের চেয়ে Penguin Books-এর অনাড়ম্বর আর uniform প্রচ্ছদপটও আমার ভালো লাগে।

সে যাই হোক, নিজে খরচ দিয়ে প্রকাশ করলে কলকাতার চেয়ে ঢাকায় অনেক সুবিধা—এখানে ছাপিয়ে কলকাতার কোন পাবলিশার্স দিয়ে পাবলিশ করলেই তো হয়।

ইতিমধ্যে, অর্থাৎ ক্রীসমাসের আগে, ছোটদের একটা উপন্যাসও লিখবো। আর এই তিনটি জিনিস শেষ করে তারপর কয়েকটি নাটিকা লিখবো—বাংলায় ভালো নাটকের নিতান্তই অভাব।

'সবুজ বাংলার কথা'র গল্পটি যে অবস্থায় বেরিয়েছে, তাই বরং আমার ভালো লাগলো। 'কাব্য-পরিচয়ে' আপনার কবিতা নির্বাচিত হয়েছে একথা অনেক আগেই শুনেছি। খুশি হয়েছি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি কবিতা এবার খুবই ভালো লাগলো—'কবিতা' আর 'আনন্দবাজারে'র—পড়তে পড়তে একরকম মুখস্থ হয়ে গেছে।

ঢাকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য খবর এই এখানে এ বৎসর সাহিত্য-আলোচনার একটি Sensation টের পাওয়া যাচ্ছে। একটি দুটি পত্রিকা নয়, এমনও আছে যাদের নাম আপনিও হয়তো শোনেননি, অথচ সারা বছরই চলছে।

এত লম্বা চিঠি পড়ে আপনি বিরক্ত হবেন জানি কিন্তু উপায় নেই, আরও বাকী রইলো। অনেক দরকারী কথা এতদিন জমে ছিল বলেই চিঠি এত বড়ো হয়ে গেল। দুদুটো চিঠি আপনি এদিকে লিখলেন, অথচ আমার কাছে একটিও নেই। এ দেখে আমাকে আপনি ভুলে যাচ্ছেন মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতো শীগ্‌গির হয় এ চিঠির উত্তর দেবেন কিন্তু। আমি ভালো, আপনার শারীরিক কুশল কামনা করি। আমার শ্রদ্ধা আর নমস্কার জানবেন। কপিলবাবুর চিঠি দেখেছি, তাঁকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি। ইতি—

আপনাদের
সোমেন

পুঃ— আপনাকে একটি কথা বলতে ভুলে গেছি, আমার দিনগুলো এখন মনোরম— আর অনেক, আপনাকে বলতে বাধা নেই, অনেক মানসিক (সাংসারিক) বিপর্যয়ের বাধা-বিপত্তি এড়িয়েও এখনকার দিনগুলো কী ভালো লাগে! তার প্রধান কারণ, উপন্যাস লেখার উত্তেজনা। কবে শেষ হবে, সেই চিন্তাই করি।

এখনকার রাতগুলো আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকলো, (আর আপনি তার প্রথম শ্রোতা) উপন্যাস লেখা ব্যর্থই হোক আর অব্যর্থই হোক—মাঝে মাঝে একেকটি রাত কখন যে শেষ হয়ে যায়, টেরও পাইনে। অমৃতের কাছে এসব জানাই নে, কারণ সে ক্ষেপিয়ে মারবে।

দুই :

৪৭ লালমোহন সাহা স্ট্রীট,
পোঃ উয়ারী, ঢাকা।
৯ই নভেম্বর, বুধবার

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ক্রীসমাসে আমার কলকাতায় আসবার ইচ্ছা আছে, আপনাকে তা বলেছি। তখন লিখিত উপন্যাসখানা নিয়ে আসবো, সেটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উপন্যাসখানা গ্রাম এবং শহর, দু'য়ে মিশিয়ে লেখা। তবে বেশীর ভাগই গ্রাম। আপনি অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন : গ্রাম্য অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর—এমনকি, যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতোগুলো Sweet উপন্যাস রচনা করেছেন বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমি, কিন্তু এতদিন সেসব সম্বন্ধে কিছু লিখিনি এই ভেবে যে, ওসব পুরনো হয়ে গেছে, এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। কিন্তু বছরখানেক সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কোন পথই খুঁজে পেতাম না, এখন কতকটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে, সেটা আমার বর্তমান উপন্যাসে ফলবে। নিজের ওপর নির্ভরতায় এবং নিজেরই বিচারশক্তিতে আমার মনে হয়, বইটি প্রকাশিত হলে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনি 'বিত্তহীন মধ্যবিত্ত'দের নিয়ে লিখতে বলেছেন, এদের ছাড়া আমি আর কাউকে নিয়ে লিখবো না জানবেন (তবে এঁদেরই কথা বলবার সুবিধের জন্যে ধনীদের সাহায্য নিতে পারি, সেটা লিখবার পদ্ধতি), আমার বর্তমান উপন্যাস তাঁদেরই নিয়ে। তবে আমার নায়ককে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখেছি, সে কী এবং কে, এ পর্যন্ত জানতে দিইনি,

www.amarboi.com ~

সর্বশেষ কী হবে এখনও বলতে পারিনে। প্লটটি অল্পেতে বলি শুনুন : একটি বন্যাপীড়িত গ্রাম, সেখানে কোনো এক বিত্তহীন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, মালতী—ঘরে অন্নের চিন্তা কিন্তু ভয়ানক স্বপ্নবিলাসী, তার বারান্দার নীচে জল দেখে তার আনন্দ হয়, বন্যার সেই নতুন জলে পা ডুবিয়ে সেই জলেই নিজের চেহারা দেখতে তার সুখ ; অথচ পেছনে ছোট ভাই-বোন, মা-বাপ, ঠাকুরমা মিলে এক মস্ত সংসার—চেঁচামেচি, দু'হাত মেলে খাবার ভিক্ষার কান্না—এর মধ্যেও আমার এই মেয়ে নিশ্চিন্তে স্বপ্ন দেখে। ইতিমধ্যে গ্রামে ফ্লাড রিলিফ কমিটি বসেছে, শুধু চাল দেয়া এদের রীতি, অর্থ নয়, সেখানকারই রজত নামে এক ছেলে এই সূত্রেই মালতীদের সাথে পরিচিত হলো, মালতীর স্বপ্ন দেখায় সে আঘাত করলো, তার স্বপ্ন সে ভেঙে দিলো। এখানে রজতের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সে আমার উপন্যাসের নায়ক— ইচ্ছা করেই আমি তাকে (শুধু তাকেই) অস্বাভাবিক করেছি, তার কারণ, যা আমি বলতে চাই নইলে তা আর বলা হয় না। একটা নতুন বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি শুধু এরই ওপর বেশী ছায়াপাত করছে ইংরেজিতে যাকে adventurer বলে, কতকটা সেই জাতীয় চরিত্র, প্রথম থেকে শেষ অবধি সে সকলের কাছে অজ্ঞাত অথচ সকলের সাথেই ঘনিষ্ঠতার অন্ত নেই। রজতের ideology প্রচার করতে গিয়ে অনেকখানেই আমাকে চেপে যেতে হয়েছে, পুরোপুরি খোলা হতে পারিনি; এইখানেই একটা কথা আমার বার বার মনে হয়েছে, সেটা এই, দেশে যদি চারপাশে এমনি নাগপাশের বাঁধন না থাকতো, অর্থাৎ দেশে যদি ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট থাকতো তবে আমাদের বিশেষভাবে উপন্যাস সাহিত্যের গতি এই যে রুদ্ধ হয়ে এসেছে, তার বাঁধন খুলতো। বৃহত্তর চিন্তা আমরা কি কম করি, মার্কস-হেগেল-কোল-স্ট্রাচি-শ' কি অনেকেরই কণ্ঠস্থ নয়? কিন্তু আমাদের এই দারিদ্র্যপীড়িত, দুঃখক্লিষ্ট জীবনে বৃহত্তর চিন্তাকে মিশ খাইয়ে একটু আশার বাণী শোনায় কে? ক্যাপিটালিজম আর ইম্পিরিয়ালিজম-এ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, প্রথমটির বিরুদ্ধে কোন লেখকের অভিযান করতে হলে, দ্বিতীয়টির [বিরুদ্ধেও] করতে হয়; সুতরাং বই প্রকাশিত হবার পরদিনই বন্ধ। তখন কী আশা, স্পর্ধা, সাহস আর পুঁজি নিয়ে গরিব লেখক আর একখানা উপন্যাসের সূচনা করবে? জমিদারদের তো অনেকেই গাল দিলো (শুধু গাল-ই, উপায় বের করলে না কেউ); কিন্তু মূলে কী, তা কি কেউ জানে না? জানলেও জানাবার সাহস তাদের কোথায়?— এই বয়সে আমার যতখানি intellectual অনুভূতি-অভিজ্ঞতা আছে, তার সবখানি আমি নায়ক রজতকে ঢেলে দিয়েছি, কতদূর সফল হলাম কে জানে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আপনি বলেন, আমিও বলি,—স্বীকার করি, শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের যা গুণ তার সবই আছে তাঁর মধ্যে— বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি, অভিনব চরিত্র সৃষ্টি, অপূর্ব অভিজ্ঞতার উপলব্ধি, সবই আছে, কিন্তু পড়াশুনা কম বলে মনে হয়। কল্পনা করা যায়, এই প্রতিভার সঙ্গে বিস্তর পড়াশুনার যোগ থাকলে আরও কতো বড় সাহিত্যই না আমরা পেতাম।

তারপর প্লটের কথা বলছিলাম— রজত মালতীর স্বপ্ন ভেঙে দিলো। তার মনে সে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিলো। বেশী বেগ পেতে হলো না, কারণ উপকরণ সামনেই আছে, মালতীর হাতের কাছেই সব দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সরলভাবে বুঝিয়ে দিলো। তারপর

www.amarboi.com ~

সে চলে এলো। আর এক গ্রাম ; এখানকার যিনি জমিদার, তিনি থাকেন শহরে, একজন উচ্চ এডুকেশনাল অফিসার, বছরে একবার দেশে আসেন, সেবা'রও এসেছেন, সঙ্গে দুটি শিক্ষিত মেয়ে আর স্ত্রী। রজত তাদের সঙ্গে পরিচিত হলো। এখনও পরিচয়ের বাঁধুনি দৃঢ় হচ্ছে, বাকী আছে কেবল শেষটুকু। উপন্যাসখানা বইয়ের আকারে তিনশো পৃষ্ঠা সম্ভবত হবে।

সেদিন বার্নার্ড শ'র Intelligent Woman's Guide to Socialism বই খানা কিনেছি, এখন সময় মতো পড়ছি। সন্তোষ সেন নামক ভদ্রলোকের কথা বলেছিলেন, অমৃতের সাথে দুইদিন তাঁর বাসায় গিয়েছি, পাইনি। আর একদিন যাবো। আসলে, অমৃত সারাদিনে সেই সন্ধ্যেবেলা একটু সময় পায়, তখনই শুধু সেই ভদ্রলোকের কাছে যাওয়া যায় কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় কখনও কাউকে বাসায় পাওয়া যায় নাকি? আপনি বইয়ের কথা লিখেছেন কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানটুকু পেতে হলে প্রথমই যে কারুর সাহায্য ছাড়া আমি একা সেই বই পড়ে বুঝতে পারবো, মনে হয় না। দুরূহ বিষয় শুনেছি। সে যা হোক, আমি চেষ্টা করবো।

গৌরপ্রিয় দাশগুপ্ত আপনার কাছে চিঠি লিখেছিলেন দেখতে পাচ্ছি। ওঁর সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আছে, একজন সাহিত্য-সেবক। এক 'নটরাজ' পত্রিকার সম্পাদক ছাড়া অন্যভাবেও হয়তো আপনি ওঁকে চিনতে পারবেন : ওরিয়েন্টাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ঢাকার ব্রাঞ্চ—ম্যানেজার বি. ভি. দাশগুপ্ত ওঁর বাবা। আমি ভালোই আছি। আশা করি আপনি ভালো আছেন। আমার নমস্কার জানবেন।

আশা করি ক্রীসমাসে আপনার সাথে দেখা হবে। কলকাতা থাকতেই আমার একান্ত ইচ্ছা ; কলকাতা সম্বন্ধে একখানা বিশদ উপন্যাস লিখবার ইচ্ছা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখেছি। এখানে মোটেই ভালো লাগছে না। কিরণশঙ্করের কবিতার বই শীগ্‌গিরই বেরুচ্ছে ; এবারে ঢাকা হলের বার্ষিকী বাসন্তিকা তাঁরই সম্পাদনায় বের হবে। ইতি—

আপনার
সোমেন

তিন :

৪৭ লালমোহন সাহা স্ট্রীট,
পোঃ উয়ারী, ঢাকা।
৯. ১২.৩৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অনেকদিন যাবৎ আপনার কোন সংবাদ পাচ্ছি না। এর মধ্যে কয়েকদিনের জন্য অন্যত্র গিয়েছিলাম, এসে দেখি, অমৃত ঢাকায় নেই। শুনতে পেলাম সে এখন কলকাতায়। এতদিনে তার সাথে আপনার দেখা হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি সবদিক থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কোনপক্ষে কোন সংবাদ নেই। 'সবুজ বাংলার কথা'র কথা ভেবে চিন্তিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

হচ্ছি—অমৃতের স্থানে কে ভার নিলো, গত সংখ্যা ঢাকায় দেখলাম না কেন ইত্যাদি। অমৃতর সাথে আমার কিছু কথা আছে, অথচ ঠিকানা জানিনে। আর, সে-ও কেমন আজ কতোদিন যাবৎ গিয়েছে, একটা চিঠি পর্যন্ত দিলে না। এমন খেয়ালী আর আমি কোনদিন দেখিনি।

তাছাড়া, আপনি? দাবী কথাটা যদিও আপনার মুখেই শুনে কৃতার্থ হয়েছি, কিন্তু আপনার ওপরও যে উল্টো কারুর দাবী থাকতে পারে, সে কথাটা আপনাকে অস্বীকার করতে দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।

সেদিন একখানা বই এনেছি, বইটি পুরনো—লেখকের নামই শুধু আগে জানতাম, তা-ও আপটন সিনক্লেয়ারের একখানা উপন্যাসে তাঁর উল্লেখ দেখছিলাম—যোসেফ ম্যাজিনির *Duties of Man* এই বই পড়ে একটা ভয় হয় সেটা আপনাকে বলছি।—ম্যাজিনি যখন বেঁচে ছিলেন, সে আজকের কথা নয়, তিনি এবং তাঁর মতো অনেক লোককে পেয়েও ইটালী তাঁদের কাম্যকেও বরণ করে নিতে পারলো না, অর্থাৎ সমাজব্যবস্থায় ভারতের অনুরূপ হয়েও এবং অতো আগেও অনেক চিন্তাশীল লোকদের বক্তৃতায় সোস্যালিজমের আভাস পেয়েও, সেখানে আজ ফ্যাসিজম। এই দেখে মনে হয়, ভারতেরও তাই হবে, শেষ পর্যন্ত সেই বহু নিন্দিত ডেমোক্রেসী—রায় বা ভারতের অগণ্য দরিদ্র অধিবাসীর আশা সফল হবে না, কাল নয় বৃটিশের হাত থেকে ছাড়া পেলো, পরশু পড়বে গিয়ে ধনীদের হাতে। আপনাকে আমার শ্রদ্ধার নমস্কার জানাচ্ছি। আপনার কুশল কামনা করি। আশা করি, শীঘ্রই উত্তর পাবো।

ইতি—

আপনার
সোমেন

পত্র : চার

৪৭, লালমোহন সাহা স্ট্রীট
ওয়ারী, ঢাকা।
১৪.১২.৩৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। আমি ঠিক করেছিলাম বৌবাজার বা হ্যারিসন রোড়ের দিক দিয়েই থাকবো খরচ সাপেক্ষ হলেও কারণ, হোটেলেই যখন থাকা। কিন্তু এখন দেখছি আপনার ওখানেই উঠতে পারি—আপনার এমন অযাচিত জিজ্ঞাসায় খুব ভালো লাগছে। দূরে হলে ক্ষতি নেই, আমার কাজই এমন কী! আপনার সাথে সাক্ষাতের কামনা করেছিলাম, তাই সারাক্ষণে পূরণ হলো দেখে ভালো লাগছে। বলতে দ্বিধা নেই, কলাকাতায় এই আমার প্রথম আসা। কিন্তু মনে হয়, কলকাতার অর্ধেকই যেন আমার জানা, আর বাকী অর্ধেক হয়তো অজানা। আমি খুব সম্ভব আগামী রবিবার কিংবা মঙ্গলবার (রবিবারই আপাতত যাবার ইচ্ছে) এখান থেকে রওনা দেবো। সেকথা ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে কাল কি পরশু আপনাকে জানাবো, সেই অনুযায়ী স্টেশনে লোক রাখতে হবে—(আপনাকে আমি চিনবো, না হলে অমৃতকে পাঠালেও হয় কিন্তু ওর ওপর আমার বিশেষ ভরসা হয় না, ঠিকানা (!) সংগ্রহ করেও এখনও যখন একটি চিঠি লিখতে পারলে না।) না হলে অসুবিধে হবে, আমি একা। যাহোক, এখান থেকে যাবার ঠিক দিনটি আমি কাল কি পরশু চিঠিতে জানাবো।

উপন্যাস অনেক আগেই শেষ হয়েছে 'প্রবর্তকে' ছাপানয় মত দিতে পারি। এখন একটা নাটক লিখছি, যাবার আগেই শেষ করবার ইচ্ছে, তাই সময় নেই, গল্প লেখার ফুরসৎ হয় না। তাছাড়া তিন-চারটি বই এখন হাতে, সেগুলো ইতিমধ্যে শেষ না করে দিলেই নয়। পারি তো কলকাতায় গিয়ে যা হয় লিখবো।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। আমি ভালো, আপনার কুশল কামনা করি। ইতি—

আপনার

সোমেন

পত্র : পাঁচ

পঞ্চম চিঠিটি লিখেছেন অচ্যুতকুমার গোস্বামীকে—

ঢাকা

১৭.৮.৪০

প্রিয় অচ্যুতবাবু,

যে বয়সে মানুষের সামান্য অঞ্চলাঘাতেও মূর্ছা যাবার উপক্রম হয় সে বয়স অনেক আগে পার হয়ে এলেও কী জানি কেন আবার নতুন করে আপনার একটি চিঠির আঘাত পাব বলে অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছিলাম। এতদিনে সেই চিঠি এলো। আপনাকে ধন্যবাদ।

সন্তান সম্বন্ধে আপনার কোন উদ্বেগের কারণই নেই, কারণ, পিতা হয়ে আমার দায়িত্ব বড়ো কম নয়। সে যথারীতি বেড়ে উঠছে এবং ভূমিষ্ঠ-সম্ভাবনা পূর্ব-নির্ধারিত সময়েই হবে আশা করি। তাকে ভালোবাসি বলে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। দু'বেলা তো যেতে হচ্ছেই, তাছাড়া রণেশবাবুকে প্রুফ দেখানো লেখা সংগ্রহ করা ইত্যাদি। অতএব মহাশয় কেবল উদ্বেগে অধীর না হয়ে কিছু কাজের ভারও গ্রহণ করুন এসে, অমন পথে বসিয়ে পালানো চলবে না।

....কে নিয়ে মুস্কিলে পড়া গেছে, তিনি কী রকম লেখা দেন সেই ভয়ে সবিশেষ চিন্তিত আছি। আপনি যতজন সাহিত্যিকের বাড়ী পারেন Raid করে আসবেন এবং আমাদের সন্তান-সম্ভাবনাকে সবিস্তারে জানিয়ে আসবেন। হীরেন মুখার্জী এবং সুরেন গোস্বামীর ঠিকানা যেন কোন উপায়ে সংগ্রহ করে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে আসতে পারলে ভালো হয়। তাছাড়া ....অফিস থেকে যে কোন উপায়ে আমার লেখাটি উদ্ধার করবেন। অবিশ্যি কিরণকে দিয়ে ইতিমধ্যে এক চিঠি দিয়েছি। লেখাটির নাম : 'সংকেত'। লেখকের নাম : সোমেন চন্দ।

অবশেষে আপনার প্রতি আমি কয়েকটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি :

১. রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে যখন-তখন যা-তা খবেন না।

২. রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া দেখে চলবেন।

www.amarboi.com ~

৩. ....অথবা ঐ জাতীয় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বেশীক্ষণ কাটাবেন না।

আর কী লিখবো। আপনি তাড়াতাড়ি এসে পড়ুন। ফরিদপুর হয়ে আসবেন কী? করে রওনা দেবেন জানাবেন। আমি ভালো আছি বটে, কিন্তু আপনার বিহনে কৃশ হয়ে যাচ্ছি।

পার্কের সান্ধ্য-বৈঠক যথারীতি চলছে। রণেশবাবু আপনার ভূমিকাটির খুব প্রশংসা করছেন। নৃপেনবাবু লিখতে রাজী হয়েছেন শুনে খুশি হয়েছি।

আপনার শরীর কেমন? সাবধান হয়ে চলবেন। আমার গভীর, আন্তরিক, বিশেষ ভালোবাসা জানবেন।

ইতি

সোমেন

ষষ্ঠ ও সপ্তম চিঠি লিখেছেন তার প্রিয়বন্ধু অমৃতকুমার দত্তকে—

৪৭, লালমোহন সাহা স্ট্রীট

ওয়ারী, ঢাকা।

১৫.১২.১৯৩৮

প্রিয় অমৃত,

কলকাতা গিয়ে এভাবে হাওয়া হয়ে যাবে ভাবিনি। আশা করেছিলাম তোমার চিঠি পাবো। কিন্তু মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় না। আমি ভেবে অবাক হই, তুমি এতদিনেও একটা চিঠি দিতে পারলে না। গতকাল নির্মলবাবুর কাছে চিঠি দিয়েছি। আগামী মঙ্গলবার কলকাতার উদ্দেশ্যে আমি ঢাকা থেকে রওনা হবো। তুমি অবশ্যই শিয়ালদা স্টেশনে থাকবে, তা না হলে খুব অসুবিধে হবে। আমি কিছুই জানি না—চিনি না, কখনো কলকাতা যাইনি। ভালোই হবে, তোমাকে নিয়ে কলকাতার সব জায়গা দেখা যাবে। ভালো কথা, কলকাতায় আমি নির্মলবাবুর বাড়ীতেই থাকবো।

জানতে পারলাম, র‍্যলফ ফক্সের The Novel and People বইখানা কলকাতায় পাওয়া যায়। আমার জন্য অনুগ্রহ করে এক কপি সংগ্রহ করা চেষ্টা করো। বইখানি পড়ার আমার খুব ইচ্ছা। সতীশদার কাছে বইখানির নাম শুনেছি। 'বন্যা' প্রায় শেষ করেছি। যাবার সময় কলকাতা নিয়ে যাবো। 'প্রবর্তক' পত্রিকায় ছাপাতে চেষ্ট করবো। একটা নাটকও লিখতে আরম্ভ করেছি। আশা করি দু'একদিনের মধ্যে শেষ হবে। নাটকটা 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ছাপাতে পারলে ভালো হয়।

ঢাকায় সবাই ভালো আছে, তবে তোমার বিহনে আমরা সবাই কৃশ হয়ে যাচ্ছি। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে না। অচ্যুতবাবুর শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না।

আশা করি, যথাসময়ে তুমি স্টেশনে থাকবে, তা না হলে আমার খুব কষ্ট হবে। নির্মলবাবুর সঙ্গে এব্যাপারে যোগাযোগ করতে পারো। স্টেশনে থেকো কিন্তু, না হলে আমার খুব অসুবিধে হবে।

আমি ভালো আছি। তোমার কুশল কামনা করি।

ইতি

সোমেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও!২৪৮www.amarboi.com ~

পুনঃ— তোমাদের বাসার সকলে ভালো আছে। আমি গত পরশু গিয়েছিলাম তোমাদের বাসায়। তোমার বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে অনেকক্ষণ।

৪৭, লালমোহন সাহা স্ট্রীট
ওয়ারী, ঢাকা।
১০. ৯.১৯৪০

প্রিয় অমৃত,

গতকাল কলকাতা থেকে লেখা তোমার চিঠিটা পেলাম। তুমি আর কতোদিন কলকাতা থাকবে? এদিকে কাজের চাপে আমি দিশেহারা। অচ্যুতবাবু এখনো ঢাকা ফেরেননি। পূর্বে তাঁর চিঠি পেয়েছি। আমি শীঘ্র তাঁকে ঢাকা আসতে লিখেছি।

'ক্রান্তি'র কাজ প্রায় শেষের পথে। তুমি এসে তরতাজা গ্রন্থ দেখতে পাবে। প্রগতি লেখক সংঘের কাজ ভালোভাবে চলছে। কিছুদিনের মধ্যে একটা সভা করতে চাই। সতীশবাবুর সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা হয়েছে। অনুষ্ঠানে কাজী আবদুল ওদুদ, কিংবা বুদ্ধদেব বসু অথবা সুভাস মুখোপাধ্যায়কে আনার চেষ্টা করবো। তুমি প্রাথমিক আলোচনা শেষ করে আসতে পারো কি? ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে আমি কলকাতা যাবো। তখন তাঁদের সঙ্গে দেখা করবো।

গত কয়েকদিন রেল-শ্রমিকদের নিয়ে বেশ ঝামেলায় ছিলাম। লেখার জন্য একটুও সময় পাই না। তবু লিখতে হবে, মেহনতী মানুষের জন্য, সর্বহারা মানুষের জন্য, আমাদের লিখতে হবে। র‍্যালফ ফক্সের বই পড়ে আমি অন্তরে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। কডওয়েলের বইটিও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই না হলে কি মহৎ সাহিত্যিক হওয়া যায়? স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে তাঁদের আত্মবিসর্জন ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আশার কথা বাংলা সাহিত্যের তরুণ লেখকরা এদিকে সচেতন হচ্ছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় লেখক হতে পারেন, তাঁর লেখায় প্রগতিচিন্তার ছাপ আছে। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' পড়ে মনে হলো, তিনি ভালো লিখবেন। তবে রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ মনে হয় খুব ক্ষীণ, আর পড়ালেখাও কম। কলকাতা গেলে মানিকবাবুর সঙ্গে দেখা করবো।

বিপ্লবের জন্য একজন লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। গোর্কির কথাই চিন্তা করো। শৌখিন সাহিত্য করার আর সময় নেই।

অচ্যুতবাবুর ঠিকানা নিশ্চয়ই তুমি জানো। ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করো। পারলে দু'জনে একসঙ্গে চলে এসো। নতুন ভালো কোন বই কিনেছো কি? আসার সময় পত্র-পত্রিকা নিয়ে এসো। নির্মলবাবুর কোন সংবাদ জানো কি? অনেকদিন হলো তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। প্রগতি সাহিত্য সম্পর্কে ওনার ধারণা একটু বিরূপ বলে মনে হয়।

আমি ভালো আছি। তোমার কুশল কামনা করি। যত শীঘ্র পারো ঢাকা চলে এসো। সান্ধ্য-বৈঠকে তোমার অভাব অনুভব করছি—

ইতি
সোমেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৪৯ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট : সোমেন চন্দের কয়েকটি গল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত্রিশেষ

লোকটিকে কী জানি কেন চিত্তর একটু তালা লাগিয়াছে। রতন গোঁসাই-এর গায়ের বর্ণ শ্যাম, চামড়া মনে হয় পালিশ করা সোনার চেয়েও মসৃণ, লম্বা দেহ এবং ঈষৎ মোটা, মাথা ভরা একরাশ ঘাড় পর্যন্ত চুল, একটিও পাকা দেখা যায় না, বেশ করিয়া সযত্নে আঁচড়ানো, চোখ দুটি গোল হইলেও বেশ ভাসা ভাসা—চকচক করে, মুখে সর্বদাই মিষ্টি হাসি। সেদিনেও গল্প হইতেছিল।

রতন একটা আসনের উপর দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া, সামনেই চিত্ত ও আর একটি লোক।

চিত্ত জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাকে কখনও গান গাইতে শুনি নি তো?'

রতন কোন উত্তর না দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। চোখের দৃষ্টি নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। কখন বিকাল হইয়াছে। গাছপালার পাশে তির্যক ছায়া, তার ফাঁকে ভাঙা মিষ্টি রোদ।

রতন আগে কথা আর না তুলিয়া অন্য লোকটিকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'তারপর কালিচরণ, কেমন আছ?'

— 'এই তুমি যেরকম রাখ।' কালিচরণ হাসিল।

— 'আমি রাখবী কী হে? রাখবে একমাত্র আকাশের ঐ —'

রতন উপরের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ আবার বলিল, 'তোমার ছেলেটির না অসুখ করেছিলো বলেছিলে?'

— 'সেরে গেছে।'

রতন এবার হাসিয়া বলিল,'কালিচরণ, এ তোমার ভারী অন্যায়— বিয়ে করেছ সেই করে, খাওয়ালে না, থাক, সেকথা নয় জোর করে ভুলেই গেলাম। কিন্তু তারপর ছেলে হল, তাতেও খাওয়ানোর নামটি নেই, এ কেমন কথা বল? ভারী অন্যায়, ভারী—'

কালিচরণ মুখ নীচু করিয়া হাসিল।

ঘরের ভিতর ছিল বিনোদিনী। তাহার গলা শোনা গেল :

— 'আর সেকথা মানুষের কাছে বলতে উল্টো আমাদেরই লজ্জা করে। ওর সঙ্গে আমাদের এত ঘনিষ্ঠতা, আর মধ্যে কিনা বিয়ে হল, এমনকি ছেলে হল, তাতেও খাওয়ালে না! বাস্তবিক এসব কথা মনে হলে সংসার আর ভালো লাগে না।'

রতন হাসিমুখে বলিল, 'ওরে বাপ্‌রে এতই দুঃখ।'

— 'হ্যাঁ গো।' বিনোদিনী হাসিয়া উঠিল।

কালিচরণ লজ্জা পাইয়া বলিল, 'আচ্ছা, সে হবে' খন। ঝুলন পূর্ণিমা করে?'

—'এখনও দু'মাস বাকী।'

—'সেদিন এখানকার উৎসবে যা খরচ হবে সব আমার।'

রতন খুশি হইয়া বলিল, 'শুনছ ঠাক্‌রুণ?'

www.amarboi.com ~

—'হুঁ।'

কিছুক্ষণ পরে কালিচরণ চলিয়া গেল।

চিত্ত বলিল, 'কেন গাও না বলবে?'

রতন চারিদিকে চাহিয়া মুখ বাড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল— 'বলি শোন। সে অনেক দিনের কথা। তখন আমাদের এখানে রাধা বলে একটি মেয়ে ছিল। ওর একবার অসুখ হল, সে ভয়ানক অসুখ, মেয়েদের যেসব কঠিন রোগ হয়। কবরেজ চিকিৎসা করত। এতে হল না দেখে দু'ক্রোশ দূরের মাধবদি, সেই যে যেখানে খুব বড় রথের মেলা বসে, সেখান থেকে মহিম ডাক্তারকে আনানো হল, সে বুড়ো এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু যার আয়ু সত্যি ফুরিয়ে এসেছে তাকে কী আর বাঁচানো যায়? যায় না। অবস্থা খারাপ হয়ে এল। এমন সময় হল কী, আশ্চর্য, রাধা আমার গান শুনতে চাইল। কিন্তু ডাক্তারদের সাথে রোগীর নীতি মেলে না। তখন এমনি খারাপ অবস্থা যে একটু টু শব্দ করাও ভালো নয়। তাছাড়া রোগীর মনে মরবার/ভাব জেগেছে, প্রশ্রয় দেওয়াও ভালো নয়। ক্ষান্ত হলাম। কিন্তু সে সময় রাধার মুখের যে অবস্থা, যে কাতরতা দেখেছি, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত গান গাওয়া হয়নি, হবেও না।'

শুনিয়া চিত্তর কষ্ট হইল, কিন্তু কথাগুলি আস্তে আস্তে বলার সপক্ষে সে কোন কারণই খুঁজিয়া পাইল না।

রতন নীচের দিকে চাহিয়া কী ভাবিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। আকাশে ধূসরতা, ছায়ার সঙ্গে বাতাস মিলিয়া যেন ভারী হইয়া গেছে। বনপথ স্তব্ধ।

চিত্তর দুটি চোখ কাহাকে যেন এতক্ষণ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, পায় নাই। সে হঠাৎ উঠিয়া বলিল, 'যাই এখন।'

—'এখনই যাবে?'

—'হ্যাঁ, একটু কাজ আছে!'

—'রাতে আসবে?'

—'আজ ঠিক বলতে পারিনে, দেখি যদি পারি—'

চিত্ত চলিয়া আসিল। ধূলা উড়াইয়া রাখাল ছেলেগুলি গরু লইয়া ফিরিতেছে। কুকুরগুলি পথে আসিয়া দাঁড়ায়, আর অনর্থক ঘেউ ঘেউ করে।

সে আনমনে ধীরে ধীরে হাঁটিতেছিল। পথের পাশে সরকার বাড়ীর খোলা পুকুর, জলে ভরা।

হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল এক কলসী জল কাঁখে ললিতার মতোই কে যেন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেছে। চিত্ত আর একটু কাছে গিয়া ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিল, হ্যাঁ, সেই। বুকটা তাহার কেমন যেন করিয়া উঠিল।

তাহাকেই সে খুঁজিয়াছিল।

চিত্ত যে পথের ওপর দাঁড়াইয়াছে, ললিতাকে সেখান দিয়াই যাইতে হইবে। সে ধীরে ধীরে আসিয়া কাছ দিয়াই যাইতেছিল, চিত্ত বলিল, 'এই সন্ধ্যে বেলায় জল নিচ্ছ যে?'

www.amarboi.com ~

ললিতা নীরবে একটু হাসিল। ভারী সুন্দর, চোখ দুটি ছোট হইয়া আসে, লালাভ গালে টোল পড়ে, চামড়ার টানে চিবুকটি সরল হইয়া যায়।

চিত্ত বলিল, 'বারে, বোবা নাকি?'

—'না গো না। বোবা কেন হতে যাব।' ললিতা আবার হাসিয়া সামনে অগ্রসর হইল।

দেখা যায়, সচকিত কতটুকু ফর্সা নগ্ন-পা, মাথা-ভরা চুল, চলমান, জল ভারে বাঁকা দেহলতা। ছায়ার স্নিগ্ধতা ঘিরিয়া রহিয়াছে।

চিত্ত সেখানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পথের বাঁকে অদৃশ্য হইবার আগে ললিতা আর একবার ফিরিয়া চাহিয়াছে।

পথের দিন হাটবার। হাট আখড়ার পিছনেই। ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া দুপুরবেলা দুইটার মধ্যে জমিয়া উঠিল। নানা গাঁয়ের লোকে গিজগিজ করে। আর ভয়ানক গোলমাল। বড় বড় কয়েকটি বটগাছ ডালপালা শিকড় গাড়িয়া সমস্ত জায়গাটিকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়াছে, বট গাছের গোড়ায় উঁচু করিয়া মাটি দিয়া বাঁধানো, সেখানে কেউ নামিতে পারে না। এখানকার লোকদের বিশ্বাস, উহার মধ্যে দেবতার অংশ আছে, তাই পূজা দেওয়া হয়। এই গাছের বয়স কেহ আন্দাজ করিতে পারে না, ছেলে বুড়ো সকলেই বলে যে, জন্মাবধি তাহারা ঠিক এমনই দেখিতেছে। চিত্ত অনেকক্ষণ অনির্দিষ্টভাবে ঘুরিয়া বেড়াইল, দেখিতে বেশ লাগে। গরীবরা, মজুররা আর অল্পবয়সী ছেলেগুলি সস্তা সিগারেট কিনিয়া খাইয়া বেড়াইতেছে। অলস জীবনের একটু উত্তেজনা যেন অনুভব করা যায়।

চিত্ত রতনের ওখানে গেল।

—'কি করছো গোঁসাই?'

—'এই তো এইমাত্র চান করে দুটি খেয়ে নিলাম।'

—'এসো। ওগো ললিতে, সতরঞ্জি পেতে দাও তো।'

ললিতা সতরঞ্জি হাতে আসিয়াছিল, কিন্তু চিত্ত তাহার হাত হইতে সেটা লইয়া বলিল, 'থাক, থাক, বোবা মেয়ে।'

চিত্ত খুব আস্তেই বলিয়াছিল।

লজ্জায় রাঙা হইয়া ললিতা বলিল, 'বা রে!'

আনত মুখের চাপা হাসির ভঙ্গিটি বেশ সুন্দর।

রতনের চোখে কিছুই এড়ায় না, সে বলিল, 'কি বলে গো?'

ললিতা ঘরে যাইতে যাইতে একবার চিত্তর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আমি নাকি বোবা। এমন মিথ্যে বলতে যে পারে, সে কী না করতে পারে।'

— 'মানুষকে মেরে ফেলতে পারে?'

— 'হ্যাঁ।'

রতন একমুখ হাসিয়া উঠিল,— 'শুনছো চিত্ত, কী বলছে?'

— 'শুনেছি!' চিত্তও হাসিতে লাগিল।

www.amarboi.com ~

একটু পরে রতন বলিল, 'হাট জমেছে কেমন?'

— 'ভালো।'

—'আগে দেখেছি, এত লোক হতো না। এখন একটা বাজার চলতে পারে, কী বলো?'

— 'হু।' চিত্ত অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল। তার এই অন্যমনস্কতার কারণ রতন বোঝে! সে ডাকিল,—'ওলো ললিতে, কোথায় গেলে?'

—'বলুন।' ললিতা আসিল।

রতন বলিল, 'আজ ললিতা যা রেঁধেছিল— বিনু ঠাক্‌রুণ কোথায়?'

— 'ঘুমুচ্ছেন ও ঘরে।'

— 'কী বলছিলাম, হ্যাঁ যা রেঁধেছিল, এক কথায় চমৎকার। অনেকদিন এমন রান্না খাইনি।'

চিত্ত ললিতার দিকে চাহিয়া বলিল, 'তা এমন রাঁধলে কার লাভ? ভাগ তো পাইনি। এখন শুনেই পেট ভরাই আর কী।'

ললিতা একপাশে গুটিসুটি হইয়া বসিল।

রতন বলিল, 'অবিশ্যি একদিন যা হয়েছিল সেকথা মনে হলে এখনো হাসি পায়। আমরা না ঘরের মানুষ, কিছু মনে করবো না, কিন্তু সেদিন দু'চারজন অতিথি খাওয়াতে হলে কী ব্যাপারটা হত বল দেখি?'

— 'সে তো আর ইচ্ছে করে করেনি, ভুল হয়ে গিয়েছিল।'

— 'তা বটে, কিন্তু বিনু ঠাক্‌রুণ সেদিন থেকে সত্যি তোমার ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন। আজ আবার কী মতিগতি হল, রাঁধতে দিলেন। সৌভাগ্য তোমার, তুমি সে ক্ষমতার অপব্যবহার করলে না, পাশ হলে, আরে বৈকুণ্ঠ যে!'

একটি মাঝবয়সী লোক পথ দিয়া যাইতেছিল; গোঁসাই-এর ডাকে থামিল।

— 'তোমরা একটু বসো, আমি আসছি!' রতন লোকটির কাছে গিয়া কী কথা বলিতে বলিতে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইল।

ললিতা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এবার চিত্তর দিকে মুখ তুলিয়া হাসিল।

চিত্তও হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তুমি বাইরে গেলে অতবড় ঘোমটা দাও কেন?'

— 'এমনি!'

— 'পাছে আমরা দেখে ফেলি, না?'

— 'দুৎ, তার জন্য নয়। সে বালাই কার থাকে? যার—' ললিতা মাঝখানে থামিয়া গেল। চোখের দৃষ্টি করুণ।

চিত্ত সেদিকে কান না দিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, খুব বুঝি রূপ না? খুব সুন্দরী?'

ললিতা মুচকি হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, খুব সুন্দরী। পুকুরে জল আনতে গিয়ে জলে যখন ছাড়া পড়ে, প্রথমে ভয়ানক কাঁপতে থাকে, ছায়াগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তারপরে একটু পরে ভাঙা ছায়া জোড়া লাগে, আশ্চর্য হয়ে দেখি, সে কী অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে কলসী কাঁখে করে দাঁড়িয়ে আছে, আমার দিকে চেয়ে হাসছে। জলকে নেড়ে দিতে ভয় করে, তাহলে ঢেউ হবে, আর মেয়েটি হারিয়ে যাবে। আমার জল ভরা আর হয় না।

www.amarboi.com ~

শেওলাভরা সিঁড়ির উপর বসে পড়ি। আর চেয়ে থাকি—' ললিতা আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

— 'ইস, এত অহঙ্কার! তারপর আর আছে?'

ললিতা বলিল, 'নিশ্চয়ই আছে। সে আর একদিন বলব।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চিত্ত বলিল, 'সেদিন আমাদের বাড়িতে গিয়ে গান গাইলে, চমৎকার গান, সেই থেকে তোমায় আমি চিনি। কতো বছর এখানে এসেছো?'

— 'কতো বছর আবার? বারোটা মাসও তো হয়নি গো। যেদিন প্রথম এলাম, তখন খুব ছোট ছিলাম।'

— 'নাকি?'

— 'আর এখন কতো বড়ো হয়ে গেছি, অনেক বড়ো?'

— 'এক বছর না যেতেই?'

'হ্যাঁ।' ললিতা নীরবে হাসিল।

— 'চিত্ত বলিল, 'আচ্ছা, এমন চমৎকার গলা পেলে কোথায়?'

— 'তার এক কাহিনী আছে।'

—'সবটার পেছনেই ইতিহাস? কী সে ইতিহাস শুনি?'

ললিতা বলিল, 'সকলেই অনুযোগ করত, সবই যখন আছে, গলার সুর নেই কেন? আমিও ভাবলাম সত্যি তো, কিছুরই তো অভাব নেই, তবে গলায় গান নেই কেন? ঠিক এই প্রশ্নই ঘুরে বেড়াতে লাগল আমার মনে, বোধ হয় দিনরাত। ইচ্ছে যদি তেমন হয়, উপায় একটা তার হয়ই। আমারও হলো। রাতের স্বপ্ন বন্দিনী হলো হাতের মুঠোয়। কিন্তু সেই গানের সঙ্গে একটা দুঃস্বপ্নও এলো, যার জন্যে সারা জীবন চোখের জল ফেলেও সান্ত্বনা মেলা ভার।'

— 'সেটা কী?'

— 'তা অন্যদিন বলবো।'

চিত্ত হাসিয়া ফেলিল, 'তোমার কোন শেষই কী আজকে শেষ হবে না? ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখছো কেন?'

— 'তাতো আমি নিজেই কিছু জানিনে।'

— ' বোধ হয় তোমার এটা স্বভাব।'

— 'স্বভাব?'

— 'হ্যাঁ। এক একজনের এক একটি স্বভাব থাকে, যা নিতান্ত নিজের, যা অন্য কারুর সঙ্গে মেলে না। যেমন ধরো আমার স্বভাব, রোজ এখানে আসা—'

— 'কেন?' ললিতা মুচকি হাসিয়া বলিল।

চিত্ত কী যেন বলিতে যাইতেছিল এমন সময় রতন দেখা দিল, নিজের পরিত্যক্ত আসনে আবার বসিয়া বলিল, 'এক কাণ্ড ঘটেছে!'

ললিতা উৎসুক চোখে তাহার দিকে চাহিল। চিত্ত জিজ্ঞাসা করিল, 'কী?'

কোন ভালো খবরেই রতন বশীভূত নয়, অন্তত বর্ণনার দিক দিয়া। বেশী হৈ চৈ করা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

www.amarboi.com ~

রতন বলিল, 'নদীর ঘাটে একটা মড়া এসে লেগেছে।'

— 'মড়া!'

— 'হ্যাঁ! মড়া একটি মেয়ে, জলে থেকে ফুলে নাকি ভয়ানক দেখতে হয়েছে। তার ওপর পেটে আবার নাকি একটা সন্তান। আত্মহত্যা না সাপের কামড়ে মরেছে কে জানে?'

চিত্ত বিস্ময়ে বলিল, 'তুমি দ্যাখোনি?'

— 'না, শুনলাম। খুব ভিড় হয়ে গেছে সেখানে।'

— 'আমি যাই, চিত্ত উঠিয়া বলিল, ' কোনখানে, খেয়াঘাটে তো?'

— 'হ্যাঁ।'

চিত্ত চলিয়া গেল।

ললিতা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই, আশ্চর্য হইয়া সব শুনিতেছিল, এখন মুখ নীচু করিয়া কী যেন ভাবিতে লাগিল।

রতন বলিল, 'তোমার কী মনে হয় ললিতে, আত্মহত্যা?'

— 'হ্যাঁ।'

হাটের একটানা সোরগোল। বেলা গড়াইয়া যাইতেছে, বিকাল হইতে বেশী বাকী নাই।

সকলেই মড়াটি দেখিয়া আসিয়াছে ; আবরণহীন বিপুল দেহ, ফুলিয়া পচিয়া একটি বিশ্রী গন্ধে সেখানে বাতাস ভরপুর।

ললিতা ঠিকই বলিয়াছে, জানা গেছে মেয়েটি আত্মহত্যাই করিয়াছিল। গাঁয়ের মধ্যে এমন একটা ঘটনা অভিনব বটে। আলোচনার আর শেষ নাই। রতনের ওখানেও জমিয়া উঠিয়াছে।

রাত্রি দশটা হইবে। সকলেই কিছু না কিছু বলিতেছিল ; চুপ করিয়াছিল কেবল ললিতা। সে ঘরের ভিতর বসিয়াছিল। বৈঠক হইতে নিঃশব্দে চিত্ত উঠিয়া গেল। আজ এতোক্ষণে মাত্র চাঁদ উঠিয়াছে। বনানী কথা বলিতে সুরু করিয়াছে। পায়ে হাঁটা সাদা পথ টুকরা জ্যোৎস্নায় মনোরম। সৌন্দর্য আহরণের নেশায় চোখ বুজিয়া আসে ; পা ফেলা মন্থর, দেহ শিথিল। কিন্তু বুকে হাত রাখিয়া সে হাঁটিতে লাগিল। পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্রের উৎস উপভোগে বঞ্চিত এক অনাগত আত্মা জ্যোৎস্নালোকিত শুকনো বালুচরে নিঃশ্বাস না ফেলিয়া ঘুমাইতেছে।

বহিরাবরণ তাহার মা, নিজের মূঢ়তায় অন্যকে মারিবার বেদনায় এখনও বোধকরি তাহার চোখের জল শুকায় নাই।

সেখানে মড়াকে ঘিরিয়া জমিয়াছিল অনেক, নানা জনে নানা কুৎসিত মন্তব্য করিয়াছিল, ওদিকে ললিতাও ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিল। কিন্তু আর একটা জিনিস যাহা তাহার মনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল তাহা হইল ভয়।

ইস, কী ফুলিয়াছে রে বাপু। কী বিকৃত মুখের ভঙ্গী, কেমন বিশ্রী গন্ধ। ললিতা শিহরিয়া উঠিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

আড্ডা এইমাত্র ভাঙ্গিয়াছে। রতন একা কতোক্ষণ বসিয়া উঠিয়া ঘরে গেল। একপাশে কাঁপিয়া কাঁপিয়া তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোয় দেখা গেল, ঘরের এককোণে মাটির উপরেই ললিতা পড়িয়া ঘুমাইতেছে ; শরীর কুঁচকানো, মাথায় একটি, আর এক হাত বুকের উপর ন্যস্ত।

রতন কিছুক্ষণ তেমনি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর কাছে গিয়া ডাকিল, 'ললিতে!' কোন উত্তর আসিল না।

— 'ওগো ললিতে, ললিতে।'

— 'কে?' ললিতা জাগিয়া উঠিল।

— 'এই তো আমি। হঠাৎ সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া রহিল। মুখে কোন শব্দ নাই, আলোর দিকে স্থির দৃষ্টি। রতন বলিল, 'একেবারে খালি যে, ওরা সব কোথায় গো?'

— 'দক্ষিণের ঘরে বোধ হয়।'

— 'কিন্তু তুমি এখানে একা কেন?' রতনের চোখ নিবিড় হইয়া উঠিল, বলিল, 'না খেয়ে দেয়ে এখনই ঘুমুচ্ছো।'

— 'টেরও পাইনি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।' ললিতা দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, 'ওদের ডাক দেবো?'

— 'না।'

— 'তবে কি?' ললিতা তাহার দিকে কতোক্ষণ চাহিয়া কী মনে করিয়া আঙিনায় গেল, কাহাকে যেন খুঁজিল, তারপর বাঁশের খুঁটি চাপিয়া নিঃশব্দে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। এখন মাথার উপরে চাঁদ, জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করে উঠানটি, গাছের নীচে সেই ভাঙা নরম আলো। পৃথিবী ভরিয়া রূপের প্রবাহ বহিয়া গেছে, সেদিকে চাহিয়া চক্ষু বুঝিয়া আসে, বুকে নিঃশ্বাস ভরিয়া উঠে।

কিন্তু বাহিরের পৃথিবীর তুলনায় মনের কোণ শূন্য, কেবল শূন্য। সেই মরুভূমিতে কাহার হাতের স্পর্শ, ঐ জ্যোৎস্নার মত নরম, বুলাইয়া গেছে। কিন্তু কী জানি কেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, যেন চিত্তর সেই আগ্রহের মূলে শ্মশানবাসী খেয়ালই বেশী।

পিছনের দরজার চৌকাঠ ধরিয়া রতন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ললিতা দেখে নাই, টের পাইলে সে হয়তো ভীষণ চমকিয়া উঠিত।

পরদিন ভরা দুপুর মাথায় করিয়া চিত্ত আসিল জল খাইতে। অন্তত তাহার কথায় এই বোঝা যায়। ললিতা তখন রাঁধিতেছিল, হাসিয়া বলিল, 'কেন গো এমন অসময়ে?'

খুঁটি ধরিয়া চিত্ত বলিল, 'তেষ্টা পেয়েছে।'

বিস্ময়ে ললিতার চোখ বড় হইল : 'তা বলে অতদূর থেকে এলে? বাড়ীতে জল নেই? আচ্ছা এ কী রকম তেষ্টা?'

— 'আরো বাপরে ; সে ভয়ানক তেষ্টা, ছাতি ফেটে যাচ্ছে, পেট চোঁ চোঁ করছে, বুক শুকিয়ে আসছে, নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না, এ কী, দাঁড়াতেও তো পারছি না গো।' চিত্ত বসিয়া পড়িল।

তাহার ভঙ্গী দেখিয়া রুদ্ধ হাসিতে ললিতার ফর্সা মুখ যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। চিত্তর জল তৃষ্ণা সত্যি পাইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই কিন্তু সে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার দিকে

www.amarboi.com ~

চাহিয়া রহিল ; কপালে আর তীক্ষ্ণ চিবুকে অল্প ঘাম, ঠোঁটে হাসি, কপালে আর গালের পাশে কিছু শুকনো বিপর্যস্ত চুল।

ললিতা হাত ধুইয়া জল আনিয়া দিল। চিত্ত অল্প একটু খাইয়া গ্লাসটি এক পাশে রাখিয়া বলিল, 'আজ প্রসাদ দেবে? তোমার রান্নার নাকি তুলনা নেই?'

— 'কে বলে?'

— 'সকলের মুখে তাই শুনি, বিশেষ গোঁসাই তো প্রায়ই বলেন।'

— 'গোঁসাইজি?' ললিতা মুচকি হাসিল।

— 'হাসলে কেন?'

— 'এমনি।'

— 'কোন কারণ না থাকলে এমনি কেউ হাসে?'

ললিতা চুপ করিয়া রহিল।

চিত্ত বলিল, 'বললে না?'

— 'এমনি গো এমনি', ললিতা হাসিয়া অন্য কথা পাড়িল ' — 'খাওয়া হয়েছে?'

— 'তা তো মনে নেই।'

— 'খেলে কী না খেলে তাও মনে নেই, হা ভগবান! খিদের ব্যাপারে মানুষ কী করে ভুলে যায়? তুমি কী করে ভুললে?'

চিত্ত বলিল, 'কে বলে আমি খিদের জ্বালা ভুলেছি? তার জ্বালায় একেবারে জর্জরিত। তাই তো বলছিলাম প্রসাদ দিতে। দাও, দাও, ওগো ললিতে—'

ললিতা হাসিয়া ফেলিল, 'মাছরাঙা দেখেছো?'

— 'দেখেছি।'

— 'সেগুলোকে আমার ভালো লাগে না।'

— 'কেন?'

— 'তা ঠিক বলতে পারবো না, কী জানি কেন!'

— 'ও', চিত্ত বলিল, 'আচ্ছা চাতক দেখেছো?'

— 'দেখেছি।'

— 'ঐ পাখিটা আমার দু' চোখের বিষ।'

— 'কেন?'

চিত্ত বলিল, 'কেমন হাঁ করে বৃষ্টির আশায় চেয়ে থাকে ভিক্ষুকের মতো, ভয়ানক অলস, সবই আরামে পেতে চায়। আর পেটভরা অহঙ্কার।'

ললিতা আবার হাসিয়া উঠিল, 'দুষ্টু!'

চিত্ত বলিল, 'কেমন, হয়েছে তো? আমারও মুখ আছে।'

— 'আরও বলবে?'

— 'বলবো না? মুখই তো একমাত্র সম্পত্তি যার ওপর কারুর জোর নেই। বলতে কী বাধা? বলবোই তো!'

চিত্ত চুপ করিয়া রহিল।

কতোক্ষণ ব্যস্তভাবে এটা ওটা নাড়িয়া আড়চোখে ললিতা চাহিয়া দেখিল, একটু পরে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'রাগ করেছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৬৭www.amarboi.com ~

— 'না', চিত্ত হাসিয়া ফেলিল।

ললিতা সহজ হইয়া বলিল, 'আমি তো কোন কাজই করতে পারছিনে। তোমার সঙ্গে কেবল গল্প করছি। কখন একটা অঘটন ঘটে, হাত পুড়ে যায়, কে জানে?'

চিত্ত বলিল, 'তা কখনো পুড়বে না, আর যদি পোড়েই তখন কি করব জানো?'

'জানি!'

— 'কি জানো বলো।'

ললিতা তবু চুপ।

— 'বলো?'

— ' তোমার ওই কালো চোখ চেপে ধরবে আমার ব্যথায়।'

— 'তারপর?'

— 'তারপর চোখ থেকে বেরিয়ে আসবে জল, মুছে দেবে আমার ব্যথা, আমার মন তখন খুশীতে ভরে উঠবে।'

আনন্দে চিত্ত তাহার হাত বাড়াইয়া দিল।

কিন্তু ললিতা চকিতে আর একপাশে সরিয়া হাসিমুখে অর্ধেক সুর মিশাইয়া গাহিল: 'বঁধু ছুঁতে করেছি মানা—'

— 'ওগো ললিতে, ডালা না হয়েছে?' বিনোদিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

চিত্ত একটু দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিল।

আর একদিন দুপুরবেলা আঙিনায় বসিয়া ললিতা একটা আসন তৈরি করিতেছিল। আখড়ার প্রায় সবাই ঘুমাইয়াছে, কাহাকেও দেখা যায় না। চারিদিক নিস্তব্ধ। অলস, মন্থর গতিতে সময় চলে।

বাতাস একটু নাই।

ললিতা একমনে রঙিন সুতায় ফুল তুলিতেছিল ; গলায় গানের একটা কলি। কাছেই অপ্রশস্ত পথে শুকনো পাতার মর্মর উঠিল, কে যেন যাইতেছে। সে মুখ তুলিয়া দেখিল, চিত্ত। সে খুশি হইয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িল। চিত্তর একবার এদিকে চোখ পড়িয়াছিল। সে কাছে আসিয়া বলিল, 'একা কী করছো? গোঁসাই কোথায়।'

— 'ঘুমুচ্ছেন।'

চিত্ত বলিল, 'এক গ্লাস জল খাওয়াবে?'

— 'আবার সেই জল, ললিতা হাসিয়া কোল হইতে আসন রাখিয়া উঠিল।

জল খাইয়া চিত্ত বলিল, 'একটা পান?'

ললিতা পান আনিয়া দিল। চিত্ত সেটা মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল, 'কী না সেই গানটা সেই যে ভজহরি গাইতো।— অর্থটা বেশ মনে আছে।'

কী অর্থ, গানটা কে যে গাহিত তাহা হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া ললিতা জিজ্ঞাসা করিল।

— 'অর্থটা হচ্ছে, তোমারই দেওয়া পানে রাঙিয়া ঠোঁট ছাপ এঁকে দেবো তোমার শাদা ঠোঁটে।' চিত্ত তাহার পানে চাহিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল।

ললিতার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি আসনটা হতে লইয়া বলিল, 'একটা কাজ করবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

— 'বলো?'

— 'এখানে আমার নামটা লিখে দাও না, আমি তুলবো।'

চিত্ত হাসিয়া বলিল, 'কী দিয়ে লিখবো?'

— 'দাঁড়াও এনে দিচ্ছি।'

চিত্ত সযত্নে নাম লিখিয়া দিল।

কতোক্ষণ চুপচাপ।

সে বলল, 'তোমার সেই গল্পটা তারপর কী হলো!'

— 'সেই যে ছায়া দেখে জলভরা আর হচ্ছে না?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'তারপর কতোক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম হুঁশ নেই, একটা ডাকে হঠাৎ চমকে উঠে দেখি সন্ধ্যার বাকী নেই, পুকুরে ছায়া নেমেছে, জলের রং হয়ে গেছে কালো, বাতাস হয়েছে স্থির। কী আর করি, কলসীতে জল ভরে ছায়া ভেঙে রাত করে চলে এলাম। রাগ আর কারুর ওপর নয়, নিজের ওপর। আমি কী পাগল হয়েছি! কিন্তু কে জানতো তখন, একরকম মানুষ আছে, নিজের থেকে পরের ওপর মায়া তাদের বেশী, নিজের চেয়ে পরের সম্বন্ধে তারা বেশি সচেতন? লম্বাপনা লোকটা, চমৎকার চেহারা। এত কথা বলতে পারি কিন্তু সেদিন কী হলো মুখে কিছুই এলো না। এমন নাকি হয়। এর মূলে নাকি আর কিছুই নয়, শুধু ভালো লাগা! যাই হোক তাড়াতাড়ি চলে এলাম এই ভেবে, লোকটি হারিয়ে যাবার নয়। আমার অতি কাছেই সে সারাক্ষণ থাকে।'— পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চিত্তর দিকে একবার চাহিয়া ললিতা হাসিয়া ফেলিল। চিত্ত তাহার একটি হাত ধরিয়া বলিল, 'আমিও দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে, আমাকে পেছনে রেখে মেয়েটি চলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে আমার দৃষ্টিপথ থেকে, কিন্তু মনের পর্দায় আরো উঠেছে জেগে, আমি দাঁড়িয়েই রইলাম।— ওগো ললিতে।'

— 'কী গো!'

— 'ভাবছি আজ কতো কথাই না বললাম! এক একটা দিন এমনি হয়, না?'

— 'হ্যাঁ!'

— 'নইলে কে জানতো, তুমি আসবে এখন?' ললিতা আবার হাসিল। তাহাকে যেন একটা রোগে পাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু চিত্ত ইহাই চায়। হাসিলে এত সুন্দর দেখা যায়, সে আগে কখনও এরকম দেখে নাই। সে বলিল, 'আসনটা কার জন্যে করছো?'

— 'যে বসবে তারই জন্যে।'

— 'গোঁসাই?'

— 'আজ তবু একটু ঘুমিয়ে নিলুম', দু'জনকেই ভয়ানক আশ্চর্য করিয়া রতন দেখা দিল, বলিল, 'দুপুরবেলা কখনো আমার ঘুমের অভ্যাস নেই, আজ কী জানি কেন হলো! চিত্ত কখন এলে, আরও আগে?'

চিত্ত কিছু বলিল না।

রতন দু'জনের দিকেই একবার করিয়া চাহিয়া বলিল, 'ললিতা ভারী কাজের মেয়ে, এদিক দিয়ে অমন যে বিনু ঠাক্‌রণ তাকেও হার মানায়। কী ললিতে, বসবার একটা কিছু দাও?'

www.amarboi.com ~

ললিতা উঠিয়া আসন আনিয়া দিল।

বসিয়া রতন বলিল, 'কালিচরণ আসবে বলেছিলো, ওর জন্যেই কতোক্ষণ বসে, কী আর করি, শুয়ে পড়লাম। ব্যাটার কী কথার ঠিক আছে। বলেছে না ঝুলন পূর্ণিমার সময় খচর করবে, দেখো সেব মিছে কথা। তারপর তুমি যখন এসেছিলে কাউকে দিয়ে ডেকে আনলেই তো পারতে। দিনে ঘুম সইতে পারি না, পরে আর কিছুই ভালো লাগে না। অনেকক্ষণ নিশ্চয়ই এসেছো?" রতন টের পাইয়াছিল আগেই। চিত্ত সংক্ষেপে বলিল, 'হ্যাঁ!'

রতন বলিল, 'ললিতাও আমারই মতো। কুঁড়েমি কাকে বলে জানে না।'

— 'তবে একবার গল্প পেলে—' চিত্ত উঠিয়া পড়িল।

— 'যাচ্ছো?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'আবার কখন আসবে?'

— 'সন্ধ্যাবেলা।'

চিত্ত চলিয়া গেল। রতন কতোক্ষণ তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ললিতাও কখন সরিয়া গিয়াছে।

আজ অনেকদিন পরে আবার বিকেলবেলা চিত্ত পুকুর পারে ছিপ লইয়া বসিল। কাছে একটি লোকও নাই, কেবল পার ঘেঁষিয়া কয়েকটা গরু ঘাস খাইতেছে।

বঁড়শি ফেলিয়া, সে নিস্তরঙ্গ জলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আকাশে একটুকরো মেঘ নাই। পুকুরের চারিদিকের গাছের পাতা নড়ে না। ওদিকের তালগাছটায় বসিয়া কয়েকটা শকুন বোধহয় ডানা নাড়িতেছে, তাহারই শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসে। দিকচক্ররেখা, চিত্ত যে জায়গায় বসিয়াছে, সেখান হইতে দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যায়, পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ, দীর্ঘ, সোজা উজ্জ্বল আলোর রেখার সমষ্টি।

চিত্ত যেন অতি সন্তর্পণে কী লক্ষ্য করিতেছে : তাহার মনে হাস্যমুখী এক মেয়ে ছায়া ফেলিয়াছে। সিঁথিবিহীন চুল টান করিয়া বাঁধা, চোখ দুটিতে ঝরিয়া পড়ে, ঈষদুমুক্ত ঠোঁটে কত কথা যেন থামিয়া আছে।

ললিতা যেন আসিয়া দাঁড়িইয়াছে তাহার চোখের সামনে। হাত বাড়াইয়া চিত্ত তাহাকে ধরিতে গেল কিন্তু সে তাহার হাত সরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে দৌড় দিল। যেন বিদ্যুৎ।

চিত্ত তাহার পিছনে পিছনে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া দেখিল, ললিতা মুখে হাত চাপিয়া ঘরের এককোণে দেওয়ালের সঙ্গে লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সে কাছে গিয়া তাহার কাঁধে দুই হাত রাখিল।

বলিল, 'হাত দিয়ে মুখ ঢেকেছো যে!'

হাত দুইটি সরাইয়া দিতেই ললিতা আবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

চিত্ত নত হইয়া বলিল, 'ঠোঁট ছুঁয়ে থামাবো নাকি হাসি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৬৩ www.amarboi.com ~

ললিতা যেন একটা অবলম্বনের মতো তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

একটু পরে চিত্ত বলিল, 'ওগো ললিতে আজও তোমার কাছে একটা পান চাইছি।'

— 'এই ভর সন্ধ্যেবেলা, এখন কতো কাজ।' ললিতা বলিল,—'আলো জ্বালাতে হবে না?'

তাহার হাত ধরিয়া সে বাহিরে আসিল।

এখনও একটু আলো আছে, সব অস্পষ্ট দেখা যায়। এমন সময় তাহারা দেখিল, ঠকঠক শব্দ করিয়া খড়ম পায়ে রতন এদিকে আসিতেছে।

চিত্ত চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু সে ডাক দিয়া বলিল,— 'কোথায় যাচ্ছো গো, আমি যে তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। তোমার সঙ্গে কদিন ধরে ভালো করে কথা বলতেই পারছি না। এসো, বসো।'

রতনও বসিল। বলিল, 'ললিতে এখনও আলো জ্বালাওনি, কখন জ্বালাবে বলো? তোমাদের কী সে দিকে হুঁশ আছে।'

চিত্ত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রাখিল।

তালপাতায় ডানার ঝাপট। চিত্ত স্বপ্ন হইতে চমকিয়া উঠিল, দেখিল : অন্তর্দৃষ্টির সীমানায় ললিতা অদৃশ্য হইয়া গেছে, আর কিছুই নাই, ধূ ধূ করে শূন্য মরুভূমি।

সূর্য অস্ত গেছে। সে বঁড়শি গুটাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পথে আসিয়া পাশের ঝোপে ছিপটি রাখিয়া সে রতনের ওখানে চলিল।

ঘরের বাহিরে কেহ নাই। চিত্ত চারিদিকে চাহিল, কাহাকেও দেখা যায় না। আখড়ার পূর্বদিকে মেহেদি গাছের বেড়া-ঘেরা একটি ছোট বাগান আছে। চিত্ত সেখানে গিয়া দেখিল, সাজি হাতে ললিতা ফুল তুলিতেছে। সে তাহাকে লক্ষ্য করে নাই।

কাছে গিয়া চিত্ত ডাকিল, 'ললিতে।'

ললিতা চকিতে তাহার পানে চাহিয়া হাসিল।

— 'ফুল তুলছো?'

— 'হুঁ। দাঁড়াও, হয়ে গেছে প্রায়।'

চিত্ত বলিল, 'ইস, এত ফুল দিয়ে কী করবে? আমাকে একটা দাও না, ওই যে গোলাপ ফুলটা—'

— 'তুমি নেবে?' ললিতা খুশি হইয়া ফুলটি ছিঁড়িয়া আনিয়া দিল।

চিত্ত চলিল, 'আর সব কোথায়?'

— 'মাধবদির মেলায় গেছে।'

— 'গোঁসাইও?'

— না। তিনি ওদিকে এইমাত্র কোথায় যেন গেলেন।

ললিতা বাগান হইতে বাহির হইয়া ঘরে ফুল রাখিয়া আসিল। চিত্ত আঙিনায় একটা পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িয়াছে।

ললিতা কতটুকু পুরানো কাপড় আনিয়া সলিতা পাকাইতে বসিল।

চিত্ত বলিল, 'তোমার কথা মনে হতেই চলে এলাম। ভেবেছিলাম আসবো না।'

ললিতা হাসিয়া বলিল, 'আমি তাহলে ভাগ্যবতী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৬৪www.amarboi.com ~

চিত্ত বলিল, 'গোঁসাইর মনে আমার উপর রাগ জমে উঠেছে। আমি লক্ষ করেছি। তোমার কী কোন অসুবিধে হচ্ছে সেজন্যে?'

— 'একটুও না।'

— 'তাই! সে লোক ভালো আমি জানি, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে যাতে ভালো থাকা যায় না। ওকে আমার ভালো লাগে, বিশ্বাস করো ওর ওপর আমার এতটুকু রাগ নেই। যদি উপায় থাকতো হবে ঠিক আগে যেমনটি ছিল তেমনটি হওয়া যেত।'

নতমুখী ললিতা সলিতা পাকাইতেছিল।

চিত্ত বলিল, 'কিন্তু উপায় যে নেই। সেই কবে ছিল যাওয়ার কথা, এখনও যাইনি, কেন জানো?'

— 'জানি গো জানি।'

— 'কী জানো?'

ললিতা হাসিয়া বলিল, 'বলতে পারবো না।'

চিত্ত বলিল, 'প্রথম যে দিন তোমাকে দেখি, সে দিনে তুমি যে গানটি গেয়েছিলে তার রেশ এখনও আমার মনের অনেক উঁচু পর্দায় উঠে বাজছে, আমার খুব ভালো লাগছে। ললিতে—'

ললিতা খিল খিল করে হাসিয়া ফেলিল, বলিল, 'ও মা বলে কী গো! এত আমি সইবো কী করে?'

ললিতা হাসি চাপিয়া সুর ধরিল :

ওগো সুখের জোয়ারে ভাসিছে, আমার মন
ভাবি নাই কভু, লুকায়ে কোথা ছিল এমনক্ষণ।

ললিতা আলো জ্বালাইয়া দিল। এমন সময় রতন আসিয়া উপস্থিত।

রতন বলিল, 'চিত্ত এমন চুপ করে বসে থাকায় কী লাভ? গল্প করো। আমি বাপু মুখ বুজে বসে থাকতে পারিনে, তোমরা একে দোষই বলো আর যাই বলো।'

চিত্ত এতক্ষণে একটু হাসিল, বলিল, 'তুমিই বলো, আমার পুঁজিতে আর গল্প নেই।'

— 'তা আমার বেলায় থাকবে কেন' রতন চকিতে একবার ললিতার দিকে চাহিয়া বলিল, 'সে থাক, আমিই বলি শোন। আমি তখন আমাদের বাড়ী শান্তিপুরে থাকি, অনেকদিন আগের কথা, আমাদের বাড়ীতে একটা কুকুর ছিল, দিশি কুকুর, গায়ের রং সবখানেই কালো কেবল পা আর মুখ ছাড়া সেখানে সাদা রং। মাঝারি গোছের দেহের আয়তন, পা দুটি খাটো, লেজটিও কে যেন কেটে দিয়েছিল। সে যাই হোক আমরা কুকুরটাকে খুব ভালোবাসতাম। ওটাও আমাদের খুব পোষ মেনেছিল, আমরা যা খেতাম সব ওকে দিতাম, দরকার হলে ভালো জিনিস আমিও ওকে খাওয়াতাম। ওর শোবার জায়গা পর্যন্ত করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, একদিন হলো কী, আমারও ছোট বোনকে সে অনর্থক কামড়ে দিল। আমরা তো সকলেই অবাক, এ কেমন করে হয়!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিতরের ইঙ্গিত ধরিয়া কোনরকম বিরক্তি চাপিয়া চিত্ত উঠিয়া পড়িল, রতন ইহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধরিয়া বলিল, "যাচ্ছো কেন, শেষটুকু শুনে যাও।'

— 'না আমি যাই, আমার কাজ আছে।'

— 'শুধু আমার বেলাতেই কাজ না? দাঁড়াও শেষটুকু তোমায় শুনতেই হবে।' রতন হাত ছাড়িল না। মুখটি অস্বাভাবিক কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

— 'কী আরম্ভ করেছ গোঁসাই? ছেড়ে দাও, আমি যাই।'

ললিতা স্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল।

হাত না ছাড়িয়া রতন উষ্ণ স্বরে বলিল, 'তারপর আমরা ভাবলাম এ কেমন করে হয়। এতকাল থাকে, বাড়ির লোকের মতই আদর করেছি, খাবার দিয়েছিল, ভালোবেসেছি, সে কেন এরকম করলে? কৃতজ্ঞতা বলে কোন জিনিসই কী নেই? এছাড়া মানুষ বাঁচে কী করে? তাই যদি না থাকে তাহলে তো আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি, তুমিও আমাকে মেরে ফেলতে পার, ললিতাও পারে। তারপর অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, পৃথিবীতে এমন একশ্রেণীর জীব আছে যারা খুব প্রিয়জনের বুকেও ছুরি বসাতে পারে, এতটুকু দ্বিধা করে না, যাদের শিরা-উপশিরায় বিভীষণের রক্ত, চোখে কংসের দৃষ্টি, ঐ তাদের মতো, যারা তলে তলে ভয়ানক খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওপর দেখে কিছুই বোঝা যায় না। এছাড়া অন্য কিছুই না।' চিত্ত আর পারিল না, জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

ললিতা দ্রুত ঘরে গিয়া দু' হাতে চোখের জল চাপিল।

রতন ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া স্তব্ধের মতো বসিয়া রহিল। এত রাগ তাহার কোনদিনও হয় নাই।

বাহিরের অন্ধকার আরও গাঢ়তায় চাপিয়া আসিয়াছে। একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ। কিছু দূরে কামার বাড়ীর লোহা ঠুকিবার আওয়াজ।

রতন দুই হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া, তার উপরে মুখটি স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিল। চোখ দুইটি তাহার অকারণ জ্বালা করিয়া উঠিতেছে।

একটু পরেই বিনোদিনীরা আসিল। রতন তখনও বসিয়া আছে। বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, ললিতা ওপাশের দরজায় চৌকাঠ ঘেঁষিয়া বসিয়া আছে, মুখ হাঁটুর ভিতরে। সে আন্দাজে কিছু একটা কল্পনা করিয়া মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, 'কী গো ঠাক্‌রুণ, রাত বারোটা না একটা বেজেছে যে ঘুমে মুখ তুলতে পারছো না? আমরাও রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ গো! নিজের রূপের জ্বালায় দেখি চোখে-মুখে পথ দেখতে পাও না। এত অহঙ্কার ভালো নায় বলে দিচ্ছি।'

ললিতা তবু মুখ তুলিল না।

আঙিনা হইতে রতন বলিল, 'ঘুমুচ্ছে নাকি?'

— 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি কী মিথ্যে বলছি?' বিনোদিনী বাহিরে আসিয়া বলিল, 'বয়স তো আমাদেরও একদিন ছিল কিন্তু ভর সন্ধ্যায় ঘুম কাকে বলে সে তো কখনো জানি নি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও!২৬৬www.amarboi.com ~

রতন সায় দিয়া বলিল, 'ওকথা আর বলো না বিনু ঠাক্‌রুণ, তোমার পায়ের ধুলোর যোগ্যও তো ও নয়।'

বিনোদিনী খুব খুশি হইয়া কাছে আসিয়া বলিল, 'এ বেলা শুধু দুধ খাবেন বলেছিলেন, এখন আনবো?'

— 'না থাক্।'— রতন তাহার হাত ধরিল। বিনোদিনী চারিদিকে একবার চাহিয়া নিজেকে ছাড়িয়া দিল।

কালিচরণ কথা রাখিল ঠিকই।

ঝুলন পূর্ণিমা রাত্রি। অনেক লোক জমা হইয়াছে। একটু বেশি রাতে কীর্তন আরম্ভ হইবে, এখন গল্প চলিতেছে, রতন রোজ যেখানে বসে সেইখানেই বসিয়া, আর চারিদিকে অন্যান্য সব লোক। সকলের শেষে খাওয়া হইবে। কালিচরণ এখন গাঁজার সরবরাহে ব্যস্ত।

সমস্ত লোকগুলির মাথার উপরে রাশি রাশি ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। মাঝে মাঝে মৃদু গুঞ্জন। রতনের আস্তে মিষ্টি কথা।

রাত্রি একটু বাড়িলে পর কীর্তন আরম্ভ হইল। রতন গান গায় না ঠিকই! সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ইতিমধ্যে চিত্তও কখন আসিয়া এককোণে নীরবে বসিয়াছে। রাগ করিতে সে পারে না। রতন তাহাকে লক্ষ্য করিল কিন্তু ডাকিয়া কিছু বলিতে পারিল না। সেদিনের ব্যাপারটা মনে করিয়া আজ তাহার সত্যি দুঃখ হইতেছে।

সময়ের কাঁটার চলার বিরাম নাই। উৎসবরত মানুষেরও সেদিকে খেয়াল নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি রাত

রাত অনেক।

রাস্তায় লোকজন একটিও নেই। এখন আশ্বিনের শেষ, তাই একটু শীতের আমেজ লাগে। সুকুমার তার জামার কলারটি আরও টেনে ধরলো। নিতান্ত অন্যমনস্ক হয়েও সে শুনতে পেলো, একটা বিড়াল মিউ মিউ করে কাতরস্বরে ডাকছে, হয়তো হঠাৎ কোন খোলা ড্রেনে পড়ে স্নান করে উঠেছে। তাছাড়া ড্রেনের গন্ধও নাকে আসে, রাত্রির বিস্তব্ধতায় দিনের বেলার চেয়েও তীব্র। দূরে একটা কেরোসিনের ল্যাম্প টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলছে। পাশেই একটা দীর্ঘ অস্পষ্ট ছায়া।

সে পুরনো বাড়ীটার একটা ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে সুকুমার থাকে, সামনেই তার মস্ত বড়ো গেট, প্রায় অর্ধেকটা ভাঙা। সর্বাঙ্গ লোনায় ধরেছে। বাড়ী ঢুকতে গিয়ে সুকুমার দেখলো, লম্বা একটা লোক হঠাৎ কোথায় সাপের মত সরে পড়লো। লোকটা কে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এদের ছায়া দেখলেও চিনতে কষ্ট হয় না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সুকুমার বাড়ী ঢুকে পড়লো। ভিতরের মা'র কাশির শব্দ শোনা যায়, সেই কাশি। সুকুমার ডাকলো, 'মা?'

মা'র বদলে ভোলা এসে হাজির হলো।

ভোলা সুকুমারের কুকুর।

কিন্তু একটা সামান্য কুকুরের আগেও ছেলের ডাক না শোনার এই অক্ষমতায় লজ্জিত হয়ে মা চেঁচিয়ে উঠলো— যা এখান থেকে, কেবল পায়ে পায়ে হাঁটে! কতোবার বলি, আমার বাপু এসব ঘেন্না করে, তবু —' মা আর বলতে পারলো না, দরজা খুলে দিয়ে যেন নিষ্কৃতি পেলো। তার চুলগুলো কাকের বাসার মতো উস্কোখুস্কো, মুখে একটা অসাধারণ কাঠিন্যের ছাপ, চোখে একটা অদ্ভুত কাতরতা। ভ্রূ কুঁচকে সে কুকুরটার কাণ্ড দেখলো। সুকুমারের বুকে সে শিশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তার সমস্ত শরীরটাকে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে শুঁকছে। সুকুমার বললে, 'আরে, দাঁড়া, দাঁড়া, আগে ঘরে ঢুকতে দে।'

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে মা আলো হাতে সটান ঘরের দিকে গেল। ভিতরের এই গলির বাতাস ঠাণ্ডা আর ভারী, চারদিকে কেমন একটা পচা আবর্জনার গন্ধ।

ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে সুকুমার তক্তপোষের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। ভোলাও তার বুকের ওপর মুখ রেখে গা চাটবার চেষ্টা করলো। তার কান দুটি নিয়ে খেলা করতে করতে সুকুমার হঠাৎ বললে, 'এবেলা কী রেঁধেছো মা?' কোন উত্তর নেই। বোঝা যায়, বাইরে অন্ধকারে কোথাও সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

সুকুমার আবার ডাকলো, 'মা?'

কিছুক্ষণ পরে ভারী অস্পষ্ট গলায় উত্তর এলো, 'তুই এখন খাবিনে সুকু?' দেখলো, অন্ধকারে দেয়ালে হেলান দিয়ে নীরবে সে দাঁড়িয়ে আছে। সুকুমার বললে, 'তুমি এখাদে দাঁড়িয়ে কেন মা? বাইরে যে হিম পড়ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৬৮www.amarboi.com ~

— 'কোথায় হিম!' ব্যঙ্গের সুরে সে বললে, 'যা গরম পড়েছে!'

এই বলে পরক্ষণেই আবার অন্ধকূপের মতো রান্নাঘরে ঢুকে ভাত বেড়ে ডাকলো, 'খেতে আয়।'

সুকুমারের পেছনে পেছনে ভোলাও ঢুকছিলো। এবার চুপ করে থাকা যায় না। মা চিৎকার করে উঠলো : 'ঢের হয়েছে বাপু, শোবার ঘর এমন কী বিছানা পর্যন্ত তো হয়েছে, এখন খাবার ঘরটা থাক!'

সুকুমার হেসে ফেললো, হাসতে হাসতে ভোলাকে লক্ষ্য করে বললে,—'যা এখান থেকে, দূর হয়ে যা, পাজী কুকুর কোথাকার— আমাদের জাত ধর্ম খুইয়ে ছাড়বি দেখছি!'

একটু একটু করে খানিকটা এগিয়ে পেছিয়ে গিয়ে ভোলা এখন অন্ধকারে শুয়ে পড়লো! অনেক আগেই তার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। ওপরের ঘরের মাতাল দীননাথ চক্রবর্তীর মেয়ে বীণা কয়েকদিন ধরে তাকে রোজ খাইয়ে দেয়। কিন্তু এ ইতিহাসের বিন্দু-বিসর্গও সুকুমার জানে না।

খাওয়া-দাওয়ার পরে সুকুমার একটা বই খুলে বসলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সারাদিনের পরিশ্রমে চোখ তার জড়িয়ে এলো। বইটা পাশে সরিয়ে রেখে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

মা এবার ছেলের পাশে বসলো। ছেলের নিদ্রিত মুখের দিকে চেয়ে চোখের দৃষ্টি তার অদ্ভুত নরম হয়ে এসেছে।

সে তার দেহে গভীর স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তার নিজের ফ্যাকাশে বর্ণহীন চোখেও একরাশ অশ্রু জমা হয়েছে, একটু পরেই সমস্ত বাঁধ ভেঙে হয়তো বইতে থাকবে।

ওদিকে ওপরের ঘরে বসে বসে দুই করুণ চোখে যে মেয়েটি রাত জাগছে, সে বীণা। কার জন্যে এই রাত জাগা? অন্তত তার বাবার জন্যে যে নয়, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে হওয়া চলে। দীননাথ ঘোর মাতাল, বুড়ো হবার আগেই গরুর মতো শান্ত বৌটাকে লাথি-গুঁতো মেরে যমের বাড়ী পাঠিয়েছে। এখন বৌর অভাবে বাইরে রাত কাটিয়ে আসে। সুতরাং দীননাথ চক্রবর্তীর একমাত্র মেয়ে বীণা তার অপেক্ষায় যে রাত জাগে না, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে।

কিন্তু এতক্ষণে সে আলোটা নিভিয়ে দিলো।

সুকুমারের ঘরের ওপর নিবদ্ধ দৃষ্টিকে এতোক্ষণে সে অন্ধকারে ঠেলে দিলো, একটা কুকুরের মতো কুঁকড়ে শুয়ে অনেক আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।

এখন সমস্ত বাড়ীটিই বিদেশে প্রথম আসা কোন মূঢ় বালকের মতো স্তব্ধ। অন্যান্য ভাড়াটের তো অর্ধেক রাতের ঘুম হয়ে গিয়েছে। তারা সারাদিন একমুষ্টি অপ্রচুর অন্নের জন্যে দেহের রক্ত জল করে বাড়ী ফিরে, তারপর সন্ধ্যার পরেই খেয়ে দেয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়, সবগুলো ছেলেমেয়েকে ঘুমিয়ে পড়তে দেয়ার অবসরও তাদের নেই, তার আগেই তাদের নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসে। তারপর, সেদিন যা একটা কাণ্ড ঘটলো, তা যেমন হাস্যকর, তেমনি করুণ। সকলের শেষে কলতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটিতে

www.amarboi.com ~

থাকে নকুল, সে কোন এক বইয়ের দোকানে কাজ করে। তার শরীরটা এত মোটা, ভারী আর লম্বা যে হঠাৎ দেকলে কোন কাল্পনিক দৈত্যের কথা মনে হয়। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে, তার বৌ চিরটা কাল কেবল ছেলেমেয়ে প্রসব করে, তারপর একদিন হঠাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই মরে গেল। নকুল তখন আর কি করবে? এক দরজা দিয়ে স্ত্রীর শবদেহ শ্মশানে পাঠিয়ে আর এক দরজা দিয়ে কোন এক গাঁয়ে মেয়ে দেখতে চলে গেল। যখন ফিরে এলো, তখন তার গায়ে সিল্কের জামা, পরনে নক্‌শি পাড়ের ধুতি, পায়ে চকচকে পাম্প সু, মুখে সিগারেট আর একরাশ পান, আর তার পেছনে দুই হাত লম্বা একটি বৌ, তার আড়াই হাত ঘোমটা। কাপড়টুকুও ভালো করে পরতে জানে না, কোমরের নীচে দেহের প্রস্থটুকু কাঠির মতো সরু। সেদিন রাত্রে এই বৌটিই হঠাৎ ভীষণ চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, তারপর বাকী রাতটুকুও শূকরের মতো চিঁ চিঁ করে কেঁদেছিল। বাস্তবিক এমন কাণ্ড কমই দেখা যায়। তখন একটি গল্প নিয়ে বাড়ীর অন্যান্য বধূ আর মেয়েদের ভিতরও একটা খোরাক জুটেছিল মন্দ নয়, তারা এই নিয়ে অনেক বলাবলি অনেক ফিসফাস করেছে।

দূরে গির্জার ঘড়িতে একটা বেজে গেল। দীননাথ এখনো ফেরেনি। বীণা আকাশ-পাতাল অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো। এদিকে সুকুমারও গভীর ঘুমে অচেতন। কিন্তু মা'র ঘুম কখনো গভীর হয় না। সে কেবল শুয়ে থাকে মাত্র। মাঝে মাঝে জেগে কাশতে থাকে। এই মাত্র সে কেঁদে একটু চোখ বুজেছে, এখনো কান্নার ছাপে অপরিচ্ছন্ন আর বিকৃত তার মুখ। সুকুমার তাকে আর কতো কাঁদাবে?

সুকুমারের কাছে কতো লোক যে আসে তার ইয়ত্তা নেই। সারাদিন ডাকাডাকি লেগেই আছে। সর্বদা যারা আসে তাদের মধ্যে গ্লাস-ওয়ার্কসের সামসুর একজন। তার চোখ আর চুল— দুই-ই কটা, চোখে-মুখে সর্বদাই একটা খুশি ঝরে পড়ে। এই সামসুর ছাড়া আরও অনেকেই আসে। তাদের কারুর বয়স চৌদ্দ, কারুর বয়স চল্লিশ ; যার বয়স চৌদ্দ, তার নাম অনিল। এদের নিয়ে মাঝে-মাঝেই জটলা করে সুকুমার, সকলে মিলে রুদ্ধ ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। রাশিয়া, লেলিন ইত্যাদি দু'-একটা পরিচিত কথা ছাড়া মা এদের কথা কিছুই বুঝতে পারে না।

একদিন একটা ব্যাপার ঘটলো চমৎকার। সুকুমার গঠাৎ সামসুরকে লক্ষ করে বলল, 'একা এটা বিড়ি খাচ্ছেন। দিন একটা?' সামসুর অমনি মেঝের ওপর একটা বিড়ি ফেলে দিলো। এবং সেই বিড়িটা জ্বালিয়ে সুকুমারের কী সহজ স্বাচ্ছন্দ্য টান।

ব্যাপার দেখে মা'র দুই চক্ষু স্থির। আর কখনো সে তাকে বিড়ি বা সিগারেট টানতে দেখেনি। তার চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে এলো।

হা-হা করে হেসে সুকুমার বললে, 'দেখুন, মা কেমন রেগেছে!' সুকুমার তার হলদে দাঁতগুলি বের করে হাসলো।

সুরেন মুখ বাড়িয়ে বললে, 'আমাদের কিছু দোষ নেই, মা!' মা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'উহুঁ, তোমাদের কিছু দোষ নেই, তোমরা সব শান্ত সুবোধ বালক!' তারপর সুকুমারের দিকে লক্ষ করে বলল, 'তোরা মনে করিস আমি কিছুই বুঝিনে কিন্তু আমি সব বুঝি!'

www.amarboi.com ~

এই শুনে সকলেই হেসে উঠলো। সুরেনের গলাটাই শোনা যায় সবচেয়ে বেশী। সে আস্তে কথা বলতে পারে না। যত বাজে বা হাস্যকর কথাই হোক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে সে কথা বলবে। জামার বোতাম তার কোন কালেই থাকে না। তবু বোতাম লাগানোর বৃথা চেষ্টা করতে করতে সে বললে, 'কী বোঝেন, বলুন, আমরা সবাই শুনি।'

মা তার দিকে একদৃষ্টে চাইলো, এই মধুর স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় মুখের কাঠিন্য চেষ্টা করলো দূর করতে, কিন্তু চেষ্টা করেও যেন পারলো না।

সুকুমার বললে, 'বুঝলে না! আপনারা পাভেলকে জানেন?'

— 'পাভেল?'

— 'সে কী, গোর্কির 'মা' পড়েন নি?'

— 'হুঁ, পড়েছি, পড়েছি।'

— 'ইনিও সেই পাভেলের মা, সেই মা!' সুকুমার মা'র দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।

এর কয়েকদিন পরেই সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর প্রদীপ জ্বালিয়ে অনেকদিন পরে মা একখানা বই খুলে বসলো। বইটা পড়ে-পড়ে তার এত ভালো লেগে গেল যে ওদিকে যে নটা বেজে গেছে, সেদিকে তার এতটুকু খেয়াল নেই। এক সময় কুকুরটার কলরবে বই-এর প্রতি তার মনোযোগ কিছুক্ষণের জন্যে ভেঙেছিলো বটে, কিন্তু একটু পরেই আবার সে পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছিলো। ভাবলো; ছেলের আসতে এখনো অনেক দেরি, রাত এগারোটার আগে সে কখনো আসে না। কিন্তু সেদিন সুকুমার হঠাৎ এসে পড়লো। দরজা খোলা পেয়ে এত চুপি চুপি সে আসতে পেরেছিলো যে, ভোলা একবার আনন্দে ঘেউ ঘেউ করে উঠলেও বইটি তাড়াতাড়ি লুকোনোর অবসর মা পায়নি।

তার হাতে বই দেখে সুকুমার বিস্মিত। জামাকাপড় খুলতে খুলতে সে বললে, 'ও কী বই পড়ছো, মা!' ভ্রূ কুঁচকে দাঁতে দাঁত চেপে— কিন্তু বোকার মতো একবার হেসে মা বললে, 'কেন, তোরা পড়িস আমরা পড়তে পারিনে? আমাদের পড়ায় দোষ আছে নাকি?'

বই-এর মলাট দেখেই সুকুমার চিনতে পেরেছে।

ভয়ানক খুশি হয়ে সে বললে, 'তুমিও এই বই পড়ছো, মা? দোষ আছে কে বললে? কিছু দোষ নেই। তুমি সত্যি সত্যি পাভেলের মা হতে পারবে। আমি অবিশ্যি পাভেলের মতো হতে এখানো পারিনি? তবে হবো।—'

সুকুমার মাটির ওপর শুয়ে পড়লো, মার কোলে মাথা রেখে বললে, 'মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও না, মা? পিঠেও একটু হাত বুলিয়ে দেবে?'

— 'বারে, আমি পড়বো না বুঝি?'

সুকুমার আশ্চর্য হয়ে গেল, এমন সহজ চাপল্য-ভরা কথা সে অনেকদিন শোনেনি।

কিন্তু ছেলের মুখের দিকে চেয়ে পরক্ষণেই মা-র মুখ কঠিন হয়ে এসেছে, মনে হলো যেন একটা ভয়ানক অপরাধ করে ফেলেছে সে, চোখের চারপাশের চামড়া তার কুঞ্চিত হয়ে গেল, তীক্ষ্ণ নাক আরও তীক্ষ্ণ হয়ে এলো, বইটি পাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে সে ভারী গলায় বললে, 'দাঁড়া, দিচ্ছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৭২www.amarboi.com ~

মা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু গভীর নয়— গভীর ঘুম তার কখনো হয় না— তন্দ্রার মতো খানিকটা। তার গলার খর্ খর্ শব্দ বেশ শোনা যায়, হয়ত এখুনি উঠে কাশতে বসবে। চোখের জল এখনো শুকোয়নি।

ওদিকের বারান্দায় একটি কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপরে পড়ে ভোলা ঘুমুচ্ছে। কোথায় একটু খর্ খর্ শব্দ শুনে একবার চোখ মেলে চাইলো, বাক্স থেকে নেমে এদিক-ওদিক একটু হাঁটাহাঁটি করলে তারপর বাক্সের ওপর উঠে আবার শুয়ে পড়লো। বারান্দায় ওদিকটায় শুয়ে-শুয়ে সেখানে কেমন সেগুলি যথাস্থানে যাচ্ছিলো।

সৈন্যগুলি খুব লম্বা আর খুবই জোয়ান, পায়ে লোহার মতো বুটের জুতো, গায়ে খাকি শার্ট, গলার আওয়াজ মরচে-পড়া লোহার মতো কর্কশ, তাদের কথাগুলোকে মনে হয় যেন ইস্পাতে ইস্পাতে ঠোকাঠুকি করে মরছে। তাদের দেখে রাস্তার পাশে লোক জমে গেল, মাথার ওপরে আগুনের মতো রৌদ্রকেও উপেক্ষা করে তারা বিস্ময়ে তাদের কার্যকলাপ দেখতে লাগলো। কোন একটা কাজে এসে রাস্তা বন্ধ দেখে সুকুমারও সেই জনতার ভিতর দাঁড়িয়েছিল। তখন খচ্চরের গাড়িগুলো বিপুল ঝন্ ঝন্ শব্দ করে রাস্তা দিয়ে চলছে, প্রত্যেকটি গাড়ীর সামনে আর পেছনে কিছু কিছু সৈন্য। এমন সময়ে হঠাৎ একটা কাতর 'কুঁই' 'কুঁই' শব্দে সকলে বিস্ময়ে চেয়ে দেখলো, ছোট বাদামি রঙের একটা কুকুর— তার গলাটি গাড়ীর ওপরে ভারী কলের সঙ্গে একটা সরু দড়ি দিয়ে বাঁধা— খচ্চরের পায়ের তলায় কয়েকবার এদিক-ওদিক হয়ে রাস্তার এই পাশে ঠিকরে পড়ে কাৎরাচ্ছে। ব্যাপার দেখে রাস্তার দুইপাশের লোকগুলোর চোখ আতঙ্কে বড় হয়ে গেল, সকলেই একসঙ্গে 'ইস্' শব্দ করে দুঃখ প্রকাশ করলো, তারা অনুমান করলো যে, কুকুরটা নিশ্চয় গাড়ীর নীচে চাপা পড়েছে। একটু পরেই কাৎরাতে কাৎরাতে মারা যাবে।

কিন্তু কুকুরটা নেহাতই নাছোড়বান্দা, তার মরবার সম্ভাবনা যদিও সম্পূর্ণই ছিল, তবু সে মরলো না। গাড়ীটা তখনো চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও হেঁচড়াচ্ছে।

এমন সময় একটা সৈন্য এসে দড়িটা ছিঁড়ে তাকে পাশে ফেলে দিলো। সুকুমার দৌড়ে গিয়ে তাকে কোলে করে নিয়ে এলো।— দুপুরের রৌদ্র আগুনের মতো গায়ে বিঁধছিলো, জনতার চাপে গরম আরও বেশি, সৈন্যগুলির উৎকট ঘামের গন্ধে চারদিকের বাতাস ভরপুর। সুকুমারের বুকের কাছে মুখ রেখে বাচ্চা কুকুরটা চিঁ চিঁ করে কাঁদতে লাগলো। রাশি রাশি লোমের উষ্ণতা সুকুমারের গায়ে লাগছে।

তার নামকরণ করা হয়েছে ভোলা। ভোলা এখন অনেক বড়ো হয়েছে। সে এখন একলাই নির্ভয়ে এদিক-ওদিক বেড়িয়ে আসে, তার দাপটে এখন মানুষও ভয় পায়, অনেক কুকুরও লেজ তুলে দৌড় দেয়। কিন্তু সুকুমার তাকে স্পষ্টই বলে দিয়েছে : 'দ্যাখ, কুকুর-পোষ্যটা নিতান্তই বড়লোকী ব্যাপার কিন্তু আমি গরিব। একবেলা ভাত জোটে তোর আর একবেলা জোটে না। আমি যা খাই, তুইও তাই খাবি। তাতে বাঁচতে হয় বাঁচবি, না হয় মরবি, বুঝলি?'

এই ভোলা একদিন এদিক-ওদিক ঘুরে অনেক চিন্তা করে আস্তে আস্তে ওপরের ঘরের কাছে বারান্দাটিতে গিয়ে হাজির হলো। বীণা শুয়ে-শুয়ে একটা বই পড়ছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে দেখে নেমে এসে নিতান্ত আপনার জনের মতো বললে, 'এখানে কেন? নিশ্চয়ই টের পেয়েছিস, আমি আজ মাংস রেঁধেছি? (দীননাথ মদ যেমন নিত্যই খায়, মাংস তেমন প্রায়ই আনে) খাবি?'

ভোলা এখানে-ওখানে হুস্ হুস্ করে অনেক কিছু শুকলো ; তারপর ফ্যাল-ফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে লেজ নাড়তে লাগলো।

বীণা একটা অদ্ভুত মমতা বোধ করলো এই কুকুরটার ওপর। সুকুমারের ঘরের দিকে একবার চেয়ে বললে, 'ভালো লোকের হাতেই পড়েছিস। নিজের শরীরের দিকেই নজর দেয়ার সময় যার নেই—' ওই পাশে গদাধরের স্ত্রীকে দেখে বীণা থেমে গেল, হঠাৎ রেগে বললে,—

— 'যা এখান থেকে, যা বলছি, একেবারে ওপরে এসে হাজির হয়েছেন, ভারী ইয়ে আমার! যা এখান থেকে, যা বলছি! ও মাসীমা, আপনাদের কুকুরের কাণ্ড দেখেছেন?' বীণা তাকে তাড়া দিতে দিতে একেবারে নীচে নিয়ে গেল, রান্নাঘর থেকে কিছু মাংস নিয়ে তার পায়ের কাছে ফেলে চুপি চুপি বললে, 'খা!—' তাকে খেতে দিতে গিয়ে সুকুমারের কথা মনে করে বীণার মুখ লাল হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে। বীণা নাক সিঁটকিয়ে বললে, 'তোর গায়ে কী গন্ধ রে! একদিনও চান করিস না বুঝি? কেউ তোকে চান করিয়ে দেয় না, না? দেবে কী, নিজের শরীরের দিকেই নজর দেয়ার সময় যার নেই—' তারপর বীণা চারদিকে চেয়ে নিজের কথাটাকে অর্ধ সমাপ্ত রেখেই একটা সাবান নিয়ে বসে গিয়েছে, তাড়াতাড়ির মধ্যে যতটা পারা যায় তাকে ধুইয়েছে, ধোয়াবার সময় তার সেমিজ ঘামে ভিজে গেল।

বেলা তিনটের পরে সুকুমারের ঘরের কাছে গিয়ে ডাকলো, 'মাসীমা?'

মা চোখ বুজে শুয়ে ছিলো, মেয়েটার ডাক শুনে চোখের পাতার নীচে তার চোখের মণিও কুটিল হয়ে উঠেছে, সে ইচ্ছা করেই কোন সাড়া দিল না।

বীণা তবু ঘরে ঢুকে মাকে ঘুমুতে দেখে নিঃশব্দে জানালার তাকের কাছে গেল, একটা মোটা বই খুলে সেটার নাকের কাছে ধরে একটু শুঁকে আবার বাইরে এসে ভোলাকে লেজ নাড়তে দেখে বললে,'তা হলে আমিও শুয়ে থাকিগে, কী বলিস? কাজের মধ্যে তো কেবল শুয়ে থাকা—' কিন্তু মনে মনে বললে, সুকুমারের কাজের কি শেষ নেই?

অনেক রাতে ভোলার গায়ে সুগন্ধি সাবানের গন্ধ পেয়ে সুকুমার বলছিলো, 'মা, তুমি কি আজ ওকে চান করিয়ে দিয়েছো?'

মার চোখ তখন ছোট হয়ে গেল, গলার ভিতর একটা খুশ্ খুশ্ বোধ করছিলো, কাশতে কাশতে তার মুখ লাল হয়ে গেল, চোখ দুটি যেন ছুটে বের হয়ে আসতে চায়, তবু সে বললো, 'আমাকে একটা ওষুধ এনে দিবি, সুকু?'

কেরোসিন কাঠের ওপর ভোলা তেমনি ঘুমুচ্ছে, এখন রাত দুটোর কম নয়। ভাঙা কলতলায় সঞ্চিত উচ্ছিষ্ট ভাত, পচা ডাল-তরকারি আর মাছের কাঁটার দুর্গন্ধকে ক্ষীণ বাতাসও বয়ে আনে। দেয়ালের কোণ ঘেঁষে মালপত্র ডিঙিয়ে ছোটবড়ো অনেক ইঁদুর এখানে-সেখানে আসা-যাওয়া করে, তাদের খুট্ খুট্ আওয়াজ শোনা যায়।

www.amarboi.com ~

এমন সময় দীননাথ এসে জড়িত স্বরে ডাকলো, —'বীণা ও বীণা?' কোন উত্তর না পেয়ে নিজের মনে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগলো, 'বীণা? ও বীণাপাণি, একটিবার দরজা খোল, মা? তোর বজ্জাত মা-মাগীর মতো তুইও আমায় সারারাত বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবি কী? দরজা খোল, মা?'

বীণা নিঃশব্দে এসে দরজা খুলে দিলো, মদের তীব্র গন্ধ সইতে না পেরে নাকে কাপড় চেপে একটু দূরে সরে দাঁড়ালো।

কিন্তু দীননাথকে খাইয়ে-দাইয়ে বিছানায় আশ্রয় নিতে রাত চারটের আর বাকী থাকে না। নাকে-মুখে কাপড় দিয়ে বীণা শুয়ে পড়লো।

এদিকে কিছুক্ষণ পরেই আবার সুকুমার ঘুম থেকে উঠে বসলো, কিছুক্ষণ অর্ধনিমীলিত চোখে চেয়ে বসে তারপর আলো জ্বালিয়ে একটা বই খুলে বসলো। বইখানা রালফ্ ফক্স-এর "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক নীতি"। সুকুমার পড়তে লাগলো— "সাম্রাজ্যের রাজধানী আড়ম্বরপূর্ণ দিল্লী নগরীর প্রয়োজনাতিরিক্ত জাঁকজমকময় প্রাসাদগুলি নিঃসম্বল কৃষকদের শোষিত অর্থে নির্মিত। দুইটি শাসন পরিষদ, রাজ্য পরিষদ, মন্ত্রীবৃন্দ ও সেক্রেটারী গোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও, শাসন সংস্কার ও নিয়মতান্ত্রিক সুবিধা সত্ত্বেও ভারত সরকারের ভিত্তি ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পরে ১৮৫৮ সালে যাহা স্থাপন করা হইয়াছিল ঠিক সেই অবস্থায়ই আছ ...." সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখে এই ছাপার অক্ষরগুলি মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যায়, অথবা যেন খুব দীর্ঘ হয়ে তাড়া করে মারতে আসে, বা বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রে এক ঝাঁক সৈন্য, চমৎকার এক-একটি বলির পাঁঠা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথবা এও মনে হয়, এক বিশাল মরুভূমি, তার মাঝখানে পাঠশালার মতো সরু জোড়া জোড়া ঠ্যাং—এ ভর করে বড়ো মাথাওয়ালা একদল লোক, বালির ভিতর মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে।

এরা কে! সুকুমার একটু নড়ে-চড়ে বসে চোখ ঘষতে লাগলো। এখন শেষ রাতে বেশ ঠাণ্ডা লাগছে, একটু পরেই ভোর হবে। দূরে হঠাৎ অনেকগুলি কুকুরের মিলিত চিৎকারধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় ; শেষ রাতে পুলিশকে টহল দিতে দেখে তারা নিত্যকার মতোই বিদ্রোহ জানাচ্ছে। ভোলাও সেই শব্দ শুনে বাক্স থেকে নেমে একবার বারান্দায় এপাশে আর একবার ওপাশে ঘুরে আবার স্বস্থানে গিয়ে শুয়ে পড়লো। ওদিকে কলের জল পড়তে শুরু করেছে। প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় গপ্ গপ্ শব্দ হচ্ছে। ওটা যেন পড়বার জন্যেই প্রস্তুত থাকে এবং চিরকালই পড়তে থাকবে এইভাবে।

বাইরে কিছু কিছু কুয়াশা পড়ছে, কোন গাছের চারদিকে একটা মোটা আংটির মতো মনে হয়, বাড়ীর সামনের আঙিনায় যে শেফালী গাছটি একটা ছোলা মুরগির মতো আজও বেঁচে আছে, তার অবশিষ্ট কয়েকটি ডাল থেকে কিছু ফুল একটি-দুটি করে আঙিনার কর্কশ শরীরে ঝরে পড়ছে। এমন সময় বাইরে হঠাৎ একটা গোলমাল, কতকগুলি ভারী পদশব্দ, হিন্দি-বাংলায় মিশ্রিত বুলি, দরজায় ধাক্কাধাক্কি। লাথির শব্দও শোনা যায়। তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করে সুকুমার দ্রুত জানালার তাকের কাছে গেল। ওদিকে মা-ও জেগে উঠেছে। ব্যাপারটা সহজেই অনুমান করে ভয়ে তার গলা যেন বুজে আসতে চায়। সে বললে, 'সুকু, তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৭৪ www.amarboi.com ~

— 'বলো?"

— 'তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি।'

সুকুমার কী একটা জিনিস তাড়াতাড়ি খুঁজতে খুঁজতে অন্যমনস্কভাবে বললে, 'বলো।'

— 'ওরা আর একদিন এসে তোকে খুঁজেছিল।'

সুকুমার কেবল বললে, 'ও—' তারপর তাক থেকে একটা কাগজের বান্ডিল বার করে তার হাতে দিয়ে বললে, —'এটা কোথায় রেখে এসো গো।'

কাঁপতে কাঁপতে মা অমনি বীণার কাছে গেল, তাকে এখন কতো আপনার মনে হচ্ছে। বললে, 'বীণা, মা, তোর কাছে এটা রাখ।'

খানা-তল্লাসী হতে বেলা আটটা বেজে গেল।

দারোগা তাদের সঙ্গে সুকুমারকে নিয়ে যেতে ভুললেন না। সবই স্বপ্নের মতো মনে হয়। স্বপ্ন যখন ভেঙেছে তখন দেখা গেল, মা'র শুকনো দুইগাল বেয়ে দরদর করে জল পড়ছে। কিন্তু একসময় গলা তার খুশ্ খুশ্ করতে লাগলো, এমন কাশি যে, চোখ দুটি ছুটে বের হয়ে আসতে চায় যেন, তার কাশি কী ইহজীবনেও আর যাবে না। ওদিকে ভোলাও চিঁ চিঁ করে গোঙাচ্ছে।

আর বীণার অবস্থা আরও মারাত্মক।

সে আজ বাড়ীর সকলকে উপেক্ষা করে যেন প্রকাশ্য রাজপথে নেমে এলো, সুকুমারের ঘুরে ঢুকে দেখলো ঘরময় ইতস্তত ছড়ানো নানা জিনিসপত্র, বই-কাগজপত্র। সেই রাশি রাশি বই আর কাগজের স্তূপে মুখ গুঁজে বীণার চোখে জল ভরে এলো, চুলের খোঁপা তার খুলে গেল, পিঠ থেকে কাপড়ের আঁচল খসে পড়লো।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো পরদিন। সেদিন দুপুরবেলায় ভীষণ বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। বিকেলবেলায় তা খানিকটা থামলো বটে, কিন্তু বৃষ্টি টিপ টিপ করে পড়তেই লাগলো। সেদিনের পাইকারী ধরপাকড়ে শহরে একটা বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বিকেলে শত শত শোভাযাত্রাকারী বৃষ্টি উপেক্ষা করে মুখে প্রতিধ্বনি দিয়ে নগরের অনেক পথ অতিক্রম করলো। মা বুঝতে পেরেছিলো, এরা কারা এবং কেন।

সে ব্যস্ত হয়ে ডাকলো, 'বীণা! ও বীণা!'

— 'বলুন।'

— 'শুনিস!'— এই বলতেই সেই কাশি আবার শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ঐ বীণা এখন কতো আপনার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকেত

১

তখনো আকাশ ভালো করিয়া পরিষ্কার হয় নাই, নানারকমের পাখি আগামী দিনের ঘোষণায় প্রাণপণে ডাকাডাকি করিতেছে, বনগ্রামের মরা নদীর কঠিন বুকেও ভয়ানক ঝড় তুলিয়া কাহাদের এক লঞ্চ তীরে আসিয়া ভিড়িল।

প্রথমে দেখিয়াছিল অন্ধ দশরথ। তাহার দুই ছেলে— এক ছেলে গিয়াছে বেহালে, আর এক ছেলে যার বয়স অল্প, হাতের বৈঠাটি একপাশে রাখিয়া সে তখন অন্ধ পিতার জন্য এক ছিলিম তামাক ভরিতেছিল, আর দশরথও তখন তাহার হাতের জালটি গুটাইয়া গলাটি একটু ভিজাইবার আশায় পশ্চিমের প্রায়ান্ধকার আকাশের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া ছেলের তামাকের প্রতীক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ কেমন একটা গুম্ গুম্ আওয়াজ তাহার কানে বাজিতে লাগিল, কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগে কান পাতিয়া শুনিয়া সে ডাকিল, 'রাম?'

দশরথ-পুত্র রাম তখন তামাক ভরিতে ব্যস্ত, তাহার কিছুই ভালো লাগিতেছে না, রাগিয়া বলিল, 'ক্যান?'

দশরথ বলিল, 'কিছু হুনস্‌নি?'

রাম মুখ না তুলিয়াই বলিল, 'না।'

দশরথ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'দ্যাখ তো চাইয়া, ইস্টীমার তো না?'

— 'তা অইলে তুমি কিছু দেখতে পাও, না বাবা?'

রামচন্দ্রের বিশ্বাস, তাহার বাবা তেমন করিয়া না দেখিলেও কিছুটা নিশ্চয় দেখিতে পায়, কিন্তু দশরথ ইহা শুনিলে আর রাগ সামলাইতে পারে না। এবার হয়তো শুনিতে পায় নাই, তাই রক্ষা। কোন উত্তর না পাইয়া আবার সে ডাকিল, 'রাম!'

— 'কী।' কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাম একবার সেদিকে তাকাইল : দশরথের কথা মিথ্যা নয়, সত্যই একটা ছোট জাহাজের মতো চোখে পড়ে, এখন আওয়াজ আরও স্পষ্ট—

দারুণ খুশি হইয়া সে বলিল, 'হ, বাবা।'

— 'দ্যাখ্ আমার কথা হাছা কিনা।' দশরথ হাসিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক গল্প জুড়িয়া দিল : সে অনেকদিন আগেকার কথা, বেলতলীর জমিদার বাড়ীর বড় ছেলে সদ্য বিলাত হইতে ফিরিয়া সেই প্রথম যখন নিজ গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তখন আসিবার পথে বিস্তর দুর্ভোগ ভুগিয়া এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তার কিছুদিন পরেই দেখা গেল, মস্ত এক স্টীমার ভীষণ হাঁকডাকের সঙ্গে আশপাশের গ্রামের সমস্ত লোককে আনিয়া হাজির করিয়াছে নদীর পারে। স্টীমার কোম্পানীর নূতন লাইন খুলিয়াছে, তখনকার নদী কী আর এখন আছে। দশরথ সেই দৃশ্য দেখিয়াছে তাহার জীবনে। আজকাল কী আর সেরকম ঘটনা ঘটে। সেসব দিনের মানুষও আজ আর নাই, তাহাদের কীর্তিও নাই। এবং পরক্ষণেই এই অদ্ভুত খবরটি শ্রীরামচন্দ্রের মুখে সারা গ্রামে রটিয়া গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৭৬www.amarboi.com ~

অনেকক্ষণ পরে লঞ্চের সিঁড়ি বাহিয়া যে লোকটি সদলবলে নামিয়া আসিল, তাহার গায়ে চমৎকার পাঞ্জাবী আর সিল্কের চাদর, পায়ে চকচকে পাম্প-সু, মুখে একটি সিগারেট আর মৃদু হাসি।

যাহারা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের কেহ দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, কেহ সেখানে থাকিয়াই বুকের ওপর দুই হাত রাখিয়া এমনভাবে চাহিল, তাহাদের মতো তাহারা চলিয়া যাইবে না, মারিয়া ফেলিবে না তো আর! ইহারা নবীন। যাহারা প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া হাসিল। ইহাদের স্পর্ধা তো কম নয়। ব্যাপার যাই হোক না কেন সবটাতেই একটা বাহাদুরি দেখানো চাই। বাবু, সেলাম। ইয়াসিন একটা গেলাম দিয়া বলিল, আজ জীবনের শেষ ঘণ্টাগুলি ঢং ঢং করিয়া বাড়িতেছে, এতকাল যে সেলামের জোরেই সে সকলের প্রিয় হইয়া আসিয়াছে, আজও তাহার অন্যথা হইবে না।

বাবু সেলাম গ্রহণ করিলেন এবং মৃদু মৃদু হাসিলেন।

২

খবরে যদিও জানা গেল লোকটি এক কাপড়ের কলের ম্যানেজার— একেবারে বড় কর্তা, মিলের জন্য এখানে লোক সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে, তবু তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত রহিল না।

শীতের সকাল। রহমানের বাড়ী পার হইয়া দূরে কাহাকে যেন দেখিয়া বলরাম পাশে সরিয়া দাঁড়াইল, লোকটা একটু কাছে আসিলে পর হাসিয়া বলিল, 'কাকা না গো?' ইয়াসিন বলিল, 'হু'।

— 'কী যে অইছে, দূরের থনে তোমারে চিনতেই পারি নাই। হ্যাশে— খবর হুনছোনি? তোমরা যতই কও, আমার কিন্তু মনডা খালি কয়, এখবর মিছা।'

— 'দুরো। তোমার তো হগলটাতেই খালি সন্দ!' ইয়াসিন পরম নিঃসন্দেহে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল— এমনভাবে চাহিল যেন ইহার পরে আর দ্বিতীয় কথা নাই। সে সকলের আগে নিজের কানে যাহা শোনে, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিবে, এমন হতভাগ্য এ অঞ্চলে কেহ নাই। ধীরে ধীরে সে বলিল, বাবুটি যে কোন মিলেরই বড়বাবু, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তিনি যে লোক-সংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন, একথাও মিথ্যা নহে— বলরাম তাহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে। তাহার ছোটবেলায়ও যে এমনি আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। সে তখন ছোট, হঠাৎ এমনি একদিন কোথা হইতে এক বাবু আসিয়া সারাটা গাঁ তোলপাড় করিয়া তুলিল!—

ইতিমধ্যে আকবর আলী আসিয়া তাহার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল। তাহার হাতে একটি আমের কচি ডাল, সেটা দাঁত দিয়া চিবাইতে চিবাইতে সে মাথা নাড়িতে লাগিল। ফিক্ করিয়া কিছু থুথু ফেলিয়া বলিল, 'লড়াইয়ের খবর রাখনি, ইয়াসিন মিঞা? হেইর লেইগা ফাঁকি দিয়া লোক লিবার আইছে, জান?'

আরো দুই-একজন আসিয়া জুটিয়াছিল। এমন একটি কথা শুনিয়া তাহারা সকলে বিস্ময়ে আর ভয়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সকলে আকবরের দিকে আকৃষ্ট

www.amarboi.com ~

হইতেছে দেখিয়া ইয়াসিন রাগিয়া উঠিল, হঠাৎ নিজের বুড়া আঙ্গুলটি তাহার চোখের সামনে ধরিয়া বলিল, 'তুমি এইটা জান?' আকবর আলী গম্ভীরভাবে বলিল, 'তোমার কুন ডর নাই, হ্যারা বুড়া মানুষ গো নিব না।'

ঝগড়া ক্রমেই বাড়িয়া চিলল। আরও বাড়িত। কিন্তু কে একজন বলিল, 'বাচ্চা মৌলবী!'

সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল, ঝগড়া কিছুক্ষণের জন্য থামিল— এই আশায় যে বাচ্চা মৌলবীই ইহার মীমাংসা করিতে পারিবে।

বাচ্চা মৌলবী বলিয়া তাহাকে সবাই ডাকে, তার একমাত্র কারণ এই যে তাহার বয়স অত্যন্ত অল্প এবং এই বয়সেই সে মৌলবী হইয়াছে। সে পাশের গ্রামেই থাকে এবং মাঝে মাঝে কোন পত্রিকা হাতে করিয়া আসিয়া বেলা দুইটা-আড়াইটা অবধি এ অঞ্চলের সকলকে যুদ্ধের খবর শুনাইয়া যায়। শহরের খবর তাহার কাছে অবিদিত নাই, মাসের মধ্যে পনেরো দিনই তো সে সেখানে কাটায়। এ কথা সবাই জানে, নবাবের সঙ্গে বসিয়া সে খানা খাইয়াছে এবং নবাব সাহেব তাহার হাতে চুমা খাইয়াছেন।

বাচ্চা মৌলবীর পরনে পাঞ্জাবী আর লুঙ্গি, গোঁফ এখনও ভালো করিয়া উঠে নাই, হাতে একটা ঘড়ি। কিন্তু ঘড়িটা কখন চলিতে শুরু করে, আর কখন থামে এ খবর কেউ রাখে না। ঘড়িটা একবার চোখের সামনে ধরিয়া এই শীতের সকালেও পত্রিকা দিয়া বাতাস খাইতে খাইতে মৌলবী শুদ্ধ ভাষায় বলিল, 'ওনারে আমি চিনি।' এই বলিয়া ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে তাহার এক সুদীর্ঘ পরিচয়ের ইতিহাস বিধৃত করিয়া অবশেষে বলিল, 'তাইন লোক নিতে আইছে ঠিকই। রহমান, তোমার ঘরে তো তাঁত আছে, তোমারে নিব আগে।'

রহমান এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, মৌলবীর কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। নতুন বিবাহ করিয়াছে সে, তেলে আর জলে চুলগুলি চমৎকার পরিপাটী, চোখে সুরমা, পরনের জামা আর লুঙ্গি রঙিন।

বেলা হইয়া যাইতেছিল। মৌলবীর সময় নাই, একবার সূর্যের দিকে এবং আর একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'দশটা বাইজা গেছে, আমি যাই, কাজ আছে, আমার একটু চৌধুরী বাড়ী যাইতে অইব।'

আকবার আলী তবু কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু মৌলবীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার পাশে গিয়া ফিক্ করিয়া থুথু ফেলিয়া বলিল, 'মৌলবী।'

মৌলবী পাশে তাকাইল।

আকবর আলী বলিল, 'আমার একটা কথা রাখবা তুমি?'

'কও?'

— 'আমার ভাই-এর লেইগা একটু কইয়া দিবা তুমি—'

মৌলবী পরিষ্কার ভাষায় বলিল, 'দিব, দিব!' বলিয়া তর্ তর্ করিয়া চলিয়া গেল।

শত আনন্দ হইলেও হাসিয়া কখনো আনন্দ প্রকাশ করে না ইয়াসিন। সকলের দিকে একবার তাকাইয়া সে বলিল, 'অহনও বিশ্বাস অয় না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও!২৭৮www.amarboi.com ~

বলরাম আগে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও ইতিমধ্যে আবার বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছে। ইয়াসিনের কাছে ঘেঁষিয়া বলিল, 'কাকাগো, তোমার কাছেই আইছিলাম, একটা আলাপ করুম।' মণ্ডল-পুত্র কিসের পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছে কে জানে। ইয়াসিন হাসিল।

৩

বিকালের রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। গাছের ছায়ার নীচে একটা চেয়ারে বসিয়া ম্যানেজার বাবু মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের গাঁ-টি বেশ ভালো লেগেছে। তোমরাই দেশের গৌরব। ফেমিন হবার আগে সারা ভারতের কা[illegible] জোগাতে তোমরাই। এমনকি বিদেশেও ছড়িয়ে দিতে, অথচ আজ শুকিয়ে মরছো। তোমাদের কদর কজনা বোঝে?' নদীর দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া তিনি বলিলেন, 'সেখানেও এমনি নদীর হাওয়া, নদীর একেবারে পার ঘেঁষেই চমৎকার ব্যারাক সেখানে, তোমরা থাকবে। হাতের কাছে হাসপাতাল, খেলার মাঠ, সিনেমা, যখন যা খুশি!—' ম্যানেজার বাবু মৃদু হাসিলেন।

রহমান নাম লিখাইয়া ফেলিল। আজই রাত বারোটার সময় লঞ্চে উঠিতে হইবে।

বাড়ী ফিরিলে তাহার বুড়া বাপ হুঁকাটি ছেলের হাতে দিয়া বলিল, 'তাড়াতাড়ি খাওন-দাওন সাইরা শুইয়া পড়, বারোটা বাজলে পর আমি ড়াইকা দিমুনে, যাও, শুইয়া পড় গিয়া।'

রহমান পিতৃআজ্ঞা যথারীতি পালন করিল।

তাড়াতাড়ি খাইয়া-দাইয়া শুইতে আর দেরি করিল না।

কিন্তু রাত বারোটা বাজিতে আর কতোক্ষণ লাগে? বুড়া রহমানের ঘরের দরজার কাছে গিয়া ডাকিল, 'বাপ, সময় অইয়া গেছে, অ্যালা ওঠ।'

কোন উত্তর আসিল না, বা কেউ বাহির হইয়া আসিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করিয়া বুড়া মনে মনে হাসিল, নিজের মৃত স্ত্রীর কথা মনে পড়িল।

অথচ এদিকে বারোটা বাজিয়া যাইতেছে। বুড়া আবার ডাকিল, 'রহমান, ওঠ। ইস্টীমার ছাইড়া দিতে আর কতোক্ষণ!' এই বলিয়া নিজের ঘরের দাওয়ায় আসিয়া আবার তামাক সাজিতে বসিল। কিছুক্ষণ এমনি কাটিবার পরও রহমানকে আসিতে না দেখিয়া হুঁকা হাতে বুড়া আবার বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখিল, দাওয়ায় খুঁটি চাপিয়া ধরিয়া অন্ধকারে নিঃশব্দে রহমান বসিয়া আছে।

হুকাটি তাহার হাতে দিয়া বুড়া বলিল, 'তাড়াতাড়ি তৈয়ার অইয়া লও, বাপ, আর দেরি কইরো না।'

রহমান তেমনি খুঁটি ধরিয়া বসিয়া রহিল।

এক হাতে একটি বহু পুরনো লণ্ঠন, আর এক হাতে একটি প্রকাণ্ড চকচকে লাঠি লইয়া পথ দেখাইয়া চলিল বুড়া। রাস্তায় সাপ বা মানুষের ভয় থাক বা নাই থাক, এ দুটিকে ছাড়া সে কখনো পথ চলিতে পারে না। ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে সে বলিল, 'হেইখান গিয়া চিঠি দিও, তা না অইলে চিন্তায় থাকুম।'

রহমান আস্তে বলিল, 'আইচ্ছা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৭৭ www.amarboi.com ~

গোলাম আলীর বাড়ী পার হইলেই একটা মস্ত বকুল গাছের নীচ দিয়া হাঁটিতে হয়। সেখানে বকুল ফুলের গন্ধে চারদিক থাকে। সেই গাছের নীচ দিয়া চলিতে চলিতে রহমানের শরীর অবশ হইয়া আসিল, ঘুমে ভরা চোখ বুজিয়া আসিল, সে অনুভব করিল এখনও যেন সে কারও ফুলের মতো বুকে মুখ রাখিয়া গভীর নিঃশ্বাস ফেলিতেছে।

ঠক্ ঠক্ করিয়া এখানে-সেখানে লাঠি ফেলিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বুড়া আবার ডাকিল, 'বাপ্।'

— 'কও?' কিন্তু কিছুক্ষণ কান পাতিয়া থাকিয়াও রহমান আর কোন কথাই শুনিতে পাইল না। বোধ হয় যা বলিতে হইবে সব ভুলিয়া গিয়াছে বুড়া।

একটু পরেই লঞ্চের আলো দেখা গেল। আশেপাশে অনেক লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই উচ্চস্বরে গল্প করিতেছে। কেহ সিঁড়ি বাহিয়া লঞ্চে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। সব মিলিয়া একটা মস্ত হল্লা।

একটু নির্জনতায় ছেলেকে টানিয়া বুড়া আবার বলিল, 'বাপ?'

— 'কও?'

— 'একটা কথা কমু। এত বুড়া হইয়া গেলাম, তুমি আমারে ছাইড়া কোনো কালে কোনো খানে যাও নাই, কিন্তু আইজ ছাইড়া গেলা, আমার মনডারে কী দিয়া বান্ধুম, তুমিই কও?' বুড়া অনেক কষ্টে তাহার সবগুলি কথা এতোক্ষণে বলিয়া ফেলিল এবং ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এমন দৃশ্যের সঙ্গে রহমানের এই প্রথম পরিচয়, সে কী যে করিবে ভাবিয়া পাইল না।

নদীর উপরের ঠাণ্ডা বাতাসে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো কাঁপিতেছে! চারিদিকে জলের গন্ধ। আকাশে অজস্র তারা। পাশেই আগামী কোন সুখের সৌরভে বিহ্বল লোকজনের হল্লা। বুড়ার শীর্ণ হাতের লাঠিখানাও ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে রহমান উপরে উঠিয়া দেখিল, সেই বাচ্চা মৌলবী সারা লঞ্চময় চরকিবাজীর মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লোকটি এমনি পাতলা ছোটখাটো মানুষ, যেন হাওয়ার সঙ্গে উড়িয়া চলে, এক মিনিটে হাজার মাইল অতিক্রম করে।

রহমানকে দেখিয়া সে ঘড়ি দেখিয়া এদিক-সেদিক তাহার চঞ্চল দৃষ্টি বুলাইয়া তর্ তর্ করিয়া বলিল, 'এতক্ষণে আইছ! টাইম অইয়া গেছে।'

মৌলবী টাইম ধরিয়া চলে। আবার ঘড়ি দেখিয়া সে সামনের দিকে অগ্রসর হইল।

রেলিং ধরিয়া রহমান একা দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক হাত নীচেই তাহাদের গ্রামের নদী, আজ ছাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া অত্যন্ত আপনার বলিয়া মনে হয়। নদীর জলে লঞ্চের আলো পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছে, লঞ্চের ভিতরের মানুষগুলির আবক্ষ ছায়াও সেখানে দেখা যায়, অন্ধকারের বুকে কেবল আরো কতকগুলি গভীর অন্ধকারের মতো মনে হয়। আর তাহাদের আত্মীয়-স্বজনরা— তাহারাও লণ্ঠন হাতে বিদায়ের প্রার্থনায় কাতর।

রহমানের চোখের পাতা বুজিয়া আসিল। সে দেখিল, নদীর জলে কে এক নারীমূর্তি, নাকের-চোখের জলে এক হইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। তাহার নাকের ডগায় ঘাম, ঘর্মাক্ত সমস্ত শরীরটিকে রহমান ঝুঁকিয়া দেখিল। তাহার গায়ে এখনও সেই মেয়েটির ঘামের গন্ধ। আরও নিবিড় হইয়া সে সেই গন্ধ শুঁকিতে লাগিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৮৭ www.amarboi.com ~

ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিল।

কোনরকমে একটা জায়গা করিয়া ছোট পুঁটুলিখানা মাথার নীচে রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল। একটু পরেই সে স্বপ্ন দেখিল। আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাষ, এখন ভয়ানক বাতাস ছাড়িয়াছে, দীর্ঘ সুপারি আর নারিকেল গাছের মাথায় ভীষণ মাতামাতিতে নদীর জলে দুরন্ত ঢেউ, বড়ো বড়ো ধান গাছের শিষগুলি যন্ত্রণায় কাঁপিতেছে, আকাশে পাখির কলরব, রহমান যেন শুনিতে পাইল, তাহাদের গোয়াল ঘরের গরুগুলি 'মা' 'মা' করিয়া কাতরস্বরে ডাকিতেছে। মনে হয় এমন করিয়া যেন তাহারা আর কোনদিনই ঘরটা আসলে গোয়াল ঘর নয় তো, তাহার শোবার ঘর। বৌ তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, গলা জড়াইয়া ধরিল, বুকের মাঝখানে তাহার হাতটি রাখিয়া বলিল, 'এই দ্যাখো, এহান কেমুন ব্যথা। তোমারে ছাইড়া আমি থাকতে পারুম না বন্ধু, মইরা যামু।' একটু পরে রহমান টের পাইল, তাহার দুইটি পা আরও দুইটি পায়ের সঙ্গে সুতার মতো হইয়া গিয়াছে।

—'রহমান? ও রহমান?'

রহমান ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল, ভালো করিয়া চাহিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'কে? আজু?'

মৌলবী তাহার বৌ'র নাম জানিত, হাসিয়া বলিল, 'না, আমি তোমার বৌ না, আমি মৌলবী।'

রহমান চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, 'ও!'

কিন্তু মৌলবী কাজের লোক, তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'ভোর অইয়া আইছে, আর কত ঘুমাইবা?'

রহমান বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, সেখানে অনেক অন্ধকারের সারি এখনও ঠেলাঠেলি করিয়া মরিতেছে।

ম্যানেজার বাবুর কামরায় আলো দেখা যায়।

মৌলবী গল্প করিতে লাগিল, তাহার অভিজ্ঞতার ইতিহাস বলিয়া যাইতে লাগিল, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, রহমান কেবল হাঁ করিয়া শুনিল।

মৌলবী অনেক গল্প করিল।

কিন্তু ভোর আর হয় না, তাহারা উঠিয়া এধার-ওধার অনেক ঘুরিল। দুই-একজনকে জাগাইয়া গল্প করিল। ঘণ্টা দুই চলিয়া গেল। তবু ভোর আর হয় না, বাহিরে তেমনি অন্ধকার, গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতায় কেবল জলের শব্দ।

মৌলবীর ঘড়ির কাঁটা কখন চলিতে শুরু করে, আর কখন গিয়া থামে, সে তথ্য রহমান আজও জানিতে পারিল না, কেবল হ্যাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

আবার সে একা-একা কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল, লঞ্চের এটা-ওটা উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া কতোক্ষণ দেখিল, শেষে হাত পা গুটাইয়া বৌ'র কথা ভাবিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে ভোর হইল। এখন মস্তবড় নদী, ওপারের সীমানা কুয়াশায় ভরা, সূর্যের আলোয় জলের উপর কেহ কতকগুলো চকচকে নূতন টাকা ছড়াইয়া রাখিয়াছে মনে হয়। নদীর দুইপাশে মাঝে-মাঝে ইটের খোলা, পাটের গুদাম।

www.amarboi.com ~

দূরে মিলের চিমনি দেখা গেল। কিন্তু ধোঁয়ার চিহ্ন নাই। কোথা হইতে আসিয়া আবার মৌলবী দেখা দিল। কোন নূতন খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে নিশ্চয়। বলিল, 'আমরা আইসা পড়ছি।'

৪

সকলের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা তাহাদের কর্মস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। সকলে সামনের দিকে ছুটিয়া আসিল। ঐ যে কী একটা গম্বুজের মতো, ওটাই কী তাদের মিল? মৌলবী তাদের বুঝাইয়া দিতে লাগিল। সে সবই জানে। সকলে বিস্ময়ে আর আনন্দে এমন একটা জিনিসের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পৌঁছিতে বেশী দেরি হইল না। ধীরে ধীরে লঞ্চের গতি মন্থর হইয়া আসিল, এখন পাড়ে ভিড়িবে। ম্যানেজার বাবু আসিয়া দেখা দিলেন। কেমন একটা সফলতার আনন্দে তাঁহার সারামুখ উজ্জ্বল। সকলে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। দুই হাত ছাড়িলে যদি চলে সেকানে পাঁচ হাত সরিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু তখনও লঞ্চটা পাড়ে একেবারে ভিড়ে নাই, ধীরে ধীরে যেন একটা ভীষণ কলরব, সহস্র কণ্ঠের মিলিত চিৎকার—ধ্বনি সকলের কানে আসিয়া বাজিল। সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, মিল দেখার আনন্দে একেবারে ভাঙ্গিয়া না পড়িয়া রহমান আগেই কিছুটা লক্ষ করিয়াছিল, এখন সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া শব্দটা আরও লক্ষ করিতে চেষ্টা করিল। মৌলবীর মুখে বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র নেই, সে নিতান্তই নির্বিকারভাবে ম্যানেজার বাবুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ব্যাপারটা সকলের আগে বুঝিবার আশায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ম্যানেজার বাবুর মুখ হঠাৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে, মুখের সেই মৃদুমন্দ হাসি আর নাই। লঞ্চ-চালকদের কী একটা নির্দেশ দিতে তিনি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই যা দেখা গেল, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নাই। নদীর পারেই প্রকাণ্ড চর, ধূ-ধূ করে বালু। তার পরে মিলের সীমানা। সেই ভীষণ গোলমাল আরও ভীষণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড চরটা মুহূর্তে হাজার হাজার লোকে ভরিয়া গেল ; সেই লোকগুলি প্রাণপণে দৌড়িয়া আসিতেছে, প্রাণ যায় কী বাঁচে। ব্যাপার দেখিয়া রহমানের চোখে বিস্ময়ের অন্ত নাই— যেন একটা প্রকাণ্ড নদীর মুখ হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত জল বিপুল বেগে সারাটা পৃথিবী ভাসাইয়া লইল। রহমানের বুক কাঁপিতে লাগিল, নিঃশ্বাস দ্রুত হইয়া আসিয়াছে।

লোকগুলির কতক হুড়মুড় করিয়া জলে নামিয়া পড়িল, লঞ্চটাকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল। আর বেশীর ভাগই দাঁড়াইয়া রহিল পাড়ে। কিন্তু সকলের মধ্যে একটা ভয়ানক চঞ্চলতা, কেহ হাত নাড়িয়া কিছু বলিতেছে, কেহ কেবলই চিৎকার করিতেছে, সকলের মুখে-চোখে— কার্যকলাপে এমন একটা ভাব যেন এখনই পারিলে লঞ্চটাকে ডুবাইয়া দেয়। আর কী গোলমাল! আকাশকেও ফাটাইয়া চৌচির করিয়া দিবে মনে হয়। অমন দৃপ্ত রাগান্বিত পদক্ষেপে তাহাদের পায়ের নীচের ভূমিখণ্ড মুহূর্তে ধসিয়া যাইবে যেন, তাহাদের চিৎকার-ধ্বনিতে নদীর জলও উত্তাল হইয়া উঠিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!২৮২www.amarboi.com ~

কিন্তু রহমান লক্ষ করিয়া দেখিল, একেবারে সামনে একটা লোকের মধ্যে পেছনের সকলের শক্তি যেন একত্রিত হইয়াছে। লোকটার বয়স অল্প, চেহারায় এক হাজার হাজার লোকের মধ্যেও একটা পার্থক্য ধরা পড়ে। সে হাত নাড়িয়া ভয়ানক চিৎকার করিয়া কী যেন বলিতেছিল, প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই শোনা যায় নাই, কিন্তু শেষে গোলমাল আপনিই কমিয়া আসিল।। রহমান আশ্চর্য হইয়া শুনিল, লোকটা দৃপ্তস্বরে বলিতেছে : 'বন্ধুগণ, আমাদের দেখে আশ্চর্য হবেন না। আমরা এই মিলেরই শ্রমিক, আপনারা যেখানে কাজ করতে এসেছেন আমরা সেখানেই প্রথম কাজ করতে আসি। আমরা জানি আপনাদের শুধু চাকরির কথা বলেই আনা হয়েছে, আসল কথা বলা হয় নি। এই চাকরির ভেতর কী রহস্য তা আপনাদের কাছে গোপন করা হয়েছে। বন্ধুগণ, আমাদের কথা আপনারা একটিবার শুনুন, আমাদের বিশ্বাস করুন। যারা আপনাদের চাকরি দেবে বলে নিয়ে এসেছে তাদের আপনারা চেনেন না, কিন্তু আমরা চিনি। আমরা তাদের কাছে শুধু আমাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাতে গিয়েছিলাম, আমাদের সামান্য কয়েকটা মাত্র দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম কিন্তু তারা গ্রাহ্যই করেনি। তারা আমাদের মুখের ওপর লাথি মেরেছে! কিন্তু আমরা কেন তা সহ্য করবো? আমরা স্ট্রাইক করেছি, মিলের কাজ বন্ধ। আমরা তার প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমাদের এই শক্তিকে পিষে ফেলবার জন্যে, আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নেওয়ার জন্যে তারা মিথ্যে কথা বলে আপনাদের এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আপনারা তাদের বিশ্বাস করবেন না। ভাই সব। আপনাদের চোখে পৃথিবী যেমন, আমাদের কাছেও তাই, আপনাদের যতখানি শোষণ দুঃখ-দুর্দশার কষ্ট সহ্য করে চলতে হয়, আমাদেরও তাই। আমাদের ঘর নেই, বাড়ী নেই, আজ এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে কাল কোথাও দাঁড়াবার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই— আমার চাষী ভাইরা, দোহাই আপনাদের, ভাই হয়ে ভাই-এর মুখের ভাত এমন করে কেড়ে নেবেন না। একথা মনে রাখবেন, আজ যারা আমাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তারা আপনাদেরও সেই লাথি থেকে রেহাই দেবে না। বন্ধুগণ, আমরা আপনাদের ভাই, ভাই-এর কথা একটিবার মন দিয়ে শুনুন, ভাই-এর কথা বিশ্বাস করুন— আপনারা এ কাজে যোগ দেবেন না, দোহাই আপনাদের, যে লোক আজ আপনাদের ভাই-এর মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে, তার উল্লাসকে আর বাড়াবেন না।—'

রহমান স্তব্ধ হইয়া গেল, তাহার মনের ভিতর সব গোলমাল হইয়া গেল, সে আর কিছুই ভাবিতে পারে না।

ম্যানেজার বাবুর মুখে সেই হাসি আর নাই। রাগে অগ্নিমূর্তি হইয়া তিনি বলিলেন, 'সিঁড়ি ফ্যালো, সিঁড়ি ফ্যালো।'

মৌলবী হাসিমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, হাসিয়া হাসিয়া সকলকে বুঝাইল, ও কিছু নয়, একটা চাকরি খালি হইলে পঞ্চাশটা লোক আসিয়া যেমন দাঁড়ায়, ইহারাও তেমনি, পঞ্চাশটা চাকরি খালি হইয়াছে তো পঞ্চাশ হাজার লোক আসিয়া হাজির হইয়াছে। জোর করিয়াই লইবে আর কী। যেন মগের মুল্লুক। যেন মামার বাড়ীর আব্দার।— প্রিয়নাথ, শ্রীপতি, বাদশা মিঞা, চাঁদ মিঞা এবং আরও অনেকে মৌলবীর কথায় সায় দিল, চরের উপর বিপুল জনতার দিকে আঙুল দেখাইয়া বোকার মতো তাহারা হাসিতে লাগিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

ওদিকে সিঁড়ি পড়িয়াছে। একজন-দুইজন করিয়া সকলে নামিতেছে। সকলের শেষে নামিল রহমান। নামিয়াই সে আশেপাশে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের গ্রামের কেহ তাহার পাশে নাই, সকলে জনতার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সে একা একা ঘুরিতে লাগিল, একবার গেল উপরের দিকে। এখন জনতা আর সেইরকম জমাট বাঁধিয়া নাই, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

একজন তাহার জামা ধরিয়া টানিল— বলিল, 'শুনুন?'

রহমান দেখিল তাহাকে যে জামা ধরিয়া টানিতেছে সে নিতান্ত অল্প বয়সের একটি ছেলে। বয়স ষোল-সতেরোর বেশী হইবে না।

মুখের রং বেশ ফর্সা কিন্তু রোদে লাল ঘর্মাক্ত— মাথায় বড় বড় চুল, অবিন্যস্ত, সার্টের বুকের বোতাম খোলা, ফর্সা বুক আর গলা বেশ চোখে পড়ে। ছেলেটি চমৎকার মিষ্টি গলায় বলিল, 'আপনার বাড়ী কোথায় ভাই?'

রহমান বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ছেলেটি আবার বলিল, 'বলুন না, আপনার বাড়ী কোথায়?' রহমান এবার বলিল, 'বনগাঁ।'

—'বনগাঁ? বাঃ চমৎকার নামটি তো। আচ্ছা, সেটা এখান থেকে কতদূর হবে?'

রহমান হিসাব করিয়া বলিল কতদূর হইবে।

ছেলেটি বলিল, 'এখানে এই এলেন, না? এখানে কেন এসেছেন? এমনি বেড়াতে, না?'

তাহার এই অনুসন্ধিৎসায় রহমান প্রথমে একটু বিরক্তিবোধ করিল, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আর মিষ্টি কথা শুনিয়া তাহা ভুলিয়া গেল। বলিল, 'এহানে কাজ করতে আইছি।'

— 'ও!' ছেলেটি চারিদিকে চাহিয়া একটু পরে বলিল,— 'কিন্তু কাজ যারা এখন করছে তাদের উপায় হবে কী? ব্যাপার কী হয়েছে জানেন? এদের কোন দোষ নেই তবু এদের তাড়িয়ে দিয়ে আপনাদের সে জায়গায় বসানো হবে। যার আর কোন উপায় নেই এমন একজনের ভাত মারতে আপনার ইচ্ছে হয়?"

রহমান কিছু বলিল না।

— 'বলুন না, ইচ্ছে হয় কিনা?'

রহমান তবু কিছু বলিল না। ছেলেটি বিলল, 'মনে করবেন না, আপনিও চিরকালই ওদের সুনজরে থাকতে পারবেন, আপনাকেও এমনি একদিন তাড়িয়ে দেবে।—' এই বলিয়া একটু হাসিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল।

রহমানের ইচ্ছা হইল তাহাকে একটি বিড়ি খাওয়াইয়া দেয়, কিন্তু ছেলেটি তখন চলিয়া গিয়াছে।

রৌদ্রের তেজ ক্রমেই বাড়িতেছে। বালুর চর চিক্‌চিক্ করে। নদীর হাওয়া রৌদ্রের মতোর তীব্র।

রহমান এদিক-সেদিক ঘুরিয়া একবার উপরের দিকে গেল, দেখিল গেটের কাছে কয়েকটি লোক হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে অর্থাৎ কাহাকেও যাইতে দিবে না, এই মতলব। একটু দূরে তাহাদের গ্রামের কয়েকজন হাত গুটাইয়া জটলা করিতেছে। রহমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৮৪ www.amarboi.com ~

তাহাদের সঙ্গে জুটিল। সেই জটলায় বাদশা মিঞাই প্রধান বক্তা। তাহাকে দেখিয়া সে এক পলক হাসিয়া বলিল, 'রহমানরে, হ্যারা তো যাইতেই দিত না, মনডা কয়।'

— 'কও?'

— 'হ্যারা জোর কইরা গেলে কী করতো?"

বাদশা মিঞা সমস্যায় পড়িল। সে এমন ব্যাপারের কথা আরও শুনিয়াছে বটে কিন্তু ইহার পরের ঘটনা আর জানে না। আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'কী করতো আবার। ধইরা, মাইর দিত!'

বাদশা মিঞা অকূলে কূল পাইয়া মাথা নড়িতে নড়িতে বলিল, 'হ, মাইর দিত। ঠিক, ঠিক, ঠিক।'

সুতরাং স্থির হইল, ওখানে জোর করিয়া ঢুকিলে উহারা খুব কষিয়া মার দিবে।

কিছু পরে মৌলবী আসিয়া বলিল, সামনের আর একটা গেটে তাহাদের যাইতে হইবে। সেখানে সকলেই আছে, শুধু তাহারাই কেন এখানে দাঁড়াইয়া আছে?

সকলে তাড়াতাড়ি মৌলবীকে অনুসরণ করিল।

সেই গেটের কাছে গিয়া দেখিল সেখানেও কয়েকটি লোক তেমনি হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বাদশা মিঞার মেজাজটা খারাপ হইয়া গেল।

— যেখানে যাই সেখানেই ইহারা জোঁকের মত লাগিয়া থাকে কেন?

মৌলবী তুড়ি মারিয়া বলিল, 'ভাই, তোমরা হগলে আস।'

এই বিপদের সময় ভাগ্যিস মৌলবীর মতো মানুষ সঙ্গে ছিল। তা না হইলে কী যে উপায় হইত কে জানে। সকলে দল বাঁধিয়া সামনের দিকে গেল কিন্তু ততোক্ষণে সেই লোকগুলি সারা গেট জুড়িয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

এ আবার কোন কায়দা? বাদশা মিঞা আশ্চর্য হইল। মার দিবে না তো। ব্যাপার দেখিয়া রহমান দূরে সরিয়া আসিল, তাহার সঙ্গে আরও কয়েকজন আসিল। মৌলবী আর শেষ পর্যন্ত যাইতে পারিল না।

এইভাবে আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সূর্য এখন মাথার উপর উঠিয়াছে। চারিদিকে তেমনি গোলমাল। এই সমস্যার কখন যে শেষ হইবে, রহমান ভাবিয়া কূল পায় না।

এদিক-ওদিক দৌড়াইয়া, এ-গেট ও-গেট করিয়া তাহার ক্ষুধা পাইয়া গিয়াছিল। একটা ছোট পুঁটুলিতে বৌ কিছু মুড়ি চিড়া আর গুড় বাঁধিয়া দিয়াছিল। রহমান আর একজনকে লইয়া একটু নির্জনে গিয়া পুঁটুলি খুলিয়া বসিল। খাওয়া শেষ হইলে নদীতে গিয়া হাত ধুইয়া আসিল। এখন একটা বিড়ি না খাইলে চলে না। কিছু দূরে একটা দোকানে গিয়া এক পয়সার বিড়ি সে কিনিল। কিন্তু একটা মুখে দিতেই আর একজন সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। এক মুহূর্তে এক পয়সার বিড়ি শেষ হইয়া গেল। রহমান নূতন বিবাহ করিয়াছে, সে এমনি দিয়া-থুইয়া খাইবে না তো কে খাইবে।

হাজার হাজার লোকের এমন বিপুল সমাবেশ, মুহূর্তের পর মুহূর্ত এমন বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, একটা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া বিড়ি খাইতে খাইতে রহমান যতই ভাবিতে লাগিল ততই আশ্চর্য হইতে লাগিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমে বিকাল হইতে লাগিল। রৌদ্রে, অনাহারে, দৌড়াদৌড়িতে, চিন্তায় প্রত্যেকেই যেন এখন এক একটি ভুতের মতো দেখিতে। এমন সময় আবার মৌলবীর ডাক আসিল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া জানাইয়া গেল যে তাহাদের এখন ঢুকিতে হইবে। আর দেরি করলে চলিবে না, অনেক সময় পার হইয়া গিয়াছে।

সকলে দৌড়াইয়া আর একটা গেটের কাছে গিয়া জড়ো হইল। গোলমাল আরও বাড়িয়া গেল। আকাশ বিদীর্ণ করিয়া নানারকম ধ্বনি উঠিল। কান ফাটাইয়া ফেলিবে আর কী। রহমান সকলের পিছনে ছিল, একেবারে সামনের দৃশ্য দেখিতে পায় নাই। পরে টের পাইল। তাহার সামনের লোকগুলি অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সে এখন একা, পাশে চাহিয়া দেখিল, আর সেই ছেলেটি, কী একটা উত্তেজনায় লাল তাহার মুখ, চুলগুলি এলোমেলো, প্রাণপণে সে চিৎকার করিতেছে। রহমান বুঝিতে পারিল না সেই ভাষার অর্থ। সামনের দিকে চাহিয়া দেখিল, আশ্চর্য, এবার গেট জুড়িয়া শুইয়া কয়েকটি লোক। আর তাহাদের পা দিয়া মাড়াইয়া ভিতরে চলিয়া গেল মৌলবী, আর তাহার পেছনে আরও কয়েকজন। রহমান নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিল না, লোকগুলির দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল সে।

এমন হল্লা সে জীবনেও শোনে নাই। কান ফাটিয়া গেলেও কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। দেখিল, এখান হইতে সেখানে লোক ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ ঘুষি দেখাইতেছে, কেহ দৌড়াইতেছে, হঠাৎ একটা লোক উঁচু ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে শুরু করিল। রহমান আশ্চর্য হইয়া দেখিল, সে লোকটি আর কেহ নয়, তাহাদের লঞ্চ পাড়ে ভিড়িবার সময় যে লোকটি প্রথম জলের কাছে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিয়াছিল সেই। তাহার তখনকার কথাগুলি রহমান এখনও ভুলে নাই। তাড়াতাড়ি সে আরও কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত জনতা আরও ঘন হইয়া আসিল। লোকটি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিল :

'বন্ধুগণ, আমার চাষী-ভাইরা ...।'

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। এখন প্রায় সারাটা আকাশ লাল। নীচে ধ্বংসের উৎসব দেখিয়া রক্তবর্ণ আকাশ যেন রক্তনেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া বিস্তর অশুভ কামনা করিতেছে। মানুষের পায়ের চাপে মাটির পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে আর বাকী নাই। এখানকার এই কলরবের আগুনের মতো যদি কোন শিখা থাকিত তবে সারাটা পৃথিবী নিশ্চয় পুড়াইয়া ফেলিত। বক্তা মাটিতে লাথি মারিয়া, বলিষ্ঠ ডান হাতে শূন্যে ঘুষি দেখাইয়া দৃপ্তস্বরে বলিল, 'বন্ধুগণ, আমার চাষী ভাইরা .....।'

কিন্তু এমন সময় হঠাৎ গুলির ভীষণ আওয়াজ, আশেপাশের সব লোক পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতেছে, কারুর কোনদিকে কোন খেয়াল নাই, কে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল, কে পায়ের তলায় পিষিয়া গেল, কারুর কোন দিকে লক্ষ নাই, সকলেই যার যার প্রাণ হাতের মুঠোয় লইয়া দৌড়াইতেছে। এক মুহূর্তে সারাটি মাঠ সশস্ত্র সৈন্যে ভরিয়া গেল।

রহমান প্রথমে লক্ষ করে নাই, যখন খেয়াল হইল তখন তাহার মাথা ঘুরিতেছে, হাত-পা কাঁপিতেছে, কানের ভিতর ভীষণ ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। সে কোন রকমে দৌড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৮৬ www.amarboi.com ~

দিল, দৌড়াইতে দৌড়াইতে শুনিতে পাইল— পেছনে কত লোকের তীব্র আর্তনাদ, কত লোকের কাতর গোঙানি। মুখ ফিরাইলে দেখেতি পাইত, কেহ রক্তাক্ত দেহে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে, কেহ পড়িতে পড়িতে হাঁটিতেছে; আবার হঠাৎ বসিয়া পড়িল। শীতের দিনের গৈরিক ধূলি রক্তবর্ণ হইয়া গেল।

অনেকদূর গিয়া আর দৌড়াইতে না পারিয়া রহমান তবে থামিল, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে সে বসিয়া পড়িল। হাত-পা তাহার এখনো ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, বুকের ভিতর কালবৈশাখীর ঝড়। পেছনে যাহা ফেলিয়া আসিয়াছে, রহমান সেদিকে আবার চাহিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না, চক্ষু তাহার বুজিয়া আসিল। সেখানকার কথা স্মরণ করিয়া চোখে তাহার জল আসিল। রহমান নির্জীবের মতো পড়িয়া রহিল।

যখন উঠিল তখন অনেক রাত। কোথাও টু শব্দটি নাই। রহমান ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, শরীরের সবগুলি গ্রন্থি তাহার বেদনায় টনটন করিতেছে। তবু কোন রকমে সে হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক পরে নদীর পারে আসিয়া দাঁড়াইল, চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে এখানে, নদীতে নৌকা আর জাহাজের শব্দও শোনা যায়। রহমানের মনে পড়িল সেই লোকটির কথা : বন্ধুগণ, একথা আপনারা মনে রাখবেন, আজ আমাদের যারা শুধু লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তারাই আপনাকেও লাথি থেকে রেহাই দেবে না।

নদীর জলের দিকে চাহিয়া রহমানের চোখ আবার ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটি খুব তাড়াতাড়ি পল্টনের মাঠ পার হচ্ছিলো। বোধহয় ভেবেছিল, লেভেল ক্রসিং-এর কাছ দিয়ে রেলওয়ে ইয়ার্ডে পড়ে নিরাপদে নাজিরাবাজার চলে যাবে। তাহার হাতের কাছে বা কিছু দূরে একটা লোকও দেখা যায় না— সব শূন্য, মরুভূমির মতো শূন্য। দূরে পিচঢালা পথের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে দুই-একটি সুদৃশ্য মোটরকার হুস্ করে চলে যায় বটে, কিন্তু এত তীব্র বেড়ে যায় যে মনে হয় যেন এই মাত্র কেউ তাকেও ছুরি মেরেছে, আর সেই ছোরার ক্ষত হাত দিয়ে চেপে ধরে পাগলের মতো ছুটে চলেছে। নির্জন রাস্তার ওপর মোটর গাড়ীর এমনি যাতায়াত আরও ভয়াবহ মনে হয়। দূরে গভর্নর হাউসের গর্বময় গাম্ভীর্য মানুষকে উপহাস করে। পথের পাশে সারি সারি কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। মাঠের ওপর কয়েকটা কাক কিসের আশায় হেঁটে বেড়াচ্ছে। অনেক দূরে একটা ইঁদুরের মতো ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে কে? একটি সৈন্য। ঐ সৈন্যটি আজ তিনদিন ধরে এক জায়গায় ডিউটি দিয়ে আসছে।

লোকটা মাঠ ছেড়ে রাস্তায় পড়লো। তার পরনে ছেঁড়া ময়লা একখানা লুঙ্গি, কাঁধে ততোধিক ময়লা একটা গামছা, মাথার চুলগুলি কাকের বাসার মতো উস্কোখুস্কো, মুখটি করুণ। তার পায়ে অনেক ধুলো জমেছে, কোন গ্রামবাসী মনে হয়।

এমন সময় কথাবার্তা নেই দুটি ছেলে এসে হাজির, তাদের মধ্যে একজন কোমর থেকে একটা ছোরা বের করে লোকটার পেছনে একবার বসিয়ে দিলো। লোকটা আর্তনাদ করে উঠল, ছেলেটি এতটুকু বিচলিত হলো না, লোকটার গায়ে যেখানে-সেখানে আরও তিনবার ছোরা মেরে তারপর ছুটে পালালো, কুকুর যেমন লেজ তুলে পালায় তেমনি ছুটে পালালো। লোকটা আর্তনাদ করতে করতে গেটের কাছে গিয়ে পড়লো, তার সমস্ত শরীর রক্তে ভিজে গেছে, টাট্‌কা লাল রক্ত, একটু আগে দেখেও মনে হয়নি এত রক্ত ঐ কংকালসার দেহে আছে।

মিনিট দশেক পরে এক সৈন্য বোঝাই গাড়ী এলো, সৈন্যরা বন্দুক হাতে করে গাড়ী থেকে পটাপট নেমে সার্জেন্টের আদেশে হাতের কাছে যাকে পেলো তাকেই ধরলো। হিন্দি বুলি ছেড়ে, সিগার খেয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে সার্জেন্টদের শ্বেতবর্ণ মুখ আরক্ত হয়ে এলো। যারা এদিকে জেলের ভাত খেতে আসছিলো তাদের থামিয়ে দিলো। 'উধার মৎ যাইয়ে বাবু, মৎ যাইয়ে।'

কিছুক্ষণের মধ্যই তিন নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় অর্ধেকটা ঘেরাও হয়ে গেল, ছোট ছোট গলি এবং সমস্ত রাস্তার মাথায় সশস্ত্র পুলিশ সঙ্গীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ ঢুকতে পারবে না, কেউ বেরুতেও পারবে না, শৃঙ্খলিত করে একটা সাময়িক বন্দীশালা তৈরি হলো।

কিন্তু শৃঙ্খলের ভিতরেও সংগ্রাম হয়। এক বিরাট সংগ্রাম শুরু হলো। তাদের মুখ চূর্ণ হয়ে গেল, কেউ হিন্দুত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে বীরের মতো অগ্রসর হলো। এক রিটায়ার্ড অফিসার ভদ্রলোক একটা ব্যাপার করলেন চমৎকার। বাক্স থেকে বহু পুরনো একটি পাৎলুন বের করে সেটা পরে' এবং তার ওপর একটা পুরনো কোট চাপিয়ে এক সুদর্শন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৮৮www.amarboi.com ~

যুবকের মতো ওপর থেকে নীচে নেমে এলেন, তাঁর শরীরের ভিতর আগের সেই তেজ দেখা দিয়েছে, যখন ওপরওয়ালা অনেক সাহেব-সুবোকেও বকে ঝকে নিজের কাজ তিনি করে যেতেন। সেই দিন আর এখন কই, হায়, সেই দিনগুলি এখন কোথায়।

ভদ্রলোক নীচে নেমে এলেন, পাৎলুনের দুই পকেটে কায়দা করে দুই হাত ঢুকিয়ে দুই পা ফাঁক করে গেটের ওপর দাঁড়ালেন। ঐ যে, রক্তবর্ণ সার্জেন্টটি এদিকেই আসছে। ভদ্রলোক তার সঙ্গে বড়বাবুসুলভ ইংরেজি আরম্ভ করে দিলেন।

শিক্ষয়িত্রী সুপ্রভা সেনের ব্যাপার আরো চমৎকার। সে তো-মেয়েদের কোন ইস্কুলে চাকরি করে। শহর দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বলে প্রচুর ছুটি উপভোগ করছিলো, আজও এইমাত্র দুপুরের রেডিও খুলে বসেছে। ছুটির দিন বলে একটা পান চিবুচ্ছে। ভোরবেলা ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছোট ভাইকে গাধা বলে শাসিয়েছে, খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে কিছু ভেবেছে আর এখন বসেছে রেডিয়োর গান শুনবে বলে। তার চোখে চশমা, একগাছি খড়ের মতো চুল সযত্নে বাঁধা। আঙুলগুলি শুকনো হাড়ের মতো দেখতে, আর শরীরের গঠন এমন হয়ে এসেছে যে যত্নবতী না হলেও চলে। এমন সময় বাইরের রৌদ্রে গুর্খাদের বন্দুকের সঙ্গীন ঝল্‌মল্ করে উঠলো, তাদের শ্বেত অধিনায়কের গর্বোন্নত শির আরও চোখে পড়ে, এবং বুটের খট্‌মট্ আওয়াজ। সুপ্রভা সেন আর তিলমাত্র দ্বিধা না করে নীচে চলে গেল, বসনে এবং ব্যবহারে বিশেষ যত্নবতী হয়ে সাহেবের সম্মুখীন হলো।

মুহূর্তে এই গল্প লাফিয়ে চললো এবং সুপ্রভা সেনের অনেক খ্যাতি ও অখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

লাইনের পাশে কোন বাড়ীই খানাতল্লাসীর হাত থেকে রেহাই পেলো না, রাজনৈতিক বন্দীদের বেলায় যেমন খানাতল্লাসী হয় তেমন অবশ্য নয়, তল্লাসী হয় শুধু মানুষের।

ভিতরের দিকে তেমনি ছুটোছুটি, একবার এদিকে একবার ওদিকে। কিন্তু সকলের মুখেই হাসি, বিরক্তি বা রাগের চিহ্নমাত্র নেই। অশোকের দেখে রাগ হলো, এই ব্যাপক ধরপাকড় আর ব্যাপকতর ঘেরাও মানুষের কাছে একটা Sports হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধঃপতন বা পচন একেই বলে। অশোকের ইচ্ছে হয় চিৎকার করে বলে, 'আপনারা কেন হাসবেন? কেন হাসছো তোমরা?'

একটা জায়গায় কিছু লোক জমা হেয় গেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভেঙ্গে গেল। লোকগুলির মুখে হাসি আর ধরে না। তারা আর কিছুতেই সীরিয়াস হতে পারছে না। অশোকের মনে হলো, এরা একেবারে জর্জরিত হয়ে গেছে।

রাস্তা দিয়ে একটি ফেরিওয়ালা যাচ্ছিলো পুরনো কাগজের বোঝা নিয়ে। তার পায়ে একটা ময়লা কাপড়ের প্রকাণ্ড ব্যান্ডেজ বাঁধা। সে হঠাৎ থেমে বললে, 'বাবুরা হাসছেন! হাসুন, আপনাদেরই দিন পড়েছে, গভর্নমেন্টের যেমন পড়েছে। দিন পড়েনি শুধু আমাদের, আমরা মরবো, মরবো!'

অশোক মন্থর পায়ে হেঁটে বাসায় গেল। এই মাত্র আর একটা ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেছে। দোলাইগঞ্জ স্টেশনের ডিস্ট্যান্টসিগ্‌ন্যাল পার হয়ে এক বৃদ্ধ যাচ্ছিলো—ঘটনার বিবরণ শুনতে আর ভালো লাগে না। কখনো নিজেকে এত অসহায় মনে হয়!

www.amarboi.com ~

অশোকের মা খালি মাটিতে পড়ে ভয়ানক ঘুমুচ্ছিলেন, ছেলের ডাকে ঘুম থেকে উঠে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'যা শিগ্‌গির, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি। একশোবার বলেছি যে, যা বাপু মামাবাড়ীতে কিছুদিন ঘুরে আয়, মারামারিটা কিছু থামলে পরে আসিস, না তবু এখানে পড়ে থাকা চাই, একটা ছেলেও যদি কথা শোনে! মাটি কামড়ে পড়ে থাকা চাই, শহরের মাটি এমন মিষ্টি, না?' অশোক হেসে বললে, 'এত কাজ ফেলে কোথায় যাই বলো?'

— 'হুঁ', কাজ না ছাই। কাজের আর অন্ত নেই কী না! তোদের কথা শুনবে কে রে? কেউ না। বুঝতে পেরেছি তোদের কতখানি জোর, কেবল মুখেই পট্‌টটি, হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা।'

— 'জানো কংগ্রেস মিনিসট্রির সময় কানপুরে কী হয়েছিলো? আমরা দাঙ্গা থামিয়ে দিয়েছিলুম।'

মা দুই হাত তুলে বললেন, 'হয়েছে। অমন ঢের বড় বড় কথা শুনেছি। তোদের রাশিয়ার কী হলো শুনি? পারবে জার্মানীর সঙ্গে? পারবে?'

অশোক বাইরের দিকে চেয়ে বললে, 'পারবে না কেন মা? বিপ্লবের কখনো মরণ হয়?'

মা হাঁ করে চেয়ে রইলেন, একটু পরেই চুপি চুপি বললেন,

— 'হ্যাঁরে একি সত্যি?'

— 'কী মা?'

— 'ঐ যে উনি বললেন, জার্মানী রাশিয়ার সব নিয়ে গেছে, একেবারে আমাদের দেশের কাছে এসে পড়েছে?"

অশোক হো হো করে হেসে উঠলো, 'এঁরা হিটলারের চেয়েও লাফিয়ে লাফিয়ে চলেন।'

এমন সময় অজু মানে অজয় এসে হাজির। অজু অশোকের ছোট ভাই। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'নবাব বাড়ী সার্চ হয়ে গেছে।' অশোক চোখ পাকিয়ে বললে, 'এটি কোত্থেকে আমদানি, শুনি!'

— 'বারে, আমি এইমাত্র শুনলুম যে!'

— ' তোমার দাদারা বলেছে নিশ্চয়?'

অজু একজন 'হিন্দু সোসালিস্ট'। সম্প্রতি দাঙ্গার সময় জিনিসটির পত্তন হয়েছে। এই বিষয় শিক্ষা নিতেই সে পাগলের মতো ঘোরাফেরা করে। উচ্চৈঃস্বরে মানুষের সঙ্গে তর্ক করে, হিটলারের জয়গান করে, হানাহানিতেও প্রচুর আনন্দিত হয়।

— 'বারে, আমি নিজের কানে শুনেছি! একটা সোলজার আমায় বললে,—'

— ' তোমায় কচু বলেছে!'

অজু কর্কশ স্বরে বললে, 'তোমরা তো বলবেই—' তারপর মৃদুস্বরে— 'তোমরা হিন্দুও নও, মুসলমানও নও—'

— 'আমরা ইহুদির বাচ্চা, নারে?' অশোক হা হা করে হেসে উঠলো, বললে, 'সার্চ হোক বা না হোক, তাতে Rejoice করবারই বা কী আছে, দুঃখিত হবারই বা কী আছে? আসল ব্যাপার হল অন্যরকম। দেখতে হবে এতে কার কতোখানি স্বার্থ রয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৯৭www.amarboi.com ~

অজয় চুপ করে ছিলো, সে খুক্ খুক্ করে হেসে উঠলো।

দুপুর আস্তে বিকেলের দিকে এগিয়ে গেল।

অশোক রাস্তায় বেরিয়ে দেখতে পেলো, এই মাত্র পুলিশ তুলে নেওয়া হয়েছে। লোকে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এই অঞ্চলেরই অধিবাসী যারা বাইরে ছিল, অনাহারে তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু বেশিরভাগ লোকেরই মুখের হাসিটি শুকোয় নি। ভিতরে এবং বাইরে যারা ছিল তাদের সকলেরই অভিজ্ঞতার বর্ণনা চলতে লাগলো। ওদিকে দুই গাড়ী বোঝাই ভদ্রলোকদের ধরে নিয়ে গেছে। একজন ভদ্রলোক গাড়ীতে বসে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললেন।

— 'কার আবার স্বার্থ তাকবে? স্বার্থ রয়েছে হিন্দু আর মুসলমানের।' এই বলে অজয় অন্যদিকে চেয়ে একটা গান গাইতে লাগলো!

মা বলে উঠলেন, 'তোরা ভাইয়ে ভাইয়ে এমন ঝগড়া করিস কেন বলতো? আমাদের সময় আমরা বড় ভাইয়ের দিকে মুখ তুল কথা কইতাম না, মুখে মুখে তর্ক করা দূরের কথা। কিন্তু দাদা আমার যা ভালোবাসতেন। ছোটবেলায় অনেক শীতের রাত্তিরে আমরা এক লেপের তলায় শুয়ে ঘুমিয়েছি।'

অশোক গালে হাত দিয়ে বললে, 'হয়েছে। এবার ভাইয়ের গল্প আরম্ভ হয়ে গেছে, আমাদের তাহলে উঠতে হয়।'

তারপর আস্তে আস্তে সন্ধ্যা এগিয়ে এলো। এবার তবে বাসায় ফিরতে হয়। কিছু পরেই সান্ধ্য আইন শুরু হয়ে যাবে। রাস্তাঘাট নির্জন হবার আগে একটা মস্ত ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়ে গেছে। পুলিশগুলো মানুষের শরীর সার্চ করে নিচ্ছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরা একেবারে হাত তুলে দাঁড়িয়ে যায়। এক ভদ্রলোক একটা পেন্সিল কাটা ছুরি নিয়ে ধরা পড়লেন। সকলে তাঁর নির্বুদ্ধিতার নিন্দা করতে ছাড়লো না। ওদিকে সমস্ত দোকানপত্র আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটু আগেও রাস্তার পাশে একটা মেলা বসেছিলো যেন, এখন সকলেই শেষ ডাক দিয়ে চলে যাচ্ছে। রিটায়ার্ড অফিসাররা নিজেদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পরম স্নেহের দৃষ্টিতে সেই অস্থায়ী হিন্দু দোকানদারদের দিকে বার বার তাকাচ্ছেন, ওদের এখন পুত্রবৎ মনে হচ্ছে, অথবা যেন বোমা বিধ্বস্ত লন্ডন নগরীর অসংখ্য রেফিউজি।

অশোক বাসার কাছে গিয়ে দেখে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে যেতেই বললেন, 'বাবা আশু, তোর বাবা তো এখনও এলো না।' তারপর ফিসফিস করে— 'তাছাড়া আজ আবার মাইনে পাবার দিন।'

কিছুমাত্র চিন্তার চিহ্ন না দেখিয়ে অশোক তৎক্ষণাৎ বললে,

— 'আহা, অত ভাবনা কিসের—? এখনো তো অনেক সময় আছে।'

— 'অনেক নয় আশু, সাতটা বাজতে আর আধঘণ্টাও বাকী নেই।'

অশোক আবার রাস্তায় নেমে এলো, পেছনে ছোট ভাই নীলু মা'র আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে রইলো, বেলাও মা'র পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তায় ক্রমেই লোক কমে আসছে। যারা কিছুদূরে আছে তাদের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়েছে। কয়েক মিনিট পরেই ছোট ছোট সৈন্যদল মার্চ করে গেল। আকাশের রং ক্রমেই ধূসর হয়ে আসছে। রাস্তা আর দালানের গায়ে ছায়া নেমেছে। বাদুড় উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৯১ www.amarboi.com ~

এই সাতটা বাজলো। অশোক ফিরে এলো।

মা এখনো বাইরের দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে। চোখ দুটি ভোরের তারার মতো করুণ। 'আশু, এখন উপায়?' — মা ভাঙা গলায় বললেন। তাঁর চোখ জলে ভরে এসেছে।

অশোক কিছু বললে না। নিশব্দে ঘরে ঢুকে খালি তক্তপোষের ওপর শুয়ে পড়লো। তার মুখ কুঞ্চিত হয়ে এসেছে, চোখের ওপর একটা বিষম দুর্ভাবনার চিহ্ন স্পষ্ট। হয়তো এক কঠিন কর্তব্যের সম্মুখীন হতে চলেছে সে। নীলু তার হাত ধরে ডাকলো, 'বড়দা, ও বড়দা? বড়দা, বড়দা গো? বারে, কথা বলে না। ও বড়দা? বারে! বারে!'

নীলু কেঁদে ফেললো, 'বাবাগো' বলে নাকি সুরে কাঁদতে লাগলো।

ওদিকে মা-ও কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। বেলাও তার পাশে বসে দুই হাঁটুর ভিতর মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এছাড়া সমস্ত বাড়ীর মধ্যে একটা ভয়াবহ গাম্ভীর্য বিরাজ করছে। অন্ধকার নেমেছে রাস্তায়। ঘরের অন্ধকার আরও সাংঘাতিক। আলো জ্বালাবে কে? ঘরের আবহাওয়া ভুতুড়ে হয়ে উঠেছে। বাইরে ঘন ঘন বাসের হর্ন শোনা যায়। সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। যেন কোন যুদ্ধের দেশ। অথবা কোন সাম্রাজ্যবাদের শেষ শঙ্খধ্বনি, বার্ধক্যের বিলাপ।

পাশের বাড়ীতে ভয়ানক তাসের আড্ডা জমেছে। বেশ গোলমাল শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আড্ডা ছেড়ে টর্চ হাতে করে বিমল এলো। বিমল ছেলেটিকে ভালোই মনে হয়, কথাবার্তায় অনেক সময় ছেলেমানুষ। অনেক সময় পাকাও বটে। সে বললে, 'অশোকবাবু, চলুন!'

অশোক প্রস্তুত হয়েই ছিল। খালি পায়েই সে বিমলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বিমল টর্চ জ্বালিয়ে এগুতে লাগলো। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলো, কোন পুলিশ আসছে কিনা। বাড়ীটা বেশী দূরে নয়। অলিগলি দিয়ে নিরাপদেই যাওয়া যায়। বিমল যথাস্থানে গিয়ে ডাকলো, 'সূর্যবাবু? সূর্যবাবু বাড়ী আছেন?"

ভিতর থেকে আওয়াজ এলো, 'কে?'

— 'আমরা। দরজাটা খুলুন।'

সূর্যবাবু নিজেই এসে দরজা খুললেন, হেসে বললেন,— 'কী ব্যাপার?'

বিমল বললে, 'আমরা আপনার ফোনে একটু কথা বলতে পারি?'

— 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই!' সূর্যবাবু সাদরে ফোন দেখিয়ে দিলেন। বিমল স্টীমার অফিসে ফোন করল, অনেকক্ষণ পরে কে একজন লোক এসে বললো, 'সুরেশবাবু কে? সুরেশবাবু বলে এখানে কেউ নেই। ও, দাঁড়ান দাঁড়ান। ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা ঘণ্টাখানেক পরে আবার আসুন। আমি খুঁজে আসছি।' বিমল অনেকবার ডেকেও তার কোন উত্তর পেলো না। ফোন রেখে অশোকের দিকে তাকিয়ে বললো, 'চলুন, আবার আসবোখন।'

অশোক ফিরে এলো। দরজার কাছে মার জল-ভরা চোখ ছল ছল করছে। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন। অশোক বললে, 'পরে যেতে বলেছে।' এই শুনে মা আবার ভেঙে পড়লেন, ভগ্নস্বরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। মাটির দিকে চেয়ে অশোক মনে মনে বললে, 'আগামী নূতন সভ্যতার যারা বীজ, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমি যোগ

www.amarboi.com ~

দিয়েছি, তাদের সুখ-দুঃখ আমারও সুখ-দুঃখ। আমি যেমন বর্তমানের সৈনিক, আগামী দিনেরও সৈনিক বটে। সেজন্য আমার গর্বের আর সীমা নেই। আমি জানি, আজকের চক্রান্ত সেদিন ব্যর্থ হবে, প্রতিক্রিয়ার ধোঁয়া শূন্যে মেলাবে। আমি আজ থেকে দ্বিগুণ কর্তব্যপরায়ণ হলাম, আমার কোন ভয় নেই।'

এমন সময় পাশের ঘরে আলো দেখা গেল— আলো নয় তো আগুন। কাগজ পোড়ার গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। অশোক গিয়ে দেখলো হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আবেদনের ইস্তাহারগুলি স্তূপীকৃত করে অজয় তাতে আগুন দিয়েছে। অশোক তৎক্ষণাৎ আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে করতে বললে, 'এসব কী করছিস?'

—'কী করবো আবার? মরা পোড়াচ্ছি।'

—'অজু তুই ভুল বুঝেছিস। চোখ যখন অন্ধ হয়ে যায়নি, তখন একটু পড়াশোনা কর। তারপর পলিটিক্স করিস।'

—'দাদা, তোমার কম্যুনিজম রাখো। আমরা ওসব জানি!'

—'কী জানিস, বল্?' অশোকের স্বরের উত্তাপ বাড়লো।

—'সব জানি। আর এও জানি তোমরা দেশের শত্রু—'

—'অজু, চুপ করলি?'

অজয় নিজের মনে গুম্ গুম্ করতে লাগলো।

অশোক উত্তপ্ত স্বরে বললে, 'ফ্যাসিস্ট এজেন্ট। বড়োলোকের দালাল। আজ বাদে কালের কথা মনে পড়ে যখন 'হিন্দু-মুসলমান ভাই-বোনরা' বলে গাধার মতো ডাক ছাড়বি? তখন তোর গাধার ডাক শুনবে কে? পেট মোটা হবে কার? স্টুপিড, জানিস দাঙ্গা কেন হয়? জানিস প্যালেস্টাইনের কথা? জানির আয়ারল্যান্ডের কথা, মূর্খ।—' কিন্তু একটা তীব্র আর্তনাদ শুনে হঠাৎ অশোক থেমে গেল, পাশের ঘরে গিয়ে দেখলো, মা আরও অস্থির হয়ে পড়েছেন।

কয়েকদিন পরে। অশোক বাইকে. চড়ে একটা সাম্প্রদায়িক-বিরোধী মিটিং-এ যোগদান করতে যাচ্ছিলো। এক জায়গায় নির্জন পথের মাঝখানে খানিকটা রক্ত দেখে সে সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। সারাদিন আকাশ মেঘাবৃত ছিল বলে রক্তটা অত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়নি, এখনো খানিকটা লেগে রয়েছে। কার দেহ থেকে এই রক্তপাত হয়েছে কে জানে? অশোকের চোখে জল এলো, সব কিছু মনে পড়ে গেল। সে চারদিক ঝাপসা দেখতে লাগলো, ভাবলো, এই চক্রান্ত ব্যর্থ হবে কবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও!www.amarboi.com ~

ইঁদুর

আমাদের বাসায় ইঁদুর এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেকা যাচ্ছে না। তাদের সাহস দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনেই, যুদ্ধক্ষেত্র সৈন্যদলের সুচতুর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মতো ওরা ঘুরে বেড়ায়, দেয়াল আর মেঝের কোণ বেয়ে-বেয়ে তর্-তর্ করে ছুটোছুটি করে। যখন সেই নির্দিষ্ট পথে আকস্মিক কোন বিপদ এসে হাজির হয়, অর্থাৎ কোন বাক্স বা কোন ভারী জিনিসপত্র সেখানে পথ আগলে বসে, তখন সেটা অনায়াসে টুক্ করে বেয়ে তারা চলে যায়। কিন্তু রাত্রে আরও ভয়ঙ্কর। এই বিশেষ সময়টাতে তাদের কার্যকলাপ আমাদের চোখের সামনে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মুরু হয়ে যায়। ঘরের যে কয়েকখানা ভাঙ্গা কেরোসিন কাঠের বাক্স, কেরোসিনের পুরনো টিন, কয়েকটা ভাঙ্গা পিঁড়ি আর কিছু মাটির জিনিসপত্র আছে, সেখান থেকে অনবরতই খুট্-খুট্ টুং-টাং ইত্যাদি নানা রকমের শব্দ কানে আসতে থাকে। তখন এটা অনুমান করে নিতে আর বাকী থাকে না যে, এক ঝাঁক ন্যূজদেহ অপদার্থ জীব ঐ কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপরে এখন রাতের আসর খুলে বসেছে।

যাই হোক, ওদের তাড়নায় আমি উত্ত্যক্ত হয়েছি, আমার চোখ কপালে উঠেছে। ভাবছি ওদের আক্রমণ করবার এমন কিছু অস্ত্র থাকলেও সেটা এখনো কেন যথাস্থানে প্রয়োগ করা হচ্ছে না? একটা ইঁদুর-মারা কলও কেনার পয়সা নেই? আমি আশ্চর্য হবো না, নাও থাকতে পারে।

আমার মা কিন্তু ইঁদুরকে বড়ো ভয় করেন। দেখেছি একটি ইঁদুরের বাচ্চাও তাঁর কাছে একটা ভাল্লুকের সমান। পায়ের কাছ দিয়ে গেলে তিনি ভয়ে চার হাত দূর দিয়ে সরে যান। ইঁদুরের গন্ধ পেলে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, ওদের যেমনি ভয় করেন, তেমনি ঘৃণাও করেন। এমন অনেকের থাকে। আমি এমন একজনকে জানি যিনি সামান্য একটা কেঁচো দেখলেই ভয়ানক শিউরে ওঠেন ; আবার এমন একজনকে জানি যাঁর একটা মাকড়শা দেখলেই ভয়ের আর অন্ত থাকে না। আমি নিজেও জোঁক দেখলে দারুণ ভয় পাই। ছোটবেলায় আমি যখন গরুর মতো শান্তর এবং অনুজ ছিলাম, তখন প্রায়ই মামা বাড়ী যেতুম, বিশেষত গভীর বর্ষার দিকটায়। তখন সমুদ্রের মতো বিস্তৃত বিলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বর্ষার জলের গন্ধে আমার বুক ভরে এসেছে, ছই-এর বাইরে এসে জলের সীমাহীন বিস্তার দেখে আমি অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছি, শাপলা ফুল হাতের কাছে পেলে নির্মমভাবে টেনে তুলেছি, কখনো উপুড় হয়ে হাত ডুবিয়ে দিয়েছি জলে, কিন্তু তখনি আবার কেবলি মনে হয়েছে, এই বুঝি কামড়ে দিলো!— আর ভয়ে-ভয়ে অমনি হাত তুলে নিয়েছি। সেখানে গিয়ে যাদের সঙ্গে আমি মিশেছি, তারা আমার স্বশ্রেণীর নয় বলে আপত্তি করবার কোন কারণ ছিল না, অন্তত সেরকম আপত্তি, আশঙ্কা বা প্রশ্ন আমার মনে কখনো জাগে নি।

সেই ছেলেবেলার বন্ধুরা মাঠে গরু চরাতো। তাদের মাথার চুলগুলি জলজ ঘাসের মতো দীর্ঘ এবং লালচে, গায়ের রং বাদামী, চোখের রংও তাই, পাগুলি অস্বাভাবিক সরু-সরু, মাঝখানে দিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা, পরনে একখানা গামছা, হাতে একটা বাঁশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৯৪www.amarboi.com ~

লাঠি, আঙুলগুলি লাঠির ঘর্ষণে শক্ত হয়ে গেছে। তাদের মুখ এমন খারাপ, আর ব্যবহার এমন অশ্লীল ছিল যে আমার ভিতর যে সুপ্ত যৌনবোধ ছিল, তা অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে উঠতো, অথচ আমি আমার স্বশ্রেণীর সংস্কারে তা মুখে প্রকাশ করতে পারতুম না। তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতো, আমার মুখ লাল হয়ে যেতো। তাদের মধ্যে একজন ছিল যার নাম ভীম, সে একদিন খোলা মাঠের নূতন জল থেকে একটি প্রকাণ্ড জোঁক তুলে সেটা হাতে করে আমার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললে, 'সুকু, তোমার গায়ে ছুঁড়ে মারবো?'

আমি ওর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম, ভয়ে আমার গা শিউড়ে উঠলো, আস্তে-আস্তে বুদ্ধিমানের মতো দূরে সরে গিয়ে বললাম, 'দ্যাখ, ভীম, ভালো হবে না বলছি ভালো হবে না! ইয়ার্কি না?'

ভীম হি-হি করে বোকার মত হাসতে হাসতে বললে, 'এ ই দিলাম, দিলাম—'

সেদিনের কথা আজো মনে পড়ে, ভীমের সাহসের কথা ভাবতে আজো অবাক লাগে। অনেকের এমন স্বভাব থাকে— যেমন অনেকে কেঁচো দেখলেও ভয় পায়। আমি কেঁচো দেখলে ভয় পাইনে বটে, কিন্তু জোঁক দেখলে ভয়ে শিউরে উঠি। এসব ছোটখাটো ভয়ের মূলে বুর্জোয়া রীতিনীতির কোন প্রভাব আছে কিনা বলতে পারিনে।

একথা আগেই বলেছি যে আমার মা-ও ইঁদুর দেখলে দারুণ ভীত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে সামলানোই দায় হয়ে ওঠে। ইঁদুর যে কাপড় কাটবে সেদিকে নজর না দিয়ে তখন তাঁর দিকেই নজর দিতে হয় বেশী। একবার তাঁরই একটা কাপড়ের নীচে কেমন করে জানিনে একটা ইঁদুর আটকে গিয়েছিলো। সে থেকে থেকে কেবল পালাবার চেষ্টা করছিলো, ছড়ানো কাপড়ের ওপর দিয়ে সেই প্রয়াস স্পষ্ট চোখে পড়ে। মা পাঁচ হাত দূরে সরে গিয়ে ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করে বললেন,

— 'সুকু, সুকু।'

প্রথম ডাকে উত্তর না দেওয়া আমার একটা অভ্যাস। তাই উত্তর দিয়েছি এই ভেবে চুপ করে রইলা।

— 'সুকু? সুকু?'

এবার উত্তর দিলাম, ' কেন?'

মা তাঁর হলুদ বাঁচায় রঙিন শীর্ণ হাতখানা ছড়ানো কাপড়ের দিকে ধরে চোখ বড়ো করে বললেন,

— 'ওই দ্যাখ!'

আমি বিরক্ত হলুম। ইঁদুরের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে আর কী! এত ইঁদুর কেন? পরম শত্রু কী কেবল আমরাই। আমি কাপড়টা ধরে সরাতে যাচ্ছি, অমনি মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আহা, ধরিস নে, ওটা ধরিস নে।'

— ' খেয়ে ফেলবে না তো!'

— 'আহা, বাহাদুরি দেখানো চাই-ই।'

— 'মা, তুমি যা ভীতু!'— ইঁদুরটা অনবরত পালাবার চেষ্টা করছিলো। বললাম, 'আচ্ছা মা, বাবাকে একটা কল আনতে বলতে পারো না? কোনদিন দেখবে আমাদের পর্যন্ত কাটতে শুরু করে দিয়েছে!'

www.amarboi.com ~

— 'আহা, মেরে কী হবে? অবোধ প্রাণ, কথা বলতে পারে না তো! আর কল আনতে পয়সাই বা পাবেন কোথায়?' মা'র গলার স্বর কিছুমাত্র কাতর হলো না, কোন বিশেষ কথা বলতে হলেও তাঁর গলার স্বর এমনি অকাতর থাকে এবং অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ হয়ে যায়। শেষ হওয়ার পর আর এক মিনিটও তিনি সেখানে থাকেন না। তিনি অমনি চলে গেলেন।

একটা ইঁদুর-মারা কল কিনতে পয়সা লাগবে, এটা আমার আগে মনে ছিল না। তা হলে আমি বলতুম না। কারণ এই ধরণের কথায় এমন একটা বিশেষ অবস্থার ছবি মনে জাগে যা কেবল একটা সীমাহীন মরুভূমির মতন। মরুভূমিতেও অনেক সময় জল মেলে, কিন্তু এ মরুভূমিতে জল মিলবে, এমন আশাও করিনে। এই মরুভূমির ইতিহাস আমার অজানা নয়। আমার পায়ের নীচে যে বালি চাপা পড়েছে, যে বালুকণা আশেপাশে ছড়িয়ে আছে, তারা ফিস্‌ফিস্ করে সেই ইতিহাস বলে। আমি মন দিয়ে শুনি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আঠারো বছর বয়স অবধি এ নিয়ে আবোল-তাবোল অনেক ভেবেছি, কিন্তু আবোল-তাবোল ভাবনা মস্তিষ্কের হাটে কখনো বিক্রি হয় না। ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ এবং বিশ্বাস দুই-ই প্রচুর ছিল, তাই ঈশ্বরকে কৃষ্ণ বলে নামকরণ করে ডেকেছি, হে কৃষ্ণ, এ পৃথিবীর সবাইকে যাতে একেবারে বড়লোক করে দিতে পারি তেমন বর আমাকে দাও। রবীন্দ্রনাথের 'পরশ পাথর' কবিতা পড়ে ভেবেছি, ইস, একটা পরশমণি যদি পেতুম। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোককে সত্যিই জিজ্ঞেস করে বসেছি, 'আচ্ছা, পরশমণি পাথর আজকালও লোকে পায়? কোথায় পাওয়া যায় বলবে?'

আমি যখন ছোট ছিলুম, আমাদের বৃহৎ পরিবারের লোকগুলির নির্মল দেহে তখনো অর্থহীনতার ছায়াটুকু পড়েনি। বুর্জোয়ারাজের ভাঙনের দিন তখনো ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায় নি। শুরু না হওয়ার আমি এই মানে করেছি যে, তখনো অনেক জনকের প্রসারিত মনের আকাশে তার ছেলের ভবিষ্যৎ স্মরণ করে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয় নি। আমাকে আশ্রয় করেই কম আশা জন্ম নিয়েছিল! অথব সে সব আশার শাখা-প্রশাখা এখন কোথায়? আমি বলতে দ্বিধা করবো না, সে সব শাখা-প্রশাখা তো ছড়ায়ই নি, বরং মাটির গর্ভে স্থান নিয়েছে। একটা সুবিধে হয়েছে এই যে, পারিবারিক স্বেচ্ছাচারিতার অক্টোপাস থেকে রেহাই পাওয়া গেছে, আমি একটু নিরিবিলি থাকতে পেরেছি।

কিন্তু নিরিবিলি থাকতে চাইলেই কী আর থাকা যায়? ইঁদুরটা আমায় পাগল করে তুলবে না? আমি রোজ দেখতে পাই একটা কেরোসিন কাঠের বাকা বা ভাঙ্গা টিনের ভিতর ঢুকে ওরা অনবরত টুং-টাং শব্দ করতে থাকে, ক্ষীণ হলেও অবিরত এমন আওয়াজ করতে থাকে যে অনতিকাল পরেই মোটা একটা বিশ্রী সঙ্গীতের আকার ধারণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুধু আমার কেন অনেকেরই বিষম বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়! একটা কুকুর যখন কঁকিয়ে কঁকিয়ে আস্তে আস্তে কাঁদতে থাকে, তখন সেটা কেউ সহ্য করতে পারে? আমি অন্তত করিনে। অমন হয়। যখন একটা বিশ্রী শব্দ ধীরে ধীরে একটা বিশ্রী সঙ্গীতের আকার ধারণ করে তখন সেটা অসহ্য না হয়ে যায় না! ইঁদুরগুলির কার্যকলাপও আমার কাছে সেরকম একটা বিরক্তির কারণ দাঁড়িয়েছিল।

আর একদিন মা চিৎকার করে ডেকে উঠলেন, 'সুকু! সুকু!'

www.amarboi.com ~

বলেছি তো প্রথম ডাকেই উত্তর দেওয়ার মতো কঠিন তৎপরতা আমার নেই।

মা আবার আর্তস্বরে ডাকলেন, 'সুকু?'

আর তৃতীয় ডাকের অপেক্ষা না করে নিজেকে মার কাছে যথারীতি স্থাপন করে তাঁর অঙ্গুলিনির্দেশে যা দেখলুম তাতে যদি বিস্মিত হবার কারণ থাকে তবুও বিস্মিত হলুম না। দেখলুম, আমাদের ক্বচিৎ-আনা দুধের ভাড়টি একপাশে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে আছে আর তারই পাশ দিয়ে একটা শাদা পথ তৈরি করে এক প্রকাণ্ড ইঁদুর দ্রুত চলে গেল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, কোন বিশেষ খবর শুনে কোন বিশেষ উত্তেজনা বা ভাবান্তর প্রকাশ করা আমার স্বভাবে নেই বলেই বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। কাজেই এখানেও তার অভিনয় হবে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। দেখতে পেলুম আমার মা'র পাতলা কোমল মুখখানি কেমন এক গভীর শোকে পাণ্ডুর হয়ে গেছে, চোখ দুটি গরুর চোখের মতো করুণ, আর যেন পদ্মপত্রে কয়েক ফোঁটা জল টল্ টল্ করছে, এখুনি কেঁদে ফেলবেন।

দুধ যদি বিশেষ একটা খাদ্য হয়ে থাকে এবং তা যদি নিজেদের আর্থিক কারণে কখনো দুর্লভ হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটা যদি অকস্মাৎ কোনো কারণে পাকস্থলীতে প্রেরণ করার অযোগ্য হয়, তবে অকস্মাৎ কেঁদে ফেলা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মা অমনি কেঁদে ফেললেন, আর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, এমন একটা অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই। মা'র ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা আমার চোখের দৃষ্টিপথকে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে দিলো, আরও গভীর করে তুললো। আমি দেখতে পেলুম আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য প্রচুর অগ্নিবর্ষণ করছে, নীচে পৃথিবীর ধূলিকণা আরও বেশী অগ্নিবর্ষী। আমার হৃদয়ের ক্ষেতও পুড়ে-পুড়ে খাক হয়ে গেল। একটি নীল উপত্যকাও দেখায় যায় না, দূরে জলের চিহ্নমাত্র নেই, জলস্তম্ভও নেই, মরীচিকাও দিয়েছে ফাঁকি। ভাবলুম স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য গ্রন্থরাজি কোথায় পাওয়া যায়? শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী অমূল্য। সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণব্রতী শ্রী অরবিন্দ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ (তখনো ভাবতুম না দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কখনো শুরু হবে।) আমার মুখভঙ্গী চিন্তাকুল হয়ে এলো, হাঁটু দুটির পেটের কাছে এনে কুকুরের মতো শুয়ে আমি ভাবতে লাগলুম— ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে নিয়েছি ভালো করে ভাবার জন্যে— ভাবতে লাগলুম, এমন কোনো উপায় নেই যাতে এই বিকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

সন্ধ্যার পর বাবা এলেন, খবরটা শুনে এমন ভাব দেখালেন না যাতে মনে হয় তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন অথবা কিছুমাত্র দুঃখিত হয়েছেন, বরং তাড়াতাড়ি বলতে আরম্ভ করলেন— যদিও তাড়াতাড়ি কথা বলাটা তাঁর অভ্যাস নয়,— 'বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে! আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলুম এমন একটা কিছু হবে। আরে, মানুষের জান নিয়েই টানাটানি, দুধ খেয়ে আর কী হবে বলো!'

দেখতে পেলুম, বাবার মুখটি যদিও শুকনো তবু প্রচুর ঘামে তৈলাক্ত দেখাচ্ছে, গায়ের ভারী জামাটিও ঘামে ভিজে ঘরের ভিতর গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন একটা বিপর্যয়ের পরেও তাঁর এই অবিকৃত-প্রায় ভাব দেখে আমি আশ্বস্ত হলুম এই ভেবে যে,

www.amarboi.com ~

ক্ষতি যা হয়েছে হয়েছেই, তার আলোচনায় এমন একটা অবস্থা যার কোন পরিবর্তন নেই বরং একটা মস্ত গোলযোগের সূত্রপাত হবে, তা থেকে রেহাই পাওয়া গেল, খুব শীগ্‌গির আর আমার মানসিক অবনতি ঘটবে না।

কিন্তু বাবা কিছুক্ষণ পরেই সুর বদলালেন, 'তোমরা পেলে কী? কেবল ফূর্তি আর ফূর্তি! দয়া করে আমার দিকে একটু চাও। আমার শরীরটা কী আমি পাথর দিয়ে তৈরি করেছি? আমি কী মানুষ নই? আমি এত খেটে মরি আর তোমরা ওদিকে ফূর্তিতে মেতে আছো! সংসারের দিকে একবার চোখ খুলে চাও? নইলে টিকে থাকাই দায় হবে!'

আমার কাছে বাবার এই ধরনের কথা মারাত্মক মনে হয়। তাঁর এই ধরনের কথার পেছনে অনেক রাগ ও অসহিষ্ণুতা সঞ্চিত হয়ে আছে ব'লে আমি মনে করি।

সময়ের পদক্ষেপের সঙ্গে স্বরের উত্তাপও বেড়ে যেতে লাগলো। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই কঠিন উত্তপ্ত আবহাওয়ায় যে অদ্ভুত নগ্নতা প্রকাশ পাবে, তাতে আমার লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। এমন অবস্থার সঙ্গে আমার একাধিকবার পরিচয় হলেও আমার গায়ের চামড়া তাতে পুরু হয়ে যায় নি, বরং আশঙ্কার কারণ আরও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। যে পৃথিবীর সঙ্গে আমার পরিচয় তার ব্যর্থতার মাঝখানে এই নগ্নতার দৃশ্য আরও একটি বেদনার কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাবা বললেন, 'আর তর্ক করো না বলছি! এখান থেকে যাও, আমার সুমুখ থেকে যাও, দূর হয়ে যাও বলছি!'

মা বললেন, 'অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। চেঁচামেচি করে পৃথিবীশুদ্ধ লোককে নিজের গুণপনার কথা জানানো হচ্ছে, খুব সুখ্যাতি হবে!'

শুনতে পেলুম, এর পরে বাবার গলার স্বর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে বোমার মতো ফেটে পড়লো!— 'তুমি যাবে? এখান থেকে, যাবে কিনা বলো? গেলি তুই আমার চোখের সামনে থেকে? শয়তান মাগী' ...। বাবা বিড়বিড় করে আরও কতো কী বললেন, আমি কানে আঙুল দিলুম, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম একটি অসাড় মৃতদেহ হয়ে, আমার চোখ ফেটে জল বেরুলো, বিপর্যয়ের পথে বর্ধিত হলেও আমার মনের শিশুটি আজন্ম যে শিক্ষা গ্রহণ করে এসেছে তাতে এমন কোন কথা লেখা ছিল না। মনে হলো যে আজ এই প্রথম বিপর্যয়ের মুহূর্তগুলি চরম প্রহরী সেজে আমার দোর গোড়ায় কড়া নাড়ছে। আগে এমন দেখিনি বা শুনিনি। তবু আমার অনুভূতির এই শিক্ষাকে কোত্থেকে এলো? বলতে পারি আমার এই শিক্ষা অতি চুপি-চুপি জন্মলাভ করেছে, মাটির পৃথিবী থেকে সে এমনভাবে শ্বাস ও রস গ্রহণ করেছে যাতে টুঁ শব্দও হয়নি। ফুলের সুবাস যেমন নিঃশব্দে পাখা ছড়িয়ে থাকে তেমনি ওর চোখের পাখা দুটিও নিঃশব্দে এই অদ্ভুত খেলার আয়োজন করতে ছাড়ে নি। আরও বলতে পারি আমার মনের শিশুর বাঁচবার বা বড়ো হবার ইতিহাস যদি জানতে হয় তবে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু সেই শিক্ষা আজকাল দিলে কই? বরং আরও কর্মহীনতার নামান্তর হলো, আমার কাঁচা শরীরের হাত দুটি কেটে ভাসিয়ে দিলো জলে, দুই চোখকে বাষ্পাকুল করে কিছুক্ষণের জন্য কানা করে দিলো। আমি কী করবো? আমার কিছু করবার আছে কী?'

— 'শয়তান মাগী, বেরিয়ে যা।'

www.amarboi.com ~

আবার ভেসে এলো অদ্ভুত কথাগুলি। এসব আমি শুনতে চাইনে, তবু শুনতে হয়। বাতাসের সঙ্গে খাতির করে তা ভেসে আসবে, জোর করে কানের ভিতর ঢুকবে ; আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার মনের মাটিতে সজোরে লাথি মারবে।

— 'যা বলছি!'

গোলমাল আরও খানিকটা বেড়ে গেল।

কিছু পরে মা বাষ্পাচ্ছন্ন স্বরে ডাকলেন, 'সুকু! সুকু!'

ঠিক তখুনি উত্তর দিতে লজ্জা হলো, ভয় করলো, তবু আস্তে বললাম, 'বলো?'

মা বললেন, 'দরজা খোল্।'

ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিলুম, ভয় হলো এই ভেবে যে, এবার অনেক বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, যা শুনতেও ভয় পাই ঠিক তারই সামনে এক গম্ভীর বিচারপতি হয়ে সমস্ত উত্তেজনাকে শূন্যে বিসর্জন দিয়ে রায় দিতে হবে।

কিন্তু যা ভেবেছিলুম তা আর হলো না। মা ঘরের ভিতর ঢুকেই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর আঁচলখানা পেতে শুয়ে পড়লেন। পাতলা পরিচ্ছন্ন শরীরখানি বেঁকে একখানা কাস্তের আকার ধারণ করলো। কেমন অসহায় দেখালো ওঁকে। ছোটবেলায় যাকে পৃথিবীর মতো বিশাল ভেবেছি, তাঁকে এমনভাবে দেখে এখন কতো ক্ষীণজীবী ও অসহায় মনে হচ্ছে! যাকে বৃহত্তম ভেবেছি, সে এখন কতো ক্ষুদ্র, সে এখনো শৈশব অতিক্রম করতে পারেনি বলে মনে হচ্ছে। আর আমি কতো বৃহৎ ; রক্তের চঞ্চলতায়, মাংসপেশীর দৃঢ়তায়, বিশ্বস্ত পদক্ষেপে কত উজ্জ্বল ও মহৎ, ঐ হরিণের মতো ভীরু ছোট দেহের রক্ত পান করে একদিন জীবন গ্রহণ করলেও আজ আমি কতো শক্তিমান! আমাকে কেউ জানে? এমনও তো হতে পারতো, আজ লন্ডনের কোন ইতিহাস-বিখ্যাত য়ুনিভার্সিটির করিডোরের বুকে বিশ বছরের যুবক সুকুমার গভীর চিন্তায় পায়চারি করছে, অথবা খেলার মাঠে প্রচুর নাম করে সকল সহপাঠিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, অথবা ত্রিশ বছরের নীলনয়না কোন খাঁটি ইংরেজ মহিলার ধীর গম্ভীর পদক্ষেপ ভীরুর মতো অনুসরণ করে একদিন তাঁর দেহের ছায়ায় বসে প্রেম যাঞ্জা করছে! এমন তো হতে পারতো, তার সোনালী চুল, দীর্ঘ পক্ষাবৃত চোখ, দেহের সৌরভ— আহা, কে সেই ইংরেজ মহিলা? সে এখন কই .... আর সেই স্বর্ণাভ রাজকুমার সুকুমারের মা ঐ ঠাণ্ডা মেঝের ওপর সামান্য কাপড় বিছিয়ে শুয়ে! এখান থেকে কতো ছোট আর কতো অসহায় মনে হয়। এক অর্থহীন গর্বে বুকটা প্রশস্ততর করে আমি একবার মার দিকে তাকালুম।

ডাকলুম, 'মা? ও মা?'

কোন উত্তর নেই। গভীর বিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কোন ভগ্ন নারীকণ্ঠ আমার কানের দরজায় এসে আঘাত করলো না। ঘুমিয়ে পড়েন নি তো?

পরদিও আবহাওয়ার গভীরতা কিছুমাত্র দূর হলো না। মা'র এমন অস্বাভাবিক নীরবতা দেখে আমার ছোট ভাই-বোনেরা প্রচুর আস্কারা পেয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। তারা নগ্নগাত্র হয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করতে লাগলো। স্কুলহীন ছোট বোনটি তার নিত্যকার অভ্যাসমত প্রেমকুসুমাস্তীর্ণ এক প্রকাণ্ড উপন্যাস নিয়ে বসেছে, অন্যদিকে চাইবারও সময় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ২৯৭www.amarboi.com ~

সেদিন অনেক রাতে সারা বাড়ী গভীর ধোঁয়ায় ভেসে গেল, সকলের নাক-মুখ দিয়ে জল বেরুতে লাগলো, দম বন্ধ হয়ে এলো। ছোটো ভাই-বোনদের খালি মাটিতে পড়ে ঘুমুতে দেখে রান্নাঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'এখনো রান্না হয়নি, মা?'

চোখের জলে ভিজে ঊনানের ভিতর প্রাণপণে ফুঁ দিতে দিতে মা বল্‌লেন, 'না। এখন চড়াচ্ছি।'

— 'এত দেরি হলো কেন?'

মা চুপ করে রইলেন।

বুঝতে পারলুম। সেই পুরনো কাসুন্দি। বুঝতে পারলুম এ জিনিস সহজে এড়াতে চাইলেও সহজে এড়াবার নয়,— ঘুরে-ফিরে এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়, পাশ কাটাতে চাইলে হাত চেপে ধরে, কোন রকমে এড়িয়ে গেলেও হাত তুলে ডাকতে থাকে। এই ডাকাডাকির ইতিহাসকে যদি আগাগোড়া লিপিবদ্ধ করি তবে সারাজীবন লিখেও শেষ করতে পারবো না, কেই পারবে না, তাতে কতগুলি একই রকমের চিত্র গলাগলি করে পাশাপাশি এসে দাঁড়াবে, আর সৌখিন পাঠকের বিরক্তিভাজন হবে। আমি তো জানি পাঠকশ্রেণী কারা? তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে কান্নাকাটির ন্যাকামি চলবে না, কিংবা কিছু লিখলেও টাকার হিসাবটাকে সযত্নে এড়িয়ে যেতে হবে বা হাসিমুখে বরণ করতে হবে। যেমন আমার বাবা অনেক সময় করেন— প্রচুর অভাবের চিত্রকেও এক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে পরম আনন্দে ঘাড় বাঁকিয়ে হাসতে থাকেন। কিংবা যেমন আমাদের পাড়ার প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা রক্ষিতমশায় করেন— ঘরে অতি শুকনো স্ত্রী আর একপাল ছেলেমেয়েদের অভুক্ত রেখেও পথে-ঘাটে রাজা-উজির মেরে আসেন। বা আমাদের প্রেস-কর্মচারী মদন— শূন্যতার দিনটিকে উপবাসের তিথি বলে গণ্য করে, কখনো পদ্মাসন কেটে বসে নিমীলিত চোখে দুই শক্ত দীর্ঘ বাহু দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঈশ্বরকে সশরীরে ডেকে আনে। এমন হয়। এছাড়া আর উপায় কী? স্বর্গের পথ রুদ্ধ হলে মধ্যপথে এসে দাঁড়াই, জীবন আমাদের কুক্ষিগত করলেও জীবনকে প্রচুর অবহেলা করি, প্রকৃতির করাঘাতে ডাক্তারের বদনাম গাই, অথবা ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করি। এসব দেখে আমি একদিন সিদ্ধান্ত করেছিলুম যে, দুঃখের সমুদ্রে যদি কেউ গলা পর্যন্ত ডুবে থাকে তবে তা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্তের নাম করতে গিয়ে যাদের জিহ্বায় জল আসে সেদিন আমি তাদেরই একজন হয়েছিলুম। বন্ধুকে এক ধোঁয়াটে রহস্যময় ভাষায় চিঠি লিখলুম : 'এরা কে জানো? এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বটে, কিন্তু না খেয়ে মরে। যে ফুল অনাদরে শুকিয়ে ঝ'রে পড়ে মাটিতে, এরা তাই। এরা তৈরি করেছে বাগান, অথচ ফুলের শোভা দেখেনা! পেটের ভিতর সুচ বিঁধছে প্রচুর, কিন্তু ভিক্ষাপাত্রও নেই। পরিহাস! পরিহাস! ....'

ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার অজ্ঞতায় নিজের মনে যে কল্পনার সৌধ গড়ে তুললুম, তাতে নিজের মনে-মনে প্রচুর পরিতৃপ্ত হলুম। যে উপবাসকৃশ বিধবারা তাদের সক্ষম মেয়েদের দৈহিক প্রতিষ্ঠায় সংসার যাত্রার পথ বেয়ে বেয়ে কোন রকমে কালাতিপাত করছেন, তাদের জন্য করুণা যেমন হলো, মনে-মনে পূজো করতে লাগলুম আরও বেশী।

কিন্তু সে সব ক্ষণিকের ব্যাপার! শরতের মেঘের মতো যেমনি এসেছিল তেমনি মিশে গেল। মগজের মধ্যে জায়গা যদিও একটা পেয়েছিলো, বেশী দিন থাকবার ঠাঁই

দুনিয়ার পাঠক এক হও!৩৩০www.amarboi.com ~

হলো না। আজ ভাবছি আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। নইলে এক অসম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণ পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে থাকতো, তখন সে ভাবনা নিয়ে মনে-মনে পরিতৃপ্ত থাকতুম বটে, কিন্তু গতির বিরুদ্ধে চলতুম, এক ভীষণ প্রতিক্রিয়ার বিষে জর্জরিত হতুম।

এমন দিনে এক অলস মধ্যাহ্নের সঙ্গে আমি সাংঘাতিক প্রেমে পড়ে গেলাম। সেই দুপুরটিকে যা ভালো লেগেছিলো কেবল মুখে বললে তা যথেষ্ট বলা হবে না। সেদিন যতটুকু আকাশকে দেখতে পেলুম তার নীলকে এত গভীর মনে হলো যে চোখের ওপর কে যেন কিছু শীতল জলের প্রলেপ দিয়ে দিলো। ভাবনার রাজ্যে পায়চারি করে আমি আমার মীমাংসার সীমান্তে এসে পৌঁছলুম সেই মধ্যাহ্নে, সেখানে রাখলুম দৃঢ় প্রত্যয়। আকাশের নীলিমায় দুই চোখকে সিক্ত করে আমি দেখতে পেলুম চওড়া রাস্তার পাশে সারি- প্রকাণ্ড দালান, তার প্রতি কক্ষে সুস্থ সবল মানুষের পদক্ষেপ, সিঁড়িতে নানারকম জুতোর আওয়াজ, মেয়ে-পুরুষের মিলিত চিৎকার-ধ্বনি পৃথিবীর পথে-পথে বলিষ্ঠ দুয়ারে হানা দেয়, বলিষ্ঠ মানুষ প্রসব করে, আমি দেখতে পেলুম ইলেকট্রিক, আর টেলিগ্রাফ তারের অরণ্য, ট্রাক্টর চলেছে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে— অবাধ্য জমিকে ভেঙে-চুরে দলে-মুচড়ে, সোনার ফসল আনন্দের গান গায়, আর যন্ত্রের ঘর্ষণে ও মানুষের হর্ষধ্বনিতে এক অপূর্ব সংগীতের সৃষ্টি হলো। একদা যে বাতাস মাটির মানুষের প্রতি উপহাস করে বিপুল অট্টহাসি হেসেছে, সেই বাতাসের হাত আজ করতালি দেয় গাছের পাতায় পাতায়। কেউ শুনতে পায়? যারা শোনে তাদের নমস্কার।— তাই অলস মধ্যাহ্নের মধুরতর মনে হলো। দেখলুম এক নগ্নদেহ বালক রাস্তার মাঝখানে বসে এক ইটের টুকরো নিয়ে গভীর মনোযোগে আঁক কষছে। কোন বাড়ী থেকে পচা মাছের রান্নার গন্ধ বেরিয়েছে, বেশ, সঙ্গীত-পিপাসুর বেসুরো গলায় গান শোনা যাচ্ছে হারমোনিয়াম সহযোগে এই অসময়ে, রৌদ্র প্রচণ্ড হলেও হাওয়া দিচ্ছে প্রচুর, ও বাড়ীর এক বধু রাস্তা কলে এইমাত্র স্নান করে নিজ বুকের তীক্ষ্ণতাকে প্রদর্শনের প্রচুর অবকাশ দিয়ে সংকুচিত দেহে বাড়ীর ভিতর ঢুকলো, দুটি মজুর কোনরকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে কয়লামলিন বেশে আবার দৌড় দিচ্ছে। এ দৃশ্য বড় মধুর লেগেছে— অবশ্য কোন বুর্জোয়া চিত্রকরের চিরন্তনী চিত্র বলে নয়। এ চিত্র যেমন আরাম দেয়, তেমনি পীড়াও দেয়। আমার ভালো লেগেছে এই স্মরণীয় দিনটিতে এক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির রাজত্বে খানিকটা পায়চারি করতে পেরেছি বলে। চমৎকার! চমৎকার।

অনেক রাত্রে ইঁদুরের উৎপাত আবার সুরু হলো। ওরা টিন আর কাঠের বাক্সে দাপাদাপি শুরু করে দিলো, বীরদর্পে চোখের সামনে দিয়ে ঘরের মেঝে অতিক্রম করে দারুণ উপহাস করতে লাগলো।

রান্না শেষ করে এসে মা সকলকে ডাকাডাকি সুরু করে দিলেন, 'ওরে মন্টু, ওরে ছবি, ওরে নারু, ওঠ্ বাবা, ওঠ!'

মন্টু উঠেই প্রাণপণে চিৎকার আরম্ভ করে দিলো। ছবি যদিও এতোক্ষণ তার উপন্যাসের ওপর উপুড় হলে পড়েছিলো, এখন বই-টই ফেলে চোখ বুঝে শুয়ে পড়লো।

— 'ওরে ছবি, খেতে আয়, খাবি আয়!'

বার বার ডাকেও ছবি টুঁ শব্দটি করে না।

www.amarboi.com ~

মা ভগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'আমার কী দোষ বল্? আমার ওপর রাগ করিস কেন? গরিব হয়ে জন্মালে ....'

মার চোখ ছল্ ছল্ করে উঠলো, গলা কেঁপে গেল। আমি রাগ করে বললুম, 'আহা, ও না খেলে না খাবে, তুমি ওদের দাও না?'

এক অনুচ্চ কণ্ঠের শব্দে হঠাৎ জেগে উঠলুম। শুনতে পেলুম বাবা অতি নিম্নস্বরে ডাকছেন, 'কনক, ও কনক, ঘুমুচ্ছো?'

বাবা মাকে ডাকছেন নাম ধরে। ভারী চমৎকার মনে হলো, মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলুম ; আর আমার প্রতি ভালোবাসা কামনা করতে লাগলুম তাঁর কাছ থেকে। যুবক সুকুমার একটিদিন তার বৌকেও এমনি নাম ধরে ডাকবে, চিৎকার করে ডেকে প্রত্যেকটি ঘর এমনি সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত করে তুলবে।

— 'কনক? ও কনক?'

প্রৌঢ়া কনকলতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত উত্তর দিলেন না, কোনবার কঁকিয়ে উঠলেন, কোনবার উঃ-আঃ করলেন। আমি এদিকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিম্নগামী হলুম। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে হারিয়ে যাবার কামনা করতে লাগলুম। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলুম, শরীর দিয়ে ঘামের বন্যা ছুটলো।

ওদিকে মধ্যরাত্রির চাঁদ উঠেছে আকাশে, পৃথিবীর গায়ে কে এক সাদা মসলিনের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে এনেছে ঠাণ্ডা জলের স্রোতের মতো বাতাস, আমার ঘরের সামনে ভিখিরি কুকুরদের সাময়িক নিদ্রাময়তার এক শীতল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ও বাড়ীর ছাদে নিদ্রাহীন বানরদের অস্পষ্ট গোঙানি শোনা যায়। মধ্যরাত্রের প্রহরী আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেবে কখন?

অবশেষে প্রৌঢ়া কনকলতার নীরবতা ভাঙলো, তিনি আবার আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, অল্প একটু ঘোমটা টেনে কাপড়ের প্রচুর দৈর্ঘ্য দিয়ে নিজেকে ভালোভাবে আচ্ছাদিত করলেন, তারপর সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গীতের আয়নায় আমার কাছে সমস্ত স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমি লক্ষ করলুম দুই জোড়া পায়ের ভীরু অথচ স্পষ্ট আওয়াজ আস্তে আস্তে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

অনেক রাত্রে বাবা গুন্ গুন্ সুরে গান গাইতে লাগলেন ; চমৎকার মিষ্টি গলা বেহালার মতো শোনা যাচ্ছে। সেই গানের খেলায় আলোর কণাগুলি আরও শাদা হয়ে গেছে, মনে হয় এক বিশাল অট্টালিকার সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে সেই গানের রেখা পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষ রাত্রির বাতাস অপূর্ব স্নেহে মন্থর হয়ে এসেছে। একটা কাক রোজকার মতো ডেকে উঠেছে। বাবাকে গান গাইতে আরও শুনেছি বটে, কিন্তু আজকের মতো এমন মধুর ও গভীর আর কখনো শুনিনি। তাঁর মৃদু-গম্ভীর গানে আজ রাত্রির পৃথিবী যেন আমার কাছে নত হয়ে গেলো। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন কার প্রাণখোলা হাসিতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠলুম। হাসির ঐশ্বর্যে বাড়ীর ইটগুলিও কাঁপছে।

বাবা বললেন, 'পণ্ডিত মশাই, ও পণ্ডিত মশাই, উঠুন? আর কত ঘুমুবেন? সকালে না উঠলে বড়লোক হওয়া যায় কী? উঠুন?'

www.amarboi.com ~

আমি অনেক কষ্টে চোখ মেলে চেয়ে দেখলুম, কখন ভোর হয়েছে গেছে! বাবার স্নেহময় কথায় আমি কখনো হাসিনে, কেমন বাধে, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে কিনা, এক কুড়ি বছর তো পেরিয়ে চললুম।

মশারির দড়ি খুলতে খুলতে বাবা বললেন, 'পৃথিবীতে যত গ্রেট মেন দেখতে পাচ্ছো, সকলের ভোরে ওঠবার অভ্যাস ছিল! আমরা যতো ভোরেই উঠি না কেন, উঠেই শুনতে পেতুম বাইরের ঘরে তামাক খাওয়ার শব্দ হচ্ছে। অমন অধ্যবসায়ী না হলে আর একটা জীবনে অত জমিজমা অত টাকা-পয়সা করে যেতে পারেন। তিনি তো সবই রেখে গিয়েছিলেন, আমরাই কিছু রাখতে পারলুম না। কিন্তু উঠুন পণ্ডিত মশাই, যারা ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে জীবনে তারা কখনো উন্নতি করতে পারে না।'

অতোটা মাতব্বরী সহ্য হয় না, জীবনে একদিন মাত্র সকালে উঠেই বাড়িসুদ্ধ লোক মাথায় তুলেছেন।

সমস্ত বাড়িটা খুশির বাজনায় মুখরিত হয়ে উঠল।

ওদিকে মন্টু সেলুনে চুল ছাঁটাইবার জন্য পয়সা চাইতে সুরু করেছে, ঘণ্টা খানেক পরেও পয়সা না পেলে মেঝেতে আছাড় কেয়ে তারস্বরে কাঁদবে। নারু পক্ব-পক্ব বাক্য বর্ষণ করে সকলের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টায় আছে! ছবি এই মাত্র তার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় নায়িকার শয়ন ঘরে নায়কের অভিযান দেখে মনে-মনে পুলকিত হয়ে উঠেছে।

বাবা দারুণ কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'তোমরা থিয়োরিটা বার করেছ ভালোই, কিন্তু কার্যকরী হবে না, আজকাল ওরকম ভালোমানুষি আর চলবে না। এখন কাজ হলো লাঠির। হিটলারের লাঠি, বুঝলে পণ্ডিত মশাই?'

আমি মনে-মনে হাসলুম। বাবা যা বলেন তা এমনভাবে বলেন যে মনে মনে বেশ আমোদ অনুভব করা যায়। তাঁর কী জানি কেন ধারণা হয়েছে, আমরা সব ভালোমানুষের দল। নিজের খেয়ে পরের চিন্তা করি, শুষ্কমুখ হয়ে শীতল জল বিতরণ করতে চাই, নিজেরা স্বর্গচ্যুত, অথচ পরের স্বর্গলাভের পথ-আবিষ্কারে মত্ত।

আবার বললেন : 'তোমাদের রাশিয়া কেবল সাধুরই জন্ম দিয়েছে, অসাধু দেয়নি, কেবল মার খেয়ে মরবে। লেনিন তো মস্ত বড় সাধু ছিলেন, যেমনি টলস্টয় ছিলেন। কিন্তু ওঁরা লাঠির সঙ্গে পারবেন কী? কক্ষনো নয়!'

বলতে ইচ্ছা হয়, চমৎকার। এমন স্বকীয়তা, এমন নূতনত্ব আর কোথাও চোখে পড়েছে? এমন করে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না, এটা জোর করে বলতে পারি। তিনি একবার যা বললেন, তা ভুল হলেও তার থেকে একচুল কেউ তাঁকে সরাবে, এমন বনঙ্গ-সন্তান বৃ-ভারতে দেখিনে। এক হিটলারি দম্ভে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

কিন্তু একমাত্র আশার কথা এই যে, এসব ব্যাপারে তিনি মোটেই সীরিয়াস নন, একবার যা বলেন দ্বিতীয়বার তা বলতে অনেক দেরি করেন। নইলে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। পৈত্রিক অধিকারে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তার অপব্যবহার করতেন সন্দেহ নেই।

ওদিকে কর্মব্যস্ত মাকে দেখতে পাচ্ছি। গভীর মনোযোগে তিনি তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন, কোথাও এতটুকু দৃষ্টিপাত করবার সময় নেই যেন। কাঁধের ওপর দুই গাছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খড়ের মতো চুল এলিয়ে পড়েছে, তার ওপর দিয়েই ঘন-ঘন ঘোমটা টেনে দিচ্ছেন, পরনে একখানা জীর্ণ মলিন কাপড়, ফর্সা পা-দুটি জলের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত বিশীর্ণ হয়ে এসেছে। পেছনে পেছনে নারু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ছেড়ে বাবা এবার ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দিলেন। নারুকে ডেকে বললেন, 'নারু, বাবা, তোমার কী চাই বলো?'

নারু তার ছোট-ছোট ভাঙা দাঁতগুলি বের করে অনায়াসে বলে ফেললো, 'একটা মোটর-বাইক। সার্জেন্টরা কেমন সুন্দর ভট্ ভট্ করে ঘুরে বেড়ায়, না বাবা?'

কিন্তু মন্টুর কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে। সে হঠাৎ পেছনে ফিরে মুখটা নীচের দিকে নিয়ে কামানের মতো হয়ে বললে, 'বাবা, এই দ্যাখো?'

দেখতে পাওয়া গেল, তার পেছনটা ছিঁড়ে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'বাঃ, বেশ তো হয়েছে, মন্টুবাবুর যা গরম, এবার থেকে দুটি জানালা হয়ে গেল, বেশ তো হলো। এবার থেকে হু হু করে কেবল বাতাস আসবে আর যাবে, চমৎকার, না?'

মন্টু সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে বুদ্ধিমানের মতো হসে উঠলো ; নারু তার ভাঙা দাঁত বের করে আরও বেশী করে হাসতে লাগলো, বাবাও সে হাসিতে যোগ দিলেন। আমাদের সামান্য বাসা এক অসামান্য হাসিতে নেচে উঠলো, গুম্ গুম্ করতে লাগলো।

হাসলুম না কেবল আমি। শুধু মনে-মনে উপভোগ করলুম। ভাবলুম আনন্দের এই নির্মল মুহূর্তগুলি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে খুশির আর অন্ত থাকে না। মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে।

বাবার পরবর্তী অভিযান হলো রান্নাঘরে। একখানা পিঁড়ি পেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে হাসিমুখে বাবা বললেন, 'আজ কী রাঁধবে? রাঁধবে আরও আমি যা বলবো?'

— 'ও মাগো, থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না!' মা দুই হাত তুলে মাথা নাড়তে লাগলেন, খিল্-খিল্ করে হেসে উঠলেন।

ব্যাপার দেখে নারু দৌড়ে গেল, দুজনের দিকে দুইবার চেয়ে তারপর মাকে মুচকি হাসতে দেখে বললে, 'মাগো, কী হয়েছে? অমন করে হাসছো কেন? বাবা তোমায় কাতুকুতু দিয়েছে?'

— 'আরে, নারে না, অত পাকামি করতে হবে না। খেলগে যা—' বাঁ হাত তুলে মা বাইরের দিকে দেখিয়ে দিলেন।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বাবা আবার বললেন, 'আচ্ছা, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখতে গিয়েছিলুম সেদিনের কথা মনে পড়ে?'

একটুও চিন্তা না করে মা বললেন, 'আমার ওসব মনে-টনে নেই!'

— 'আহা, বিলের ধারে মাঠে সেই যে গরু চরাচ্ছিলে?'

মা'র চোখ বড়ো হয়ে গেল— 'ওমা, আমি কী ভদ্দরলোক নই গো যে মেয়েলোক হয়েও মাঠে-মাঠে গরু চরাবো?'

— 'গরু চরানোটা কী অপরাধ? দরকার হলে এখানে-সেখানে একটু নেড়ে-চেড়ে দিলে দোষ হয়? আসল কথা তোমার সবই মনে আছে, ইচ্ছে করেই কেবল যা-তা বলছো।'

www.amarboi.com ~

— 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব মনে আছে, সব মনে আছে!'

মৃদু মৃদু হেসে বাবা বললেন, 'নৌকা থেকেই দেখতে পেলুম বিলের ধারে কে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার রাত্রে একটি মাত্র দীপশিখার মতো ; নৌকা থেকে নেমেও দেখলুম, সেই মেয়ে তার জায়গা থেকে এতটুকুও সরে দাঁড়াচ্ছে না বা পাখির মতো বাড়ীর দিকে উড়ে চলে যাচ্ছে না, বরং আমাদের দিকে সোজাসুজি চেয়ে আছে, অপরিচিত বলে এতটুকু লজ্জা নেই, কাছে গিয়ে দেখলুম ঠিক যেন দেবী প্রতিমা, খোলা মাঠে জলের ধারে, মানিয়েছে বেশ, গভীর বর্ষায় আরও মানাবে। তারপর এক ভাঙা চেয়ারে বসে ভাঙা পাখার বাতাস খেয়ে যাকে দেখলুম সে-ও সেই একই মেয়ে। কিন্তু এবার বোবা, লজ্জাবতী লতার মতো লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।'

বাবা হা-হা করে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। কতোক্ষণ পরে বললেন, 'তোমার কী চাই— বললে না?'

— 'আমার জন্যে একখানা রান্নার কাপড় এনো।'

— 'লাল রঙের।'

— 'হ্যাঁ।'

তারপর কার জন্যে কী এনেছিলেন খবর রাখিনি, কিন্তু নিজের জন্যে ছ' আনা দামের এক জোড়া চটি এনেছিলেন দেখেছি। মাত্র ছ'আনা দাম। বাবা এ নিয়ে অনেক গর্ব করেছেন, কিন্তু একেবারে কাঁচা চামড়া বলে কুকুরের আশঙ্কাও করেছেন।

কুকুরের কথা জানিনে, তবে কয়েকদিন পরেই জুতো জোড়ার এক পাটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ বলতে পারে না। আশ্চর্য!

পরদিন দুপুরবেলা রেলওয়ে-ইয়ার্ডের ওপর দিয়ে যেতে যেতে কার ডাকে মুখ ফিরে তাকালুম। দেখি শশধর ড্রাইভার, হাত তুলে আমায় ডাকছে। এখানে ইউনিয়ন করতে এসে আমার একেবারে প্রথম আলাপ হয়েছিলো এই শশধর ড্রাইভারের সঙ্গে। সেদিন সঙ্গে কমরেড বিশ্বনাথ ছিল। তখন গম্ভীরভাবে শশধর বলেছিলো, 'দেখুন বিশ্ববাবু, সায়েব সেদিন আমায় ডেকেছিলো।'

— 'কেন?'

— 'শালা বলে কিনা, ড্রাইভার, ইউনিয়ন ছেড়ে দাও, নইলে মুস্কিল হবে বলছি। শুনে মেজাজটা জবর খারাপ হয়ে গেল। মুখের ওপর বলে এলুম, সায়েব আমার ইচ্ছে আমি ইউনিয়ন করব। তুমি যা করতে পারো করো। এই বলে তখুনি ঠিক এইভাবে চলে এলুম। আসবার ভঙ্গিটা দেখাবার জন্যে শশধর হেঁটে অনেক দূর পর্যন্ত গেল, তারপর আবার যথাস্থানে ফিরে এলো।

আমার প্রথম অভিজ্ঞতায় সেদিনের দৃশ্যটি চমৎকার লেগেছিল। আমার আই মধ্যাহ্নের ট্রাকটর-স্বপ্নের ভিত পাকা করতে আরম্ভ করলুম সেই দিন থেকে। একথা বলাই বাহুল্য যে, ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলুম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলুম জনতার দিকে, তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলুম। তাদেরও ধন্যবাদ, যারা আমাকে আমার এই অসহায়তার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে

www.amarboi.com ~

গেছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! সেবাব্রত নয়, মানবতা নয়, স্বার্থপরতা অথচ শ্রেষ্ঠ উদারতা নিয়ে এক ক্লান্তিহীন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন!

আমি শশধরের কাছে গেলুম। শশধর বললে, 'উঠুন।'

সে আমাকে তার এঞ্জিনে উঠিয়ে নিলো। তারপর একটা বিড়ি হাতে দিয়ে বললে, 'খান, সুকুমারবাবু।'

বিকেলের দিকে একটা গ্যাঙের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করবার কথা ছিল। ওরা আমার দিকে কেউ তাকালো, কেউ তাকালো না। অদূরে এঞ্জিনের সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। পয়েন্টস্‌ম্যান-গানারদের চিৎকার করে হুইসিল শোনা যাচ্ছে।

ইয়াসিন এতদিন পরে ছুটি থেকে ফিরেছে দেখলুম। আমাকে দেখে কাজ থামিয়ে বললে, 'ওরা কী বলেছিলো জানেন?'

হেসে বললুম, 'কী?'

— 'বলছিলো আপনি একটা ব্যারিস্টার হলেন না কেন?'

সকলে হো হো করে হেসে উঠলো, আমিও হাসতে লাগলুম।

মেট্ সুরেন্দ্র গম্ভীরভাবে বললে, 'তোমার কাছে আমাদের আর একটি নিবেদন আছে, ইয়াসিন মিঞা! আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে তোমায় ইস্কুলে পড়াতে চাই!'

এবার হাসির পালা আরও জোরে। কাজ ফেলে সবাই বসে পড়লো।

ইয়াসিন রেগে গেল, বললে, 'বাঃ বাঃ বাঃ, খালি ঠাট্টা আর ঠাট্টা, না? চারটে পয়সা দিয়েই খালাস, না? চারটে পয়সা দিলেই বিপ্লব হবে, না? বিপ্লব আকাশ থেকে পড়বে, না?'

— একটু শান্ত হয়ে ইয়াসিন শেষে একটা গল্প বললে।

গল্পটি হচ্ছে এই : সে এবার বাড়ী গিয়ে তার গাঁয়ের চাষীদের একটা বৈঠকে যোগ দিয়েছিলো। সেই বৈঠকে যে লোকটা বক্তৃতা করেছিলো সে হঠা তার দিকে চেয়ে বললে,—ভাই ইয়াসিন, তোমাদের ওখানে ইউনিয়ন নেই? ইয়াসিন বুক ঠুকে বললে, 'আলবৎ আছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বুক পকেট থেকে একখানা রসিদ বের করে দিলো। লোকটি তখন ভয়ানক খুশি হয়ে বলেছিলো, তুমি যে আমাদের কমরেড, ভাই ইয়াসিন! তুমি যে আমাদেরই। ইয়াসিন তখন বিচক্ষণের মতো হেসেছিলো। — 'দুনিয়ার সবাই এরকম এক জোট হচ্ছে, আর আমরাই কেবল চুপ করে বসে থাকবো, না? চারটে পয়সা দিলেই খালাস, না?' বলতে বলতে ইয়াসিনের ঘর্মাক্ত মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে কাজে লেগে গেল, গভীর মনোযোগে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে কাজ করতে লাগলো।

আমি ফিরে এলুম। সাম্যবাদের গর্ব, তার ইস্পাতের মতো আশা, তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলুম। এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঝির্ ঝিরে বাতাসের সঙ্গে শেড-ঘর থেকে তেল আর কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ আসছে বেশ। আমি বাঁ দিকে শেড-ঘর রেখে পথ অতিক্রম করতে লাগলাম। একটু এগিয়ে দেখি লাইনের ওপর অনেকগুলি এঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় গভীর ধ্যানে বসেছে যেন। আমার

www.amarboi.com ~

কাছে ওদের মানুষের মতো প্রাণময় মনে হলো। এখন বিশ্রাম করতে বসেছে। ওদের গায়ের মধ্যে কতো রকমের হাড়, কতো কলকব্জা, মাথার ওপর ওই একটিমাত্র চোখ, কিন্তু কতো উজ্জ্বল। মানুষ ওদের সৃষ্টিকর্তা। হাসি নেই, কান্না নেই, কেবল কর্মীর মতো রাগ। এমন বিরাট কর্মী-পুরুষ আর আছে। সত্য কথা বলতে কী, এত কলকব্জার মাঝে, এতগুলি এঞ্জিনের ভিতর দিয়ে পথ চলতে চলতে আমার শরীরে কেমন একটা রোমাঞ্চ হলো। আমি হতভম্ব হয়ে তাদের মাংসহীন শরীরের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলুম।

তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বাসায় ফিরে এলুম।

কয়েকদিন পরে কোনো গভীর প্রত্যুষে একটি ইঁদুর-মারা কল হাতে করে আমার বাবা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসতে লাগলেন। দারুণ খুশিতে নারু আর মন্টুও দুই আঙুল ধরে বানরের মতো লাফাচ্ছিলো। কয়েক মিনিট পরে আরও অনেক ছেলেপেলে এসে জুটলো। একটা কুকুর দাঁড়ালো এসে পাশে। উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে যারা সাহসী তারা কেউ লাঠি, কেউ বড় বড় ইট নিয়ে বসলো রাস্তার ধারে।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, কয়েকটা ইঁদুর ধরা পড়েছে।

কাদম্বিনী খুশি হইয়া বলিলেন, 'নিশ্চয়ই করবি। তুমি কি আমাদের অজিত, বাবা, যে বছর বছর শুধু টাকা খরচ করতে হবে?'

রণু বলিল, 'আচ্ছা জ্যাঠাইমা, জিতু বলে একটি ছেলে এসেছিল এখানে ও-ই যে আপনাদের মাসতুতো না পিসতুতো ভাই-এর ছেলে, ও বুঝি বিলেত যাবে?'

—যাবে না তো কি? মস্ত বড়লোক ওরা, তার ওপর ছেলেটাকে দেখেছিস তো, কেমন মুখের ওপর একটা বুদ্ধির দীপ্তি। অনেকটা তোর মত...তোরও ওরকম হতো, কেবল পয়সার জোর নেই বলে।'

আশ্চর্য হইয়া রণু বলিল, 'কি বলেন আপনি, জ্যাঠাইমা? আমার হতো না, কক্ষনো হতো না, বড়দাই বলেছে যে...'

হাসিয়া কাদম্বিনী বলিলেন, 'কি বলেছে?'

'নিজেকে নিজে বকবো?' রণু হাসিয়া ফেলিল। কাদম্বিনীও হাসিলেন।

আশ্চর্য বটে। যাইবার সময় বীণাকে বাড়িসুদ্ধ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বেলা তিনটায় ট্রেন।

একবার দেখা হইয়াছিল, কিন্তু অতি অল্পক্ষণের জন্য।

রণু কাদম্বিনীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বীণাদিকে খুঁজে পাচ্ছি না, জ্যাঠাইমা। গাড়ীর সময় হয়ে এসেছে যে!'

—'দ্যাখ, পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?'

সেই হাজরাদের বাসায় বীণাকে পাওয়া গেল। সে কনকের সাথে বসিয়া গল্প করিতেছিল।

আগেই কনক হাসিয়া বলিলেন, 'রণু কেন আমাদের বাসায় এসেছে আমি তা জানি।'

www.amarboi.com ~

—'আপনার সব সময়ই ঠাট্টা বৌদি', রণু বলিল।

—'আমার কি দোষ ভাই? বীণা তো এতক্ষণ তোমার কথাই বলছিল। তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে, ফল বেরোয়নি কিন্তু তার আগেই তুমি চলে যাবে, তোমার নাকি পড়বার ইচ্ছা ভয়ানক, তাহলে কি হবে, বীণা বলে, যে চায় সে পায় না। তাছাড়া আরও কতো কি?...তোমার মত ছেলে খুব কম দেখা যায়।—কনক হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল রণুর। কোনদিন তাহার এ দুর্বলতা দেখা দেয় নাই, আজ কি জানি কেন দিল। সে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, 'বীণাদি, চলুন শীগগির।'

বাসায় আসিয়া রণু কি যে বলিবে খুঁজিয়া পাইল না।

বীণা প্রথমে কহিল, 'যেখানেই থাকি না কেন, তোমাকে আমি মনে করবো ভাই।'

—'তা জানি বীণাদি। আমিও আপনাকে কোনদিন ভুলবো না।' রণু আর বলিতে পারিল না।

তারপর গলি শেষ হইবার আগে রণু একবার পিছন পানে তাকাইয়া দেখিল, সকলেই তাহার দিকে চাহিয়া আছে, নাই কেবল বীণাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমলা বিরক্ত হয়ে উঠল। যেন এত বিরক্তি তার কোনদিন আসেনি। নইলে ইকনমিক্সের পপুলেশন চ্যাপ্টারটা তো জমে ওঠবার কথা কিন্তু আজকার ক্লাসে কিছুতেই যেন তার লেকচার গভীর হয়ে উঠলো না।

এমন এক-একটা দিন আসে সত্যি যখন কিছুই ভালো লাগে না। আজ যেন তাই। সে যেন আজ প্রথম টের পেলো, ইস্কুলের মেয়েদের চেয়ে কলেজের মেয়েরা গোলমাল করে বেশী। অথচ এখানে কিছুই বলা যায় না, ইস্কুলের মতো যায় না বেঞ্চির ওপর দাঁড় করানো, যায় না কান ম'লে দেওয়া। ইস্কুল থেকে কলেজে উঠে মনে করে, কি-না-কি করে ফেললাম; দুর্ভাগ্য সব। তার মেয়ে যদি হয়, সে কোনোদিন তাকে কলেজে পড়াবে না। পড়িয়ে বা লাভ কি? কিছু বোঝে না, কিছু জানে না, কেবল চোখ বুজে মুখস্থ; আর পরীক্ষা খারাপ দিলে হাউ-মাউ করে কান্না, ফিট—আরও কতো কি! কিন্তু কাজের বেলায় দ্যাখো, সব পেছনে প'ড়ে আছে। নাচের যত পারফর্ম্যান্সই দিক্, একাই কলেজে আসুক, বেড়াক একা, এক মিনিটে হাজারো কথা বলুক—এখনও তাদের মনে পাঁচ শো, এক হাজার, পাঁচ হাজার, বলো-তো দশ হাজার বছর আগেকার আদিম মনোবৃত্তি আছে বেঁচে।

অথচ পুরুষেরা এমনি বোকা যে এসব তারা মোটেই জানে না, ধরে নেয় অন্যরকম। কতো কবিতা লিখে ফেলে, দেহের রূপ-সাধনায় হয়ে ওঠে তৎপর। রমলা যদি পুরুষ হতো তবে দিত সব প্রকাশ করে।

রমলা হাসলো, তাহলে কি মজা হবে! দুর্মূল্যতা, অহংকার, লজ্জা সব চুরমার হয়ে যাবে।

রমলার মন আজ ভালো নেই। বলেছি তো, এত বিরক্তি আর অবসাদ তার কোনদিন আসেনি। দেড়টার পর এক ঘণ্টা লীজার। সে কলেজ-বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নির্জন জায়গা দোতালার ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির কাছে যে এক টুকরো বারান্দা আছে সেখানে এসে দাঁড়ালো। অন্যদিন হয়তো লাইব্রেরীতে গিয়ে বসতো; গল্প করতো প্রভাদির সঙ্গে, ভারী মজার লোক তিনি, হাসাতে-হাসাতে মারেন, কিন্তু আজ তার কি হলো, সে রেলিংয়ে ভর দিয়ে বুকের কাছে এক হাত মার্শালের ইকনমিক্স চেপে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। নীচে কিছুদূরে দেখা যায়, গেটের কাছে বেল গাছের ছায়ায় বসে কলেজের দরওয়ান কা'র সাথে গল্প করছে। ঘণ্টা পড়বার পর মেয়েরা ক্লাস বদলিয়েছে, এখনও দু'-একটি মেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। দুপুরের দমকা বাতাস মাঝে মাঝে গায়ে এসে লাগছে; কপাল আর গালের কাছে দু'-এক গোছা চুল উড়ছে বাতাসে। আকাশে ছেঁড়া শাদা মেঘ।

রমলা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার কি মনে করে প্রফেসরদের বিশ্রাম-কক্ষের দিকে গেল, কিন্তু সেখানে প্রভাদি নেই। তাহলে তিনি আসেন নি, নাকি আবার প্রিন্সিপালের ঘরে গিয়ে গল্প করছেন?

একপাশে বসে নূতন-নিযুক্ত অরুন্ধতী বসু নিবিষ্ট মনে কি যেন পড়ছে।

www.amarboi.com ~

রমলা কোন সাড়া না দিয়ে নিঃশব্দে প্রিন্সিপালের ঘরে গিয়ে হাজির হলো।

প্রভাদি সত্যি আসেন নি।

প্রিন্সিপাল নির্মলা রায় গম্ভীরভাবে কাগজ-পত্র দেখছেন। পাশের চেয়ারে ইংরেজীর অধ্যাপক সুধীরবাবু বসে আছেন, কোন কাজ আছে বোধ হয়।

রমলা চকিতে একবার সেদিকে চেয়ে বললে, 'শরীরটা ভারী খারাপ বোধ হচ্ছে নির্মলাদি।'

নির্মলা মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বললে ভাই?'

তিনি রমলাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করেন, রমলার সাথে তাঁর আত্মীয়তার একটু সূত্র নাকি আছে, আর তাছাড়া সে কলেজের সবচেয়ে অল্প-বয়সী অধ্যাপিকা।

রমলা বললে, 'ভারী exhausted feel করছি।'

—'বোর্ডিং-এ চলে যেতে চাও?'

—'If you permit—'

নির্মলা তাড়াতাড়ি বললেন, 'যাও।'

একটু হেসে রমলা চলে এলো।

কলেজের লাইব্রেরী। বুড়ো লাইব্রেরীয়ান টেবিলের ওপর ভর দিয়ে বই পড়ছেন। ঘরে আর কেউ নেই।

রমলা একটা বই নেবে। বই দিয়ে সে তার ভালো-না-লাগার সময়গুলো কাটাবে। সে বললে, 'শ'র কোন বই সবচেয়ে ভালো হবে, আপনি জানেন যদুবাবু?'

যদুবাবু বললেন, 'আমাদের এখানে তো সব বই নেই, Man and superman ছিল, এখন লাইব্রেরীতে নেই—কে যেন নিয়েছে! Doctor's Dilemma নিতে পারেন।'

—'দিন তো।'

যদুবাবু বই এনে দিলেন।

রমলা বই হাতে করে বোর্ডিং-এ চলে এলো।

দুটো বেজে গেছে। সে হাত থেকে ঘড়ি খুলতে খুলতে দেখলো।

সামনের জানালা দিয়ে হু হু করে আসছে বাতাস। তারই প্রতাপে একটি পাতলা ক্যালেন্ডার দেওয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে শব্দ করছে।

দুপুরের নিস্তব্ধতা চারদিকে।

রমলা জুড়ো ছেড়ে আয়নার কাছে এসে দাঁড়ালো! আয়নাটা ছোট। বোর্ডিংয়ে এরকমই থাকে। কিন্তু রোজই কারণে-অকারণে আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে রমলার একটা বড়ো আয়নার কথা মনে পড়ে, যাতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত যথাযথ দেখা যায়। কিন্তু দেয়ালে ঝুলানো ছোট ওই জাপানী আয়নায় দেহের সবটুকু দেখা যায় না। রূপ কি শুধু মুখেই!

পোশাক-পরিচ্ছদ বদলাবার পর রমলা গামছা সাবান নিয়ে স্নানের ঘরে গেল। কিছু পরে হাত-পা ধুয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে এলো।

গত রাত্রির বিছানা এখনও পাতাই রয়ে গেছে। টেবিলের ওপর কয়টি বই ছড়ানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩১৭www.amarboi.com ~

Writing pad-এর পাতা বাতাসে ফর্-ফর্ করছে।

রমলা আবার আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে আংশিক প্রসাধন সেরে বইটি হাতে করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। বই খুলতেই Preface—

এক—

দুই—

তিন পৃষ্ঠা—রমলার আবার বিরক্তি এসে গেল। ক্রমাগত আরও পাতা উল্টিয়ে দেখলো, প্রায় অর্ধেক বই-ই কেবল Preface। তারপর আসল নাটক।

ওরে বাপ্‌রে!

আপনারা শুনে আরও আশ্চর্য হবেন, রমলা গুপ্তা এম.এ. বইটা পাশে রেখে দিলো। অদ্ভুত বটে! এরকম মনের অবস্থায় আপনি আমি হয়তো ক্ষমা পেতে পারি কিন্তু কলেজের অধ্যাপিকা রমলা গুপ্তা কখনও পান না।

আমি জানি, এ আপনাদের চোখে ঠেকবে, কিন্তু ঘটেছিল সত্যি। কেন যে ঘটেছিল তা এখন খুলেই বলি।

দু'বছর আগেকার কথা।

প্যাক্ট হলো। কেউ কারুর স্বাধীনতায় বাধা দিতে পারবে না। যদি কখনও প্রয়োজন হয়, পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মতো ব্যবহার করবার, তখন দু'জনের সম্মতিতেই হবে। তার আগে নয়।

পূর্ববঙ্গের কোন এক বে-সরকারী কলেজের তরুণ অধ্যাপক অদিতি গুপ্ত চুক্তিপত্রে সায় দিলেন। রমলা নূতন চাকরি পেয়েছে। তখন তার প্রাচুর্যের আনন্দ, নূতন জীবনের আনন্দ, যেন খোলা মাঠের বাতাস, যেন বাধা-না-পাওয়ার মধ্য রাত্রির জ্যোৎস্না।

অদিতি গুপ্তের মতো মানুষ দেখা যায় না। মনে হলো, এই তার স্বামী হওয়ার উপযুক্ত এতটুকু অভিযোগ নেই, জোর খাটাবার ইচ্ছে নেই।

কতকগুলো চিঠি আছে। বিয়ের পর এগুলোই সম্বল। রমলা আবার উঠে ডেস্ক থেকে চিঠিগুলো বার করলো একটি সে খুলে বসলো।

চিঠির কাপড় প্যাড থেকে নেওয়া নয়, সামান্য খাম থেকে ছেঁড়া কাগজ। অন্য কোনো বাহুল্য নেই; অদিতি গুপ্তের মনের একদিক এখান দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু লেখার বাহুল্য আছে; মানে, পড়তে বেশ লাগে।

সেটিতে লেখা : রমলা, কলেজের ছাত্রদের এক সভায় শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, ছাত্রদের পক্ষ থেকে এই আদেশ এসেছে। আমার ওপর এ হুকুম। কারণ আমি পড়াই বাংলা। যাই হোক, তুমি আছ বেশ, তোমার জীবনে ওটা কখনই লাগবে না কাজে, অন্তত বক্তৃতা দিতে বলবে না কেউ।

তারপর আগের দিন রাতে প্রবন্ধ লিখে পরের দিন বলেছি কিছু। শুনেছি, খুব ভালো নাকি হয়েছে। আমার প্রবন্ধে এমন একটা দিক নাকি প্রকাশিত হয়েছে যা আগে কখনও দেখা যায়নি। সম্পূর্ণ অভিনব। অভিনবই বটে! নারী-চরিত্রে সর্বজ্ঞ আমি। হয়তো আরও কিছু লিখলে একটা অথরিটি হয়ে যেতাম।—

কি যেন এক অস্পষ্ট ইঙ্গিত, মনের এক আভাস আছে এই চিঠিতে, রমলা যেন আজ এই প্রথম বুঝতে পারলো।

www.amarboi.com ~

কিন্তু এ চিঠি আজকের নয়, অনেক দিনের। তখনকার মনের অবস্থা যা ছিল, এখনও তাই আছে কি না, কে জানে?

রমলা বাইরের দিকে চাইলো। বোর্ডিংয়ের মাঠের পামগাছের কতখানি দেখা যাচ্ছে তাই আছে কি না, কে জানে?

রমলা বাইরের দিকে চাইলো। বোর্ডিংয়ের মাঠের পামগাছের কতখানি দেখা যাচ্ছে আর লম্বা ইউক্যালিপ্টাসের ছোট পাতা বাতাসে কাঁপছে। ফাল্গুনের বাতাস, একটু শীত করে যেন। রমলা তার একহারা পরা চাদর আরও খুলে চেপে ধরলো; তা ছাড়া শরীরটাও ক্লান্ত বোধ হচ্ছে।

অদিতি বিস্ময়ে বললো, 'কোন খবর না দিয়েই যে।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রমলা বললো, 'ও, খবর দিই নি বুঝি?'

—'সে তো তুমিই জানো।'

—'সে কথা আগে ভাববার সময় পাইনি।'

—'এত কাজ। এক রকম নোটে ছাত্রীরা আর খুশী নয়, তাই অন্য অথারের বই পড়তে হয় বুঝি খুব?'

—'না, ইকনমিক্স সম্বন্ধে কেউ বড় আগ্রহ প্রকাশ করে না।' রমলা হাসলো।

ঘরে ঢুকে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে বললো, 'ঘরটি বেশ পরিষ্কার সাজানো তো! আমার ঘরের তুলনায় এ স্বর্গ। ইস্, তুমি যদি দেখতে'—

—'থাক, দেখার আর দরকার নেই। মেয়েদের বোর্ডিংয়ে পুরুষের যাবার অধিকার তো নেই।'

অদিতি রমলাকে হাত ধরে বসালো। তারপর বললো, 'সারারাত ট্রেনের জার্নি, খুব strain হয়েছে, নিশ্চয়ই ঘুমও হয়নি। তুমি বিশ্রাম করো।'

—'না, এখন স্নান করবো।' রমলা উঠে জুতো খুললো।

অদিতি বললো, 'তাহলে তুমি কাপড় বদলাও, আমি যাই।'

—'যাও।' রমলা মিষ্টি হেসে বললো, 'আবার এখনই এসো কিন্তু। বাথরুমটা দেখিয়ে দেবে এসে।'

স্নানের পর শরীরটা বেশ ঝরঝরে হলো, ভালো লাগলো।

অদিতি বললো, 'বয়কে ডাকি। কি খাবার হলো?'

—'সে সম্বন্ধে আমার কোন প্রেজুডিস নেই; যা ভালো হয়।'

—'বেশ।' অদিতি খাবার ব্যবস্তা করলো।

রমলা বললো, 'সাহেবের হোটেল। খরচ দাও কত?'

—'তা কি তোমায় বলিনি রমলা? যে সংসারে অনেক ছেলে-মেয়ে, এক স্বামী আর এক স্ত্রী, তাদের বুড়ো মা—বেশ চলে এ টাকায় যতো আমি দিই এখানে খাওয়া আর থাকায়। অবিশ্যি এই আমার ভালো লাগে। কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।'

রমলা বললো, 'মাইনেয় কুলোয় তা হলে?'

—'কোন মাসে কুলোয়, কোন মাসে কুলোয় না। জানো তো, আমার এক বিধবা বোন আছে, তাকে সাহায্য করতে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩১২www.amarboi.com ~

—'জানি', রমলা এমনি হাত দুটো এক করে বললো, 'কিন্তু একটা কথা বলবো'—

—'কি?'

—'বলো কিছু মনে করবে না—'

অদিতি হেসে বললো, 'না, বলো।'

রমলা বললো, 'আমার তো মোটেই খরচ নেই। তোমার যখন দরকার, কেন নাও না—'

—'চেয়ে?' অদিতি আবার হাসলো।

রমলার একবার ইচ্ছে হলো বলে, 'না, চেয়ে নয়, জোর করে।' কিন্তু লজ্জায় বলতে পারলো না।

তাকে নীরব দেখে অদিতি বললো, 'কি, প্রস্তাব বুঝি ঠেকে গেলে? এ তো জানই—মেয়েদের অর্জিত টাকা পুরুষে নেয় না।'

—'কিন্তু তা তো অনেকে নেয় দেখেছি।'

—'না, তা নয়। আমি বলছিলুম, তাহলে যে চুক্তি ভঙ্গ হবে।'

—'ও', বলে রমলা একটা নিঃশ্বাস ফেললো চেপে।

অদিতি তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললো, 'তুমি একটু পাতলা হয়ে গেছে। খুব কি খাটুনি পড়েছে।'

—'না। বেশী পরিশ্রম আমার ধাতে কোনদিনই সইলো না, তুমি তো জানো', রমলা হেসে বললো, 'তবু কেমন করে যে রোগা হলুম বুঝতে পারছি না তো। কিন্তু তুমি টের পেলে।'

অদিতি বললো, 'না, রোগা নয়। তুমি যেন আরও slim, আরও graceful হয়েছো।'

রমলা নীরবে হাসলো।

বয়ের হাতে খাবার এলো। টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখি তারা বসলো।

রমলা বললে, 'তুমি খাবে না?'

—'বেশীক্ষণ হয়নি যে খেয়েছি', অদিতি বললো, 'তুমি খাও, আমি গল্প করি।'

রমলা হাত গুটিয়ে বসলো।—'এত খেতে আমি কিছুতেই পারবো না। তুমি এসো সঙ্গে।'

ভঙ্গিটা কতকটা ছোট মেয়ের আব্দারের মতো। এ পরিচয় যেন অদিতির চোখে নূতন ঠেকলো! সে হেসে বললো, 'আচ্ছা, এসো।'

খাওয়া শেষ হলে পর, অদিতি কৌটো থেকে একটা সিগারেট নিয়ে বললো, 'তোমাদের নির্মলাদি কেমন, এখনও বিয়ে করেন নি? এখনও কুমারী নির্মলা রায়?'

—'হ্যাঁ, এখনও কুমারী নির্মলা রায়?' রমলা মুচকি হাসলো।

সিগারেটে আগুন লাগানো হয়নি। অদিতি তা মুখে দিয়ে এমনি বসে ছিল। রমলা দেশলাই-এর কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে দিলো।

তাতে একটা টান দিয়ে কতকগুলো ধোঁয়া ছেড়ে অদিতি বললো, 'তুমি ঘুমোও, সারা রাত জেগেছ।'

www.amarboi.com ~

রমলা সত্যি বড়ো ক্লান্তিবোধ করছিলো। সে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়লো। অদিতি টেবিলের ওপর থেকে একটা বই নিয়ে পড়তে লাগলো।...

রমলা যখন ঘুম থেকে উঠলো, তখন অনেকক্ষণ বিকেল হয়ে গেছে।

রমলা চোখ রগড়িয়ে ভাবলো, সে কোথায় এসেছে! এই তো কাল ছিল একা, আর আজ? কে আছে পাশে? এ কোন জায়গা?

সমস্ত ঘরটিতে রমলা চাপা আনন্দে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। কিন্তু অদিতি ঘরে নেই। সে হাতের কাছে ছোট টেবিল থেকে ঘড়ি তুলে দেখলো, পাঁচটা বেজেছে।

—'বেশীক্ষণ ঘুমুই নি তো, তবে অদিতি গেল কোথায়?' রমলার একটু ভয় হলো যেন। খাট থেকে নেমে সে বাইরে বারান্দায় গেল। সেখানে অদিতি নেই। তার ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে ডাকি।

নীচে গিয়ে হোটেলের মেমগুলোকে জিজ্ঞেস করলে হয়। কিন্তু ওরা কি জানে? বারান্দায় রেলিং ধরে সে ভাবতে লাগলো।

—'রমলা।'

রমলা চমকে ফিরে তাকালো, অদিতি খালি পায়ে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে, কাঁধে টার্কিস টাওয়েল।

—'এ কি?'

অদিতি হেসে বললো, 'কাপড়-চোপড় নিতে মনে নেই।'

—'বাথরুমে ঢুকেও মনে হলো না?'

—'হয়েছিলো, কিন্তু তখন অর্ধেক স্নান করে ফেলেছি কিনা।'

রমলা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। এই প্রথম সে এমনভাবে হাসলো। তারপর ঘরে গিয়ে কাপড় এনে দিলো।

একটু পর অদিতি ঠিক হয়ে বললো, 'বেড়িয়ে আসবে?'

—'চলো।'

ডাক-বাংলো, রেলওয়ে কর্মচারীদের কোয়ার্টার, পথের পাশে বড়ো লাল দালান, গাছের সারি, জনহীন-প্রায় পীচ-ঢালা মসৃণ রাস্তা।

শহরের বুকে নেমেছে ধূসর, পাতলা অন্ধকার। সারি সারি বাড়ী আর গাছপালার মধ্যে ছায়া এসেছে ঘন হয়ে।

আঁকাবাঁকা রাস্তা, সাপের মতো, কালো তার রং। বাতাসে আর দীর্ঘ সেগুন গাছের পাতার সঙ্গে শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে।

পাশে লম্বা লেক। তারপরেই অনেক দূর পর্যন্ত খোলা মাঠ। জলের মাঝখানে ছোট ঢেউ।

এখানে এই খোলা মাঠে, নরম ঘাসে, গাছের ছায়ায় আকাশের নীচে বসলে পর চোখে কেমন যেন নেশা লাগে, হাত দুটি কাকে যেন হাতড়ায়।

অদিতি সবুজ ঘাসের ওপর পা ফেলতে-ফেলতে বললো, 'একটা কথা এখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি, তুমি কেমন আছো?'

www.amarboi.com ~

রমলা হাত ধরে ছিলো, একটু হাসলো, বললে—'ভালো। তুমি?'

—'ছোটবেলায় কোনকিছু হলেই আগে থেকেই বলে রাখতুম, তোমরা যাই বলবে তার চেয়ে একবার বেশী আমার। এখনও তাই বলছি। তুমি যতটুকু ভালো, তা যদি ডিগ্রী দিয়ে মাপা যায়, তার চেয়ে এক ডিগ্রী সব সময়েই আমি বেশী।'

হাসি-মুখে রমলা বললো, 'জায়গাটা বেশ, না?'

—'হু', কিন্তু একা নয়। আমার দু'জনে আছি বলে।'

—'মানে?'

—'মানে, আমি আছি বলে তোমার ভালো লাগে, আর তুমি আছো বলে আমার ভালো লাগে।'

অন্য সময়ে অন্য কেউ হলে রমলা করতো প্রতিবাদ, কিন্তু এখন করলো না।

সে অনুভব করলো, তার হাতের মধ্যে অদিতির হাতটি আরও চেপে এসেছে।

সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এলো।

জিমখানা ক্লাবের উৎসবের বাজনা শোনা যাচ্ছে, রাত নটা। রমলা আর অদিতি হোটেলে ফিরলো। নীচের তলায় গ্রামোফোনে মার্লিনের গান হচ্ছে। ওপরে-ওঠার সিঁড়ির পাশে জানালা দিয়ে দেখা গেল, কর্মরত দু'-তিনটে মেম আর টেবিল-ঘিরে সাহেব।

ওপরে গিয়ে অদিতি চেয়ারে বসে পড়লো আর রমলা দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে।

অদিতি একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললো, 'কি, দাঁড়িয়ে যে!'

—'বিছানা করতে হবে না?'

—'কোথায় হবে?' অদিতি ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'জায়গা নেই তো। ওটা তো একজনের খাট। তুমিই না হয় ঘুমাও, আমি এখানে বসে—।'

রমলা একরকম চেঁচিয়ে উঠলো—'তবে আমি কি করবো? এখন গাড়ী আছে?'

—'ভয় পাও কেন রমলা? এ পর্যন্ত আগাগোড়া আমার স্বভাবটায় কি দেখতে পেলে, একবারটি ভেবে দেখ না! আজ রাতেই তোমাকে যেতে হবে, অসম্ভব একথা। অনেকদিন পর স্বামী-স্ত্রীতে দেখা হলে পর তারা রাত জাগতেও তো পারে? কি বলো? তারপর মেঝে আছে। সেকথা কি তুমি এত ভুলে গেলে যে, চেঁচিয়ে উঠলে ভয় পেয়ে?' অদিতি হাসতে হাসতে খুব কাছে এসে বললো, 'কি মজা, লক্ষ্য দু'জনেরই আমাদের এক হলেও ভান করে তোমাকে একটু রাগিয়ে দিলাম, তোমাকে সুন্দর দেখালো, তুমি ধরা পড়লে—আর...। এখন হাসছো?' অদিতি রমলার মুখের ওপর নত হয়ে তার পাতলা ঠোঁটে একটু চুমো খেয়ে বললো, 'খিদে পেয়েছে বড়ো। বয়কে খবর দিই।'

—'না আমার মোটেই খিদে নেই, তুমি খেলে খেতে পারো?'

—'তবে আমারও নেই।'

—'কি বলো?' আশ্চর্যের ভাবে রমলা তাকালো, 'এই যে বললে—'

অদিতি হেসে বললা, 'মনে আছে, তোমার খাওয়ার সময় হাত গুটিয়ে বস্‌লে—'

—'তারই শোধ নেওয়া হচ্ছে বুঝি?'

—'হ্যাঁ'।

—'আচ্ছা, বয়কে ডাকো। আমি হার মানছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে, আর বেড়ে উঠছে তার রহস্যময়তা! বাইরে ঘুট-ঘুটে অন্ধকার, আকাশে অজস্র তারা, চোখ মেলে রাত জাগছে, আবার দিনের বেলা ঘুমুবে। গির্জার ঘড়িতে বাজলো বারোটা, বাজলো একটা...

রাত্রির রহস্য গভীরতর হল। তারপর একটু একটু করে ভোরের আভাস।

বাজলো বেলা আটটা।

শহরের চোখে নেশা জমে রাতে, আর ভোর হতেই সে-নেশা যায় টুটে, শুরু হয় কোলাহল, ব্যস্ততা, মোটরের হর্ণ। দিনের আলোয় মানুষগুলো মুখোশ পরে।

অদিতি চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছে। আর—রমলা শুয়ে আছে আড় হয়ে মেঝেয় পাতা বিছানায়।

—'রমলা—'

—'কি?'

—'বারোটায় ছাড়বে কলকাতার গাড়ী, এখন আটটা বেজে গেছে। আমার স্বভাবটা তো জানো, আপন-ভোলা নই, কিন্তু নিজেকে ভুলতে পারি ইচ্ছে করলে। তুমি চলে যাও, এতটুকু জোর আমি করবো না,—থাকো, তোমাকে ভয়ানক ভালোবাসবো—! ওঠো! না গেলে কলেজে যাওয়া হবে না, ছুটিও নাওনি। ওঠো। তোমার অনেক কাজ—'

—'আমাকে ঠাট্টা কর না।'

—'তুমি কি স্বপ্ন দেখছো!'

—'হ্যাঁ, খুব ভালো একটা স্বপ্ন, আগে কখনও দেখিনি। খুব সুন্দর! আমার ভালো লাগছে। এত ভালো লাগছে যে তা তোমায় মুখে বোঝাতে পারবো না। এত ভালো, এত গভীর...'

রমলার ঠোঁট চেপে আসছে, চোখের পাতা অর্ধেক খোলা।

—'তুমি ঘুমোও, আমি সব ব্যবস্থা করি গে।'

—'না'—রমলা এবার যেন জেগে উঠলো, বললো, 'না। তুমি কোথায় যাচ্ছো আমায় একা ফেলে?'

অদিতি হেসে বললো, 'কেন, সম্মতির অপেক্ষা করতে হবে নাকি?'

রমলাও হেসে বললো, 'আচ্ছা কাল বিকেল থেকে এ পর্যন্ত ভেবে দ্যাখো তো, আমার সম্মতির দিকে কতদূর চাওয়া হয়েছে?'

অদিতি বললে, 'বৃথাই এতদিন প্রফেসরি করলুম রমলা! অনেক আগেই এটা আমার জানা নিশ্চয়ই উচিত ছিল যে মেয়েরা কিছু মুখে বলে না, তাদের ডাকাতি করতে হয়, অর্জুনের মতো হরণ করতে হয়।'

—'ডাকাত।' জড়িমায় রমলা চোখ বুজলো আবার। তার রাত্রি এখনও শেষ হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩১৬www.amarboi.com ~

অভিনয় শেষে গ্রীনরুমে এসে সকলে সমবেত হয়েছে। স্থান অল্প, লোক বেশী। অভিনয় ব্যাপারে এত পরিশ্রমের পরেও অজস্র কথার গতিতে মুখের রং তোলার বা পোশাক-পরিচ্ছদ বদলানোর তাড়া নেই।

স্থান-স্বল্পতা সত্ত্বেও ঘরের এক কোণে একটু নিরিবিলি আছে। মেয়েদের সেখানে আনাগোনা কম, কিন্তু ভারতী এসেই সে স্থানটুকু বেছে নিয়েছে। অত গোলমাল আর ভালো লাগে না। ভারতী তাই একটা লোহার চেয়ারে চিবুকে হাত রেখে বসে মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চুপ করে আছে।

কিন্তু কোন রকমেই রেহাই পাবার উপায় নেই। রেখা কোত্থেকে এসে ধরলো।

—ইস, ভাই, তোকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। এমন করে একলাটি বসে আছিস কেন বল্ তো? ভারতী হেসে বললো, 'এমনি'!

—তোর সবই তো এমনি, সে যাক, একটু বসতে দে আগে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে।'

—'জায়গা কোথায়?'

—'একটু সরলেই হবে—' কোন রকমে জায়গা করে রেখা তার পাশে বসলো। রানীর ভূমিকাভিনয়ে ছিল ভারতী। তাই জমকালো হয়ে সাজতে হয়েছিলো। রানীর পরিধানযোগ্য অনেক ধড়া-চূড়া। কিন্তু একটি জিনিসও ভারকীর নিজের নয়, সব এই রেখার দেয়া। সে কোথায় পাবে? মেয়েরা তাকে একদিনের জন্যও একটা ভালো কাপড় পরতে দেখেনি। তারা জানে, এর মূলে কি!

ভারতী বললো, 'তোর জিনিসগুলো—'

রেখা আর বলতে দিলো না, তার মুখে হাত চেপে বাধা দিয়ে বললো, 'ওসব কে এখন শুনতে চাইছে? এক সময় দিলেই হবে।'

—'না দামী জিনিস তো।'

—'ইস, আমি পারিনে! এখানে কি এমন কেউ নেই যে আমাকে এই nonsense talk থেকে রেহাই দিতে পারে।' রেখা অভিনয়-ভঙ্গিতে বললো।'

ভারতী নীরবে হাসলো।

ভারতীকে জড়িয়ে রেখা বললো, 'তোর মতো রূপও যদি আমার থাকতো তবে দেখতিস্।'

কথাবার্তায় রেখার প্রকৃতিই ওই রকম, সব সময় কেবল সৌন্দর্যচর্চা। একটু পরে বললো, 'থিয়েটার কেমন হলো?'

—'দু'চার বছরেও এমন হয়নি।

খানিকটা পরে : 'অঞ্জন আসবে লিখেছে।'

ভারতী বললো, 'শুধু এই? আর কি লিখেছে বল?

—লিখেছে : পাইনের মর্মর ভুলতে পারো কি? আমাকে তো অনেকগুলো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, তাদের ভাষায় আমি এক অতি পরিচিত ভাষাই শুনতে পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩১৭ www.amarboi.com ~

আমার ভালো লাগে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তটিকে কি নামকরণ করবো বলো, যখন মনে হয়, যা অতীত তা তো আর আলোক নয়, শুধু অন্ধকার।

অন্যদিকে চেয়ে কতকটা স্বগতভাবে রেখা বললো, 'এমন সরল স্বভাব, এমন সুন্দর হাসি!'

ভারতী পরিহাসচ্ছলে বললো, 'কালো অঞ্জন মেখেছিস চোখে। কিন্তু আমার তো হিংসে হওয়ার কথা।'

—'তা হোক, তাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু আমার ভয়ানক খিদে পেয়েছে।'

রেখা আশ্চর্য হয়ে বললো, 'কে তুই খাসনি? চা?'

—'ওসব আমার ভালো লাগে না।'

—'তুই একটা অদ্ভুত প্রাণী। চল্, এলাদির কাছে গিয়ে বলি।'

ভারতী তার হাত ধরে বললো, 'দোহাই তোর, তুই এখান থেকে যাসনে। অত গোলমালে আমার মাথা ধরে গেছে। এখানে বেশ ভালো আছি, তুই বরং গল্প কর।'

ভারতী খানিক থেকে বললো, 'এলে কিন্তু আমায় দেখাবি।'

—'আচ্ছা।'

—'তখন আমার দুঃসময়। তুই তো আমাকে ভুলেই যাবি।'

—'তা তুই ভাবতে পারিস, তোর মত নেমকহারাম দুটি আছে!

ভারতী আশ্চর্য হয়ে বললো, 'কি দোষটা করেছি শুনি?'

—'দোষ? কতোদিন বললাম আমাদের বাসায় যেতে। বন্ধু বলে আমারই ঠেকা বেশী, না?

—না, কে বললে অমন কথা? কখনও নয়। ঠেকা আমারই বেশী। কিন্তু তোকে আমাদের বাসায় নিইনে কেন জানিস? সেখানে গেলে তুই শ্বাসরোধে যন্ত্রণায় মারা পড়বি।

রেখা গম্ভীর হলে বললে, 'তুই আমাকে ঠাট্টা করিস?'

—'মোটেই না। জ্বলন্ত সত্য কথা।'

রেখা গম্ভীর হয়ে রইলো।

ভারতী তার হাতটি বুকের কাছে টেনে বললো, 'কাল এক মজার ব্যাপার ঘটেছিলো। শেষরাতে হঠাৎ জেগে দেখি, ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছে। ঝর ঝর একটানা শব্দ। কী যে ভালো লাগলো বলতে পারি না!'

রেখা আর চুপ করে থাকতে পারলো না, তাড়াতাড়ি বললো,'একেবারে মিলে গেছে। আমিও জেগে উঠেছিলাম কিন্তু। তোরই মতো ভালো লেগেছিলো আর মনে হয়েছিলো, ভারতী এখন কি করছে কে জানে? এখন যদিও থাকতো পাশে, শেষ রাতটুকু অনেক কথা বলে কাটিয়ে দিতাম।'

ভারতী আশ্চর্য হলে বললো, 'আমার ভাবনাও ছিল ঠিক তাই। আশ্চর্য তো!'

রেখাদের বাসা আগে। তাই যাবার পথে নেমে পড়বার সময় তার টানাটানিতে ভারতী না গিয়ে থাকতে পারলো না। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রেখা বললো, 'এখন রাত আটটা বেজেছে, আরও দু'ঘণ্টা দেরী করে গেলে বাসায় কিছু মনে করবে না; ভাববে ইস্কুলের থিয়েটার শেষ হয়নি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩১৮www.amarboi.com ~

—'তারপর যাবার উপায়?'

—'গাড়ী। আমিও যাবো সঙ্গে।'

তার শোবার ঘরে বসিয়ে রেখে সে বললো, 'বোস একটু, আসি।'

একটু পড়ে রেখা তার মাকে সাথে করে ফিরে এলো। ভারতী উঠে দাঁড়ালো। মা বললেন, 'চলো মা, কিছু খাবে।

—'ওঃ এই ষড়যন্ত্র করেছে রেখা। আমি খাবো না।'

রেখার মা হেসে বললেন, 'তাহলে ভুগতে হবে কিন্তু আমাকেই। ও তো কিছুতেই খাবে না।' ভারতীকে খেতে হলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার দু'জনে এসে বসলো ঘরে।

—'একটা রাত থেকে যা ভারতী। বাসায় খবর পাঠিয়ে দি।'

—'না না, আমার কাজ আছে।'

—'ঘরে রেডিও আছে। শুনবি?'

ভারতী হেসে মাথা কাত করলো।

কিছুক্ষণ কেটে গেছে।

—'এক্কেবারে বাজে।' রেখা বললো, 'তার চেয়ে গল্প করা ভালো।'

ভারতীর কিন্তু বেশ ভালো লেগেছিলো, এক মনে শুনছিলো। কচিৎ শোনার দুর্বলতায় মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না।

রেখা বললো, 'খুব বেশী চালাক যারা, তাদের আমি দেখতে পারিনে। তারা মনে বাইরে এক নয়।'

—'মনে বাইরে কেউ এক নয়। সে যাক। তোর কথা শুনে যাদের তুই দেখতে পারিস, সে বিষয়ে একটু আন্দাজ করতে পারছি না বটে।'

রেখা হেসে বললো, 'সত্যি এমন মরল আমি আর কখনও দেখিনি।'

—'দু-একটা প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত শুনি আগে, তারপরে তো মতের মিল হবে।'

—'একদিন জুতো খুলে জলে পা ডুবিয়ে বসেছিলাম। ফিরে আসবার সময় অঞ্জন পরিষ্কার রুমাল বার করে আমার পা মুছিয়ে দিলো, তারপর জুতো পরলাম।'

—'আরে বাপরে, এ যে দেখছি—'

—'চেঁচিয়ে ওঠার কোনই কারণ নেই। তারপর যা আছে শোন। আবার এমনও হয়েছে তিন-চার দিন আমার সম্মুখ দিয়ে অঞ্জন ওর বুড়ো ঠাকুরদার সাথে চলে গেছে, আমাকে দেখেও দেখেনি!'

—'তোর তখন কি অবস্থা?'

—'কান্না পেয়েছে।' রেখা হেসে ফেললো।

কিছুক্ষণ পরে দশটা বাজলো।

ভারতী বললো, 'আমি যাই।'

—'এখনই?'

—'বলেছি না, দরকার আছে।'

তারপর নীচে নেমে গাড়ীতে গিয়ে উঠতে ভারতী বললো, 'সঙ্গে এসে আর কি করবি? অনর্থক তোকে কষ্ট দেয়া।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩১৭www.amarboi.com ~

পরের দিন স্কুলের সময় রাণীর উপযোগী যত কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ-অলঙ্কার রেখা দিয়েছিলো, সব নিয়ে এসেছে ভারতী। কাল যখন ওদের বাসায় গিয়েছিলো তখনই দেয় যেতো এবং একবার বলেছিলো কিন্তু রেখা মোটেই কান দেয়নি। ভারতী বললো, 'এই নাও বাপু।'

—'এত তাড়া কিসের?' রেখা যেন অবজ্ঞায় বান্ডিলটায় হাত দিলো।

এ দেখে ভারতী ধরে নিলো যে, অনেক আছে বলেই এ ধরনের ভাব-ভঙ্গ। সেখানে আর কেউ ছিল না।

—'গয়নাগুলো পরে ওদের তাক লাগিয়ে দেই কি বলিস?'

—'আচ্ছা। কিন্তু আমি যাই, এখনই আসবো আবার।'

ভারতী চলে গেল। রেখা বান্ডিলটা খুললো। কিন্তু কতক্ষণ পরে এসে যা দেখলো তাতে ভারতী রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। রেখা উদ্বিগ্ন হয়ে কি খুঁজছে।

—'কি হয়েছে?'

—'একটা হার পাচ্ছিনে।'

—'একটা ছাড়া আরও ছিল নাকি!'

রেখা আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ছিল নাকি মানে? আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

ভারতী শুষ্ক স্বরে বললো,'আমার মনে হচ্ছে—'

—'আরে, না না, আমি কি মিথ্যে বলছি তোর কাছে?'

ভারতী কি যে করবে ভেবে পেলো না, একটু দেখবার আশায় বাইরে গেল। একটু পরে কতকগুলো মেয়ে এসে জুটলো।

—'কি হয়েছে রে?'

রেখা সব বললো।

একটা মেয়ে মুচকি হেসে বললো, 'আমার ঠাকুরমা একটা কথা প্রায়ই বলেন, অভাবে স্বভাব নষ্ট। যদিও সকলের বেলায় তা নয়।'

রেখা বললো, 'অন্য কিছু হলে আমার আফসোস হতো না, কিন্তু জিনিসটা বিলেতের গোল্ড স্মিথ কোম্পানীর, দাদা এনেছিলেন। তাই দুঃখ হয়। কি যে করি এখন।

—'কি আর করবে? আরও ভাব করো গো।'

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকতে ভারতী কিছুটা শুনে ভয়ে আর বিস্ময়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। এমন যে হবে সেটা কখনও ভাবতে পারিনি। তবু সে অনেকগুলো কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে গিয়ে বললো,

—'বাসায় একবার খুঁজে দেখিস না ভাই—'

—'এতো ভুলো মন নয় আমার। আর এই প্রমীলাও তো দেখেছে। অন্য জিনিস হলে আমি কিছু বলতাম না, কিন্তু এ যে—আর এতই যদি টাকার দরকার ছিল, আমি কি চাইলে দিতে পারতাম না?'

ভারতী একবার প্রতিবাদ করতে চাইলো কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

পরের দিন এর চেয়েও বেশী আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো।

রেখা এসে হাত ধরে বললো, 'তোরই কথা সত্যি হলো, বাসায় সেটা পেয়েছি। কিন্তু তোকে অনেক কষ্ট দেয়া হলো, আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও!www.amarboi.com ~

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার মতো যেন ভারতী অনুভব করলো। মুখে বললো, 'ব্যাপারটা খুব হাস্যকর বোধ হচ্ছে।'

—'হ্যাঁ, তুই আমাকে মাপ কর ভাই!'

—'ক্ষমা কাকে বলে তা আমাদের মতো লোকের জানবার কথা নয়, তার অর্থও ভালো ক'রে বুঝিনে, আরও অনেক জিনিস না বোঝার মতো!'

রেখা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

ভারতী বললো, 'কিন্তু এটা একাধিকবার প্রমাণিক হলো যে, বড়লোক এবং গরিবে এমনি খুব দরকার বোধে গম্ভীর আবহাওয়ার মধ্যে কথাবার্তা হয়তো চলতে পারে কিন্তু ভাব যাকে বলে, মানসিক ঘনিষ্ঠতা যার নাম, তা কখনও হতে পারে না।'

—'কেন?'

—'কেন তার অনেক কারণ। প্রধান কারণ হলো, এক পক্ষ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে একজন সম্রাটের চেয়েও বেশী সচেতন।'

—'কথাটা হয়তো সত্যি নয়।'

—'তুমি কিছুমাত্র দ্বিধা না করে আমাকে সকলের কাছে চোর বলে চালিয়ে দিলে কি মনে করে?'

—'ভুল হয়েছিলো বলেই তো!'

—'এ একটা হাস্যকর কথা, ধনীদের সস্তা অজুহাত।'

www.amarboi.com ~

সত্যবতীর বিদায়

শীতের এক কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরবেলায় অত্যন্ত ময়লা কাপড় দিয়ে বাঁধা একটা পুঁটুলি হাতে করে এক বৃদ্ধা, রাজকুমার রায়ের প্রকাণ্ড ফটকওয়ালা বাড়ীর ভিতরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রথামে ঢুকতে একটু দ্বিধা করেছিলো, কারণ এ-বাড়ীতে সে এই প্রথম পদার্পণ করছে, কিন্তু মুহূর্ত পরেই সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে এক নিঃসংকোচ কলেজ-বালিকার মতই চাকর-বাকরের ছুটোছুটি আর কোলাহল-কাতর উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। বৃদ্ধার চেহারা এমন কদাকার যে হঠাৎ দেখলে ভয় হয়। উঁচু কপাল, তুবড়ানো নাক, মাংসল মুখ অথচ চোখ দুটি অত্যন্ত ছোট এবং গর্তে বসানো। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, বয়স পঞ্চাশের বেশী হলেও গায়ের চামড়া এখনো যথেষ্ট ঢিলে হয়ে আসেনি।

বৃদ্ধা কারুর আশায় এদিক-ওদিক চেয়ে শেষে একটা চাকরকে ডেকে বললো, 'আচ্ছা, এটা আমাদের রাজুর বাড়ী না?'

'রাজু! রাজু কে!' এই বলে চাকরটা আবার নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

রাজু কে। তবে কি এটা রাজুর বাড়ী নয়? বৃদ্ধা মনে মনে খানিকটা অসহায় বোধ করলো। কিন্তু বাইরে সে-ভাব সম্পূর্ণ ঢেকে রেখে আর একজনকে ডেকে বললো, 'আচ্ছা, এটা আমাদের রাজুর বাড়ী নয়?'

ঝি মতির মা খন্ খন্ করে বললো, 'রাজু-টাজু কেউ এখানে নেই গো।'

কিন্তু এমন সময় ভেতর থেকে মনোরমা বললো, 'কে রে মতির মা?' এই বলে আর মতির মা'র উত্তরের অপেক্ষা না করে ধীরে ধীরে ভারী শরীরখানা নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। তার চোখে চশমা, হাতে অনেকগুলি চুড়ি, গায়ে আঁটো-সাঁটো সেমিজ, চওড়া নক্সি-পেড়ে শাড়ী। বুড়ীকে দেখে মনোরমা আশ্চর্য হলো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই বিস্ময়ের ভাব দমন ক'রে ফেললো, বরং চোখের ওপরে ভ্রূ কুঁচকে এসেছে।

একগাল হেসে সত্যবতী বললো, 'বৌ, কেমন আছো?' আচ্ছা, তোমাদের কতকাল দেখিনে, তোমাদের কথা ভেবে-ভেবে হয়রান হয়ে গেলুম, ঈশ্বরকে কতো বলি, ঠাকুর, আমার এমন ছেলে, ছেলের বৌ, সব থাকতে আমি ষাটের বুড়ী, কেন এত কষ্ট করে মরি? ছেলে তো আমার এমন নয় যে কক্‌খনো ডাক-খোঁজ করে না। আমার রাজুর মতো ছেলে কারুর হয়? কক্‌খনো হয় না, এই আমি বলে দিচ্ছি। এই তো সেবার'—এক দুই তিন চার ... সত্যবাদী হাতের কর গুনে বললো, 'পাঁচটা টাকার জন্যে দু-অক্ষর লিখে পাঠিয়ে দিলুম, আর অমনি তোমায় কি বলবো বৌ, আর অমনি যেন হাওয়ার গাড়ীতে চড়ে টাকা এসে হাজির!' বলতে বলতে সত্যবতীর দম বন্ধ হয়ে এলো।

ইতিমধ্যেই প্রায় সারা বাড়ীতে সাড়া পড়ে গিয়েছে। বাড়ীর সমস্ত ছেলেমেয়েরা—মন্টু-ঘেন্টু-জিতু-হেরা-হেলা ইত্যাদি সবাই এসে বুড়ীকে ঘিরে দাঁড়ালো। সকলের ছোট জিতু এই কুৎসিত বুড়ীকে আর কখনো দেখিনি, সে মনোরমার আঁচল ধরে নাকি সুরে বললো, 'কে ঠাকুরমা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩২২www.amarboi.com ~

সত্যবতী হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে বললো, 'আয় ভাই আয়, তোদের নাম কি রে ভাই? আরে আয় না? না এই রাজকন্যের মতো সুন্দরী বৌকে দেখে পছন্দ হচ্ছে না? সত্যবতী একটু পরিহাস করলো। ওদিকে মনোরমার শীতলতাও তার দৃষ্টি এড়ায়নি। সে তাকে খুশি করবার জন্যে বললো, 'তোমাকে ভারি শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে বৌ। কোন অসুখ করেছে বুঝি?'

মনোরমা সংক্ষেপে গম্ভীর স্বরে বললো, 'না, কোন অসুখ করেনি।'

উপরের পড়ার ঘরে বসে ইন্দু প্রাণপণে কলেজের পড়া মুখস্থ করছিলো। নতুন মানুষের সাড়া পেয়ে বারান্দার ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'মা, কে এসেছে?'

মা একবার ওপর দিকে চাইলে মাত্র, কিছু বললো না।

সত্যবতী চোখ বড়ো করে বললো, 'বৌ, আমি বলে দিচ্ছি, তোমার কোন অসুখ করেছে, তুমি না বললে আমি শুনবো কেন? দাঁড়াও, আমি ওষুধ দিয়ে দেবো।' সত্যবতী বছর দুই আগে নাকি কালী পেয়েছিলো, তাঁর আশীর্বাদে একটা মূল্যবান ওষুধও পেয়েছিলো, তাই সত্যবতী মনোরমাকে অভয় দিলো।

মন্টুরা একেবারে হাঁ করে তার দিকে চেয়ে ছিল, এমন কদাকার চেহারা তারা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেনি। ছবিতেও এ রকম চেহারা খুব কম দেখা যায়। দাঁত যা-ও আছে তা-ও এমন কালো যে দেখলে ঘেন্না করে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে কী যেন পড়ছে।

—'কিন্তু ছাই পোড়াকপাল আমার',—সত্যবতী বলা-কৈ কওয়া-নেই হঠাৎ কপালে করাঘাত করে বললো, 'হা ঈশ্বর! যার জন্য এতদূর এলাম তাকেই ভুলে গিয়েছি। রাজু কোথায় বৌ, আমার রাজু?'

মনোরমা বসবার ঘর দেখিয়ে দিলো।

সত্যবতী তর্ তর্ করে অমনি সেই ঘরের দিকে ছুটলো, পুঁটুলিটা কোথাও রাখবার জায়গা এখনো হয়নি, আর রাখবেই বা কোথায়? কোথাও এতটুকু পরিষ্কার জায়গা আছে কি? সেটা কাঁখে করেই সত্যবতী বসবার ঘরে ঢুকলো, কিন্তু ছেলের চেহারা দেখে তার দুই চক্ষু স্থির, আহা, কী চেহারা হয়েছে গো! ননীর শরীর যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেই তকতকে সোনার বরণ রংই বা কোথায়, মাথায় সেই গভীর কালো চুলই বা কোথায়? রাজকুমার চেয়ারে বসে অনেক খাতাপত্র দেখছেন, সামনেই দুটি চেয়ারে বসে আরও দুটি লোক। সেই লোকগুলির সামনেই সত্যবতী হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বললো, 'রাজু, তোর এই কী চেহারা হয়েছে বাবা? তোর এমন অসুখ, আমায় আগে জানাসনি কেন? কেন জানাসনি বল? আমি কি তোর কেউ নই? ঈশ্বরকে কত বলি, হে ঠাকুর, সবই তো দিয়েছো, তবে আর একটি মনোবাঞ্ছা যদি পূর্ণ করতে! আজ উনি বেঁচে থাকলে!'

ব্যাপারটা প্রথমে রাজকুমার ভালো করে বুঝতেই পারেনি, হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিলো। একটু পরে লজ্জায় আর রাগে মাটির সঙ্গে মিশে গেলো। সত্যবতীকে দুই হাত দিয়ে ধরে সে বললো, 'আহা, এখানে কেন মা? এখানে কেন মা? এখান থেকে যাও, অন্য সময় হবে।' সে সত্যবতীকে ঘরের বার করে দিলো। সত্যবতী তখনো শিশুর মত ফুঁপিয়ে

www.amarboi.com ~

ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো, একহাতে পুঁটুলিটা ধরে আর এক হাতে কাপড়ের আঁচল দিয়ে নাক-চোখ মুছতে লাগলো।

দুর্ধর্ষ শক্তিমান কোন লোককে কাঁদতে দেখলে যেমন হাসি পায়, এই কুৎসিত বুড়ীকেও শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে মন্টুদের হাসি পেলো, তারা খিল্-খিল্ করে হাসতে লাগলো।.

এই দেখে সত্যবতীর রাগের আর সীমা নেই!

—'আহা, হাসছিস কেন? আমরা গরীব বলে মানুষ নই বুঝি?'

মনোরমা আর সহ্য করতে পারলো না। বললো, 'দেখতেই তো পাচ্ছেন, কয়েকজন ভদ্রলোক বসে আছেন ওঘরে, তবু ওখানে গিয়ে ওদের সামনে ওরকম করছেন কেন?" মনোরমার রাগ হলো, সারা জীবনে যিনি একটি দিনের জন্যও খোঁজ করেন না, তাঁর হঠাৎ এমন উৎসাহ দেখলে সত্যি হাসি পায়।

সত্যবতী রাজকুমারের পিতা নবকুমারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তার বিবাহের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। রাজকুমারের মা মারা যাওয়ার বছর পাঁচেক পরে হঠাৎ ভয়ানক বাবু সেজে নবকুমার কোথায় উধাও হয়ে গেল, সাত-আটদিন পরে সঙ্গে করে নিয়ে এলো এই দুর্ধর্ষ সত্যবতীকে। সত্যবতী তখনো এমনি কালো বটে, কিন্তু কিছুটা মার্জিত, চকচকে, হঠাৎ দেখলে চোখ ঝলসে যায়। তার প্রশস্ত শরীর তখন দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, ধু-ধু করে। নবকুমার তখন সেই রসসিক্ত শরীরটাকে পেয়ে চুলে প্রচুর কলপ মেখে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলো।

কিছুকাল পরে আবিষ্কার করা গেল, সত্যবতী কেবল সত্যবাদীই নয়, কিঞ্চিৎ মুখরাও বটে। গ্রামের ভিতর তার শত্রুসংখ্যা হু হু করে বেড়ে যেতে লাগলো। সত্যবতী নিঃসংশয়ে এটা সিদ্ধান্ত করলো যে, সমস্ত পৃথিবী তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে এবং সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে একলা সংগ্রাম করে এতকাল বেঁচে থাকা যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় বটে। নবকুমার এই স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করবার পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একদিন ভুলেও ছেলের খোঁজ করেনি—লোকে শুনে অবাক হয়ে যায়, বাস্তবিক, মানুষ এমন পাগল হয় কী করে? শত হলেও নিজের ছেলে তো? মনোরমার অভিযোগ এইখানেই, তার ভ্রূ কুঁচকে এসেছে এই কারণেই। সে তার বড় মেয়ে জয়ন্তী এবং পুত্রবধূ সুনন্দার কাছেই প্রথম ব্যাপারখানা সবিস্তারে খুলে বললো। শেষে এই বলে উপসংহার করলো যে, এমন দরদ দেখলে হাসির বদলে কান্নাই পায়!

কিছুক্ষণ পরে ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে এক নূতন বিভ্রাট এসে হাজির। কেমন একটা পচা গন্ধ পেয়ে সত্যবতী নাকে কাপড় দিলো, দূর থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখলো, ঘরের অন্ধকার কোণের দিকটিতে একটা চড়াই মরে পড়ে রয়েছে। 'আ রামো! এমন কাণ্ড তো জীবনেও দেখিনি।'—সত্যবতী অমনি দৌড়ে মনোরমার কাছে গেলো, গিয়েই একদমে বললো, 'বৌ, তুমি জেনে-শুনে যে এমন একটা কাণ্ড করবে তা আগে জানিনি।'

মনোরমা সেদিনের বাজারের হিসাব লিখছিলো, চাকর সামনে দাঁড়িয়ে, চশমা-শুদ্ধ ভারী মুখখানা তুলে চোখ দুটি বরাবর সত্যবতীর চোখের ওপর স্থাপন করে সে বললো, 'কি হয়েছে?'

www.amarboi.com ~

সত্যবতী হাত-পা চোখ-মুখ সব একসঙ্গে নেড়ে হতাশার সুরে বললো, 'হবে আর কি! যা হবার তাই হয়েছে। একটা চড়াই মরে পড়ে রয়েছে ঘরে। বৌ, তুমি বেছে-বেছে এমন একটা ঘর কেন আমায় দিলে বলো তো? আমার রাজুর তো ঈশ্বরের ইচ্ছেয় আর ঘরের অভাব নেই।'

মনোরমা বিরক্ত হয়ে বললো, 'কে বললে আমি আপনাকে ওরকম একটা ঘরে ইচ্ছে করে থাকতে দিয়েছি!' এই বলে একজন চাকরকে ডেকে চড়াইটা বাইরে ফেলে দিতে নির্দেশ দিলো।

২

তখনো ভালো করে সন্ধ্যা হয় নি। এই সময়ে সমস্ত বাড়ীটা ভোরবেলার মতো গোলমালে ভরে যায়। ঝি উনান ধরাতে যায়, ঠাকুর মনোরমার কাছে এ বেলা কী-কী রাঁধবে সে বিষয়ে পরামর্শ করতে আসে, আর বৈকালিক চা-পান এখনো যাদের হয়নি তাদের শিশুসুলভ চিৎকারে বাড়ির এদিক-ওদিক ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

এমন সময় বারান্দার আবছা অন্ধকারে কয়েকটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সত্যবতী উৎসাহিত হয়ে ডাকলো, 'কে রে! বেলা? শোন?'

বেলার দল খিল্-খিল্ করে হেসে উঠলো, একটা দৌড় দিয়ে খানিকটা পালাবার চেষ্টা করে আবার যথাস্থানে ফিরে এলো, বুড়ীর দিকে পিট্-পিট্ করে তাকাতে লাগলো।

—'শুনে যা বলছি? আহা, ছেলে-বুড়ো সবাই এক রকম! শুনে যা? ছোট ছেলেমেয়েদের দল এবার সাহস করে সত্যবতীর ঘরের ভিতর ঢুকলো, দম বন্ধ করে বললো, 'কেন ডাকছ, বুড়ী?'

বুড়ী! সত্যবতী এক মুহূর্তে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো, তাদের তেড়ে বললো, 'আমি বুড়ী নাকি? বজ্জাত ছেলে, ধরে ধরে কান মলে দেবো? যার তার সঙ্গে ইয়ার্কি, না?'

বেলারা আবার দমে গেল, এখন কী করবে ভেবে না পেয়ে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে অন্ধকারে ঘুর ঘুর করতে লাগলো। এ দেখে সত্যবতীর মায়া হলো। তাদের ডেকে বললো, 'ফের ওরকম করিসনে বুঝলি? বুঝলি তো? হ্যাঁ, তোর নাম কী রে? কী বললি? হেলা?' সত্যবতী হেলা নামের ছোট মেয়েটিকে কোলের কাছে টেনে বললো, 'আচ্ছা হেলা, তোরা কখনো ভুত দেখেছিস?'

—'ভূত? না।'

—'আমি দেখেছি।' সত্যবতী এমনভাবে হাসলো যেন কোন ভূতের মতোই দেখায়; বললো—'শোন্, তাহলে বলি। সেদিন শনিবার, পশ্চিম পাড়ার ঘোষ বাড়ীতে শনি পূজার নেমন্তন্ন ছিল, তাই সকাল-সকাল যাচ্ছিলুম। মাত্র সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, কিন্তু এরই মধ্যে পথে লোকজন নেই। গাঁ-দেশের পথ-ঘাটের কথা তো জানিস্, কটা লোকই বা হাঁটে। সেই রাস্তা দিয়ে যেতে একটা জায়গা ছিল যেখানে গাছপালা ঝোপ-জঙ্গল এত বেশী যে দিনের বেলাতেই অন্ধকার হয়ে আসে। বাঁ দিকে একটা তেঁতুল গাছ আছে, কবে কোন ঝড়ে উপড়ে পড়ে রয়েছে, তবু আজও মরেনি, বছর বছর দিব্যি পাতা গজায়, হাঁটতে

www.amarboi.com ~

লাগলুম, কিন্তু ভাই, পথ আর ফুরোয় না, হাঁটছি-হাঁটছি-হাঁটছি, পথ আর ফুরোয় না, যতোই হাঁটি না কেন পেছন দিকে চেয়ে দেখি সেই তেঁতুল গাছ। ভাবতে লাগলুম, এবার কী করা যায়? ঠিক এখুনি তো মন্তরটা আওড়ানো আর ঠিক হবে না, একবার হারালে ও-মন্তর আর ফিরে পাওয়া যায় না। এমন সময় দেখি, আমার পথ আগলে সেই...!' সত্যবতী মুখে উচ্চারণ না করে আকারে-ইঙ্গিতে বললো, বুকের ওপর থু থু ফেললো— 'এই প্রকাণ্ড...তালগাছের মতো তার দুটি ঠ্যাং, মিশমিশে কালো শরীর। উপরের দিকে ভয়ে ভয়ে দেখলুম, তার গায়ে নেই আমাদের মতো কোন মাথা, নেই গলা, কেবল বুকের ওপর বড় বড় দুটি চোখ, আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে! আমি তো হিম্‌সিম্ খেয়ে গেলুম, শরীরের ভিতর ঘাম দিয়ে জ্বর এলো, হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো...' সত্যবতীর ছাইরঙা দুটি চোখ বড়ো হয়ে এলো, সে সকলের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন সেদিনের ভয়ের ছায়াগুলি আজো তার চোখের সম্মুখে ভূতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মন্টুরা? তাদের চোখও বিস্ফারিত, তারা ভয়ে এদিক-ওদিকে চেয়ে সত্যবতীর হাঁটুর ওপর হাত রেখে বসে রইলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩২৬ www.amarboi.com ~

এত বড় বটগাছ সচরাচর দেখা যায় না। পীরপুরের হাটকে যদি চিনিতে হয়, তবে যে-কোন অশীতিপর ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেও ইহার উত্তর মিলিবে—দূরে, সে যত দূরেই হোক না কেন, যেন আকাশেরও প্রায় অর্ধেক ছাইয়া আছে, এমন একটা দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড গোলাকার গাছের দিকে দারুণ তৎপরতায় শীর্ণ হাতটি উঠাইয়া সে বলিবে, 'আরে, তুমি কি কানা? ওই দৈত্যিটার বরাবর চলে যেতে পারো না?' যাহাকে বলা হইবে, সে যেন কোন ব্যবসায়ী, ওই হাটের দিকেই যাইতেছে, আর কোন উদ্দেশ্য তাহার নাই। পীরপুর গ্রামটি অন্যান্য গ্রামের মতো নয়, সেখানে কেউ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে পা..., একথা কেউ ভুলেও কল্পনা করিতে পারে না। কেবল একটি হাট লইয়াই যেন সারাটি গ্রাম। কেবল সারি-সারি টিনে-ছাওয়া ছোট ছোট ঘর, মাঝখানে সরু ক্ষত-বিক্ষত পথ, বটগাছের আশ্রয়ে চারিদিক চমৎকার ছায়াচ্ছন্ন, হাটবার আসিলে রাত থাকিতেই নৌকার পর নৌকার ভিড়, তারপর সারাদিন আর সারারাত কেবল জনসমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস। সেই কলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয় যাহাদের নাই, অথবা যে-কোন উপায়ে হোক সেই জনসমুদ্রের কিছুমাত্র আভাস যাহারা পায় নাই, তাহাদের পক্ষে তেমন দৃশ্যের কল্পনা করা সুকঠিন।

আশেপাশে দশ-বারোটা গ্রাম হইতে পীরপুরের এই হাট চোখে পড়ে। সেই গ্রামগুলি আর এই হাটের মাঝখানে প্রায় দুই মাইল ব্যাপী একখানা নদী আর সারি সারি অনেকগুলি বিল। বর্ষাকালে এই বিলগুলি আর নদীতে মিলিয়া যে অবস্থা হয়, সেকথা মনে করিতে হইলে, কেবল কোন সমুদ্রের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। ওপারকে মনে হয় কোন রহস্যময়, কুয়াশাচ্ছন্ন পৃথিবী, বিপুল রহস্যের ফেনা সারা গায়ে মাখিয়া এপারের পৃথিবীর সন্তানদের চোখে ধাঁধা লাগাইতেছে। ইহাও মনে হয়, আকাশের সীমারেখায় তাহা কোন ধূসর বর্ণের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের রাশি—অন্যান্য মেঘের মতো যাযাবর নয়। সেই দুই পারের মাঝখানে বিস্তীর্ণ জলরাশি আরও দুর্বোধ্য। সারাক্ষণ কেবল দুই পারের মানুষকে ভীষণ শাসাইতেছে। তারপর বাতাস বহিতে থাকে, বিশাল জলরাশিতে এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত নৌকাগুলি শাদা এবং আরও নানারকমের রঙিন পাল মেলিয়া যেন পাখায় ভর দিয়া উড়িয়া আসিতে থাকে, বটগাছের শত শত ডালের ভিতর রক্তের জোয়ার আসে, কোটি কোটি পাতা মৃদু কাঁপিতে থাকে। তারপর কোন এক সময় হয়তো শীতের আবির্ভাব, মাথার উপরে কাঠফাটা রৌদ্র, সমুদ্রের বুক দেখা যায় কঠিন, ক্ষত-বিক্ষত, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, সেখানে আগুন জ্বলিতে থাকে, বাতাস ক্ষেপিয়া যায়, আর বটগাছের নীচে অজস্র শুকনো পাতার রাশি। একটা মুসলমান বুড়ী মাঝে মাঝে সেই পাতাগুলি ঝাঁট দিয়া নেয়।

প্রায় দুই-শ' বছর আগে চলিয়া যাইতে হয়। তখন ১৭৫০ সাল। তখনো সমগ্র ভারতবর্ষের কেন, কেবলমাত্র বাংলাদেশের শাসনভারও জনকতক হিন্দু শ্রেষ্ঠীর চেষ্টায় ইংরেজ বণিকের হাতে চলিয়া আসে নাই, তাহাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তখনো প্রকৃত শাসন প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতে পারে নাই। এমন দিনে এক রাত্রে

www.amarboi.com ~

পীরপুরের বৃদ্ধ জমিদার নবকিশোর চৌধুরী তাঁহার শয্যা-সঙ্গিনী তৃতীয়-পক্ষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে লইয়া বড় বিব্রত বোধ করিলেন। একটা ভয়ানক উত্তাপে এক মুহূর্তে কী জানি কেন সমস্ত শরীরটা তাঁহার দারুণ অবশ হইয়া আসিল, কেমন একটা অবসাদে ভরিয়া গেল, তিনি অসহায় বোধ করিলেন, ইচ্ছা হইল দুই হাত দিয়া নিজের চুল ছিঁড়িতে থাকেন, অবশেষে গুটিশুটি মারিয়া তিনি পড়িয়া রহিলেন।

রাত তখন দুইটা। চারিদিক গভীর নিস্তব্ধ, কোথাও টুঁ শব্দটি শোনা যায় না। সামনের জানালা দিয়া বাগান হইতে তীব্র ফুলের গন্ধ আসিতেছে। বিছানায় বালিশের পাশেও নানারকম ফুল, কিন্তু নবকিশোরের কাছে তাহা এখন বিষের মতো মনে হইল, তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো, অথবা সুচের মতো তাঁহাকে বিঁধিতেছে। পাশেই অরুন্ধতী তাহার প্রখর যৌবন আর চেহারার দীপ্তি লইয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া আছে। নবকিশোরের ইচ্ছা হইল ডাক ছাড়িয়া কাঁদেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি ঘামিতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে তিনটা বাজিয়া গেল, হয়তো রাতকে দিন ভাবিয়া কয়েকটা কাক বাহিরে কা-কা করিতেছে, কাঁটার বিছানায় শুইয়াও নবকিশোর এক সময় ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার আশেপাশে একদল নগ্ন নর-নারী, চমৎকার তাহাদের চেহারা, যেন শ্বেত পাথরে খোদা মূর্তি, চমৎকার চোখ-মুখের ভঙ্গি, যেন অজস্র মানিক ঝরিতেছে, নবকিশোর দেখিলেন, খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া তাহারা একজন আর একজনের সঙ্গে বলিতেছে, অজস্র চুমা খাইতেছে, কেহ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কোন মেয়ের হাঁটুতে মুখ রাখিয়া কী সব বলিতেছে, কেউ বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—আর সেই একদল হাস্যমুখর, সৌন্দর্যদীপ্ত মানুষের মধ্যে তিনি যেন একটি ভেড়া। এমন সময় নবকিশোর হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন, অসহায়তার তুলনা তো নাই, শরীরটাকে আরও অবসাদগ্রস্ত বোধ করিলেন। ঘরের এক কোণে বাতি জ্বলিতেছে, মিটমিট করিয়া চাহিয়া তিনি দেখিলেন, আশ্চর্য, বিছানা খালি, পাশে তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী অরুন্ধতী নাই, ঘরের দরজা শা-শা খোলা, হু হু করিয়া শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার চোখের পাতা আর ভ্রূ কুঁচকাইয়া আসিল, তিনি খাট হইতে নামিয়া দরজার কাছে আসিলেন, আস্তে ডাকিলেন—'বৌ?

কিন্তু কোন উত্তর নাই। শুধু তাঁহার গলাটাকেই এই নিস্তব্ধতায় ভীষণ বিকৃত শুনাইল। আবার আরও জোরে ডাকিলেন, 'বৌ? বৌ?'

তবু কোন উত্তর নাই। নবকিশোরের প্রশস্ত কপাল আরও কুঁচকাইয়া আসিল, ঘর হইতে বার হইয়া তিনি এখানে-সেখানে অরুন্ধতীকে খুঁজিতে লাগিলেন, বাগানেও অনেক খুঁজিলেন, পুকুরের ঘাটের কাছে গিয়া ডাকিলেন, বৌ? ও বৌ—কিন্তু অন্ধকারে কেবলই প্রতিধ্বনিই ফিরিয়া আসিল। নবকিশোর ভাবনায় পড়িলেন। হঠাৎ চোখে পড়িল, ছেলে সুরেন্দ্রকিশোরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, আর সেখানে কোন মেয়েলী-স্বরে কথাবার্তার আওয়াজও শোনা যায়। ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হইলেন, বুক তাঁহার দুরুদুরু কাঁপিতেছে। ঘরের ভিতর কথাবার্তার শব্দ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল, আর কোন সন্দেহ রহিল না, তবু একবার উঁকি মারিয়া যা দেখিলেন, তাতে রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, হাত-পা কাঁপিতে লাগিল,—পীরপুরের চৌধুরী পরিবারের ভাগ্যে আজ এ কী

 www.amarboi.com ~

অভিশাপ, হায়, আজ এ কী দুরপনেয় কলঙ্কের ইতিহাস তাহাকেই বিশেষ করিয়া দেখিতে হইল। তাহার তৃতীয়-পক্ষের স্ত্রী সুন্দরী অরুন্ধতীর সঙ্গে এক বিছানায় শুইয়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া প্রেমালাপ করিতেছে তাঁহারই একমাত্র ছেলে সুরেন্দ্রকিশোর!

পরদিন অরুন্ধতী বা সুরেন্দ্র আর কাহাকেও বাড়ীর ত্রিসীমানায় দেখা গেল না এবং পরেও আর কোনদিন দেখা যায় নাই। কেন এমন হইল, কিছুটা অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ জানা যায় না। তবে জনশ্রুতি এই যে, নবকিশোর নাকি অরুন্ধতীকে রূপকথার রাজাদের মতো একেবারে মাটি চাপা না দিলেও এমন কিছু একটা করিয়াছেন যাতে সেই দুর্ভাগা মেয়ের মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুটা কল্পনা করিতে পারি এইরূপ : মস্তবড় দালানের যেদিকটা বেশ একটু নির্জন, আর গাছপালার ছায়ায় বেশ গম্ভীর, সেখানে একটা সুন্দর ঘর আছে। ঘরটি চমৎকার সাজানো। মেঝেতে দামী ফরাস আর বালিশের ছড়াছড়ি, বাতাসে সুগন্ধ। চারিদিকে কেমন একটা নির্জন ভয়াবহতা, মাটিতে সুচটি পড়িলে শোনা যায়। এই ঘরের এক বিপুল ইতিহাস আছে। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে হইতে সেই ইতিহাসের শুরু। নবকিশোর তাঁহার সারা রাজ্য জুড়িয়া একটি জাল তৈরী করিয়াছিলেন, সেই জালে যে মেয়েগুলি ধরা পড়িত, তাহাদের ধরিয়া আনা হইত এই ঘরে—সকলের চোখেই পাগলের মতো দৃষ্টি, নয় তো নিতান্ত ছেলেমানুষ হইলে সারামুখ চোখের জলে ভেজা, মাথার চুল আর পরনের কাপড় এলোমেলো, আত্মসমর্পণের ইচ্ছা মোটেই না থাকিলেও আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট। নবকিশোর তাহাদের কোন কুলই রক্ষা করিতেন না, কেবল পথে বসাইয়া দিতেন। সেই মেয়েগুলি তখন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত, না হয় গ্রামের হাটে-হাটে কোন বিশেষ পল্লীতে আশ্রয় লইয়া বাঁচিত। এভাবে অনেক মেয়ের কুমারী অথবা বধূ-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মৃত্যু দেখিয়া নবকিশোর বিন্দুমাত্র বিব্রত হন নাই, তাহাদের অভিশাপ আর বেদনার রক্ত গায়ে মাখিয়া তিনি এতটুকু বিচলিত হন নাই, বরং তাহাদের দেহ লইয়া আর একবার ছিনিমিনি খেলিয়াছেন, একদিকে সর্বনাশ করিয়া অন্যদিকে লাথি মারিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। নবকিশোরের সুদীর্ঘ জীবন, আর সেই জীবনের সঙ্গে জড়িত এই ঘরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই। এখন সেই ঘর তত ব্যবহৃত হয় না, মেঝেতে ধূলি পড়ে। তার মূলে একমাত্র কারণ হয়তো বার্ধক্যের অক্ষমতা এবং সেই কারণে আগের মতো প্রচুর উৎসাহের অভাব। কিন্তু সেদিন যে কাণ্ড ঘটিল তাকে সত্যই অদ্ভুত বলা চলে। ঘটনাটি গতানুগতিক পথ ধরিয়া ঘটে নাই। নবকিশোর সেই ঘরের কথা মনে করিয়াই স্ত্রীর জন্য উপযুক্ত শাস্তি খুঁজিয়া পাইলেন। অরুন্ধতী পরম গাম্ভীর্যে ঘরে ঢুকিল, নবকিশোর বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত আর খুলিলেন না। অরুন্ধতী প্রথমে অনেক ধাক্কা দিয়াছিল, তারপর কাঁদিয়াছিল। বাগানের সেই নির্জন অংশ তাহার উচ্ছ্বসিত কান্নায় থমথম করিতে লাগিল। কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতেও ক্লান্তি আসে, তাহার গলার স্বর একদিন আর শোনা গেল না।

এবং ইহার কয়েকদিন পরেই দেখা গেল নদীর পারে একটা চমৎকার খোলা জায়গা বাছিয়া সেখানে নবকিশোর দুটি বট-অশ্বত্থের চারা একসঙ্গে পুঁতিয়া দিলেন, তারপর সেই গাছে অনেক সিঁদুর মাখাইয়া নূতন কাপড় পরাইয়া বিরাট সমারোহে পূজা করিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আশেপাশের বিভিন্ন গাঁ হইতে হাজার হাজার ধূপের ধোঁয়ায় আর মানুষের কোলাহলে কত ছাগশিশুর চিৎকার আর কান্না শুনিয়াও শোনা গেল না, ধূসর মাটি রক্তে ভাসিয়া গেল, নবকিশোর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া 'মা' 'মা' করিয়া অনেক ডাকিলেন।

বটগাছের জন্মের ইতিবৃত্ত মোটামুটিভাবে এই। কিন্তু এটুকু জানিবার চেষ্টাও জনসাধারণের নাই, গাছের মধ্যে দেবতার অংশ আছে, ইহা জানিতে পারিয়াই তাহারা খালাস।

তারপর বিখ্যাত ১৭৫৭ সাল। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলা অথবা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ-ভাগ্য নিরূপিত হইয়া গেল। বাংলার ধনীরা ইংরেজদের জয়লাভের আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। অথচ পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র কতো নিরীহ দরিদ্রের রক্তে ভাসিয়া গেল। পীরপুরের একটি ছেলেও যে হতভাগ্য সিরাজের পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, অশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিল, ইহা ইতিহাসের পাতায় লেখা না থাকিলেও পীরপুরের ছেলে-বুড়ো কে না জানে?

তাহার নাম অর্জুন।

সেবার কোথা হইতে এক বাঘ আসিয়া সারাটা গ্রামে ভয়ানক উৎপাত সুরু করিয়া দিল, আজ এ-বাড়ীর ছাগলটা, কাল ও-বাড়ীর বাছুরটা প্রায়ই পাওয়া যাইতে লাগিল না। বৃদ্ধ এবং শিশুরা ভয়ে ভয়ে আর সন্ধ্যার পর বাহির হইত না। গভীর রাত্রে কোন গভীর সমস্যায় পড়িলেও কেহ ভুলেও দরজাটা একটু ফাঁক করিত না। হয়তো কখনো একটা বাছুর ভীষণ আর্তনাদ করিয়া উঠিত। গরুগুলি প্রত্যুত্তরে 'মা' 'মা' করিয়া চিৎকার করিতে থাকিত, তারপরেই সব শেষ—এমন দৃশ্যের অভাব রহিল না। গ্রামের ভিতর একটা আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিল। যে পথে বাঘের পায়ের ছাপের মতো কিছু চোখ পড়িত, সে পথ আর কেউ মাড়াইত না। কিন্তু এই দুঃসময়েও অর্জুনের সাহস দেখিয়া সকলে অবাক হইয়াছিল—বাস্তবিক এমন অসীম সাহসের পরিচয় খুব কমই পাওয়া যায়। সে একদিন সেই দুর্ধর্ষ বাঘটাকে সকলের পায়ের সামনে আনিয়া হাজির করিল। ব্যাপার দেখিয়া বৃদ্ধরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অনেক আশীর্বাদ করিলেন এবং এমন ভবিষ্যদ্বাণীও করিলেন যে, সে কালে একটা কিছু হইবে।

মেয়েরা আড়ালে থাকিয়া তাহার চেহারার দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইল। আশেপাশের দু'-চারখানা গ্রামেও এমন বীরত্বের কাহিনী মুহূর্তের মধ্যে প্রচার হইতে বাকী রহিল না। এমনকি স্বয়ং জমিদার-মহাশয়ও দারুণ খুশি হইয়া কিছু পুরস্কার দিলেন তাহাকে। কিন্তু সকলের প্রশংসা-বৃষ্টির আড়ালে অর্জুনের জীবনে আর একটি ব্যাপার যা ঘটিল, তার তুলনা নাই। অর্থাৎ অর্জুন প্রেমে পড়িল। তাহার অথবা সেই মেয়েটির প্রেমের আসরে নামিবার প্রথম দৃশ্যটি এই : রাজকুমার মণ্ডলের বাড়ীর সামনেই একটা পোড়ো বাড়ীর উঠানে মরা বাঘটাকে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। রোজই সেখানে কিছু-না-কিছু লোক জমিয়াই থাকিত। রাজকুমারের বড় মেয়ে চম্পক একদিন সেখানে গিয়া হাজির হইল, বাঘটার চারিদিকে চরকির মতো কয়েকবার পাক খাইয়া, নাকে কাপড় দিয়া এখানে-সেখানে থু-থু ফেলিয়া অত্যন্ত ঘৃণা ভরে বলিল, 'বারে, বাঘের গায়ে এমুন গন্ধ কেন? এমুনকাণ্ড তো আর দেখি নাই জীবনেও। বাঘের গায়ে এমুন গন্ধ কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৩৩৭ www.amarboi.com ~

কাছেই ছিল অর্জুন। ব্যাপার দেখিয়া সে কিছুতেই হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসি থামিলে শেষে আবার দারুণ গম্ভীর হইয়া এমন একটা তুচ্ছ বিষয়ও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বুঝাইয়া দিল। কিন্তু চম্পক তো অবাক! এমন দরদভরা স্বরে কেউ অনেক কাল তাহার সঙ্গে কথা বলে নাই। সে আরও তাহাকে দেখিয়াছে বটে কিন্তু ভালো করিয়া দেখে নাই, আজ নূতন করিয়া দেখিল, দেখিল, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বীর আসিয়াছে, তাহার চুল এলোমেলো, মুখভরা হাসি, হাতে খোলা তরবারি আর ঢাল, এখন শুধু বরণ করিতেই বাকী। বীর যুবককে বরণ করিবার লোক এখন কোথায়? চম্পক হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, কোন হরিণশিশুর মতো তাহার চোখের দৃষ্টি।

তারপর প্রেমের দ্বিতীয় দৃশ্যের কথাও বলিতে হয়। রাজকুমারের বাড়ীতে একদিন কীর্তনের আয়োজন করা হইয়াছে, গ্রামের অনেকেই আসিয়া কীর্তনে যোগ দিয়াছে। অর্জুনও আসিয়াছে। চম্পক আর স্থির থাকিতে পারিল না, চুপি-চুপি কখন কীর্তন-আসরের কাছে গিয়া হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে অর্জুনকে ডাকিল, অর্জুন আসিল—কিন্তু কাছে আসিলে পর চম্পক আর কিছু বলিতে পারে না, মাটির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে। এখানে বলিয়া রাখা ভালো চম্পকের মাথায় কিছু ছিট আছে, সে 'হাঁ' বলিলে মাঝে-মাঝে তাহার অর্থ হয় না, 'না' বলিলে অর্থ হয় 'হাঁ'। অনেক সময় ভুলেও সে চুল বাঁধিত না, আবার একসময় যখন-তখন চুল বাঁধিত। বছরচারেক আগে স্বামী তাহার জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। স্বামী জলে ডুবিয়া মরিলে স্ত্রীকে কপালে সিঁদুর মাখিয়া বারো বছর অপেক্ষা করিতে হয়, চম্পকও অপেক্ষা করিতেছিল। এখন বয়স তাহার সতেরো। এককালে স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া সে পাগলামি করিয়া এখানে-সেখানে আছাড় খাইয়া অনেক কাঁদিয়াছিল কিন্তু অর্জুনের ছায়ার আশ্রয়ে এই পাগলামি এখন অনেক কমিয়াছে। সে যেন নূতন পৃথিবীতে পা ফেলিল, জলের আয়নায় নিজের চেহারা দেখিয়া নিজেরই এখন আর বিশ্বাস হয় না, চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসে, আম গাছের নীচে শুকনো পাতার মর্মর-শব্দ সে প্রাণ ভরিয়া শোনে।

খুব দ্রুত পদক্ষেপের মতো অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু একসময় বিদায়ের পালা আসে। একদিন চমৎকার সাজিয়া-গুজিয়া এক বিদেশগামী নৌকায় অর্জুন চড়িয়া বসিল। দূর হইতে দারুণ চোখের জলে ভিজিয়া চম্পক দেখিল, বীরকুমার আবার যুদ্ধে যাইতেছে, এবারও সে জয়লাভ করিবে নিশ্চয়।

নদীর ঘাট হইতে কিছু দূরেই সেই বটগাছ। এখন কিছটা বড় হইয়াছে। পাতাগুলি কচি, চমৎকার, চকচক করে। রোদ খুব তীব্র হইয়া উঠিলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছায়া মাটিতে পড়ে। দুই-একটি ডালের ভিতর দিয়া সুতার মতো সরু শিকড় বাহির হইয়াছে। গাছের গোড়ার দিকটা সিঁদুরে-লাল, আর সেই গোড়ার মাটিও প্রচুর দুধ আর তেল খাইয়া কালো রং ধরিয়াছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, এই গাছের নীচে একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়ায়,—তাহার চুল এলোমেলো—চোখে দুটি কাহার প্রতীক্ষায় আকুল। সে চম্পক। চম্পক মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া সেই দেবাংশী গাছের উদ্দেশ্যে অনেক প্রার্থনা জানায়, বিড় বিড় করিয়া বলে, জয়ের মালা পরিয়া তাহার অর্জুন যেন শীগ্‌গিরই ফিরিয়া আসে, সে আবার তাহাকে বরণ করিয়া লইবে, তাহার বুকের ছায়ায় সেই বীরকে আশ্রয় দিবে। চম্পকের

www.amarboi.com ~

বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল, স্তনের ভিতরও কেমন একটা যন্ত্রণা, দুই হাতে সে তাহার স্তন চাপিয়া ধরিল।

চম্পক নদীর পারে আসিয়া দাঁড়ায়, চোখ ছোট করিয়া বহুদূর পর্যন্ত চাহিয়া থাকে, চোখের দৃষ্টি কখনো ভাঙ্গিয়া আসিলেও সে নিজে কখনও ভাঙ্গে না, বর্ষায় ক্ষিপ্ত নদীর ঢেউ পারে উপর আসিয়া আছাড় খায়, বর্ষা যায় শীত আসে, শীত যায় আবার বর্ষা আসে,—তবু অর্জুন আসে না; বছরের পর বছর ঘুরিয়া গেল, বটগাছ আরও বাড়িয়া ডালপালা মেলিয়া মাটিতে দীর্ঘতর ছায়া বিস্তার করিল, গ্রামের কোথাও দারুণ জঙ্গলে ভরিয়া গেল, কোথাও মানুষের পদক্ষেপে পরিষ্কার হইল, গ্রামে আবার বাঘ দেখা দিল, অনেক ছাগল-বাছুর খাইল—তবুও অর্জুন আসে না। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনতার লড়াই করিয়া সে প্রাণ দিয়াছে।

নদীর পারে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে চম্পকের শরীরও একদিন ভাঙ্গিয়া আসে, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। একদিন দেখা গেল, রাজকুমার মণ্ডলের মেয়ে চম্পক নদীর বিক্ষুব্ধ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, প্রাণপণে সে সাঁতরাইতেছে। নদীর ঢেউ-এর আঘাতে খোঁপা তাহার খুলিয়া গেল, জলের তালে তালে নাচিতে লাগিল, চম্পক সেই যে জলে নামিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই।

তারপর ১৭৬৯ সাল। সেবার বাংলার আকাশে এক গভীর দুঃস্বপ্ন দেখা দিয়াছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা আজও লোকে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে স্মরণ করে। এই সভ্যতার দিনে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন উপায়ে এমন প্রাণহানি ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। না খাইতে পাইয়া সেবার বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া গেল। শুধু 'মরিয়া গেল' বলিলে মৃত্যুটা বড় সহজই শোনায়। সেই মৃত্যুর দৃশ্যগুলি এত করুণ আর এত ভয়াবহ যে শুনিলে শরীরে কাঁটা দিয়া ওঠে। তবু অত্যাচারের সীমা নাই। তখন রাজস্ব আদায়ের যাহারা মালিক, তাহারা আরও দ্বিগুণ উৎসাহে এবং পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে লাগিল। তাহাদের অত্যাচারে লোকে ঘর ছাড়িয়া পলাইল, স্ত্রী-কন্যা বেচিয়া খাইল, অথবা আত্মহারা করিয়া বাঁচিল। মরা মানুষের হাড়ে পথঘাট ভরিয়া গেল, আবার এমন দৃশ্যের কখনও কল্পনা করা যায় যে, সাধারণ কুকুরও সেদিন ক্ষুধায় কাতর হইয়া মানুষকে তাড়া করিতেছে। এমনদিনে পীরপুরের লোকগুলির অবস্থাও কম ভয়ানক নয়। সারা গাঁয়ে দিনের বেলায়ও টুঁ শব্দটি শোনা যায় না। কারুর মুখে কোন কথা নাই, সকলেই কেবল একে অন্যের দিকে হা করিয়া থাকে, তাহারা আজ কাঁদিতেও ভয় পায়। মাঝে-মাঝে কেবল কুকুরের কাতর ডাক শোনা যায়। কুকুরের ডাক আজ মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। সেখানকার বৃদ্ধরা তখন কেবল তাহাদের দীর্ঘ, শীর্ণ আঙুল দিয়া মাটিতে তাক করিয়াছেন। প্রৌঢ়রা আর কোন উপায় না দেখিয়া স্ত্রীর মাংসপিণ্ডকেই জীবনের সায় বলিয়া জানিল, যুবকরা মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মেয়েদের বেণী রচনায় আর সাধ নাই, কপালে টিপ দিতে আর পায়ে আলতা পরিতেও ইচ্ছা জাগে না।

একদিন এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের দল সেই বটগাছের নীচে আসিয়া সমবেত হইল, বড় বড় উস্কোখুস্কো চুলে-ভরা অনেকগুলি মাথায় সেই খোলা জায়গাটি ভরিয়া গেল, সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও!৩৩২www.amarboi.com ~

মাথাগুলি কোন গভীর প্রার্থনায় নতমুখী। দেবাংশী গাছের দিকে চাহিয়া তাহারা অনেক প্রার্থনা করিতে লাগিল।

তারপর আরও অনেকগুলি বছর কাটিয়া গিয়াছে, প্রায় একশ' বছরের কাছাকাছি। এতদিনে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, পীরপুরেরও। আগে যাহারা ছিল, এখন তাহারা নাই। এখন যাহারা আছে, তাহারা আর একদল লোক, কিন্তু তাহাদের রক্তে একই মানুষের রক্তের প্রবাহ বহিতেছে। সেই বটগাছকেও আর চিনিবার জো নাই। একদিন যা ছিল নিতান্ত শিশু, সে এখন বড় হইয়া প্রকাণ্ড ছায়া বিস্তার করিতেছে। পাতাগুলি এত ঘন যে আকাশও অনেক সময় দেখা যায় না। এখানে-সেখানে মোটা-মোটা শিকড়, মাটির রস পান করিতে অতৃপ্তি নাই। গাছের ছায়া এত নিবিড় যে গ্রামের ছেলেরা ইহার নীচে বসিয়া আড্ডা মারে, শীতকালে এখানে বসিয়াই আগুন পোহায়, ধোঁয়ায় তাদের মুখ ধূসর হইয়া আসে। এছাড়া গাছের নীচে দুই-একটি ঘরও উঠিয়াছে। তার মধ্যে একটি মুদি-দোকান।

এতদিন পীরপুরের এই বটগাছকে ঘিরিয়া কতো ঘটনা ঘটিয়া গেল, আরও কতো ঘটিবে কে জানে। এতকাল এই গাছ গ্রামের দুই পুরুষ দেখিয়াছে, আরও দেখিবে।

১৮৫৭ সালে কানপুর সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ধীরে-ধীরে তাহা সারা ভারতবর্ষ ছড়াইয়া পড়িল, বাংলায়ও সে ঢেউ আসিয়াছিল। সেই বিপ্লবের আগুন এত তীব্র হইয়াছিল যে শাসনযন্ত্রের চাকাও নড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐতিহাসিক এমন কথাও বলেন, সেই বিপ্লবের যাঁরা পরিচালক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আর যা কিছুরই অভাব থাকুক আর না-ই থাকুক, শৃঙ্খলার অভাব যথেষ্ট ছিল; তাই আজও আমরা ইংরেজের আমল দেখিতেছি। সেই বিদ্রোহের ইতিহাসকে আজও লোকে 'কালা-গোরা'র যুদ্ধ বলিয়া স্মরণ করে। বিদ্রোহ-দমনের দৃশ্য তাহারা অনেক দেখিয়াছে বটে কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করে না। তখন সিপাহীদের কুকুরের মতো তাড়া করা হইত, তাহাদের প্রাণ-নাশের সমারোহ তখন খোলা আকাশের নীচেই হইত। অনেক ভারতবাসী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

একদিন একটা সিপাহী পীরপুরের বটগাছে আসিয়া আশ্রয় নিল। সে যেন কোন পলায়নপর সিংহ, পলাইতেছে বটে, কিন্তু তবু তাহার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে। মুখের রং গৌর, পেশীবহুল শরীর, হাত-পায়ে অপরিষ্কার কাদামাটির দাগ, পোশাক ক্ষত-বিক্ষত। লোকটা পূর্ণ একটা দিন সেই গাছের উপর লুকাইয়া রহিল। দুই-একজন যাহারা তাহাকে দেখিয়াছে, অনেক কাল তাহাকে ভুলিতে পারে নাই; সে ওইভাবে পলাইয়াও অত্যাচারীর হাত হইতে রেহাই পাইয়াছিল কি না জানা যায় নাই।

তারপর আরও কয়েকটা বছর কাটিয়াছে। চিরকাল একই রকম যায় না। গ্রামে একবার ভয়ানক বসন্ত দেখা দিল। এমন একটি ঘর রহিল না যেখানে অন্তত একটিও বসন্তের রোগী নাই। প্রায়ই কোন রাত্রিশেষে বা সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘন-ঘন হরিধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। হঠাৎ শুনিলে গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। নদীর পারের জল আর আকাশ শ্মশানের অগ্নিশিখায় লাল হইয়া গেল।

এম চরম অসহায়তার দিনে গ্রামের অধিষ্ঠিত দেবতার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর উপায় নাই। গ্রামের সকলে আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিল গাছের নীচে, প্রাণপণে প্রার্থনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিতে লাগিল। কী কারণে দেবতা রাগ করিয়াছেন কে জানে। সমস্ত গ্রামবাসী মিলিয়া দেবতার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিল, 'হে দেবতা ক্ষমা করো। কোনদিন না বুঝিয়া কী ভুল করিয়া ফেলিয়াছি, তুমি পিতা হইয়া তাহা ক্ষমা করো।'

দেবতার পায়ের কাছে শত শত পাঁঠা বলি দেওয়া হইল, মাটিতে রক্তের নদী বহিয়া গেল। দেবতাকে একবার রাগাইলে আর উপায় নাই, অনেক মূল্য দিয়া তবে সেই রাগ থামাইতে হয়। এমন অনেক বিপদ-আপদে যিনি পাশে আসিয়া দাঁড়ান, তাঁহাকে মাঝে মাঝে খুশি না করিলে চলে না।

এদিকে দিনের পর দিন কাটিতে থাকে। আজ যা অতি আড়ম্বরে ঘটে, কাল তা মনেও থাকে না। কিছুই ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই।

ধীরে ধীরে দেশে বণিকদের নিজেদেরই প্রয়োজনে রেলপথের বিস্তার হইতে লাগিল। তাতে সাধারণ লোকেরও কিছু উপকার হইল বটে কিন্তু সেই কিঞ্চিৎ উপকারের বদলে যতখানি অপকারের অভিশাপ আসিয়া দেখা দিল, সেই কারণে শুধু মালিকদেরই দোষ দেওয়া চলে। একটা যন্ত্রের কাছে যখন একটা ভয়ানক সুখের আশা করা অন্যায় নয়, সেখানে এই অভিশাপের ইতিহাস বড়ই করুণ! দেখা গেল, প্রতি ঘরে ম্যালেরিয়া বিরাজ করিতেছে এবং তাহার প্রতাপে প্রত্যেক মানুষকে হাতের মুঠায় প্রাণ লইয়া ফিরিতে হয়। এমনকি ইহাতে শঙ্করও যে গ্রামের সকলকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে, ইহা অভাবনীয় হইলেও অস্বাভাবিক নয়।

সম্প্রতি চোরের মতো চুপি চুপি লক্ষ করিলে দেখা যায়, শাদা কাপড় পরনে কে একটি মেয়ে প্রায়ই কোন নির্জন সন্ধ্যায় অথবা গভীর রাত্রে সেই বটগাছের নীচে আসিয়া মাথা ঠুকিয়া কাঁদিতে থাকে। খোঁজ করিলে জানা যায়, সে শঙ্কর ভুঁই-মালীর স্ত্রী সুকুমারী।

শঙ্কর তো এই সেদিনও সশরীরে বাঁচিয়াছিল। তাহার মতো জোয়ান শরীর হাজারে একটা মেলে। সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া চলিত। এছাড়া ঘর তৈরি করিতে এমন ওস্তাদ এ-অঞ্চলে আর দ্বিতীয় নাই। সেদিন সে গিয়াছিল মাধবদি'র হাটে। সন্ধ্যার কিছু পরে হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল, বলিল, 'বৌ, একটা কাঁথা দে, জ্বর আইল বুঝি।'

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'আবার কী সর্বনাশ অইছে কে জানে।' তোলা একখানা কাঁথা বাহির করিয়া সে শঙ্করের উত্তপ্ত শরীরে তাড়াতাড়ি বিছাইয়া দিল। হাত দিয়া কপাল পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'ওগো মাগো, গাও যে পুইড়া গেল!'

জ্বরের ঘোরেও শঙ্করের দুষ্টুমি বুদ্ধি যায় না। তাহার হাতখানা সরাইয়া সে বলিল, 'এমনে জ্বর দেখে না।'

'কেমনে?' সুকুমারী তাহার কপালে নিজের গাল রাখিয়া বলিল, 'এমনে?'

শঙ্কর তাহার গরম ঠোঁট দুটি সুকুমারীর ঠাণ্ডা গালে ঘষিয়া জড়িত-স্বরে বলিল 'হু।'

সুকুমারী হাসিয়া ফেলিল, তাহার গালে মৃদু একটা চড় মারিয়া বলিল, 'এই বুঝি জ্বরের রুগীর মতন কথা?'

তারপর জ্বর আরও বাড়িয়া চলিল। সেদিনের রাত্রিটা মোটামুটি ভালোই গিয়াছিল। সুকুমারীকে বেশী জাগিতে হয় নাই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও ভালো গেল। চারদিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও!www.amarboi.com ~

দিন বিছানা হইতে উঠিয়া শঙ্কর বলিল, 'বৌ, তাড়াতাড়ি ভাত বসাইয়া দে, আমি আজই ভাত খামু।' শঙ্কর সত্যই স্নান করিতে চলিল। ব্যাপার দেখিয়া সুকুমারীর দুই চক্ষু স্থির। সে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'এমুন করলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরুম। তাড়াতাড়ি যাও, শুইয়া থাক গিয়া, জ্বর অহনও ছাড়ে নাই।'

শঙ্করের স্বভাবটা চিরকালই এমনি। কেবল সুকুমারীর আশ্রয়েই সে যেন মানুষের মতো চলিতে ফিরিতে পারে, নইলে কোথায় ভাসিয়া যাইত কে জানে!

মারা যাওয়ার আগের দিন এক কাণ্ড ঘটিল। রাত্রি তখন অনেক। শঙ্কর হঠাৎ চোখ মেলিয়া ডাকিল, 'বৌ?'

সুকুমারী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলিল, 'কও?'

শঙ্কর আবার ডাকিল, 'বৌ?'

সুকুমারী বলিল, 'কী? কও না গো?'

শঙ্কর তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া বলিল, 'উ।'

সুকুমারী তবু বুঝিতে পারে না, সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, 'কী অইছে গো?'

তবু তাহার কোলের ভিতর মুখ গুঁজিয়া শঙ্কর গোঙাইতে থাকে, বিড় বিড় করিয়া একমনে কী বলে।

কী একটা কথা মনে হওয়ায় সুকুমারী হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তাহার মুখটি বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল,—'ছিঃ, এমুন পোলাপানের মতন করে না। তোমার যে জ্বর গো!'

শঙ্কর বলিল, 'না, জ্বর না, আমার জ্বর না।'

—'তুমি একটা পাগল। গাও পুইড়া যায় জ্বরে, তবু—',

সুকুমারী কী করিবে ভাবিয়া পায় না, তাহাকে আরও জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের কাছে নিজের মুখটি লইয়া সে বলিল, 'এই লও, খালি চুমা দেও।'

কিন্তু শঙ্কর তাহার মুখ ফিরাইয়া লইল, একেবারে পাশ ফিরিয়া শুইল।

এবং পরদিনই সে মারা গেল।

সুকুমারী ইহার পর আর কী করিতে পারে? ঘরের এককোণে মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া রহিল, কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ-মুখ তাহার ফুলিয়া গেল, কেবলই মনে হইতে লাগিল, মৃত্যুর আগে শঙ্কর কী একটা জিনিস তাহার কাছে চাহিয়াছিল। অথচ সে দেয় নাই, হায়, সে কেন রাজী হয় নাই? এমন কঠিন কিছু নয়তো যে কিছুতেই দেওয়া চলে না, হায়, কেন রাজী হয় নাই সে! কাঁদিতে কাঁদিতে সুকুমারীর যে দম বন্ধ হইয়া আসে আরা ভাবিতে পারে না সে।

ইহার পর হইতেই তাহাকে অনেক নির্জন সন্ধ্যায় অথবা গভীর রাত্রে সেই দেবাংশী বটগাছের নীচে মাথা কুটিয়া কাঁদিতে দেখা যায়। এমন শাদা কাপড় পরা একটা মূর্তিকে হঠাৎ দেখিলে মনে প্রথমে ভয়ই জাগে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেই ভুল ভাঙ্গে। একটা চাপা কান্নার শব্দ কানে আসিতে থাকে এবং তখন মনে হয়, ঐ শাদা কাপড়-পরা মেয়েটি শঙ্করের সদ্য-বিধবা স্ত্রী সুকুমারী ছাড়া আর কেহ নয়।

www.amarboi.com ~

তারপর আরও অনেকগুলি বছর কাটে। অনেক পরিবর্তন এবং তার দ্বিগুণ সম্ভাবনা লইয়া বিংশ শতাব্দী দেখা দিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গবঙ্গ আন্দোলনে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে চেতনা আসিল, সুরেন্দ্রনাথ দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, অনেক কলেজ-যুবক তাঁহার গাড়ী টানিয়া কৃতার্থ বোধ করিল। তারপর পৃথিবীতে মহাসমর বাঁধিতেও আর বাকী থাকে না। ভারতবর্ষে সেই যুদ্ধের যাহারা প্রতিবাদ করিল তাহারা জেলে গেল, আর যাহারা করিল না, তাহারা এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিল যে যুদ্ধের পর কিছু পাওয়া যাইবে।

কিন্তু বাহিরে যাহাই ঘটুক, পীরপুরে তার ছোঁয়াটুকুও লাগে না, সে তার বটগাছের মতোই নির্বিকার, নির্বিকল্প।

এমন সময় এক সুদর্শন সুবেশ ভদ্রলোককে পীরপুরের নদীর ঘাটে আসিয়া নৌকা হইতে নামিতে দেখা গেল। তিনি এ গাঁয়ের বিশিষ্ট জামাই; বছর বছর স্ত্রী বাপের বাড়ী আসিলে তিনিও বছর বছর আসিয়া দেখা দেন। তাঁহার হাতে কী একখানা কাগজ, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তিনি তাহা পড়িতেছিলেন। নৌকা পারে লাগিতেই আবার গুটাইয়া লইলেন এবং লাফ দিয়া পারে নামিয়া পড়িলেন। কিছু দূরেই বটগাছের নীচে পনেরো-ষোল বছরের এক বালক গভীর মনোযোগে ইহা লক্ষ করিতেছিল। সে এ গাঁয়েরই ছেলে। ভদ্রলোক কাছে আসিতে সে তাঁহার দিকে চাহিয়া মুচকি একটু হাসিল, ভদ্রলোকও হাসিলেন। তারপর সে তাঁহার পিছু লইল।

ভদ্রলোক ডান হাতে ছড়ি ঘুরাইতে-ঘুরাইতে যে বাড়ীতে গিয়া প্রথম ঢুকিলেন, সে বাড়ীর অবস্থা মোটের উপর ভালোই। তাঁহাকে দেখিয়া কয়েকটি ছেলেমেয়ে 'জামাইবাবু' 'জামাইবাবু' বলিয়া কলরব করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে এক প্রৌঢ়া মহিলা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এবং আরও লক্ষ করিলে দেখা যাইত, বাকারির বেড়ার ফাঁক দিয়া আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়েও চুপি-চুপি চাহিয়া কী দেখিতেছে।

সেই ছেলেটি হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'মৃণালদি, জামাইবাবু এসেছেন। আমি না বলেছিলাম আজ আসবেন?'

মৃণাল হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, সতু, বলেছিলি।'

ওদিকে জামাই-বেচারীকে নানারকম আদর-যত্নে রীতিমতো ঘায়েল করা হইতেছে।

এক সময় চুপি চুপি সেখানে গিয়া সতু কাগজখানা খুলিয়া বসিল। কাগজখানা একটি পত্রিকা। সতু প্রথমেই দেখিল, কোন এক জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক জায়গায় এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, বড় বড় অক্ষরে তারই বিপদ বিবরণ দেওয়া। কয়েক হাজার লোকের একটা মিটিং হইতেছিল, হঠাৎ দেখা গেল চারিদিক সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্যে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারা সেই বিপুল জনমণ্ডলীর চারিদিক ঘিরিয়া নির্মমভাবে গুলী চালাইল। চার-শ' লোক সেখানেই মারা গেল, এছাড়া আরও কত লোক যে শুধুই আহত হইয়াছিল, তার ইয়ত্তা নাই।

ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। পড়িতে পড়িতে সতুর গা-জ্বালা করিল, কখনো মুষ্টি দৃঢ় হইল, এমন কি সে কাঁদিয়া ফেলিল।

এবং ইহার কয়েক বছর পরেই দেখা গেল, এক শুভ অপরাহ্নে গ্রামের একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠ পত্রিকা-পাঠক শ্রীযুক্ত মনোহর চক্রবর্তী সমস্ত গ্রাম ভড়িয়া শুধু এই কথাই প্রচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও!৩৩৬www.amarboi.com ~

করিয়া বেড়াইতেছেন যে, তাহাদেরই পীরপুর গাঁয়ের রাজেন মিত্তিরের ছেলে সতীন মিত্র—এই তো সেদিনের ছোকরা—কলিকাতা শহরের কোন এক সাহেবকে মারিতে গিয়া নাকি ধরা পড়িয়াছে।

ঘটনা সত্য সন্দেহ নাই।

বটগাছের নীচে আশেপাশে এমনি আরও অনেক ঘটনা ঘটে। মানুষের মতো দুটি চোখ থাকিলে অনেক কিছু সে দেখিত। সে এখন বৃদ্ধ। তার গায়ে এখানে-ওখানে কেবল নানারকমের শিকড়, কোন কোন ডালে হয়তো পোকাও ধরিয়াছে। গাছের গুঁড়িটা এত মোটা যে কয়েকটি লোক মিলিয়াও নাগাল পাইবে না। গুঁড়ির কাছে চারিদিকে কে যেন বাঁধাইয়া দিয়াছে। গাছের নীচে প্রকাণ্ড বড় ছায়া এবং সেই ছায়াকে জড়াইয়া আরও বড় একটা হাট বসে। ছোট ছোট টিনের ঘরের সারি এত বেশী এবং ঘন যে হাঁটিবার পথও পাওয়া দুষ্কর।

এখন ১৯৩০ সাল। গান্ধীর আইন-অমান্য আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। সেই আগুনের ঢেউ পীরপুর গ্রামেও কিছুটা আসিয়া পৌঁছিল। একদিন কোথা হইতে একদল যুবক আসিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে ছোট একটা হারমনিয়াম। তাহারা স্বদেশী গান গাহিয়া বিলাতি বর্জনের কথা বলিয়া কিছু টাকা-পয়সা সংগ্রহ করিল। লোকগুলি সকলের কাছেই এক অদ্ভুত রহস্যময় জীব; মেয়েরা চুপি চুপি বিস্ময়ভরা চোখে এই সুদর্শন যুবকদের দেখিল।

বিকালে বটগাছের নীচে বসিল এক সভা। অনেক লোক আসিল। দেখা গেল, কয়েকটি স্ত্রীলোকও সন্তান-সন্ততিসহ বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছে। তাহারা এক হাত ঘোমটা টানিয়া স্বদেশী বক্তৃতা শুনিল। সভায় সভাপতিত্ব করিলেন শ্রেষ্ঠ পত্রিকা-পাঠক মনোহর চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি গান্ধীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যেসব অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছেন তাহা সমবেত সকল লোককে শুনাইলেন। একজন শুধু 'বন্দেমাতরম্' শব্দেরই ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের এই অপূর্ব মন্ত্র আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর মুখে-মুখে ফিরিতেছে বটে কিন্তু ইহার অর্থ অনেকেই জানে না। ইহার অর্থ হইল 'হে মাতা, তোমাকে বন্দনা করি!' এছাড়া সেই যুবকদের মধ্যেও দুই-একজন বক্তৃতা দিল।

তারপর একেবারে ১৯৩৯ সাল। বটগাছের মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে, এতদিন চোখে পড়ে নাই, কিন্তু আজ দেখিতে বড় ভয়ানক। কতকগুলি ডাল এখন একেবারে জীর্ণ, পত্রহীন। ছোট-ছোট ডাল আর শুকনো পাতা সর্বদা ঝরিয়া পড়ে, এক মুসলমান বুড়ী তা কুড়াইয়া নেয়। গাছের গুঁড়ির দিকে একটা মস্তবড় গর্তের মতো, একটা লোক বেশ লুকাইয়া থাকিতে পারে! হাটবারে চারিদিকে বাঁধানো জায়গাটিতে অনেকে দোকান সাজাইয়া বসে, অনেকে বেশ আড্ডা মারে, কেহ কাঁঠাল ভাঙ্গিয়াও খায়। মাঝে মাঝে দুই-একজন সাধুও বসে। যেদিন হাটবার, সেদিনের অবস্থা দেখিলে এতকালের ইতিহাসকে ভুলেও মনে করা যায় না, দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়, একটা ভীষণ কোলাহল চাঁদোয়ার মতো সেই প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে গুম্-গুম্ করিতে থাকে।

www.amarboi.com ~

সেদিনও হাটবার রাত থাকিতেই নানারকমের নৌকা আসিতেছে। একটার পর একটা করিয়া প্রায় আধ-মাইলখানেক নদী সেই নৌকায় ভরিয়া গেল। বেলা বারোটার পর হাট বেশ জমিয়া ওঠে। চারিদিক লোকে গিজ্-গিজ্ করে। বাহির হইতে যাহারা আসে তাহাদের চেহারা দেখিলেই বোঝা যায়। তাহাদের গায়ে নানারকমের জামা থাকে। ভিড় কোথাও পাতলা বলিয়া মনে হয় না। সব জায়গাতেই সমান। পীরপুর অথবা অন্যান্য গ্রাম হইতে যাহারাই হাট করিতে আসিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই কাঁধে গামছা, আর একটি ঝাঁকা। সকলের মুখেই হাসি, অজস্র কথা। আজ যেন একটা উৎসব। সকলে আসিয়াই একেবারে হাট করিতে বসিয়া যায় এমন নয়, অনেকক্ষণ এখানে-সেখানে গল্প করিয়া সকলের শেষে তবে হাট করে। এইদিনে কতো পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ফুলুরি, বেগুনি, জিলিপি—এসব যাহারা ভাজে, তাহাদের কথা বলিবারও অবসর নাই; কারণ সকলেই একটি পয়সার অন্তত কিছু কিনিয়া খায়।

হাটের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ, যা অন্যদিন পাওয়া যায় না।

ছোট ছোট রাখাল ছেলেরা সস্তা সিগারেট কিনিয়া নির্ভয়ে খাইয়া বেড়াইতেছে। নূতন বিবাহ করিয়াছে যাহারা, অথবা যাহাদের কাছে তাহাদের স্ত্রীদের গায়ের স্বাদ আজও পুরনো হয় নাই, তাহারা বেশীর ভাগই যেখানে গোলাপী রঙের সাবান, চিরুনী ইত্যাদি বিক্রি হয় সেখানে ভিড় করিয়া আছে। গ্রামের একমাত্র খলিফা রহমান তাহার বহু পুরনো সেলাই-এর কলখানা একেবারে হাটের মাঝখানে লইয়া বসিয়াছে। কতো লোক তাহাদের লুঙ্গি সেলাই করাইয়া লইল, কেহ কেবল জামার ছেঁড়াটুকু তালি দিয়া লইল।

দেখিতে দেখিতে বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিল। সকলে দেখিল বটগাছের নীচে বাঁধানো জায়গাটিতে দাঁড়াইয়া একটা লোক বক্তৃতা করিতেছে। লোকটা সেই সতীন মিত্র ছাড়া আর কেহ নয়। আজ নয় বছর পরে কী কারণে হঠাৎ মুক্তি পাইয়া কয়েক মাস হইল সে গ্রামে আসিয়াছে। আসিয়াই সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে দারুণ মিশিতে লাগিল, তাহাদের লইয়া কী জটলা করিতে লাগিল। আর আজ হঠাৎ দেখা গেল, ঐ বটগাছের নীচে দাঁড়াইয়া সে বক্তৃতা করিতেছে। তাহার পাশে আর নীচে অনেকগুলি কৃষক। আস্তে আস্তে অন্য কৃষকরাও একটা কৌতূহলবশে সেখানে গিয়া ভিড়িল। একটা বিপুল জনতার সৃষ্টি হইল।

সতীন বলিতেছিল : 'আমার চাষী ভাইরা, চেয়ে দেখুন, সব জিনিসেরই দর বেড়েছে কিন্তু যা বিক্রি করে আমরা দুটি খেয়ে বাঁচবো, সে জিনিসের দর বাড়েনি। কেন এমন হলো?'

সকলে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল হায়দরের ছেলে বসির সতীনের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে।

সতীন আবার বলিতেছে : 'ভাইসব, সমাজের যারা পরগাছা—যারা আমাদের গায়ের রক্ত শুষে শুধু বসে খায়, তাদের উপড়ে ফেলবার দিন এসেছে আজ। ভাইসব, আমাদের জিনিস দিয়েই ওরা মোটর হাঁকায়, ব্যাঙ্কে লাখ লাখ টাকা জমা রাখে, কিন্তু আমরা না খেয়ে মরি। এ অত্যাচার কেন আমরা সহ্য করবো? কেন সহ্য করবো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন সময় আর এক কাণ্ড ঘটিল। হঠাৎ একটা হুড়োহুড়ি পড়িয়া গেল। লাঠি-হাতে মস্ত জোয়ান একদল লোক বাঁধানো জায়গাটিতে উঠিয়া অনবরত লাঠি চালাইতে লাগিল।

দুই-এক ঘা খাইয়াও সতীন চিৎকার করিয়া বলিল, 'ভাইসব, এদের চিনে রাখুন, এরা সেই জমিদারদেরই ভাড়াটে গুণ্ডা, লাঠি চালিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করতে এসেছে!'

সতী আর বলিতে পারিল না, আরও কয়েকটা লাঠির ঘা খাইয়া বসিয়া পড়িল। রক্তে তাহার শরীর ভাসিয়া গেল, যে মাটি একদিন সিঁদুর আর শত শত পাঁঠার রক্তে লাল হইয়াছে, তাহা আজ মানুষের রক্তে লাল হইয়া গেল।

এক মুহূর্তে যা ঘটিয়া গেল, তা কল্পনাও করা যায় না। ব্যাপার দেখিয়া যে যার মতো পলাইল, আর যাহারা সেই প্রকাণ্ড, বৃদ্ধ এবং বটগাছের নীচে অত বড় হাটের মাঝখানে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া রহিল, তাহাদের দেখিবার কেহ নাই।

* * * *

ইহার কয়েকদিন পরেই এক ভীষণ ঝড় আসিল, এমন ঝড় এ-অঞ্চলে ইদানীং আর হয় নাই। ঝড়ের ঝাপটা মৃতপ্রায় বটগাছের উপরেই লাগিয়াছিল বেশী। বটগাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল, যেন প্রকাণ্ড এক দৈত্য ধরাশায়ী হইল। আর যেটুকু বাকী ছিল, তাহাও কাটিয়া লওয়া হইল। দেবাংশী গাছের কাঠ ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা ব্যবহার করে না বটে কিন্তু স্থানীয় জমিদার উহা বেচিয়া বেশ দু-পয়সা লাভ করিলেন।

দীর্ঘ দুইশ' বছর পরে বটগাছ অবশেষে মারা গেল। ইহার নীচে অনেক ইতিহাস রচিত হইয়াছে, কতো দীর্ঘশ্বাস চাপাকান্নার শব্দ ইহার প্রতিটি পাতার নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িত; ইহার নীচে কতো লোক চাপা পড়িয়াছে, এক রক্তের গঙ্গা বহিয়া গেল, কত রক্তের বীজ ছড়াইয়া আছে, সেই বীজ হইতে একদিন অঙ্কুর দেখা দিবে, তারপর অকে নূতন বৃক্ষ জন্ম নিবে, ইহাও আশা করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতীশ ওঠেনি, শিবু ওঠেনি, মনুর মা ওঠেনি, এমন কি সূর্যও আকাশে দেখা দেয় নি, তার শুধু আলো পৌঁছেছে পৃথিবীতে।

কিন্তু শ্রীবিলাস উঠেছে।

বিছানা থেকে উঠেই প্রথমে খুঁজলো লাঠি,—এটা ছাড়া সে চলতে পারে না, তার অন্ধত্বকে সে কতকটা উপহাস করে ওই লাঠির সাহায্য নিয়ে। ওই লাঠি তার মস্তবড়ো সাথী। খুঁজতে খুঁজতে সাথীকে সে খুঁজে পেলোও, তার ডগাটি একবার ডান পাশে, একবার বাঁ পাশে ফেলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো এবং আন্দাজে দিক ঠিক করে করজোড়ে সূর্যকে প্রণাম করলো।

ঘরের ভিতর তার স্ত্রী বিন্দু, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে, ভোরের বাতাসের ছোঁয়াচে বেঘোরে ঘুমুচ্ছে।

লাঠিটা একপাশে রেখে শ্রীবিলাস দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝেয় বসে পড়লো। একটু বসে থেকে ডাকতে লাগলো, ও বৌ, বৌ? ওরে কেলো, ওরে হেবো, ওঠ্ বাবা ওঠ্, আর কত ঘুমুবি বল্, রোদ্দুর উঠে গেছে যে, ও মা সদু—

অনেক ডাকাডাকিতে বিন্দুর ঘুম ভাঙলো, বললে, রাত না পোয়াতে কি আরম্ভ করেছ শুনি?

শ্রীবিলাস বললে, এখনও কি তোমার রাত রয়েছে? কত লোক উঠে গেছে। আমি কতক্ষণ ধরে উঠে বসে আছি।

ছেলেপিলেগুলো ওঠেনি, বিন্দু বাইরে এসে ধপ করে মেঝের উপর বসে চোখ রগড়ালো, গা মোড়ামুড়ি দিলো, হাই তুললো, তারপর স্থির হয়ে বললো, এইতো এখন উঠলে, আমি বুঝি দেখিনি? কত লোক উঠেছে! একটিকেও তো দেখছিনে বাপু!

—তাতে কি হয়েছে, সকলে পাগল হলে কি তুমি পাগল হবে বৌ?

বিন্দু কি একটা কাজে ভেতরে গেল, যেতে যেতে বললে, আমি বলছি, কেন মিথ্যে কথা? সারারাত যে গরম গেছে, ঘুম একরকম হতেই চায় না, তার ওপর—

—মিথ্যে কথা? শ্রীবিলাস জোরে বললে, আমি মিথ্যুক আর তুমি খুব সত্যবতী না? দেখবে, সকলে উঠেছে কিনা? দেখবে, দেখবে?

—দেখবো, বিন্দু নিঃশব্দে হাসলো।

—ওরে সতে, ওগো শিবনাথ, ও মনুর মা,—কিছুক্ষণ এমনি নিষ্ফল ডেকে হতাশ হয়ে শ্রীবিলাস বললে, আর মেয়েমানুষের অত ঘুমই বা কেন!

—মেয়েমানুষের ঘুমেই চোখ টাটায়, না! বুঝি ঘুম শুধু পুরুষের?

শ্রীবিলাস রেগে কি বলতে যাচ্ছিলো এমন সময় ঘরের পাশে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল।

—ও দাদা, কি করছো?

—কে, বীরু?

—হ্যাঁ।

www.amarboi.com ~

—এইতো দাদা বসে আছি একা, যার একা, শ্রীবিলাস যেন এক মুহূর্তে বদলে গেল, বললে, কিছু সাথে যাবে না, কেউ সঙ্গে যাবে না, স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, ভাই নয়, বোন নয়, ধন-দৌলত নয়—শ্রীবিলাস গুন্‌গুন্‌ করে পরলোকতত্ত্ব-বিষয়ক একটা গান ধরলে, তারপর থেমে বীরুর দিকে তাকিয়ে বললে—বাঁশী বেজেছে। কারখানায় চললে এত সকালে?

বীরু বললে, ঠিক এসময়ই তো রোজ আমি যাই দাদা।

—রোজই এসময় যাও? শ্রীবিলাস বললে, ঘড়ি তো নেই যে সময় ঠিক রাখবো, কি বল বীরু?

এই একটু আগেই এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করছিলো।

—কিন্তু আছে মন, আছে তাতে কাঁটা, মিনিটের নয় কিন্তু ঘন্টার কাঁটা। তাই ঠিক করে বলতে পারিনে ছ'টা বেজে ক'মিনিট হয়েছে, কিন্তু এটা বলতে পারি যে ছ'টা বেজেছে, কি বলো?

শ্রীবিলাস হাসলো, বললে, ওই যে কথায় বলে মন না গতি—

বিন্দু আবার বাইরেই এসে দাঁড়িয়েছিলো, বললে, আমাদের বীরু এখন একটা বিয়ে থা করুক, ঘর-দোর কে দেখে বলো? তাছাড়া, অসুখ-বিসুখও তো আছে? করো ভাই করো, আমরা একটা নেমন্তন্ন খাই।

বীরু যেন লজ্জা পেলো।

শ্রীবিলাস হেসে বললে, ওইতো মেয়েমানুষের দোষ, কেবল বিয়ে থা করো! আরে, বিয়ে তো করবে, খেতে দেবে কি? তারপর ছেলেপিলে হ'লে।

তার কথা শুনে বিন্দুর খিল্‌ খিল্‌ করে হাসতে বা ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো, কে কাকে বলে? কিন্তু সে তো করলো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

শ্রীবিলাস বললে, পাও অল্প মাইনে, দুজনের পেট কি করে চলবে এতে? হ্যাঁ বীরু, তোমার না মাইনে বাড়বার কথা ছিল?

—ছিল কিন্তু বাড়াচ্ছে না তো।

—বাড়াচ্ছে না? কথা দিয়েও!

—তাইতো দেখা যাচ্ছে।

—কি বলো, এ ত অন্যায়? কথা দিয়ে কথা-না-রাখার মতো পাপ আর আছে? বাইরেরটা দেখে মনে হয় শ্রীবিলাস ভয়ানক রেগে উঠেছে, পরক্ষণেই বেড়ালের মতো ঠাণ্ডা হয়ে বললে, ভগবান করুন, দিনে দিনে যেন তোমার উন্নতি হয়।

—আমি যাই?

—এসো ভাই।

কাছেই বিন্দুর নিঃশব্দে উপস্থিতি টের না পেয়ে শ্রীবিলাস জোরে ডাকতে লাগলো, 'বৌ, ও বৌ—'

—কি?

—এখনও দাঁড়িয়ে আছো? কাল যে বললে, আজ তোমাকে খুব সকালে যেতে হবে, বাবুদের বাড়ীর ছেলের ভাত। যাও তাড়াতাড়ি। আবার যদি রেগে-টেগে যায় তাহলে কি করবে বলো? যাও শীগ্‌গির।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—যাই।

—আর দ্যাখো, ঘরে কোন খাবার নেই কিন্তু, ছেলেপিলোগুলো খাবে একটা-কিছু, দুটো পয়সা যদি থাকে রেখে যেয়ো না হয়, দু'পয়সার মুড়ি কি চিঁড়ে কিনে এনে খাবে'খন।

—হুকুম করবার বেলায় তো খুবই মজা, আর পয়সা নেবার বেলায় কেবল গৌরী সেন! আঁচলে বাঁধা ছিল পয়সা, বিন্দু তা বার করে মেঝের ওপর ঝনাৎ করে ফেলে চলে গেল। শ্রীবিলাস হাত দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে আপন মনে বললে, আবার হাতের ওপর দিয়ে গেলে কি দোষটা হতো শুনি? এখন পয়সা দুটো আমি কি করে পাই? কোথায় না কোথায় গড়িয়ে চলে গেছে কে জানে? লোকে বলে, টাকা-পয়সার হাত পা আছে।

ছেলেপিলেদের মধ্যে কেলো সকলের বড়ো।

শ্রীবিলাস ডাকলো, ওরে কেলো—

কাছেই কোথায় সে খেলছিলো, দৌড়ে এসে বললে, কি বাবা?

—তোদের খুব খিদে পেয়েছে, না রে?

—পেয়েছে।

—খুব?

—হ্যাঁ বাবা, খুব।

—হেবো, সদু, ওরা কোথায়?

—ওইতো, আমি যেখানে খেলছিলাম সেখানেই তো খেলছে। সদুটা পিট্‌পিট্ করে কাঁদছেই কেবল, বলে খিদে পেয়েছে দাদা।

কেলোটা অবলীলাক্রমে মিথ্যে বলে ফেললো।

—আর হেবো, ওটাও কাঁদছে।

—কই আমি তো শুনতে পাইনি?

—পাবে কি গো! কতক্ষণ আর কাঁদবে? দিলাম এক চড়, বললাম মা এলে খাবি ছোঁড়া। তারপরই তো ফট্ করে চুপ্ করে গেল।

—চড় দিলি। শ্রীবিলাস তার লাঠিটা হাতে তুলে নিলো, সেটা দিয়ে মেঝের ওপর এক শব্দ করে বললে, কেন চড় দিলি বল, নইলে আজ তোকে—

যে এত মিথ্যে কথা বলতে জানে, সে তার সাফাই গাইতেও জানে, বিশেষভাবে তার কাছে—যে ব্যক্তি চোখে কিছুই দেখতে পায় না।

কেলো বললে, খুব জোরে নয় বাবা। আমি কেন জোরে মারবো ওকে বলো! এই এরকম আস্তে করে—সে শ্রীবিলাসের গায়ে আস্তে মৃদু একটা আঘাত করে বললে, হাতটা কেবল একটু লাগিয়েছিলাম, আর অমনি কেঁদে ফেলল ভ্যাঁ করে। এমন ছিঁচকাঁদুনে আর কখনও দেখিনি, বাপ্‌রে।

শ্রীবিলাস আবার শান্ত হলে। মাটির ওপর একপাশে লাঠিটা রেখে, আঁচলের গিঁট খুলে পয়সা দুটো বার করলো, বললে, শিরীষ দোকানীর কাছে যা, মুড়ি নিয়ে আয় দু'পয়সার, বুঝলি?

—আচ্ছা।

www.amarboi.com ~

শ্রীবিলাস কেলোর হাতে পয়সা দিয়ে বললে, মুড়ির সাথে একটু তেল আর নুনও চেয়ে নিস্ বাবা, ভুলিস নি যেন, বুঝলি?

কেলো কি আর সেখানে রয়েছে, পয়সা পেয়েই এক্ষুণি দৌড়ে পালিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে—

আসতে দেরী দেখে শ্রীবিলাস ডাকলো ছেলেটাকে, কেলো—

ঘরের পূর্বদিকের দরজার সামনেই একটা ভাঙা উঠোন ছিল, সেখানে বসে ওরা খাচ্ছিলো। শ্রীবিলাস ছিল এ পাশের বারান্দায়, টের পায়নি।

—কেলো!

উত্তর এলো, কি বাবা?

—খেলি?

—হুঁ বাবা।

—হেবো আর সদু, ওরা?

—ওরাও তো খাচ্ছে, কিরে হেবো, খাচ্ছিস না তুই আমার সঙ্গে? কেলো ফিস্‌ফিস্ করে হেবোকে বললে, বল না, চেঁচিয়ে বল।

হেবো চেঁচিয়ে বললে, হুঁ, আমি খাচ্ছি।

শ্রীবিলাস লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের দরজা পেরিয়ে বললে, সবই খেলি?

—সবই তো বাবা।

শ্রীবিলাস তাড়াতাড়ি তাদের কাছে যেতে বললে, একটুও রাখিস নি?

—হুঁ, সে তো আছেই বাবা, এই একেবারে তলায়, এই আধমুঠোও হবে না।

শ্রীবিলাস দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে, পাজী ছেলে, সবই খেয়ে ফেললি? বয়েস আমাদের বেশী হয়েছে বলে বুঝি খিদে পেতে নেই মোটেই? শয়তান ছেলে, হতচ্ছাড়া, তোর হাড়গুলো ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলবো আমি—

কেলো ভয়ে দৌড়ে পালালো।

—বৌ এলে পর বললো, এরকম ছেলে পিঠমোড়া করে বেঁধে চাবুক লাগানো দরকার, শুধু নিজের খাওয়া, সাতদিন না খাইয়ে রাখলে তবে ঠিক হয়—হবে না এমন, ছোটলোকদের সাথে মিশলে এরকম হয়ই। বৌকে কত বলেছি, না ওর কেবল টাকা আর টাকা! আরে বাপু, ইদিকে যে ছেলেপিলেগুলো অমানুষ হয়ে গেল তা চোখে পড়ছে? আবার কোথায় গেল ওটা?

শ্রীবিলাস দরজায়, চৌকাঠে, দেওয়ালে কয়েকবার খুব করে লাঠির আঘাত করে বললে, ছেলেটা কোথায় গেল?

হেরো আর সদু কাছেই ছিল, বাপের রাগ দেখে ভয়ে এতক্ষণ কিছু বলেনি, এখন কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললে, দাদা পালিয়েছে বাবা।

—পালিয়েছে বাবা! ন্যাকামি! যা আমার সুমুখ থেকে, যা বলছি, নইলে মার খেয়ে মরবি বলে দিলাম।

হেবোটা সত্যিই ছিঁচকাঁদুনে, ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে।

শ্রীবিলাস বললে, আবার কাঁদছিস কেন?

www.amarboi.com ~

—দুমুঠো করে আমাদের দিয়ে দাদা আর সবই নিজে খেয়েছে বাবা।

নিজে খেয়েছে। রাগে শ্রীবিলাসের চোখ ফেটে জল আসে আর কি! সবই নিজে খেয়েছে, আর আমরা বুঝি ভেসে এসেছি? দাঁড়া তো আসুক!

শ্রীবিলাস গুম্ হয়ে বসে রইলো।

প্রায় এগারটা অবধি বসে বসেই কেটে গেল। কাজই বা কি? অন্ধের আবার কি কাজ!

কিন্তু শ্রীবিলাসের কাজ আছে, সে দিনরাত কেবল বকে, বারান্দায় আর ঘরে আসা-যাওয়া করে, ছেলেপিলেগুলোকে নিষ্ফল শাসন করে, আরও কত কি করে!

বিন্দুর আসতে দেরী হচ্ছিলো, আজকে বেশী কাজ, উৎসব আয়োজনে রোজকার চেয়ে একটু দেরী হবেই তো।

বেলা বারোটা বাজলো।

ছোট ছেলেদের এমনি একটা স্বভাব, যেমন ভুলে থাকতে পারে খুব, তেমনি অনেক সময় যার জন্যে একবার ঝোঁক চাপলো তার জন্যে একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে।

কেলো ওরাও খিদে ভুলে তখনও কোথায় খেলছিলো।

শ্রীবিলাস নিজেই অস্থির হয়ে উঠলো।

চারদিক প্রায় নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দু'একটা কাকের ডাক।

পাশের ঘরে থাকে সতীশ। এক বাদ্যযন্ত্রের দোকানে কাজ করে। বিয়ে করেছে বেশীদিন হয়নি, এখনও সন্তান হয়নি।

শ্রীবিলাস বললে, ও সতীশ, গলার আওয়াজ যে পাচ্ছি, কাকে কি বলছো? কি হয়েছে?

ওপাশ থেকে জবাব এলো, এইতো দাদা, একটা কাচের গ্লাস গেল ভেঙে। গ্লাসটা ভালো দাম দিয়ে কিনেছিলাম, এই ভেবে যে অতিথি মানুষ-টানুষ এলে পর জল দেওয়া যাবে—তাও আবার ভেঙে গেল। আমরা গরিব মানুষ, আমাদের এমন হলো কি চলে, বলুন?

—কে ভাঙলে?

—ভাঙবে আবার কে? এই হলো কি—

ওদিকে দেওয়ালের ওপাশে সতীশের বৌ তাকে চুপি চুপি বলছে, বাইরে থেকে ভয়ানক তেষ্টা নিয়ে এসে আমায় বললে, বৌ, দাও এক গ্লাস জল, সেই গ্লাসটি করে। দারুণ তেষ্টা পেয়েছে আমার। আনলুম জলের বদলে সরবৎ করে, এসে দেখি তুমি হাসছো, হাত থেকে সরবৎ তো নিলে না, নিলে আমাকে, গ্লাস পড়ে ভেঙে গেল, আমি কি করবো বলো? আমার কি দোষ। আবার হাসছো, আরে, আরে, দ্যাখো, অত ফাজলামি করো না। দেবো মুখের ভিতর এই ভাঙা কাচ ফুটিয়ে—

এদিকে আবার শ্রীবিলাস সতীশের দিক থেকে কোন আওয়াজ না পেয়ে বললে, সতীশ, ও সতীশ—

—কি?

—ক'টা বাজলো বলতে পারো?

www.amarboi.com ~

—একটা হবে আর কি! কেন জিজ্ঞেস করছেন?

শ্রীবিলাস বিনা আয়াসে বলে ফেললো, ওই দ্যাখো, আমিও কিন্তু ওই রকমই আন্দাজ করেছিলুম। ঠিক হলো দেখছি। এখন আমি প্রায়ই পরীক্ষা করে দেখি, কি জানো, ঠিক হয়। কম আশ্চর্যের কথা নয়, কি বলো?

—হ্যাঁ। আমি চান করতে চললুম দাদা।

—ওকি, এখনও খাওনি? হা ভগবান! এমন করলে কি শরীর থাকবে? এই অবেলায় খেয়ে জোয়ান বয়সেই না হয় কোন কিছু তোয়াক্কা না করে চলতে পারো, কিন্তু বুড়ো বয়সে এর জন্যে ভুগতে হবে বাপু। যাও, তাড়াতাড়ি যাও—

অন্যের কাছে খুব ভালো মানুষ সেজে শ্রীবিলাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

একটু পরেই স্বর নামিয়ে বললে, ছেলেগুলো এমন দুষ্টু দ্যাখো, আবার বাবুদের বাসায় গেছে। কি সাহস! কতদিন মানা করলাম, তবু সেই নেঙটা দিগম্বর সেজে উপস্থিত।

শ্রীবিলাস বললে, কোনদিন গাড়ী-ঘোড়ার তলে পড়ে খুন হবে।

—হবেই তো।

শ্রীবিলাস বললে, আর যাস্‌নে কিন্তু। তারপর, বৌ, কেমন খাওয়া-দাওয়া হলো?

—খুব ভালো। আমরা তিনজনেই পেট পুটে খেয়ে এসেছি।

—আর?

—আর এনেছিও তোমার জন্যে।

—তাহলে এবেলা আর রাঁধতে হবে না বলো, শ্রীবিলাস কাছে এগিয়ে বললে, বসবো?

—চান করেছো?

—সেই কখন।

—আচ্ছা দাঁড়াও, পিঁড়ি পেতে দিই।

শ্রীবিলাস তাড়াতাড়ি বললে, না থাক্ থাক্, আমি মাটির ওপর বসতে পারবো।

বিন্দু তাকে খেতে দিতে দিতে বললে, আজ আর ভাত, ডাল, মাছ নয়, পুরনোয় মুখ বিষিয়ে উঠেছে। আজ পাকা লুচি, মাংস, দই, সন্দেশ।

শ্রীবিলাস হঠাৎ একমুখ হেসে উঠলো।

—হাসছো যে?

—এম্‌নি গো; এম্‌নি।

—এম্‌নি কেউ হাসে?

—বৌ; আমি হাসি।

খেতে খেতে হঠাৎ একবার শ্রীবিলাসের গলায় ঠেকলো।

বিন্দু তাড়াতাড়ি বললে, আহা, অত তাড়াতাড়ি খাচ্ছ কেন?

খাওয়া-দাওয়ার পর একটা পান চিবোতে চিবোতে শ্রীবিলাস বললে, সেই কড়িগুলো কোথায় গো বৌ, সেই যে কিনেছিলে, না কোত্থেকে এনেছিলে?

—আছে বুঝি কোনখানে, কেন?

—এসো না একটু খেলি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

বিন্দু বললে, না আমার ঘুম পেয়েছে। সারারাত একরকম ঘুমুইনি। আর তুমিই বা খেলবে কিগো, আমি যদি মিথ্যে চাল দিই?

—না, না, আমি খেলবো, তুমি আনো।

বিন্দু একটা ছেঁড়া পাটী পেতে তার ওপর একটা বালিশ ফেলে শুয়ে পড়লো।

শ্রীবিলাস বললে, তাহলে আমি কি করবো, ঠায় বসে থাকবো?

—রোজ যা করো তাই করো। ঘুমোও, কিছু পেতে দেবো?

—দাও।

শ্রীবিলাস যখন ঘুম থেকে উঠলো, বিন্দু তখন অনেকক্ষণ কাজে চলে গেছে। সন্ধ্যার আর বেশী বাকী নেই।

শ্রীবিলাস সদুকে বললে তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে।

সদু তিন বছরের মেয়ে, কিন্তু কথা বলে পাকা-পাকা। সে তার বাবার হাতের লাঠি ধরে তাকে কলের পরে দিয়ে এলো।

অতগুলো গরিব পরিবারের জন্যে একটিমাত্র কল, তা-ও সারাদিন জল পড়ে যায়।

শ্রীবিলাস হাত-মুখ ধুতে এসেছিলো। তাকে দেখে একজন কল ছেড়ে দিলে। সে হাত-মুখ ধুয়ে আবার ফিরে ঘরে এসে বসলো।

সকলে যে যার কাজ থেকে ফিরছে।

আর শ্রীবিলাস তার ঘরের সামনেকার বারান্দায় বসে আছে চুপ করে। অনুভব করছে মানুষের পদচারণা, কথা বলা। এমনি সে রোজই বসে থাকে একা।

তার চোখের রং ধূসর, মাঝে মাঝে জল পড়ে, মাথার চুলগুলো খুব ছোট করে ছাঁটা। পা'দুটো এক করে হাঁটুর ওপর একহাত রেখে, তার ওপর মুখটি স্থাপন করে সে বসে থাকে। এই সময় কেউ সেধে কথা বললে উত্তর দেয় খুব বিনীতভাবে কিন্তু অতি সংক্ষেপে।

রাত ন'টার সময় বিন্দু এলো। আজ সে একটু সকালেই এসেছে। ছেলেরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু শ্রীবিলাস জেগে আছে। বিন্দু জিজ্ঞেস করলে, ওরা সব খেয়েছে?

—হ্যাঁ। তুমি তো রেখে গেছলেই খাবার। কিন্তু বৌ, আজ তুমি সকালে এসেছ বলে মনে হয়।

বিন্দু বললে, হুঁ। ছুটি দিয়ে দিলে। ওদের বাড়ীতে আজ মেয়েরা নাচবে গাইবে। তারপর মেয়ে-পুরুষে মিলে থিয়েটার করবে গো—কিন্তু আমি তাতে কি কাজে লাগবো বলো? তাই চলে এলাম।

—তা নাচ-গান দেখে এলে না কেন?

বিন্দু মুচ্‌কি হেসে বললে, যাবে?

—কি বলো? এখন? এত রাতে?

—এত রাতেই তো এলাম। তাছাড়া আমার ওসব লোকের ভয় নেই।

খেয়ে-দেয়ে শ্রীবিলাস বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বললে, নেই কেন?

বিন্দুর গরমটা সত্যি একটু বেশী, সে বাইরে গিয়ে বসলো।

একটু ঝিরঝিরে বাতাস বাইরে পাওয়া যায় বটে। কিছুদূরেই একটি মাধবলীতার গাছ আছে, তাতে অজস্র ফুল, তা থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছে মাঝে মাঝে বাতাসের সঙ্গে ভেসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!www.amarboi.com ~

বিন্দু বললে, কারণ আমি জানি, আমি সত্যি, ওরা মিথ্যে। ওরা ভীতু।

তবে কাকে ভয় করো শুনি?

বিন্দু বললে, তোমাকে।

শ্রীবিলাস শুয়েছিল, উঠে পড়লো, ধীরে ধীরে বাইরে এসে বললে, আমাকে কেন?

বিন্দু ফিক করে হেসে বললে, ভয় করবো না তো কি? এই দ্যাখো, ছেঁড়া কাপড়, তালি দিয়ে সেলাই করে কোনরকমে পরি। কিছুতেই আর সংসার চালাতে পারি না। এইতো আজ অর্ধেক মাস মাত্র গেছে, আমার কাছে মোটে একটি টাকা। ঘরে শুয়ে আছে তিন ছেলে-মেয়ে। ওরা বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু ওগো, তোমার চোখে কি ঘুম নেই? তোমার চোখের আগুন নেবাও, আমি তো আর পারিনে।

—আমি এখন শোবো না।

—না, আমার শুতে ইচ্ছে করছে না।

শ্রীবিলাস কাতরস্বরে বললে, দ্যাখো, আমি অন্ধ মানুষ, কত দুঃখ। তার ওপর আমাকে আরও কষ্ট দিয়ে লাভ কি? বিন্দু, ও বিন্দু—

—না, না, আমাকে আর ডেকো না। এই বয়সে আর অত সোহাগের ডাক ভালো লাগে না। একটা রাতও....

—অত অহংকার ভালো নয়।

—আরে, এতে অহংকারের কি হলো?

শ্রীবিলাস শক্ত গলায় বললে, তুই কি সারারাত ওখানেই দাঁড়িয়ে কাটাবি?

বিন্দু চুপ করে রইলো।

—আমি চোখে দেখতে পাই না বলে মজা পেয়েছিস বুঝি? খুব মজা না, খুব মজা?

কাছেই ছিল লাঠি, শ্রীবিলাস ভয়ানক রেগে সেটা ছুঁড়ে মারলো আন্দাজে।

বিন্দু এবার হেসে উঠলো। লাঠিটা গায়ে লাগেনি। সে তা উঠিয়ে রেখে দিলে ঘরের এককোণে।

শ্রীবিলাস উঠে দাঁড়ালো, কাঁপতে কাঁপতে বিন্দুকে ধরবার জন্যে রুখে এলো, কিন্তু বিন্দু নিঃশব্দে সরে এসেছে আর এক দিকে।

একটা পুরনো বাক্সের সাথে শ্রীবিলাস খেলো ধাক্কা, আছাড় খেয়ে পড়লো, তারপর, আশ্চর্য—কেঁদে উঠলো ডাক ছেড়ে, আমাকে মেরে ফেললে রে, ওই রাক্ষুসি আমাকে মেরে ফেললে রে।

আশেপাশে অনেক লোকজন, তারা শুনতে পেলে কি মনে করবে, হয়তো ভীড় জমবে এসে এই রাতে, বিন্দু ভয় পেয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি শ্রীবিলাসের কাছে এলো, হাঁটু গেড়ে বসলো, তার হাত ধরে বললে, চুপ চুপ; কেন এমন করছো? এই দ্যাখো, আমি একটুও ভয় পাই না তোমাকে।

শ্রীবিলাসের চেঁচামেচি এক মুহূর্তে গেল থেমে, ব্যথা গেল উড়ে।

বিন্দু দরজা বন্ধ করলো।

আবার ভোরও হলো, কেউ না উঠতেই শ্রীবিলাসও উঠলো, আকাশে না-দেখা সূর্যকে প্রণামও করলো, পরলোক-বিষয়ক একটি গানও ধরলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!৩৪৭www.amarboi.com ~

সোমেন চন্দকে নিয়ে আলোচিত গ্রন্থ

(১) প্রাচীর—কবিতা সংকলন, মার্চ ১৯৪২। প্রকাশক দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশন। ১১ জন কবির কবিতা সংকলন। লিখেছিলেন—অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মণীন্দ্র রায়, দেবীপ্রাসাদ চট্টোপাধ্যায়, অবন্তী স্যানাল, শংকর ঘোষ, নীহার দাশগুপ্ত ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

(২) অগ্নিদিনের কথা—সতীশ পাকড়াশী। নবজাতক প্রকাশন, ১লা বৈশাখ, ১৩৭৮।

(৩) ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ—জ্ঞান চক্রবর্তী। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা। ১৯৬৮।

(৪) বাংলায় ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য—সমীক্ষা ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫।

(৫) একুশের উপন্যাস গ্রন্থ—প্রকাশক বাংলা একাডেমি, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ২১শে

১. আমার দাদা সোমেন চন্দ; গণশক্তি, ৭ মার্চ ১৯৯৩ গোকুল চক্রবর্তী সোমেন চন্দের মৃত্যু; সংবর্তন সাহিত্যপত্র, ১৯৭৭ গোপাল হালদার ১. সংকেত ; অরণি, ৪ মার্চ ১৯৪৩

২. ভূমিকা (বনস্পতির গল্পগ্রন্থের); পৌষ ১৩৫১, মডার্ন পাবলিশার্স গোবিন্দ ভট্টাচার্য মৃত্যু ভয়ে ছুঁয়ে থাকি; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০ চৈতন্য চক্রবর্তী সোমেন চন্দের সাহিত্যচিন্তা; সংশপ্তক, জুন ১৯৭৭ চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় সোমেন চন্দ-যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার; সংশপ্তক, জুন ১৯৭৭ চিত্ত ঘোষ তোমরা কি জানো; সাহিত্যচিন্তা, বৈশাখ ১৩৯৪ জামিল শরাফী সোমেন চন্দ; সাপ্তাহিক কালান্তর, ১৮ জুলাই ১৯৮১ চিত্ত মণ্ডল আজ সোমেন চন্দের জন্মদিন; সত্যযুগ ৭ জুন ১৯৭৬ জোতি বসু অতিতের কথা, গণশক্তি ১৬ নভেম্বর ১৯৮০ জ্ঞানচক্রবর্তী সোমেন চন্দ; একতা সাপ্তাহিক, ঢাকা, ১০ মার্চ ১৯৭৩ তরুণ স্যানাল অগ্নুৎপাত. না ফাটল; সাহিত্যচিন্তা ১৩৯৪ তুহিনকান্তি বর্ম্মন রায় সোমেন চন্দ স্মরণে; সংশপ্তক, জুন ১৯৭৭ তুলসী মুখোপাধ্যায় ১. সোমেনের উদ্দেশ্যে; সাহিত্যচিন্তা, বৈশাখ ১৩৯৪

৩. ক্ষমা কর-সোমেন চন্দ উত্তরকালের চোখে; সাহিত্যচিন্তা, বৈশাখ ১৩৯৪ তমোঘ্ন মিত্র সোমেন চন্দ : জীবন ও সাহিত্য; গণশক্তি, ৩০ মে ১৯৮৬ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁপে; সাহিত্যচিন্তা, ১৯৯৪ দীপেন রায় সোমেন চন্দকে; সাহিত্যচিন্তা মে ১৯৯০

দিলীপ মজুমদার

১. সোমেন চন্দ; সংশপ্তক, জুন ১৯৭৭
২. সোমেন চন্দ, বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্যিক শহীদ; সত্যযুগ, ৪ জুন ১৯৭৬
৩. সোমেন চন্দের গল্প; শিল্পশৈলী, সাপ্তাহিক বাংলা, ১৯৭৭ (৮ সংখ্যায়)
৪. সোমেন চন্দের কয়েকটি গল্প; শিল্পশৈলী; আগুনের অক্ষর, আগস্ট ১৯৯২
৫. মুজফ্‌ফর আহমদ ও সোমেন চন্দ; গণশক্তি, ৫ জুন ১৯৯৫

দীপক পাল সোমেন চন্দের গল্পে মেয়েরা; ভুলু, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪০০

দীপালি স্যানাল সোমেন চন্দের গল্প; গণশক্তি,৫ জুন ১৯৯৫

দিলীপ কোনার সতেজ সার্বভৌম উপস্থিত; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

দুর্গাদাস সরকার সোমেন চন্দের উপন্যাস 'বন্যা'; বাংলাদেশ, মে ১৯৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও!৩৪৮www.amarboi.com ~

নারায়ণ চৌধুরী

১. মুখবন্ধ;সোমেন স্মরণিকা, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

২. ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের প্রথম বলি সোমেন চন্দ; পশ্চিমবঙ্গ, ১০ মার্চ ১৯৭৮ নারায়ণ সরকার মৃত্যুকে নিহত কোরে উজ্জ্বল অরুণি; প্রেক্ষণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

নিখিলেশ বিশ্বাস

১. প্রথম সাহিত্যিক শহীদ; গণশক্তি, ৫ অক্টোবর ১৯৮৬

২. সোমেন চন্দ; জীবন ও সাহিত্য; গণশক্তি, ১৬ নভেম্বর ১৯৮৬

নীতীশ বিশ্বাস

১. কলকাতায় সোমেন চর্চা; পশ্চিমবঙ্গ, ১০ মার্চ ১৯৭৮

২. বিপ্লবী কথা সাহিত্যিক সোমেন চন্দ, নন্দন, জুলাই— ৮৫

৩. কমরেড সোমেন : তোমার পদাঙ্কে চিনি পথ; গণনাট্য, শারদ সংখ্যা ১৯৮৮

৪. আদর্শবাদী কথাশিল্পী সোমেন; দৈনিক বসুমতী, ৯ জুলাই ১৯৯০

৫. বিপ্লবী ও শিল্পী সোমেন; পথসংকেত, জুন-আগস্ট ১৯৯১

৬. সোমেন চন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী— সাথী হাতিয়ার ১৯৯৭ ও উবুদশ ১৯৯৯

৭. সোমেন চন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী দুই বাংলার সোমেন চর্চা; আগুনের অক্ষর, আগস্ট ১৯৯২, সাথী হাতিয়ার ১৯৯৭ ও উবুদশ ১৯৯৯

৮. উত্তর কালের চোখে সোমেন চন্দ— সাহিত্যচিন্তা, গণশক্তি, রবীন্দ্রভারতী ছাত্র সংসদ পত্রিকা উত্তরধ্বনি (শিলিগুড়ি)

নেপাল মজুমদার ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ সোমেন চন্দ, সোমেন স্মরণিকা ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ ও পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

নীহার দাশগুপ্ত আগন্তুক; প্রাচীর, মার্চ ১৯৪২

নির্মল ঘোষ সোমেন্দ্রকুমার চন্দ; নূতন লেখা, বৈশাখ ১৩৪৯

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

১. সোমেন চন্দের জীবন ও সাহিত্য; সত্যযুগ, ২৬ মে ১৯৮০

২. সোমেন সাহিত্যের উৎস ও বৈশিষ্ট্য; গণশক্তি, ৮ মার্চ ১৯৮৭

প্রণব ঘোষ সোমেন চন্দ প্রসঙ্গে; গণশক্তি, ৫ জুন ১৯৮৮

পলাশ ভট্টাচার্য সোমেন চন্দের স্মৃতিতে; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

পার্থ রাহা পঁচিশে বৈশাখের কবিতা (সোমেন চন্দকে); সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

প্রসাদ বসু শহীদ কথাশিল্পী সোমেন চন্দ; দৈনিক রাজপথ, ১৪ জুলাই ১৯৯৬

পরিমল ঘোষ ফ্যাসীবাদের শিকার এক উজ্জ্বল তরুণ; সত্যযুগ, ৫ জুন ১৯৭৭

বাসুদেব দেব বিষয় : সোমেন চন্দ; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

বিষ্ণু দে ইতিহাস; প্রাচীর, মার্চ ১৯৪২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

বুদ্ধদেব বসু

১. প্রতিবাদ; প্রাচীর, মার্চ ১৯৪২

২. কবিতা কাগজের সম্পাদকীয়; কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৯

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সোমেন চন্দ : একটি স্বপ্ন; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যারা চলে যায় তারা ভাল থাকে; সংশপ্তক, ১৯৭৭

বীরেন্দ্র গুপ্ত সোমেন চন্দ; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

বৃন্দাবন দাস তুমি জানতে; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংকেত ও অন্যান্য গল্প প্রসঙ্গে; পরিচয়, চৈত্র ১৩৪৯

বিশ্বজিৎ ঘোষ

১. সোমেন চন্দের জীব ও প্রসঙ্গকথা; সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

২. ঢাকায় প্রগতি লেখক আন্দোলন; প্রসঙ্গত সোমেন চন্দ; ঐকতান, গবেষণা পত্র, প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের অর্ধশতাব্দী পূর্তি স্মারক সংখ্যা ১৯৮৬

৩. সোমেন চন্দ : পত্রগুচ্ছ; সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

৪. রচনাবলী সম্পাদনা : বাংলা একাডেমি ঢাকা

ভবতোষ দত্ত গল্পকার সোমেন চন্দ; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

মমতা সেন সোমেন চন্দ— একটি নাম; একসাথে, ভাদ্র ১৪০২

মণীন্দ্র রায়

১. কেন লিখি; প্রাচীর, মার্চ ১৯৪২

২. সোমেন চন্দ ৭০; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

মুকুল গুহ বাংলা সাহিত্যের অহংকার সোমেন চন্দ; পাক্ষিক বসুমতী, ১৬ জুন ১৯৯৩

মণিভূষণ ভট্টাচার্য সোমনে চন্দকে মনে রেখে; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯৩

মনীষীমোহন রায় সোমেন চন্দকে মাথায় রেখে; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় একটি মৃত্যু : অনেক জীবন; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

মুজফ্‌ফর আহমদ ভূমিকা— সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ; ২৬ মে ১৯৭৩

মোজাম্মেল হোসেন সংকেত গল্পের নাট্যরূপ; সৃজনী সংকলন, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

১. সোমেন চন্দের সাহিত্য মূল্যায়ন; সত্যযুগ, ১৩ জুন ১৯৭৬

২. সোমেন চন্দ বনস্পতির প্রতিশ্রুতি; পশ্চিমবঙ্গ, ১০ মার্চ ১৯৭৮

রাম বসু

১. সোমেন চন্দকে; সংশপ্তক, জুন ১৯৭৭

২. সোমেন চন্দকে; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

রবীন সুর সোমেন চন্দ; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিন পাল প্রসঙ্গ ইঁদুর : চারটি গল্প; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০
রাণা চট্টোপাধ্যায় সোমেন চন্দকে; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

রণেশ দাশ গুপ্ত

১. বিদ্রোহী সোমেন মানস; সংশপ্তক, জুন ১৯৭৭
২. স্মরণের গ্রন্থি; প্রতিরোধ স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৫০
৩. সোমেন জন্মবার্ষিকীতে কয়েকটি প্রস্তাব; কালান্তর, ৩০ জুন ১৯৮০
৪. বাংলা ছোটগল্প ও সোমেন চন্দ; সাহিত্যচিন্তা, এপ্রিল ১৯৮১
৫ সোমেন চন্দ; দুই পর্যায়ের আন্দোলন ও দায়িত্ব; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০
৬. প্রগতি লেখক সোমেন চন্দ; দৈনিক বসুমতী, ৯ জুলাই ১৯৯০
৭. সোমেন চন্দের পরিচিতি-পটভূমি; ভূমিকা-সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ; কালিকলম, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৭৩
৮. বাংলা ছোট গল্পের সুকান্ত— সোমেন চন্দ; গণসাহিত্য, মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৩, ঢাকা
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সোমেন চন্দের রচনায় জীবনপ্রত্যয়; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

১. সোমেন চন্দের 'বন্যা' প্রসঙ্গে; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০
২. সোমেন চন্দ স্মরণে; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৮৭
শংকর ঘোষ প্রতিজ্ঞা; প্রাচীর, মার্চ ১৯৭৭
শ্যামসুন্দর দে যে চেয়েছিল; সাহিত্যচিন্তা, ১৯৯০
শংকর ব্রহ্ম শ্রীচরণেষু সোমেন চন্দ; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৮৭

শম্ভু বসু সোমেন চন্দ

শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক : রণক্ষেত্রে, সাহিত্যক্ষেত্রেও; গণশক্তি, ৫ মার্চ ১৯৯৫
সতীশ পাকড়াশী সোমেন চন্দ; পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৪৯

সরদার ফজলুল করিম

১. সংকেত; প্রতিরোধ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০
২. সোমেন হত্যাকাণ্ড এবং সেকালের এক কিশোর মনের প্রতিক্রিয়া; চল্লিশের দশকের ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯৪, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা
সুধীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রগতি সাহিত্যের ধারায় সোমেন চন্দ; কুরুক্ষেত্র, ডিসেম্বর ১৯৮১

স্নেহাংশু কান্ত আচার্য

সোমেন চন্দ; সংশপ্তক, জুন ১৯৭৭
স্বপন ঘোষ সোমেন চন্দ ও কমুনিস্ট পার্টি; সংশপ্তক, জুন ১৯৭৭
সত্যদাস মঙ্গল শরণাগতির প্রতি সোমেন চন্দ; সংশপ্তক, জুন ১৯৭৭
সুশান্ত দাস বিপ্লবী কথাশিল্পী সোমেন চন্দ; শিক্ষা ও সাহিত্য, এ বি টি এ, এপ্রিল ১৯৯৬
সরোজমোহন মিত্র ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রাম ও সোমেন চন্দ; এসময়, এপ্রিল ১৯৯৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সানাউল্লাহ লাবলু শেকড়ের সন্ধানে সোমেন চন্দ; অতলান্তিক, প্রবন্ধ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৪, ঢাকা
সরলানন্দ সেন ২৪শে ফাল্গুন; প্রতিরোধ, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯
সমীর হোড় প্রতিবেদন; প্রতিরোধ, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

সুমিতা চক্রবর্তী
১. সোমেন চন্দের ছোট গল্প; জীবনবোধ; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০
২. সোমেন চন্দের ছোট গল্প; একসাথে, শারদ সংখ্যা, ১৪০৩
সংযুক্তা গুহ বন্দ্যোপাধ্যায় সোমেন চন্দের রচনায় সৃজনশীলতা; আগুনের অক্ষর, আগস্ট ১৯৯২
সমর সেন নববর্ষের প্রস্তাব; প্রাচীর, মার্চ ১৯৪২
সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বেচ্ছাবাহিনীর গান; প্রাচীর, মার্চ ১৯৪২
সুকান্ত ভট্টাচার্য ছুরি (১৯৪৪ সালে লিখিত); সুকান্ত সমগ্র
সিদ্ধেশ্বর সেনগুপ্ত সোমেন চন্দ; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত সোমেন চন্দ; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০
সামসুল হক নীল মানুষের কথা; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০
সমীর রায় সোমেন চন্দ; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০
সন্তোষ চক্রবর্তী স্মরণীয়েষু; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০
সমীর মুখোপাধ্যায় সোমেন চন্দের স্মৃতিতে; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০
সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত জীবন শিল্পী সোমেন চন্দ; গণশক্তি, ৮ মার্চ ১৯৮৭
সুরত রাহা তবুও সোমেন চন্দ; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০
সুব্রত রাহা তবুও সোমেন চন্দ, কালান্তর ৭ জুন ১৯৭৬
সৌরী ঘটক সোমেন চন্দ, কালান্তর ৭ জুন ১৯৭৬
সুদীপ চক্রবর্তী সোমেনের জন্য দিবারাত্রির গল্প; সাহিত্যচিন্তা, মে ১৯৯০

সাধন পাল সোমেন চন্দ
সুব্রত রুদ্র সোমেন চন্দের গল্প
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সোমেন চন্দের স্মরণে; আগুনের অক্ষর, আগস্ট ১৯৯২
ক্ষুদিরাম দাস গল্পকার সোমেন চন্দ; সোমেন স্মরণিকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

ড. সফিউদ্দিন আহমদ
মার্কসবাদী সাহিত্যিক সোমেন চন্দ, বই : আগষ্ট ২০০৯
বিপ্লবী সোমেন চন্দ : প্রাঙ্গণ, ২০০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~